থ্রিলার

দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট

সিডনি শেলডন

অনুবাদ অনীশ দাস অপু

এক অপূর্ব সুন্দরী ফরাসী অভিনেত্রী, যার আবেগ এবং প্রতিশোধের বাসনা তাকে প্যারিসের বস্তি থেকে তুলে নিয়ে যায় প্রভাবশালী এক কোটিপতির শয়নকক্ষে... এক ডায়নামিক গ্রীক টাইকুন যিনি কখনোই অপমানের কথা বিস্মৃত হন না। ক্ষমা করেন না তাঁর শত্রুকে.... এক সুদর্শন যুদ্ধ নায়ক যাকে দেখলেই প্রেমকাতর হয়ে ওঠে নারী... এবং এক নিস্পাপ তরুণী, যার ভালোবাসার স্বপ্নের রূপান্তর ঘটে দুঃস্বপ্নের রাতে....

প্যারিস এবং ওয়াশিংটন, হলিউড এবং গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে আশ্চর্য গতিশীল কাহিনীর প্লট, যাতে আছে প্রেম, ষড়যন্ত্র এবং দূর্নীতি, যেখানে শাস্তি সবসময় অপরাধকে ছাড়িয়ে যায়...

'শ্বাসরুদ্ধকর, গ্ল্যামারাস, স্মরণীয় এবং দমবদ্ধ করা উপন্যাস'

ঔপন্যাসিক **আরভিং ওয়ালেস**।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

ওয়ার্ল্ড বেস্টসেলার রোমাঞ্চোপন্যাস

দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট

মূল : সিডনি শেলডন

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪৪০.০০ টাকা

THE OTHER SIDE OF MIDNIGHT a thriller By Sidney Sheldon
Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email : anindyaprokash@yahoo.com

First Published : February 2008
Second Print : February 2011

Price : Taka 440.00
US $ 10

ISBN978-984-414-047-09

উৎসর্গ

সুমনা সাবরিনা
আমার বই পেলে যে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়

ভূমিকা

দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট সিডনি শেলডনের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সাড়া-জাগানো উপন্যাস। প্রেম-সংঘাত-ষড়যন্ত্রে পূর্ণ এ আশ্চর্য গতিশীল থ্রিলার একবার ধরলে পড়া শেষ না করে উঠতেই পারবেন না। ঔপন্যাসিক আরভিং ওয়ালেস বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'দমবন্ধ করা কাহিনী'। গল্পের প্রয়োজনেই অনিবার্যভাবে এসেছে সেক্স এবং কাহিনীর রস যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য আমি কোথাও সেন্সর করিনি। কাজেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের বইটি পড়া বারণ।

অনীশ দাস অপু

মুঠোফোন : ০১৭১২৬২৪৩৩৬

ভূমিকা

এথেন্স ১৯৪৭

নিজের গাড়ির ধুলোমাখা উইন্ডশিল্ড দিয়ে এথেন্সের অফিস ভবন এবং হোটেলের দিকে তাকিয়ে আছে চিফ অভ পুলিশ জর্জিয়স স্কুরি।

'কুড়ি মিনিট,' হুইলে বসা পুলিশম্যান বলল, 'রাস্তায় জ্যাম নেই।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল স্কুরি। স্থিরদৃষ্টি ভবনের দিকে। একধরনের ইল্যুশন কাজ করে তার মধ্যে। আগস্টের প্রখর সূর্য তীব্র উত্তাপ ছড়াচ্ছে। একটা ঢেউ যেন ঘিরে রেখেছে ভবনগুলোকে। ইস্পাত এবং কাচের জলপ্রপাত যেন গড়িয়ে নামছে রাস্তায়।

দুপুর বারোটা দশ। এখনই রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য, অল্প কজন পথচারী হেঁটে যাচ্ছে। তবে তারা পুলিশের গাড়িগুলোর দিকে তেমন আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে না। গাড়ি তিনটে পুবদিকে, হেলেনিকন বিমানবন্দরের দিকে ছুটছে। এয়ারপোর্ট এথেন্সের কেন্দ্রস্থল থেকে কুড়ি মাইল দূরে। প্রথম গাড়িতে রয়েছে চিফ স্কুরি। সাধারণ কোনো ব্যাপার হলে চামড়ায় ফোস্কা পড়া এমন গরমে বাইরে বেরুত না সে। দায়িত্বটা অধীনস্থ কারো ওপর গছিয়ে দিয়ে নিজের ঠাণ্ডা অফিসে আরাম করত। তবে ব্যাপার সাধারণ নয় বলেই নির্দয় সূর্যের চাঁদিফাটা রোদের মধ্যে তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে।

দুটো ব্যক্তিগত কারণে স্কুরি এখন রাস্তায়। প্রথমত, আজ বিভিন্ন দেশ থেকে ভিআইপিরা আসছেন। তাঁদেরকে যথাযথভাবে স্বাগত জানানো হল কিনা তা দেখার দায়িত্ব স্কুরির। দ্বিতীয়ত, বিমানবন্দরে আজ গিজগিজ করবে বিদেশি সাংবাদিক এবং নিউজরিল ক্যামেরাম্যানরা। চিফ স্কুরি নির্বোধ নয়। সে এই সুযোগে ক্যামেরায় নিজের চেহারাটা দেখিয়ে নেবে। পৃথিবীতে নাড়া দেয়ার মতো ঘটনা তার অঞ্চলে ঘটছে আর এ থেকে সুবিধা গ্রহণ না-করার মতো বোকা সে নয়। বিষয়টি নিয়ে সে এ-পৃথিবীতে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুজন মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছে : একজন তার স্ত্রী, অপরজন তার রক্ষিতা। মধ্যবয়সী, কুৎসিত চেহারার অ্যানা তাকে বিমানবন্দর থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে আড়ালে থাকতে। তাহলে কোনো সমস্যা হলেও তাকে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। কিন্তু মেলিনা, তার অপূর্ব সুন্দরী রক্ষিতা পরামর্শ দিয়েছে সুযোগটা

কাজে লাগাতে। সেও একমত যে এরকম ঘটনা স্কুরিকে বিখ্যাত করে তুলতে পারে। সবকিছু যদি ঠিকঠাকভাবে সামাল দিতে পারে স্কুরি, তার বেতন তো বৃদ্ধি পাবেই—ঈশ্বর চাইলে বর্তমান কমিশনার অবসরে যাবার পরে তাকে কমিশনার অভ পুলিশ পদে অধিষ্ঠিত করাও হতে পারে। অন্তত শতবারের মতো স্কুরি ভেবেছে মেলিনা যদি তার স্ত্রী হত আর অ্যানা হত তার রক্ষিতা, তাহলে কেমন হত!

চিন্তাভাবনার মোড়টা অন্যদিকে ফেরাল স্কুরি। এয়ারপোর্টে কোনোরকম ঝামেলা না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে তাকে। নিজের সেরা একডজন লোক নিয়ে চলেছে সে। তবে মূল সমস্যাটা হবে প্রেস নিয়ে। সারাবিশ্ব থেকে এতবেশি সাংবাদিক এথেন্সে ভিড় করেছে, রীতিমতো বিস্মিত স্কুরি। সে নিজেই তো ছ'বার সাক্ষাৎকার দিল। একেকবারে একেক ভাষায়। তার সাক্ষাৎকার অনূদিত হয়েছে জার্মান, ইংরেজি, জাপানি, ফরাসি, ইটালি এবং রুশ ভাষায়। সে যখন নিজের নতুন সেলেব্রিটির ভূমিকা উপভোগ করতে শুরু করেছে, ওই সময় কমিশনার তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন প্রকাশ্যে চিফ অভ পুলিশের মন্তব্য করা এখনো সংঘটিত না-হওয়া হত্যা-মামলার মতো। স্কুরি জানে কমিশনার একথা বলেছেন স্রেফ ঈর্ষায়। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পত্রিকায় আর সাক্ষাৎকার দেবে না। তবে সে এয়ারপোর্টে পৌঁছার পরে যদি ক্যামেরাম্যানরা সেলেব্রিটিদের ছবি তোলার সময় তার ছবিও তুলতে থাকে, কমিশনার নিশ্চয় কোনো অনুযোগ করতে পারবেন না।

সিগরু এভিনিও দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি, মোড় নিল বামে, সাগরের পাশ ধরে ফালেরনের দিকে চলল। স্কুরির পেটের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল। এয়ারপোর্ট আর পাঁচ মিনিটের পথ। সেলেব্রিটিদের তালিকায় চোখ বুলাল সে। সন্ধ্যা নামার আগেই এরা এথেন্সে পৌঁছাবেন।

আরমন্দ গটিয়ের এয়ার-সিকনেসে ভুগছে। নিজেকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে, জানের মায়া তার প্রবল। দুর্ঘটনার ভয়ে আকাশে উড়তে সে ভয় পায়। গ্রীষ্মের সময় উপকূলে বাতাস একটু জোরেই বয়, প্লেনও দোলে। এতেই ভয়ানক নার্ভাস গটিয়ের। বমি বমি লাগছে তার। সে লম্বা অত্যন্ত রোগা-পাতলা একজন মানুষ। কপালটা উঁচু, চেহারায় রুক্ষভাব। কুড়ি বছর বয়সেই গটিয়ের 'লা নুভেল ভেগ' দিয়ে ফ্রান্সের চলচ্চিত্রজগৎ জয় করে নিয়েছে। এবং নাটক পরিচালনায় আরো বেশি নাম কামিয়েছে। সে এখন পৃথিবীর সেরা পরিচালকদের একজন। বিমানের সুন্দরী স্টুয়ার্ডেসরা তাকে দেখেই চিনে ফেলেছে। ইশারা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে যে-কোনো দরকারে গটিয়ের তাদেরকে পেতে পারে। বিমানযাত্রার পুরোটা সময়

অসংখ্য যাত্রী এসে তাকে বলেছে তারা তার ছবি ও নাটক সাংঘাতিক পছন্দ করে। তবে গটিয়ের একমাত্র আকর্ষণবোধ করেছে ইংলিশ ইউনিভার্সিটির অপূর্ব সুন্দরী ছাত্রীটির প্রতি। মেয়েটি অক্সফোর্ডের সেন্ট অ্যান-এ যাচ্ছে। সে নাট্যকলা নিয়ে থিসিস লিখছে এবং সাবজেক্ট হিসেবে বেছে নিয়েছে আরমন্দ গটিয়েরকে। তাদের আলাপচারিতা ভালোই চলছিল। তবে ছন্দটা কেটে গেল নোয়েল পেজ-এর প্রসঙ্গ অবতারণা করায়।

'আপনি ওর ছবি পরিচালনা করেছেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ছাত্রী, 'আমি ওর ট্রায়াল দেখব। ব্যাপারটা সার্কাসের মতো লাগছে আমার কাছে।'

গটিয়ের আসন খামচে ধরল। নিজের প্রতিক্রিয়ায় নিজেই বিস্মিত। এতদিন পরেও নোয়েলের স্মৃতি তাকে তীব্র বেদনার্ত করে তোলে। ধারালো ছুরির ফলার মতো ধরতে পারেনি, কোনোদিন পারবেও না। তিনমাস আগে সে যখন খবরের কাগজে জানতে পারল গ্রেফতার হয়েছে নোয়েল, আর কিছু ভাবতে পারেনি গটিয়ের। সে নোয়েলকে তার করেছে, চিঠি লিখে আশ্বাস দিয়েছে তার পক্ষে যা-যা করা সম্ভব করবে। তবে কোনো জবাব পায়নি। নোয়েলের ট্রায়ালে হাজির হওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না। কিন্তু দমিয়ে রাখতে পারেনি নিজেকে। নিজেকে শুনিয়েছে সে আসলে নোয়েলকে দেখতে চায়, মেয়েটি কতটা বদলে গেছে। দীর্ঘদিন তারা একই ছাদের নিচে থেকেছে। অবশ্য ট্রায়ালে হাজির থাকার আরো একটা কারণ আছে। গটিয়েরের নির্মাতা অংশ এ নাটক দেখতে চায়, বিচারক যখন রায় দেবেন নোয়েল বেঁচে থাকবে নাকি তাকে মরতে হবে, ওই সময় ওর চেহারাটা দেখতে চায় সে।

ইন্টারকমে পাইলটের ধাতবকণ্ঠ ভেসে এল। তারা তিন মিনিটের মধ্যে এথেন্সে অবতরণ করছে। নোয়েলকে দেখতে পাবার উত্তেজনায় বমি বমি ভাবটা চলে গেল আরমন্দ গটিয়েরের।

কেপটাউন থেকে এথেন্সে যাচ্ছে ড. ইসরায়েল কাৎজ। সে কেপটাউনের আবাসিক নিউরো সার্জন এবং গ্রুট স্কার-এর চিফ অভ স্টাফ। এটা শহরের অন্যতম বৃহৎ নতুন হাসপাতাল। বিশ্বের সেরা নিউরো-সার্জনদের একজন ড. কাৎজ। মেডিকেল জার্নালগুলো ভরা থাকে তাঁর নতুন কর্মকাণ্ডের খবরে। তাঁর রোগীদের মধ্যে রয়েছেন একজন প্রধানমন্ত্রী, একজন প্রেসিডেন্ট এবং একজন রাজা।

ড. কাৎজ BRAC বিমানের আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার উচ্চতা মাঝারি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, গভীর বাদামি চোখ, লম্বা, নমনীয় একজোড়া হাত। ক্লান্তিবোধ করছে সে। ডানপায়ে সেই চিনচিনে ব্যথাটা ফিরে এসেছে আবার। ছ'বছর আগে এক দানব কুঠারের কোপে পা-টি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

লম্বা একটা দিন ছিল ওটা। ড. কাৎজ প্রায় ভোর পর্যন্ত একটা অপারেশন করেছে, আধডজন রোগী দেখেছে, তারপর হাসপাতালের বোর্ড অভ ডিরেক্টরদের বৈঠক সেরে বেরিয়েছে। এথেন্সে যাবে ট্রায়াল দেখতে। তার বউ তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে।

'তুমি ওর জন্য এখন কিছুই করতে পারবে না, ইসরায়েল।'

হয়তো ঠিকই বলেছে সে। কিন্তু একবার নোয়েল পেজ তার জীবন বাঁচিয়েছে। তাকে ঋণী করে রেখেছে। নোয়েলের কথা ভাবছে সে, সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা ফিরে এল। নোয়েলের সঙ্গে থাকার সময় এরকম হত তার। এ এক রোমান্টিক-ফ্যান্টাসি অবশ্যই। কারণ ওই দিনগুলো আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। ড. ইসরায়েল কাৎজ টের পেল ঝাঁকি খেয়েছে প্লেন, চাকা নেমে গেছে। নামতে শুরু করেছে আকাশযান। জানালা দিয়ে তাকাল সে। নিচে কায়রো। সে এখান থেকে TAF বিমানে চড়বে। যাবে এথেন্সে, নোয়েলের কাছে। ও কি খুনের দায়ে ফেঁসে যাবে? প্লেন রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে, আরেকটি ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল ড. কাৎজ-এর। প্যারিসে এ খুনটাও করেছে নোয়েল।

ইয়টের রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ্পি সোরেল। দেখছে ক্রমে কাছিয়ে আসছে পিরাউস জেটি। সাগরভ্রমণ পছন্দ করে ফিলিপ্পি। ভক্তদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তির সেরা উপায় এটা। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতাদের অন্যতম সে। বক্স-অফিসে তার নামেই ছবি চলে। তবে খুব একটা সুদর্শন বলা যাবে না ফিলিপ্পি সোরেলকে। চেহারাটা বক্সারদের মতো, ডজনখানেক ম্যাচে হারা বক্সার। নাকটা ভাঙা। চুল পাতলা হয়ে এসেছে। হাঁটার সময় সামান্য খোঁড়ায় সে। তবে এসবে কিছুই এসে যায় না। কারণ ফিলিপ্পি সোরেলের রয়েছে দুর্দান্ত সেক্স-অ্যাপিল। সে শিক্ষিত, মৃদুভাষী, অত্যন্ত ভদ্র, ট্রাক-ড্রাইভারের মতো চেহারা এবং শক্তসমর্থ জওয়ানি মেয়েদেরকে পাগল করে তোলে। জেটির কাছে চলে এসেছে ইয়ট, সোরেল আবার ভাবল এখানে সে কী করতে এসেছে। সে নোয়েলের ট্রায়াল দেখতে একটা ছবির কাজ বাদ দিয়েছে। সে খুব ভালোই জানে আদালতকক্ষে প্রতিদিন যাওয়া মানে প্রেসের সহজ টার্গেটে পরিণত হওয়া। ওখানে থাকছে না তার প্রেস-এজেন্ট কিংবা ম্যানেজার। সাংবাদিকরা তার উপস্থিতির মাজেজা নির্ঘাত উল্টো ধরে নেবে, ভাববে সাবেক রক্ষিতার মার্ডার ট্রায়ালে হাজির হয়ে পাবলিসিটি পেতে চাইছে সোরেল। ট্রায়ালে হাজির হওয়া সোরেলের জন্য বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হলেও সে নোয়েলকে আবার দেখতে চায়। নোয়েলকে সাহায্য করতে চাইছে সে। জেটির শান-বাঁধানো বাঁধে ঢুকে পড়ল ইয়ট, সোরেল ভাবছে নোয়েলকে নিয়ে। ভাবছে যাকে সে ভালোবাসত,

যার সঙ্গে সে বসবাস করত। শেষে এই সিদ্ধান্তে এল : নোয়েল হাসতে হাসতে খুন করতে পারে।

ফিলিপ্পি সোরেলের ইয়ট যখন গ্রিসের উপকূল অভিমুখে এগোচ্ছে, ওই সময় হেলেনিকন এয়ারপোর্ট থেকে একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে, একটি প্যান আমেরিকান ক্লিপারে বসে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট উইলিয়াম ফ্রেজার। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, ধূসর-রঙা চুলের সুদর্শন পুরুষ, পাথর মুখ, অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কর্তৃত্ব। হাতে ধরা একতাড়া কাগজের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, পড়ছেন না। গত একঘণ্টা তাড়াটা ওভাবেই হাতে ধরে রেখেছেন ফ্রেজার, একটি পাতাও ওল্টাননি। এ সফরের জন্য তাঁকে ছুটি নিতে হয়েছে, কংগ্রেসে একটা সমস্যা চলছে তা ফেলে তিনি চলে এসেছেন। আগামী কটা হপ্তা তাঁর ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাবে জানেন তিনি, তবে এছাড়া উপায়ও ছিল না। এ যেন প্রতিশোধের সফর, ভাবনাটা একধরনের শীতল তৃপ্তি এনে দিল ফ্রেজারের মনে। আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া ট্রায়ালের চিন্তা জোর করে মন থেকে দূর করে দিলেন তিনি, প্লেনের জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরে। অনেক নিচে একটা এক্সকারসন বোট দেখতে পেলেন, গ্রিসের দিকে যাচ্ছে। দিগন্তে ফুটে উঠেছে উপকূল-রেখা।

অগাস্তি ল্যানচন সী-সিকনেসে ভুগছে। সেইসঙ্গে তিনদিন ধরে সিঁটিয়ে আছে আতঙ্কে। সে সিকনেসে ভুগছে, কারণ মার্সেই থেকে ওঠা ওই এক্সকারসন বোট ঝড়ের কবলে পড়েছিল। আর আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকার কারণ তার স্ত্রী যদি জানতে পারে সে কী করছে, খবর আছে ল্যানচনের। অগাস্তি ল্যানচনের বয়স ষাট, মোটা এবং টেকো। গদার মতো ছোট ছোট পা, সারা মুখে ফুটকি, শুয়োরের মতো কুঁৎকুঁতে চোখ, পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সবসময় ঝুলে থাকে সস্তা সিগার। মার্সেইতে একটি পোশাকের দোকানের মালিক ল্যানচন। স্ত্রীকে প্রায়ই শোনায় ধনী মানুষদের মতো ছুটি কাটাতে যাবার সুযোগ তার নেই। অবশ্য ছুটি কাটাতে যাচ্ছেও না সে। যাচ্ছে প্রিয়তমা নোয়েলকে আরেকবার দেখার জন্য। নোয়েল তাকে ছেড়ে চলে যাবার পরে সে মেয়েটির ক্যারিয়ারের সমস্ত খোঁজখবর রেখেছে গসিপ কলাম, খবরের কাগজ এবং পত্রিকা ঘেঁটে। নোয়েল যখন প্রথম নাটকে অভিনয় করল, সে ট্রেনে চেপে প্যারিসে গিয়েছিল ওকে দেখতে। কিন্তু নোয়েলের গর্দভ সেক্রেটারি নোয়েলের সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেয়নি। পরে নোয়েলের সিনেমা দেখেছে ল্যানচন। একবার, দুবার নয়, অসংখ্যবার। মনে পড়েছে একবার কীভাবে নোয়েল তার সঙ্গে প্রেম করেছিল। হ্যাঁ, এ ভ্রমণে প্রচুর খরচা যাচ্ছে, তবে অগাস্তি ল্যানচন জানে প্রতিটি পয়সা উসুল হয়ে যাবে। তার দামি নোয়েলের

নিশ্চয় মনে পড়বে তার সঙ্গে একত্রে কাটানোর সময়ের কথা, সে ল্যানচনের কাছে নিরাপত্তা চাইবে। ল্যানচন প্রয়োজনে বিচারকসহ অন্যদেরকে ঘুস দেবে—অবশ্য টাকার অঙ্কটা খুব বেশি না হলেই রক্ষে—নোয়েল মুক্তি পাবে। নোয়েলকে সে মার্সেইর ছোট অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে তুলবে। ওখানে যখন মন চাইবে নোয়েলের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে সে।

অবশ্য তার স্ত্রী যদি টের না পেয়ে যায় সে কী করছে।

এথেন্স নগরীর ঘিঞ্জি এলাকা মোনাসটিরাকি। এখানকার এক জরাজীর্ণ ভবনের দোতলার ছোট ল অফিসে বসে কাজ করছিল ফ্রেডরিক স্টাভরস। বয়সে তরুণ স্টাভরস অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নিজের পেশায় নাম কামাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সহকারী রাখার ক্ষমতা তার নেই, তাই লিগাল রিসার্চের ব্যাকগ্রাউন্ড ঘাঁটার মতো ক্লান্তিকর কাজগুলো নিজেকেই করতে হয়। কাজের এ অংশটি তার মোটেই পছন্দ নয়। তবে এবারে সে উৎসাহ নিয়ে কাজটি করছে। কারণ জানে এ কেসে জিততে পারলে আইনজীবী হিসেবে তার চাহিদা এমন বেড়ে যাবে যে বাকি জীবন কীভাবে চলবে তা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ইলেনাকে বিয়ে করে সংসার পাতবে দুজনে। দামি একটা অফিস নেবে, ল ক্লার্ক ভাড়া করবে এবং এথিনি লেস্কির মতো ফ্যাশনেবল ক্লাবে যোগ দেবে। ওখানে রাঘব-বোয়াল মক্কেল ধরা যায়।

তবে প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ফ্রেডরিক স্টাভরস এথেন্সের রাস্তায় বেরুলেই লোকে চিনে ফেলে তাকে। কাগজে ছবি দেখেছে এরকম কেউ কেউ তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চায় সেই স্টাভরস কিনা। কয়েক হপ্তার মধ্যে অচেনা একজন থেকে একলাফে অ্যাটর্নিতে রূপান্তর ঘটেছে তার, যে ল্যারি ডগলাসের পক্ষে লড়াই করছে। স্টাভরসের মন বলে এ লোক ভুল ক্লায়েন্ট। ল্যারি ডগলাসের মতো চালচুলোহীন কারো জন্য লড়াইয়ের বদলে তার বরং সুন্দরী নোয়েল পেজকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করা উচিত ছিল। কিন্তু সে নিজেই তো চালচুলোহীন। বরং এটাই যথেষ্ট যে শতাব্দীর সবচেয়ে সাড়া-জাগানো হত্যাকাণ্ডের কেস-এর অন্যতম অংশীদার হিসেবে সে কাজ করতে পারছে। অভিযুক্ত যদি ছাড়া পেয়ে যায় সবার জন্য সেটা দারুণ ব্যাপার হবে।

তবে একটা ব্যাপার খুব খোঁচাচ্ছে স্টাভরসকে। বিষয়টি নিয়ে বিরতিহীন ভাবছে সে। একই অপরাধের জন্য দুজনকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে আরেকজন উকিল লড়াই করছে নোয়েল পেজের জন্য। যদি নোয়েল পেজ নিরপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়... শিউরে উঠল স্টাভরস। এ নিয়ে আর ভাবতে চাইল না। সাংবাদিকরা তাকে একটা প্রশ্ন বারবারই করছে—দুই বিবাদীকেই সে অপরাধী মনে করছে কিনা। জবাবে স্টাভরস সরল হাসি ফোটায় মুখে। দুজনই

অপরাধী কিংবা নিরপরাধ হলে কী এসে যায়? তাদের দুজনকেই সেরা লিগাল ডিফেন্স দেয়া হয়েছে।

অবশ্য নিজেকে সেরা মনে করে না স্টাভরোস। তবে নোয়েল পেজের পক্ষে দাঁড়ানো মানুষটি সাংঘাতিক জাঁদরেল এক উকিল। তাঁর নাম নেপোলিয়ন চোটাস। এর মতো প্রতিভাধর আইনজীবী দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। জীবনে কোনো আইনী মামলায় হারেননি চোটাস। মনে মনে হাসল ফ্রেডরিক স্টাভরস। কারো কাছে বলেনি, তবে প্ল্যান করেছে নেপোলিয়ন চোটাসকে সে হারিয়ে দেবে।

নিজের ক্ষুদ্র আয়তনের অফিসে বসে যখন নানান পরিকল্পনা করছে ফ্রেডরিক স্টাভরস, ওইসময় এথেন্সের অভিজাত এলাকা কোলোনাকির বিলাসবহুল বাড়িতে, ডিনার পার্টিতে হাজির হয়েছেন নিকোলাস চোটাস। চোটাস হালকা-পাতলা, ক্ষয়রোগীদের মতো অত্যন্ত কৃশ চেহারার একজন মানুষ। তার ভাঙাচোরা মুখে বড় বড় চোখে ব্লাডহাউন্ডের দৃষ্টি। ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী চোটাস এ মুহূর্তে ডেসার্ট খাচ্ছেন। আগামীকালের মামলা নিয়ে ভাবনায় মগ্ন। ডিনারপার্টির আলোচনার মুখ্য বিষয়ই হল কালকের ট্রায়াল। তবে এ ব্যাপারে চোটাসকে সরাসরি প্রশ্ন করার কেউ সাহস পাচ্ছে না। তবে সন্ধ্যাবেলায়, ব্রান্ডি আর মদের বন্যায় যখন ভেসে যাচ্ছে পার্টি, আমন্ত্রণকর্ত্রী জানতে চাইলেন, 'আপনার কি মনে হয় ওরা দুজনেই অপরাধী?' সরল গলায় জবাব দিলে চোটাস, 'তা কী করে হয়? ওদের একজন আমার ক্লায়েন্ট।' হাসলেন তিনি।

'নোয়েল পেজ আসলে কীরকম?'

ইতস্তত করলেন চোটাস, 'তাঁর মতো নারী দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি', সাবধানে শব্দ বাছাই করছেন। 'সে অপূর্ব সুন্দরী, প্রতিভাময়ী—' বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন নোয়েল পেজকে নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অবশ্য শব্দ সাজিয়ে নোয়েলকে বর্ণনা করা যায় না। ক'মাস আগে নোয়েল সম্পর্কে তাঁর জানাটুকু সীমাবদ্ধ ছিল স্রেফ গসিপ কলাম আর সিনে সাময়িকীর মাধ্যমে। তিনি নোয়েলের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করেননি। অভিনেত্রীদেরকে তিনি পছন্দ করেন না। বরং ঘৃণাই করেন বলা যায়। তাদেরকে মনে হয় শরীরসর্বস্ব, মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই।

কিন্তু ভুল ভেবেছিলেন তিনি। নোয়েলের সঙ্গে সাক্ষাতের পরপরই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছেন চোটাস। নোয়েল পেজের কারণে তিনি নিজের কঠোর একটি আইন ভঙ্গ করেছেন। মক্কেলের সঙ্গে কখনো মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়া চলবে না। চোটাসের পরিষ্কার মনে আছে সেই বিকেলটার কথা যেদিন নোয়েলের পক্ষে লড়াই করার জন্য তার কাছে গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে নিউইয়র্ক যাবার কথা ছিল তাঁর। ওখানে তাদের মেয়ে থাকে। চোটাস এবারই প্রথম দাদু হয়েছেন।

নাতনিকে দেখতে যাচ্ছিলেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা প্রায় শেষ। নাতনিকে দেখতে যাবেনই, কেউ তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এরকম একটা দৃঢ় সংকল্প ছিল নিকোলাস চোটাসের। তবে মাত্র দুটি শব্দ সংকল্প থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাকে। মনের চোখে দেখছেন বাটলার তাঁর শোবার ঘরে ঢুকছে, টেলিফোন হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলছে, 'কন্সটানটিন ডেমিরিস।'

এ দ্বীপে হেলিকপ্টার এবং ইয়ট ছাড়া প্রবেশের কোনো রাস্তা নেই। এবং এয়ারফিল্ড ও প্রাইভেট জেটি, দুটি জায়গাতেই চব্বিশঘণ্টা সশস্ত্র রক্ষী ট্রেনিং পাওয়া জার্মান শেফার্ড নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। দ্বীপটি কন্সটানটিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত আস্তানা, এখানে আমন্ত্রণ ছাড়া যে-কারো প্রবেশ নিষেধ। এখানে আসার যারা সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজা-রানী, প্রেসিডেন্ট, এক্স-প্রেসিডেন্ট, মুভি তারকা, অপেরা গায়ক এবং বিখ্যাত লেখক ও চিত্রকর। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। কন্সটানটিন ডেমিরিস বিশ্বের তৃতীয় ধনবান ব্যক্তি, যার রুচি এবং স্টাইল জানে টাকা দিয়ে কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হয়।

ডেমিরিস এ মুহূর্তে তাঁর অভিজাত লাইব্রেরিতে, আর্মচেয়ারে আয়েশ করছেন, ঠোঁটের ফাঁকে তাঁর জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা সমতল আকারের মিশরীয় সিগারেট। ভাবছেন কাল সকালে শুরু হতে যাওয়া মামলা নিয়ে। প্রেম তাঁর নাগাল পেতে কয়েক মাস ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁর ধারেকাছেও ঘেঁষার সুযোগ পায়নি। খুনের দায়ে তাঁর রক্ষিতার বিচার হবে। এ মামলায় পরোক্ষভাবে তাঁর নাম জড়ানো হবে। তিনি ভাবছেন নোয়েলের এখন কীরকম অনুভূতি হচ্ছে। ও এখন নিকোডেমাস স্ট্রিট প্রিজন-এ আছে। ও কি ঘুমাচ্ছে? নাকি জেগে আছে? নাকি সামনে যে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে তার কথা ভেবে আতঙ্কিত? নেপোলিয়ন চোটাসের সঙ্গে শেষ আলাপচারিতা মনে পড়ে গেল ডেমিরিসের। চোটাসকে বিশ্বাস করেন তিনি, আস্থা আছে আইনজীবীটি তাঁকে ডোবাবে না। তিনি অবশ্য চোটাসকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নোয়েল অপরাধী নাকি নিরপরাধ তা নিয়ে তাঁর কিছু আসে যায় না। চোটাস ডেমিরিসের কাছ থেকে যে বিপুল অঙ্কের পারিশ্রমিক নিয়েছেন তার বিনিময়ে নোয়েলকে তার রক্ষা করতে হবে। নাহ্, ডেমিরিসের চিন্তিত হবার কিছু নেই। মামলা নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না। কারণ কন্সটানটিন ডেমিরিস এমন একজন মানুষ যিনি কখনো কিছু ভোলেন না। তাঁর মনে পড়ল ক্যাথেরিন ডগলাসের প্রিয় ফুল ট্রায়ানটাফিলিয়াস, গ্রিসের অপূর্ব সুন্দর গোলাপ। তিনি সামনে ঝুঁকলেন, ডেস্ক থেকে নোটপ্যাড নিলেন। নোট করলেন *ট্রায়ানটাফিলিয়াস, ক্যাথেরিন ডগলাস*।

তার জন্য এটুকুই তিনি করতে পারেন।

প্রথম খণ্ড

ক্যাথেরিন
শিকাগো : ১৯১৯-১৯৩৯

প্রতিটি বড় শহরের একটি আলাদা ইমেজ বা ভাবমূর্তি রয়েছে, আছে ব্যক্তিত্ব যা শহরটিকে দান করে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ১৯২০ সালে শিকাগো ছিল অশান্ত, ডায়ানামিক এক দানব, রূঢ়, আদব-কায়দা জানে না। তবে এ শহরই জন্ম দিয়েছে উইলিয়াম বি. ওগডেন, জন ওয়েন্টওয়ার্থ, সাইরাগ ম্যাককরমিক এবং জর্জ এম. পুলম্যান-এর মতো টাইকুনদের। এ শহর ফিলিপ আর্মারস, গুস্তাভাস সুইফটস এবং মার্শাল ফিল্ডসের। হাইমি ওয়েস এবং স্কেয়ারফেস আল কাপুর মতো পেশাদার গুণ্ডা সর্দারদের আস্তানাও এ শহরে।

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের শৈশবের যেসব স্মৃতি নাড়া দেয় তার মধ্যে অন্যতম হল তার বাবা তাকে ধুলোমাখা মেঝের একটি বারে নিয়ে যেতেন। বসিয়ে দিতেন ভয়ানক উঁচু একটা টুলে। নিজের জন্য অর্ডার দিতেন প্রকাণ্ড এক গ্লাস বিয়ারের, মেয়ের জন্য গ্রিন রিভার। তখন ক্যাথেরিনের বয়স পাঁচ। লোকজন ক্যাথেরিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। বাবা খুব উপভোগ করতেন ব্যাপারটা। লোকে ড্রিংকের অর্ডার দিত, বাবা সবার বিল পরিশোধ করতেন। ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে রাখতেন বোঝাতেন যে পাশেই আছেন তিনি। বাবা ছিলেন ফেরিঅলা। বাড়িতে প্রায় থাকতেনই না। মেয়েকে ব্যাখ্যা করতেন তাঁকে দূরের শহরে ফেরি করতে যেতে হয়। এ কারণে দীর্ঘদিন ক্যাথেরিন এবং তার মার সঙ্গে তার দেখা হবে না। তবে ফেরার সময় তিনি মেয়ের জন্য সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে আসবেন। ক্যাথেরিন বাবার সঙ্গে একটা চুক্তি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠত। বলত বাবা যদি তার সঙ্গে থাকে তাহলে তাকে আর ক্যাথেরিনের জন্য কোনো উপহার আনতে হবে না। বাবা হাসতেন। বলতেন তাঁর মেয়েটা অকালপক্ক হয়ে গেছে। তারপর শহর ত্যাগ করতেন তিনি। ছয়মাস পরে আবার দেখা মিলত তাঁর। ক্যাথেরিনের মা ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন মহিলা। মা'র কথা তেমন মনেও পড়ে না ওর। তবে বাবার কথা মনে আছে পরিষ্কার। বাবা ছিলেন সুদর্শন, হাসিখুশি, সুরসিক এবং উষ্ণ একজন মানুষ। বাবা বাড়ি ফেরা মানে ছুটির আনন্দে সবাইকে মাতিয়ে তোলা, সেই সঙ্গে নানান উপহারের বিস্ময়।

ক্যাথেরিনের সাত বছর বয়সে চাকরি হারালেন বাবা। নতুন জীবন শুরু হয়ে গেল ওদের। শিকাগো ছেড়ে চলে এল ইন্ডিয়ানার গ্যারিতে, সেখানে এক গহনার দোকানে সেলসম্যানের কাজ জুটিয়ে নিলেন বাবা। ক্যাথেরিনকে ভর্তি করা হল স্কুলে। সহপাঠীদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি ক্যাথেরিন। শিক্ষকদের সে ভয় পেত। তাঁরা তার একাকিত্বকে ভুল বুঝতেন। ভাবতেন মেয়েটা অহংকারী। বাবা প্রতিদিন ডিনারে হাজির থাকেন, প্রথমবারের মতো ক্যাথেরিন উপলব্ধি করতে শুরু করে অন্যদের মতো তারাও সত্যিকারের পারিবারিক জীবন উপভোগ করছে। প্রতি রোববার তারা মিলার বিচে যায়, ভাড়া করা ঘোড়ায় চড়ে কিংবা বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়ায়।

গ্যারিতে ভালোই লাগছিল ক্যাথেরিনের। কিন্তু ওর বাবার চাকরিটা আবার চলে গেল। ওরা চলে এল শিকাগোর শহরতলি হার্ভেতে। স্কুল তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। সেশনের মাঝামাঝিতে স্কুলে ভর্তি হল ক্যাথেরিন। যথারীতি এখানেও কারো সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল না। নিঃসঙ্গ বালিকার খেতাব জুটল এ স্কুলেও। স্কুলের সহপাঠীরা নবাগতা ক্যাথেরিনকে স্বাগত তো জানালই না বরং জোট বেঁধে তার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করতে লাগল।

পরবর্তী কয়েক বছর গায়ে উদাসীনতার একটা বর্ম চড়িয়ে রাখল ক্যাথেরিন। অন্য বাচ্চাদের হামলা থেকে রক্ষা পেতে এটাকে সে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। বর্মটি কেউ ছিদ্র করার চেষ্টা করলে তীক্ষ্ণ ভাষায়, বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে সে প্রত্যুত্তর দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল হামলাকারীদেরকে বুঝিয়ে দেয়া তারা তার আপন নয়, পর। যাতে তারা ক্যাথেরিনের ধারেকাছেও না ঘেঁষে। তবে প্রখর বুদ্ধিমত্তার কারণে শীঘ্রি সে স্কুলে পরিচিত হয়ে উঠল।

চোদ্দ বছরে পা দিয়েছে ক্যাথেরিন। তার শরীরে নারীত্বের সমস্ত কমনীয়তা ফুটে উঠছিল। সে আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা নিজের শরীর দ্যাখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কত দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন ঘটছে, অবাক হয় ক্যাথেরিন। আয়নায় নিজেকে দেখতে খারাপ লাগে না। তবে নিজেকে মডেল হিসেবে কল্পনা করতে কষ্ট হয়। মডেলদের মতো সুন্দরী সে নয়। কিন্তু ক্যাথেরিন চায় তার শরীর বিশেষ কিছু হয়ে উঠুক। কারো কাছে স্পেশাল হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে ক্যাথেরিন, কল্পনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সে।

গ্রীষ্মে পনেরোতে পা দিল ক্যাথেরিন। আয়নায় এখন আরো বেশি বেশি করে নিজেকে দেখে সে। তবে শারীরিক পরিবর্তন বলতে চিবুকে দু-একটা গোঁটা উঠেছে, আর কপালে ফুঁসকুড়ি। মিষ্টি খাওয়া বাদ দিল ক্যাথেরিন, মেরি বেকার এডিরের লেখা সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ থেকে দূরে সরে রইল এবং আয়নার সামনেও আর দাঁড়াল না।

ক্যাথেরিন এবং তার পরিবার শিকাগো ফিরে এসেছে। রজার্স পার্কে সস্তা ভাড়ায় ছোট, ঘিঞ্জি একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছে। দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ক্রমে

ভামে উঠছিল। ক্যাথেরিনের বাবার কাজ কমে গেছে। হতাশা থেকে তিনি বেশি বেশি মদ গিলতে লাগলেন। মা'র সঙ্গে তাঁর প্রতিদিনই ঝগড়া হয়। অশ্লীল গালিগালাজের তোড়ে টিকতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ক্যাথেরিন।

আধডজন ব্লক পরেই সৈকত। তীর ধরে একা হেঁটে বেড়ায় ক্যাথেরিন, পাতলা, রোগা শরীরে আদর বুলায় ঝিরঝিরে বাতাস। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে লেকের দিকে।

টমাস উলফকে আবিষ্কার করে ক্যাথেরিন। তাঁর বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। তাঁর বই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত করে ওকে। ভবিষ্যৎ নিয়ে নস্টালজিয়ায় ভোগে ক্যাথেরিন, যা ঘটেনি এখনো।

ক্যাথেরিনের মাসিক শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে নারীতে রূপান্তর ঘটছে তার। সে এখন তার প্রয়োজন জানে, বুঝতে পারে কিসের জন্য তার আর্তি। তবে এই চাওয়া শারীরিক নয়, এর সঙ্গে জড়িত নেই যৌনতা। তার আকুলতা নিজেকে চেনাবার, কোটি মানুষের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ব্যাকুলতা ক্যাথেরিনের। যেন সবাই জানতে পারে কে সে, যখন সে হেঁটে যাবে সবাই আঙুল তুলে দেখাবে, 'ওই যে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার, বিখ্যাত—' বিখ্যাত কী? সমস্যা এখানেই। ক্যাথেরিন জানে না সে আসলে কী চাইছে। শুধু জানে মরিয়া হয়ে কামনা করছে। শনিবারের বিকেলে, যদি অতিরিক্ত পয়সা থাকে পকেটে, ম্যাকভিকার্স কিংবা শিকাগোর প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দ্যাখে। ক্যারি গ্রান্ট এবং জাঁ আর্থারের মোহনীয় জগতের মাঝে ডুব দেয় ক্যাথেরিন, হাসে ওয়ালেস বিরি এবং মেরি ড্রেসলারের সঙ্গে, বেটি ডেভিসের রোমান্টিক বিরহে কাতর হয় যন্ত্রণায়। মার চেয়ে আইরিন ডানের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করে বেশি।

ক্যাথেরিন সেন হাইস্কুলে সিনিয়র ইয়ার পার করছে। তার ব্রন-শত্রু, আয়না অবশেষে হয়ে ওঠে তার বন্ধু। আয়নার মেয়েটিকে ভারি সুন্দর লাগে ক্যাথেরিনের। কুচকুচে কালো কেশরাজি, ক্রিমের মতো সাদা নরম ত্বক, মেদহীন, সুঠাম শরীর, চমৎকার আবেদনময় মুখের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। ঝকমকে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়া। তার বক্ষজোড়া শ্বাসরুদ্ধকর রকম আঁটসাঁট, নিতম্বের বাঁক ঘুরিয়ে দেয় মাথা, লম্বা পাজোড়া থেকে দৃষ্টি ফেরানো যায় না। তার গোটা অবয়ব আর দশটা মেয়ের থেকে আলাদা, আয়নায় প্রতিফলিত হয় এমন ধরনের এক বৈশিষ্ট্য যার সঙ্গে ঠিক যেন পরিচিত নয় ক্যাথেরিন। এ আসলে ছেলেবেলা থেকে ঢেকে রাখা নিরাপত্তা বর্মের একটা অংশ, ধারণা করে ক্যাথেরিন।

অর্থনৈতিক মন্দা শিকাগো শহরটার টুঁটি শক্ত করে চেপে ধরেছে। সেইসঙ্গে বেড়ে চলেছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং দুর্নীতি। ক্যাথেরিনের বাবা লাখ লাখ ডলারের স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ভারী বোঝা তোলার একধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। গাড়ির চাকার ওপরে লাগাতে হয়। যন্ত্রটা ড্যাশবোর্ডের বোতাম টিপে নিচে

নামানো যায়। কিন্তু কোনো অটোমোবাইল কোম্পানি এ যন্ত্রের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল না। তিনি ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক সাইনবোর্ড বানালেন। দোকানের ভেতরে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কাজ দেবে। এ নিয়ে কয়েকটি বৈঠকও হল। শেষতক ব্যর্থ হল বৈঠক।

তিনি ওমাহায় ছোটভাই র‍্যালফের কাছ থেকে টাকা ধার করে শু-রিপেয়ার ট্রাক তৈরির কাজে লেগে গেলেন। ক্যাথেরিন এবং তার মার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বকবক করছেন। 'এ প্রজেক্ট ব্যর্থ হতেই পারে না,' জোরগলায় ঘোষণা দিলেন তিনি। 'চিন্তা করে দ্যাখো শু-মেকার তোমাদের দরজায় আসছে! এ জিনিস কেউ কখনো আগে বানায়নি। আমার এখন একটা শু-মোবাইল আছে, ঠিক? দিনে এ থেকে কুড়ি ডলার পাই, হপ্তায় একশো কুড়ি ডলার। দুটো ট্রাকে হপ্তায় আসবে দুশো চল্লিশ ডলার। এক বছরের মধ্যে আমি কুড়িটি ট্রাকের মালিক হয়ে যাব। তার মানে হপ্তায় আয় হবে দুহাজার চারশো ডলার। বছরে একলাখ পঁচিশ হাজার ডলার। তবে এটা তো মাত্র শুরু...।' দুমাস পরে শু-মেকার এবং ট্রাক অদৃশ্য হয়ে গেল। আরেকটি স্বপ্নের ঘটল অবসান।

ক্যাথেরিনের নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খুব শখ। সে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী। কিন্তু কলেজে বৃত্তি পেলেও ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া কঠিন। এদিকে ভর্তিরও বেশি দেরি নেই। ক্যাথেরিন জানে স্কুল ছাড়ার পরে তাকে লেগে যেতে হবে কাজে। সেক্রেটারির চাকরি জুটিয়ে নেবে। তবে ধনী এবং সফল মানুষ হওয়ার স্বপ্ন সে কিছুতেই জলাঞ্জলি দেবে না।

দুটি ছেলে ক্যাথেরিনের প্রেমে পড়েছে। একজন টনি কোরম্যান। সে একদিন তার বাবার ল ফার্মে যোগ দেবে। ক্যাথেরিনের চেয়ে লম্বায় এক হাত খাটো টনি। গায়ের চামড়া লেই-করা ময়দার মতো থলথলে, চোখজোড়া সবসময় ছলছল করে, তার দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। অপরজন ডিন ম্যাকডারমট, মোটা, লাজুক; দাঁতের ডাক্তার হতে চায়। এছাড়া আছে রন পিটারসন। এ অবশ্য ওই দুজনের থেকে আলাদা। সে সেন হাইস্কুলের ফুটবল-তারকা। সবাই বলে রন অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ নিয়ে সহজেই কলেজে ভর্তি হতে পারবে। সে লম্বা, কাঁধজোড়া প্রশস্ত, ম্যাটিনি আইডলের চেহারা তার, স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্র।

রনের সঙ্গে ক্যাথেরিনের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কারণ ছেলেটা তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয়। স্কুল করিডরে যতবার দেখা হয়েছে রনের সঙ্গে, বুকের ভেতর পাগলা ঘোড়ার মতো কলজে লাফাতে শুরু করেছে ক্যাথেরিনের। সে বহুবার ভেবেছে রনকে এমন কিছু উত্তেজক কথা বলবে যাতে তাকে নিয়ে রন ডেটিঙে যায়। কিন্তু রনের কাছে গেলেই ক্যাথেরিনের জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়,

নারবে পাশ কাটায় সে। কুইন মেরি এবং গারবেজ স্কো, অসহায় ক্যাথেরিন ভাবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা তীব্র হয়ে উঠছিল। বাড়ি ভাড়া তিনমাস বাকি। ওদেরকে এখনো উচ্ছেদ করা হয়নি কারণ বাড়িঅলা ক্যাথেরিনের বাবার নিত্যনতুন আবিষ্কারের প্রতিভায় রীতিমতো মুগ্ধ। ক্যাথেরিনকে ঘিরে থাকে বিষণ্ণতা। তবে তার বাবা আগের মতোই আছেন, হাসিখুশি, আশাবাদী। তবে বাবার ছদ্ম হাসিমুখের আড়ালে হতাশ চেহারাটা ঠিকই দেখতে পায় ক্যাথেরিন। বাবা এখনো হেনরিচিতে জমকালো পার্টি দেন, বেয়ারাদের মোটা বকশিশ দিতেও তাঁর কার্পণ্য নেই। এজন্যই বাবাকে এত পছন্দ করে ক্যাথেরিন। গোমড়ামুখোদের দুনিয়ায় সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত একজন মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ততা যেন জন্মসূত্রে পাওয়া একটা উপহার। বাবা এ উপহার সবাইকে বিলিয়ে চলেছেন।

ক্যাথেরিন ভাবে বাবা যে স্বপ্ন দেখতে পারছে এটাই বা কম কিসের। যদিও তাঁর স্বপ্ন কখনো পূরণ হয় না। মা তো স্বপ্ন দেখতেই ভয় পায়।

এপ্রিলে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেলেন ক্যাথেরিনের মা। এই প্রথম মৃত্যু দেখল সে। শোক জানাতে বাড়ি ভরে গেল বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীতে। ফিসফিস করে কৃত্রিম শোকবাণী শোনাল তারা। এতে ক্যাথেরিনের কষ্ট মোটেও কমল না।

ক্যাথেরিনের চাচা র‍্যালফ এবং চাচি পলিন ওমাহা থেকে উড়ে এলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে। ক্যাথেরিনের বাবার দশ বছরের ছোট র‍্যালফ। বাবার ঠিক বিপরীত। তিনি ভিটামিন মেল-অর্ডারের ব্যবসা করেন। অত্যন্ত সফল একজন ব্যবসায়ী। বেশ বৃহদায়তনের র‍্যালফ। তাঁর সবকিছুই চৌকো। চৌকো কাঁধ, চৌকো চোয়াল, চৌকো থুতনি। ক্যাথেরিন নিশ্চিত তার মনটাও চৌকো। তার বউ পাখির মতো হালকা-পাতলা। পাখির মতোই কিচিরমিচির করে চলেছেন সর্বক্ষণ। বেশ সুখী দম্পতি তাঁরা। ক্যাথেরিন জানে চাচা তাঁর বাবাকে বড় অঙ্কের টাকা ধার দিয়েছেন। তার চাচা-চাচি মার মতোই, স্বপ্ন দেখার ধার ধারেন না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে র‍্যালফ চাচা ক্যাথেরিন এবং তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। অ্যাপার্টমেন্টের ছোট লিভিংরুমে বসলেন তাঁরা। পলিন ট্রেতে কফি এবং বিস্কিট নিয়ে এলেন।

'আমি জানি টাকাপয়সার টানাটানি চলছে তোমার,' ভাইকে বললেন র‍্যালফ চাচা। 'তুমি সবসময়ই একটু বেশি বেশি স্বপ্ন দ্যাখো। তবে তুমি আমার ভাই। আমি তোমার অমঙ্গল চাই না। পলিন এবং আমি তোমাকে নিয়ে আলাপ করেছি। তুমি আমার সঙ্গে কাজ করো।'

'ওমাহায় গিয়ে?'

'ওখানে খুব ভালো থাকবে তোমরা। আমাদের বাড়িটি বেশ বড়।'

দমে গেল ক্যাথেরিন। ওমাহা! তার মানে তার স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল।

'আমাকে একটু ভাবতে দাও,' বললেন বাবা।

'ছ'টার ট্রেন ধরব আমরা,' বললেন র‍্যালফ চাচা। 'যাবার আগে তোমার সিদ্ধান্ত জানতে চাই।'

ক্যাথেরিন তার বাবার সঙ্গে যখন একান্তে কথা বলার সুযোগ পেল, তিনি গুঙিয়ে উঠলেন, 'ওমাহা! বাজি ধরতে পারি ওখানে ভালো একটা নাপিতের দোকান পর্যন্ত নেই।'

তবে ক্যাথেরিন জানে বাবা অভিনয়টা করছেন আসলে তার জন্য। নাপিতের দোকান-টোকানের যুক্তি ভুয়া। জীবনের ফাঁদে আটকা পড়েছেন বাবা। ক্যাথেরিন ভাবল ওমাহায় একঘেয়ে, নীরস কাজ বাবা আদৌ চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা। তাঁর দশা হবে খাঁচায় বন্দি বুড়ো পাখির মতো। খাঁচায় শুধু ডানা ঝাপ্টাবেন, বন্দিত্ব তাঁর শ্বাসরোধ করে ফেলবে। আর ক্যাথেরিনকে নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির কথা ভুলে যেতে হবে। সে স্কলারশিপের আবেদন করেছে তবে এখনো কোনো খবর পায়নি। সেদিন বিকেলে বাবা তাঁর ভাইকে ফোন করে জানালেন তিনি চাকরিটা করবেন।

পরদিন ক্যাথেরিন প্রিন্সিপালের কাছে গেল জানাতে সে ওমাহা যাচ্ছে, ভর্তি হবে ওখানকার স্কুলে। প্রিন্সিপাল তাঁর ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্যাথেরিন নিজের কথা বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'অভিনন্দন, ক্যাথেরিন। তুমি নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ফুল স্কলারশিপ পেয়ে গেছ।'

সে-রাতে এ বিষয় নিয়ে পিতা আর কন্যার বিশদ আলোচনা হল। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল তিনি ওমাহা যাবেন, ক্যাথেরিন ভর্তি হবে নর্থওয়েস্টার্নে, থাকবে ক্যাম্পাসের ডরমিটরিতে।

দিনদশেক পরে ক্যাথেরিন লা স্যালে স্ট্রিট স্টেশনে এল বাবাকে ট্রেনে তুলে দিতে। ভীষণ নিঃসঙ্গতায় ভুগছে ও। পৃথিবীর সবচেয়ে পছন্দের মানুষটাকে বিদায় দিতে হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে ওর মধ্যে উত্তেজনাও বিরাজ করছে। ট্রেনটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাক, চাইছে ক্যাথেরিন। কারণ জীবনে এই প্রথম মুক্ত জীবনযাপন করতে যাচ্ছে সে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখল বাবা ট্রেনের জানালায় মুখ চেপে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

ছেড়ে দিল ট্রেন। যতক্ষণ মেয়েকে দেখা যায় তাকিয়ে থাকলেন বাবা। ক্যাথেরিনের সুদর্শন পিতা, যিনি এখনো বিশ্বাস করেন একদিন জয় করবেন পৃথিবী।

নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আজ ম্যাট্রিকুলেশন ডে। দারুণ উত্তেজনা ক্যাম্পাস জুড়ে। ক্যাথেরিনের খুশি ধরে না। স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের দুনিয়ায় প্রবেশের চাবিকাঠি এই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাণ্ড অ্যাসেম্বলি হলের চারপাশে চোখ বুলাল ও। শতশত ছাত্রছাত্রী লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে নাম রেজিস্টারের জন্য। ক্যাথেরিন

বলল : *একদিন তোমরা চিনবে আমি কে, বলবে, আমি ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের সহপাঠী ছিলাম।* বেশিরভাগ কোর্স নিল ক্যাথেরিন। তারপর ডরমিটরিতে চলে এল।

ওইদিন সকালেই রুস্ট ক্যাশিয়ারের পদে খণ্ডকালীন কাজ পেয়ে গেল। রুস্ট ক্যাম্পাসের জনপ্রিয় স্যান্ডউইচের দোকান। ক্যাথেরিন বিকেলে কাজ করবে। বেতন হপ্তায় পনেরো ডলার। আহামরি না হলেও বইপত্রসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচটা চলে যাবে এতে।

ইউনিভার্সিটিতে ছয়মাস কেটে গেল ক্যাথেরিনের। অর্ধবছর পরে তার মনে হল গোটা ক্যাম্পাসে একমাত্র তারই যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা নেই, এখনো অনাঘ্রাতা সে। তার সিনিয়ররা সেক্স নিয়ে প্রচুর গল্প করে, সবই শুনতে পায় ক্যাথেরিন। শুনতে মজাই লাগে। তবে একই সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে ওঠে এই মজাটা উপভোগ করার সুযোগ পেতে পেতে সে আবার বুড়িয়ে না যায়। সেক্স নিয়ে আলোচনা চলে সর্বত্র। ডরমিটরি, ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, রুস্ট। এমন খোলামেলা কথা, কান ঝাঁ ঝাঁ করে ক্যাথেরিনের।

'জেরি অবিশ্বাস্য। কিংকং-এর মতো।'

'ওর লিঙ্গ নাকি মস্তিষ্ক কোন্‌টার কথা বলছ?'

'ওর মস্তিষ্কের দরকার নেই, হানি। গতরাতে ছয়বার আমার রাগমোচন হয়েছে।'

'আর্নি রবিনসনের সঙ্গে শুয়েছ কখনো? ওর জিনিস ছোট তবে দারুণ শক্তিশালী।'

'অ্যালেক্স-এর সঙ্গে আজ রাতে ডেটিং আমার। কী করা যায় বলো তো?'

'ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। গত হপ্তায় আমাকে সৈকতে নিয়ে গিয়েছিল অ্যালেক্স। আমার প্যান্টি খুলেই চাটাচাটি শুরু করে দিল। আমিও ওরটা চাটতে চাইলাম। কিন্তু জিনিসটা খুঁজেই পেলাম না।' তারপর বাঁধভাঙা হাসিতে ফেটে পড়ল দু বান্ধবী।

ওদের কথা অশ্লীল এবং বমি ওঠার মতো শোনালেও একটা শব্দও মিস করতে চায় না ক্যাথেরিন। মেয়েরা যখন তাদের সরস যৌন অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে, ক্যাথেরিন কল্পনায় দেখে সে একটি ছেলের সঙ্গে বিছানায় গেছে, মেতে উঠেছে আদিম উন্মাদনায়। কুঁচকিতে কেমন ব্যথা অনুভব করে ক্যাথেরিন, উরুতে জোরে জোরে ঘুসি মারে। কুঁচকির ব্যথাটা ভুলতে নতুন ব্যথার সৃষ্টি করে।

মাই গড, ভাবে ক্যাথেরিন, *কুমারী হয়েই হয়তো মরতে হবে আমাকে। এই আমি, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উনিশ বসন্তের একমাত্র ভার্জিন তরুণী। হয়তো গোটা আমেরিকার মধ্যে আমিই একমাত্র কুমারী। ভার্জিন ক্যাথেরিন। চার্চ আমাকে সন্ন্যাসিনী বানাবে এবং বছর বছর আমার জন্য মোম জ্বালিয়ে যাবে। আমার সমস্যাটা কী?* ভাবে সে। *আমিই বলছি,* জবাব দেয় ক্যাথেরিন। *কেউ*

তোমাকে বিছানায় যাবার জন্য ডাকেনি। আর কাজটা একা একা হয় না। দুজন লাগে।

মেয়েদের সেক্সুয়াল আড্ডা, যাকে নিয়ে সবচে বেশি আবর্তিত সে রন পিটারসন। সে অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ পেয়ে নর্থওয়েস্টার্নে ভর্তি হয়েছে। সেন হাইস্কুলের মতো এখানেও সমান জনপ্রিয়। ক্লাস-ক্যাপ্টেন করা হয়েছে তাকে। টার্ম শুরু হবার দিনই ল্যাটিন ক্লাসে তাকে দেখল ক্যাথেরিন। আগের চেয়েও সুদর্শন লাগছে। পেশিবহুল শরীরটা আরো সুঠাম হয়েছে, চেহারায় ফুটে আছে কাউকে পরোয়া না-করার ভঙ্গি। ক্লাস শেষে সে হেঁটে এল ক্যাথেরিনের কাছে। ক্যাথেরিনের বুকের ভেতরে দ্রিম দ্রিম ঢাকের বাজনা শুরু হয়ে গেল।

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার!

হ্যালো, রন।

তুমি এ ক্লাসে আছ?

হ্যাঁ।

খুব ভালো হল আমার জন্য।

কেন?

কেন? ল্যাটিনের 'ল'ও বুঝি না আমি। আর তুমি তো দারুণ এক প্রতিভা। দুজনে মিলে চমৎকার গান বাজাতে পারব। আজ রাতে কী করছ?

তেমন কিছু না। আজ রাতেই পড়া শুরু করতে চাইছ?

সৈকতে চলো। ওখানে একান্তে কথা বলা যাবে। পড়াশোনা পরে হবে।

রন স্থির চোখে দেখছে ক্যাথেরিনকে।

'হেই!... তুমি—?' ওর নাম মনে করার চেষ্টা করছে। ঢোক গিলল ক্যাথেরিন। ও-ও ভুলে গেছে নিজের নাম। 'ক্যাথেরিন,' বলল দ্রুত, 'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।'

'ও হ্যাঁ। জায়গাটা কেমন? চমৎকার না।'

ক্যাথেরিন কণ্ঠে আগ্রহ ফুটিয়ে তুলতে চাইল ওকে খুশি করার জন্য। ওকে প্রলুব্ধ করার জন্য। 'হ্যাঁ, এটা—'

রন দমবন্ধ করা এক স্বর্ণকেশীর দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। অপেক্ষা করছে ওর জন্য। 'দেখা হবে,' বলে মেয়েটির দিকে পা বাড়াল রন।

এবং এখানেই সিনডারেলা ও রাজপুত্রের গল্পের সমাপ্তি, ভাবল ক্যাথেরিন। *তারপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল। রাজপুত্র হারেমে আর সিনডারেলা তিব্বতের এক গুহায়।*

ক্যাথেরিন রনকে প্রায়ই ক্যাম্পাসে দেখল। প্রতিবারই নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে। কখনো বা দু-তিনটে মেয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে হাঁটছে রন। মাই গড, ওর কি

কোনো ক্লান্তি নেই? ভাবে ক্যাথেরিন। এখনো কল্পনা করে একদিন রন আসবে তার কাছে ল্যাটিন শিখতে। কিন্তু রনের সঙ্গে তার আর কথা হয় না।

নিঃসঙ্গ বিছানায় রাতে শুয়ে সেইসব মেয়ের কথা চিন্তা করে ক্যাথেরিন, যারা মিলিত হচ্ছে তাদের বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে। সে রন পিটারসনকে নিয়ে ভাবে। কল্পনায় রন তার কাছে আসে, তাকে নগ্ন করে। ক্যাথেরিন আস্তে আস্তে রনের গা থেকে খুলে নেয় সমস্ত পোশাক। যেমনটি সে রোমান্টিক উপন্যাসে পড়েছে। রনের শার্ট খোলে ক্যাথেরিন, বুকে নরম হাত বুলায়, তারপর খুলে ফেলে ট্রাউজার্স, কোমর থেকে টেনে নামিয়ে দেয় শর্টস। রন ক্যাথেরিনকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়, এগোয় বিছানার দিকে। এমন সময় চাগিয়ে ওঠে ক্যাথেরিনের রসবোধ। কল্পনায় সে রনকে পা পিছলে আলুর দম হয়ে পড়ে যেতে দেখে মেঝেতে। ব্যথায় অস্থির হয়ে চেঁচায় রন। গর্দভ! নিজেকে চোখ রাঙায় ক্যাথেরিন, কল্পদৃশ্যটাও তো ঠিকমতো তৈরি করতে জানো না! আসলে ওর মঠে ঢোকাই উচিত। অবশ্য ক্যাথেরিন জানে না মঠের সন্ন্যাসিনীরা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি দেখে কিনা কিংবা স্বমেহন তাদের জন্য পাপ কিনা। ধর্মযাজকরা কখনো যৌনমিলন করেছেন কিনা তাও জানা নেই ওর।

রোমের প্রাচীন এক মঠের বাগানে, গাছের নিচে বসে আছে ক্যাথেরিন। প্রাচীন একটি পুকুরের জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করছে। বইছে শীতল সমীরণ। এমন সময় খুলে যায় বাগানের ফটক, প্রবেশ করে লম্বা এক ধর্মযাজক। মাথায় চওড়া কিনারার হ্যাট, গায়ে লম্বা কালো আলখেল্লা। প্রিস্টের চেহারা অবিকল রন পিটারসনের মতো।

‘অহ্, স্কুসি, সিনোরিনা, বিড়বিড় করে প্রিস্ট। জানতাম না এখানে কেউ আছেন?

লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায় ক্যাথেরিন। *আমার এখানে আসা উচিত হয়নি, ক্ষমা প্রার্থনা করে সে। কিন্তু বাগানটি এত সুন্দর ভেতরে ঢুকে এর সৌন্দর্য অবলোকনের লোভ সামলাতে পারিনি।*

না, না ঠিক আছে। ক্যাথেরিনের দিকে এগিয়ে যায় প্রিস্ট। তার গভীর কালো চোখ জ্বলজ্বল করছে। মিয়া কারা... *আমি আসলে আপনাকে মিথ্যা বলেছি।*

মিথ্যা বলেছেন?

জি। তার চোখ যেন ক্যাথেরিনের শরীর লেহন করছে। *আমি জানতাম আপনি এখানে আছেন। কারণ আপনার পিছু নিয়েছিলাম আমি।*

শিহরণ জাগে ক্যাথেরিনের শরীরে। *কিন্তু—কিন্তু আপনি একজন প্রিস্ট।*

বেল্লা সিনোরিনা। প্রথমে আমি একজন পুরুষ, তারপর প্রিস্ট।

সে লাফ মেরে এগোয় ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরার জন্য, কিন্তু আলখেল্লায় পা বেঁধে ধপাস করে পড়ে যায় পুকুরে।

ধ্যাত!

ক্লাসশেষে প্রতিদিন রুস্টে আসে রন পিটারসন। দূরপ্রান্তের একটি টেবিল দখল করে। দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায় বুথ। তার বন্ধুরা আসে। মেতে ওঠে আড্ডায়। ক্যাথেরিন ক্যাশ-রেজিস্ট্রারের কাছে, কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। রন ঢোকার সময় তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নড করে। তারপর নিজের টেবিলে চলে যায়। তবে কখনোই ক্যাথেরিনের নাম ধরে ডাকে না। *ও আমার নাম ভুলে গেছে,* ভাবে ক্যাথেরিন।

কিন্তু রনকে দেখলেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ক্যাথেরিনের চেহারা। অপেক্ষা করে ওকে হ্যালো বলার জন্য, অপেক্ষা করে ওকে ডেটিং-এ ডাকবে রন অথবা একগ্লাস পানি খেতে চাইবে। কিন্তু কিছুই বলে না সে। যেন ক্যাথেরিন একটা আসবাব। ঘরে যেসব মেয়ে আছে তাদের তুলনায় শতগুণ সুন্দরী ক্যাথেরিন, শুধু জাঁ-অ্যান বাদে। এ সেই স্বর্ণকেশী যার সঙ্গে রনকে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু সবগুলো মেয়েকে একত্রিত করলেও ক্যাথেরিনের কাছে পৌঁছুবার যোগ্যতা কারো হবে না। সে সবার চেয়ে প্রতিভাময়ী, উজ্জ্বল। কিন্তু ক্যাথেরিনের সমস্যাটা কী? একটি ছেলেও তাকে আজ পর্যন্ত ডেটিং-এর জন্য ডাকল না কেন? পরদিনই এ-প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল ক্যাথেরিন।

ক্যাম্পাসের রাস্তা ধরে হনহন করে রুস্টের দিকে এগোচ্ছিল ক্যাথেরিন, দেখা হয়ে গেল জাঁ-অ্যানের সঙ্গে। সঙ্গে এক কৃষ্ণকেশী। একে চেনে না ক্যাথেরিন।

লন ধরে ওর দিকেই আসছিল তারা।

'ওয়েন, এ হল মিস বিগ ব্রেন,' বলল জাঁ-অ্যান। *আর তুমি মিস বিগ বুবস।* ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবল ক্যাথেরিন। অ্যানের বক্ষজোড়া সত্যি অসাধারণ। জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

'তুমি সবাইকে শেখাতে চাও, তাই না?' শীতল গলা জাঁ-অ্যানের। 'কিন্তু সবাইকে তো শেখাতে পারবে না, হানি।' ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, রক্তিম হয়ে উঠল ক্যাথেরিনের গাল।

'আ—ঠিক বুঝলাম না।'

'ওকে ছেড়ে দাও,' বলল কৃষ্ণকেশী।

'কেন ছাড়ব?' বলল জাঁ-অ্যান। 'সে নিজেকে ভাবেটা কী?' ক্যাথেরিনের দিকে ফিরল। 'তোমাকে সবাই কী বলে, জানো?'

'হুঁ।'

'বলে তুমি একটা লেসবো।'

হাঁ হয়ে গেল ক্যাথেরিন, অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল, 'আমি কী?'

'লেসবিয়ান। সমকামী। নিজেকে সতী-সাবিত্রী বানিয়ে চললেও সবার চোখকে তো আর ধুলো দিতে পারবে না।'

'কী—কীসব বাজে কথা বলছ।' তোতলাতে লাগল ক্যাথেরিন।

'তুমি কি সত্যি সবাইকে বোকা বানাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল জাঁ-অ্যান। 'তুমি সবই করো কিন্তু ভাবখানা এমন যেন ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানো না।'

'কিন্তু—আ—আমি কখনো—'

'তুমি ছেলেদের কখনো কাছে ঘেঁষতে দাও না।'

'আসলে—' মিনমিনে শোনাল ক্যাথেরিনের কণ্ঠ।

'বাদ দাও,' বলল জাঁ-অ্যান, 'তুমি আমাদের সঙ্গে চলার যোগ্য নও।'

চলে গেল ওরা। বেকুব হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাথেরিন।

সে রাতে ঘুম এল না ওর। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল শুধু।

তোমার বয়স কত, মিস আলেকজান্ডার?

উউনশ।

কখনো পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন করেছ?

কখনো না।

তুমি পুরুষদের পছন্দ করো?

সবাই কি করে না?

তোমার কি কখনো মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছে জেগেছে?

অনেকক্ষণ এ নিয়ে ভাবল ক্যাথেরিন। সে তার শিক্ষয়িত্রীদের পছন্দ করত। কিন্তু এখন মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ভাবছে। ভাবছে এক নারী শরীরের সঙ্গে তার শরীর লেপ্টে আছে, ঠোঁটে ঠোঁট, নরম হাত বোলাচ্ছে তার গায়ে। গা ঘিনঘিন করে উঠল ক্যাথেরিনের। না! জোরে বলল ও। 'আমি স্বাভাবিক একজন নারী! কিন্তু সে যদি স্বাভাবিকই হয়ে থাকে তাহলে শুয়ে আছে কেন এভাবে? কেন অন্যদের মতো পুরুষের বক্ষ লগ্না হয়ে শুয়ে পড়ছে না! হয়তো ও যৌনশীতল নারী। ওর সম্ভবত অপারেশন দরকার এই জড়তা কাটানোর জন্য।

ডরমিটরির জানালায় সূর্যের প্রথম আলো যখন স্পর্শ করল ভোরের আগমন ঘোষণা করে তখনো দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি ক্যাথেরিন। তবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। কুমারীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবে সে। এবং সেই সৌভাগ্যবান হতে চলেছে প্রতিটি মেয়ের স্বপ্নপুরুষ রন পিটারসন।

নোয়েল

মার্সেই—প্যারিস ১৯১৯-১৯৩৯

২

তার জন্ম রাজকুমারীর মতো।

শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে যায় তার। সাদা একটা দোলনায় ঘুমাত সে। মাথার ওপরে লেসের কারুকাজ-করা চাঁদোয়া, তাতে গোলাপি ফিতে। দোলনা বোঝাই থাকত জন্তু-জানোয়ার, সুন্দর সুন্দর পুতুল আর সোনালি রঙের খেলনা র‍্যাটল সাপ দিয়ে। সে দ্রুত বুঝে যায় মুখ হাঁ করে চিৎকার দিলেই কেউ-না-কেউ এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করবে। ছয়মাস বয়সে তার বাবা তাকে প্যারামবুলেটরে চড়িয়ে বাগানে ঘুরতে বেরুতেন। সে ফুলের গাছে হাত দিত। বাবা বলতেন, 'ওগুলো সুন্দর, প্রিন্সেস। তবে তুমি ওদের চেয়েও সুন্দরী।'

বাড়িতে বাবা যখন তাকে কোলে তুলে নিতেন খুব ভালো লাগত তার। জানালার কাছে তাকে নিয়ে যেতেন বাবা। সে জানালা দিয়ে তাকাত বাইরে। দেখত উঁচু উঁচু ভবনের ছাদ। বাবা বলতেন, 'ওটা তোমার রাজ্য, প্রিন্সেস।' উপকূলে নোঙর-করা জাহাজের লম্বা মাস্তুলের দিকে আঙুল তুলে বলতেন, 'ওই যে বড় বড় জাহাজ দেখতে পাচ্ছ? একদিন ওগুলো তোমার হুকুমে চলবে।'

তাকে দেখতে আসত অনেকেই। তবে বিশেষজনরা ছাড়া তাকে কোলে নেয়ার অনুমতি মিলত না। অন্যরা দোলনায় শুয়ে থাকা তাকে দেখত। তার অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী, ঝলমলে সোনালি চুল, মধুরঙা নরম ত্বক দেখে বিস্ময় প্রকাশ করত। বলত, 'মেয়েটা যে কী সুন্দর হয়েছে!' তার বাবা গর্ব করে বলতেন, 'যে কেউ দেখলেই বলবে ও একজন রাজকুমারী।' তিনি দোলনায় ঝুঁকে ফিসফিস করতেন, 'একদিন এক সুদর্শন রাজকুমার এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।' তিনি সস্নেহে গোলাপি কম্বলটি টেনে দিতেন তার গায়ে, সে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেত। তার গোটা পৃথিবীজুড়ে জাহাজ, লম্বা মাস্তুল এবং প্রাসাদের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু পাঁচবছর বয়সে বুঝতে পারে সে আসলে মার্সেইর এক জেলের মেয়ে। আর চিলেকোঠার ছোট ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে যেগুলোকে সে প্রাসাদ ভাবত তা গুদামঘর। গা

ঘুলিয়ে ওঠা গন্ধযুক্ত মাছের বাজারের গুদামঘর। তার বাবা ওখানে কাজ করেন। আর নৌবাহিনীর জাহাজ ছিল আসলে পুরোনো মাছধরার নৌকা। এগুলো ভোর হওয়ার আগে মার্সেই ত্যাগ করে এবং দুপুর নাগাদ ফিরে আসে ডক-এ তাদের গন্ধযুক্ত মাল উগরে দেয়ার জন্য।

আর এটা ছিল নোয়েল পেজের রাজ্য।

নোয়েলের বাবাকে তার বন্ধুরা বলত, 'ওর মাথায় রূপকথা ঢুকিয়ে দিয়ো না, জ্যাকুইস। তাহলে সে নিজেকে সবার থেকে আলাদা ভাবতে থাকবে।' তাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছিল।

মার্সেইকে ওপর থেকে দেখলে মনে হয় এটা সন্ত্রাসের শহর, যে-ধরনের সন্ত্রাস সাগরঘেঁষা শহরগুলোতে স্বাভাবিক ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানে জেলেরা টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় খরচ করার জন্য, লুটেরারা তা কেড়ে নিয়ে তাদেরকে হালকা করে দেয়। তবে ফ্রান্সের আর সবার মতো মার্সেইর মানুষের মধ্যেও প্রবল সংহতি রয়েছে। আর এটা এসেছে জীবনসংগ্রামের কারণে। মার্সেইর জেলেরা পৃথিবীর অন্য সব জেলে-পরিবার থেকে আলাদা নয়। তারা ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে একত্রে মাছ ধরে, সংগ্রাম করে বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে এবং ভাগ করে নেয় সুখ-শান্তি।

এ কারণেই জ্যাকুইস পেজের প্রতিবেশীরা নোয়েল পেজকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে প্রশংসায়। তারা মনে করে জ্যাকুইস অসাধারণ এক মেয়ের বাবা হয়েছে। তারা বুঝতে পারে না গোবরে কী করে পদ্মফুল ফুটল।

নোয়েলের বাবা-মাও তাঁদের মেয়ের অপূর্ব সৌন্দর্যে বিমোহিত, বিস্মিত। তারাও বুঝতে পারে না এ মেয়ে কী করে তাদের ঘরে এল। নোয়েলের মা ভারী শরীরের এক চাষার মেয়ে, তার বক্ষ ঝুলে পড়েছে, উরুজোড়া মোটা, পাছাও থলথলে। নোয়েলের বাবা হোঁতকা, কাঁধজোড়া চওড়া, ছোট ছোট চোখ। তার চুলের রঙ ভেজা বালুর মতো। প্রথম প্রথম মনে হত প্রকৃতি একটা ভুল করে ফেলেছে, ওই পরীর মতো মেয়েটি কিছুতেই তাদের কন্যা হতে পারে না। বড় হওয়ার পরে নোয়েল তার বন্ধুদের মেয়েদের মতোই সাধারণ, সাদামাটা চেহারার হবে। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতেই থাকল। নোয়েল যতই বড় হচ্ছে, ততই রূপ ফেটে পড়ছে তার।

পরিবারে স্বর্ণকেশী এই অপরূপার আগমনে নোয়েলের মা তার স্বামীর চেয়ে কম বিস্মিত। নোয়েলের জন্মের নয়মাস আগে, নোয়েলের মা'র সঙ্গে এক ফ্রেইটারের নরওয়েজিয়ান নাবিকের সাক্ষাৎ হয়। স্বর্ণকেশের বিশালদেহী এই ভাইকিং দেবতাটি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখত উষ্ণ, প্রলুব্ধ করার হাসি। জ্যাকুইস যখন কাজে ব্যস্ত, ওই সময় একদিন নাবিকটি নোয়েলদের ছোট বাড়িটির বিছানায় নোয়েলের মার সঙ্গে একটি ব্যস্ত ঘণ্টা কাটিয়ে গিয়েছিল।

কন্যার সোনালি চুল এবং অপূর্ব সুন্দর চেহারা দেখে নোয়েলের মা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কে তার মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল ভেবে নোয়েলের বাবা তাঁর দিকে আঙুল তুলে হয়তো জানতে চাইবে মেয়ের আসল বাবার পরিচয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সে তা জানতে চায়নি।

'আমাদের পরিবারের কারো শরীরে নিশ্চয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রক্ত বইছে,' গর্ব করে বন্ধুদের বলে নোয়েলের বাবা, 'তবে মেয়েটা আমার মতোই চেহারা পেয়েছে।'

তার স্ত্রী একথা শুনে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় আর মনে-মনে ভাবে পুরুষমানুষ কী বোকা!

বাবার সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে নোয়েল। বাবা তাকে নিয়ে খেলা করেন, বাবার গা থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ আসে, সবই তার খুব পছন্দ। তবে বাবার মেজাজকে সাংঘাতিক ডরায় সে। বাবা যখন মাকে তারস্বরে বকা দেন, কষে চড় বসিয়ে দেন গালে, বিস্ফারিত চোখে দৃশ্যটা দ্যাখে নোয়েল।

তবে নোয়েলের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করে না তার বাবা। জাহাজঘাটায় নিয়ে যায় মেয়েকে, কঠোর, পরিশ্রমী লোকদেরকে দেখিয়ে বলে এদের সঙ্গে সে কাজ করে। জাহাজঘাটার সবার কাছে সে রাজকুমারী। এজন্য গর্ববোধ করে নোয়েল তার বাবার মতোই।

বাবাকে খুশি করতে চায় নোয়েল। বাবা খেতে ভালোবাসে বলে সে তার জন্য রান্না শুরু করল। তৈরি করে বাবার প্রিয় খাবার, ধীরে ধীরে রান্নাঘরে মার জায়গাটা দখল করছে সে।

সতেরো বছর বয়সে পূর্ণ যুবতীতে রূপান্তর ঘটল নোয়েলের। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা, টলটলে পরিষ্কার বেগুনি চোখ, ছাই-সোনারঙা কেশ। তার ত্বক অত্যন্ত মসৃণ, তাতে সোনালি একটা আভা সবসময় চকচক করে। যেন এইমাত্র মধুর পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছে নোয়েল। তার শরীর দেখার মতো। নিটোল, খাড়া, উদ্ধত একজোড়া বক্ষের অধিকারিণী সে, সরু কোমর, গোল নিতম্ব, লম্বা, সুঠাম পা। তার কণ্ঠ নরম, জলতরঙ্গের মতো বাজে শ্রবণেন্দ্রিয়তে। নোয়েলের মধ্যে শক্তিশালী, মন কেড়ে নেয়া একধরনের আবেদন আছে। তবে ওটা তার আসল জাদু নয়। জাদু লুকিয়ে আছে তার সারল্যের মাঝে, তার চেহারায় এমন একটা ব্যাপার আছে যার আবেদন কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এমন কেউ নেই যে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না নোয়েলের দিকে। মার্সেইর পুরুষরা নোয়েলের মতো সুন্দরী জীবনে দেখেনি, আর কোনোদিন দেখবে বলে আশাও করে না। সবার মনে সুপ্ত বাসনা যত টাকা লাগুক, কিছুক্ষণের জন্য হলেও কিনে নেবে নোয়েলের সঙ্গ।

নোয়েলের বাবা কন্যার সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন। তবে মেয়ের রূপ নিয়ে

তেমন মাথা ঘামায় না জ্যাকুইস পেজ। সে খেয়াল করে পুরুষরা তার মেয়ের ব্যাপারে কী প্রচণ্ড আগ্রহী। সে কিংবা তার স্ত্রী কেউই নোয়েলের সঙ্গে সেক্স নিয়ে কথা বলে না, তবে জ্যাকুইস নিশ্চিত তার মেয়ে এখনো কুমারী যা নারীর অন্যতম সম্পদ। তার ধূর্ত, কৃষকমন চিন্তা করে প্রকৃতির এই অবদান কীভাবে কাজে লাগিয়ে দু পয়সা কামানো যায়। সে দিব্যচক্ষে দেখতে পায় মেয়ের সৌন্দর্য প্রচুর পয়সায় বিকোচ্ছে। মেয়েকে সে খাওয়ায়, পরায়, পড়াশোনা করায়; কাজেই মেয়ের প্রতি তো তার একটা দাবি আছেই, মেয়েও তার কাছে এসব কারণে ঋণী। এখন ঋণ শোধ করার সময় এসেছে। সে যদি নোয়েলকে কোনো ধনীমানুষের রক্ষিতা করতে পারে, মেয়ের নিজের জন্য যেমন ভালো হবে, জ্যাকুইসেরও আর খাওয়াপরার চিন্তা থাকবে না। সৎমানুষের জন্য জীবনধারণ দিনদিন কঠিন হয়ে উঠছে। যুদ্ধের ছায়া জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ইউরোপ জুড়ে। নাজিবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে হতভম্ব করে তুলেছে ইউরোপকে। কয়েক মাস বাদে গুদেতেন অঞ্চল দখল করেছে নাজিরা, তারপর ঢুকে পড়েছে স্লোভাকিয়ায়। হিটলার যদিও আশ্বাস দিয়েছেন আর কোনো দেশ দখলের খায়েশ তাঁর নেই, কিন্তু সবার আশঙ্কা বড়ধরনের একটা যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে।

যুদ্ধের প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে ফ্রান্সে। দোকানে এবং বাজারে মালপত্রের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। জ্যাকুইসের ভয় মাছধরার সুযোগও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তার দশা কী হবে? এ সমস্যার সমাধানের জন্য তার মেয়ে আছে। তার জন্য উপযুক্ত একজন প্রেমিক খুঁজে দিতে হবে। মুশকিল হল ধনবান কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় নেই জ্যাকুইসের। তার সমস্ত বন্ধু তার মতোই হতদরিদ্র। জ্যাকুইস এমন লোককে তার মেয়ের কাছে ঘেঁষতে দেবে না যে-কিনা তার দাম দিতে পারবে না।

ইদানীং নোয়েল খুব অস্থিরতায় ভুগছে। ক্লাসে সে ভালোই করছে তবে স্কুলে যেতে ভালো লাগে না তার। বাবাকে একদিন বলল সে কাজ করতে চায়। বাবা নীরবে তাকে পর্যবেক্ষণ করল, সম্ভাবনা যাচাই করছে চতুরতার সঙ্গে।

'কী ধরনের কাজ?' জানতে চাইল সে।

'জানি না ঠিক,' জবাব দিল নোয়েল। 'মডেল হিসেবেও কাজ করতে পারি, পাপা।'

পরবর্তী হপ্তায় প্রতিদিন বিকেলে জ্যাকুইস পেজ কাজ সেরে বাড়ি ফিরে প্রথমেই সেরে নিল গোসল। মাথা এবং হাত থেকে মাছের গন্ধ দূর করল সাবান মেখে। নিজের ভালো একটা পোশাক পরে চলে এল ক্যান-বিয়েরেতে। এই রাস্তাটা পুরোনো বন্দর থেকে ধনীলোকদের এলাকার দিকে চলে গেছে। রাস্তায় হাঁটার সময় দুপাশের পোশাকের দোকানগুলো দেখল সে। তবে সে যা খুঁজছিল

পেয়েও গেল তা বন মার্চেতে এসে। মার্সেইর সবচেয়ে অভিজাত কাপড়ের দোকান এটি। জ্যাকুইস এ দোকান নির্বাচন করেছে, কারণ এর মালিক মশিউ অগাস্তে ল্যানচন। ল্যানচনের বয়স পঞ্চাশ, কুৎসিত চেহারার এক টেকো, ছোট ছোট পাডজাড়া গদার কথা মনে করিয়ে দেয়। তার চেহারায় সবসময় লোভ ফুটে থাকে। তার স্ত্রী ছোটখাটো একজন মহিলা, শান-দেয়া ধারালো কুঠার যেন। মহিলা ফিটিংরুমে কাজ করে। দর্জিদের কাজ তদারকিতে ব্যস্ত থাকে। দর্জিদের সঙ্গে তার চেঁচামেচি প্রায়ই ভেসে আসে ফিটিংরুম থেকে। মশিউ ল্যানচন এবং তার স্ত্রীর দিকে একঝলক তাকিয়েই জ্যাকুইস পেজ বুঝতে পারল তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

নোংরা, জীর্ণ পোশাক পরা লোকটাকে দরজা খুলে দোকানে ঢুকতে দেখে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ল্যানচন। খ্যারখেরে গলায় বলল, 'আপনার জন্যে কী করতে পারি, বলুন?'

চোখ টিপল জ্যাকুইস পেজ, মোটা একটা আঙুল দিয়ে ঠেলা দিল ল্যানচনের বুকে, হাসল। 'আমিই বরং আপনার জন্য কিছু করতে পারি, মশিউ। আমি আমার মেয়েকে আপনার দোকানে পাঠাব কাজ করার জন্য।'

হতভম্ব হয়ে সামনে দাঁড়ানো গেঁয়ো লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল অগাস্তি ল্যানচন, চেহারায় ফুটল অবিশ্বাস।

'আপনি আপনার মেয়েকে—'

'কাল সকাল নয়টায় এখানে হাজির হয়ে যাবে সে।'

'আমি বুঝতে পারছি না—'

আর কিছু না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকুইস পেজ। কয়েক মিনিট পরে ঘটনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল অগাস্তি ল্যানচন। পরদিন সকাল ঠিক নটায় তার দোকানে হাজির হয়ে গেল জ্যাকুইস পেজ। ল্যানচন তার ম্যানেজারকে বলতে যাচ্ছিল লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়ার জন্য। কিন্তু মুখের কথা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরুল না আর। কারণ পেজের পেছনে দেখতে পেয়েছে সে নোয়েলকে। দুজনে হেঁটে আসছে ল্যানচনের দিকে। আগে পিতা, পেছনে তার অবিশ্বাস্য সুন্দরী কন্যা। হাসল বুড়ো।

'এই যে আমার মেয়ে। কাজ করার জন্য প্রস্তুত।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল অগাস্তি ল্যানচন।

'সুপ্রভাত, মশিউ,' মিষ্টি হাসি উপহার দিল নোয়েল। 'বাবা বললেন আপনি নাকি আমার জন্য একটা কাজ রেডি করেছেন।'

মাথা দোলাল অগাস্তি ল্যানচন। যখন কথা বলল নিজের কণ্ঠই যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

'হ্যাঁ। আ-আমি দেখছি কী করা যায়।' তোতলাতে লাগল সে। নোয়েলের মুখ

নগ্ন শরীর দেখছে সে। যা দেখছে বিশ্বাস হচ্ছে না। অপার্থিব লাগছে মেয়েটিকে। কল্পনা করছে এই তরতাজা ডাঁসা নগ্ন শরীরটি তাকে কেমন মজা দিতে পারবে।

জ্যাকুইস পেজ বলল, 'তোমরা কথা বলো। আমি যাই।' ল্যানচনের কাঁধে সজোরে চাপড় বসাল সে, চোখ টিপল যার বহু অর্থ হতে পারে। ল্যানচন তার মেয়েকে নিয়ে কী ভাবছে জ্যাকুইস পেজ ভালোই বুঝতে পারছে।

প্রথম কয়েক হপ্তার মধ্যেই নোয়েল বুঝে গেল আরেকটি পৃথিবীতে প্রবেশ ঘটেছে তার। এ দোকানে যেসব মহিলা আসে তাদের পরনে থাকে সুন্দর-সুন্দর পোশাক। চমৎকার তাদের ব্যবহার। তাদের পুরুষসঙ্গীরা নোয়েলের বেড়ে ওঠা জগতের নোংরা জেলেদের থেকে হাজার মাইল দূরের বাসিন্দা। এই প্রথম নোয়েলের মনে হতে থাকে নাকে আর মাছের গন্ধ পাচ্ছে না সে। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আগে সচেতন ছিল না সে। কারণ মাছের উৎকট গন্ধ নোয়েলের জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ করেই সব বদলে গেল। আর এর সমস্ত কৃতিত্বের দাবিদার তার বাবা। মশিউ ল্যানচনকে তার বাবার খাতির দেখে সে রীতিমতো গর্বিত। যারা হপ্তায় দু-তিনদিন দোকানে আসে, মশিউ ল্যানচন তাকে নিয়ে চট করে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। কনিয়াক কিংবা বিয়ার গিলে আসে।

শুরুতে মশিউ ল্যানচনকে ভালো লাগেনি নোয়েলের। কিন্তু নোয়েলের সঙ্গে সে অত্যন্ত সতর্ক আচরণ করে। দোকানের এক তরুণী কর্মচারীর কাছে নোয়েল শুনেছে ল্যানচনের স্ত্রী একবার তার স্বামীকে স্টাফরুমে এক মডেলের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় আবিষ্কার করার পরে কাঁচি দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কেটে দিতে চেয়েছিল। নোয়েল টের পায় সে যেখানেই যায়, ল্যানচনের দুচোখ তাকে অনুসরণ করে। তবে নোয়েলের সঙ্গে তার ব্যবহার অতিশয় নম্র ও ভদ্র। 'সম্ভবত,' সন্তুষ্টি নিয়ে ভাবে নোয়েল, 'সে আমার বাবাকে ভয় পায়।'

ঘরের আবহাওয়াও হঠাৎ করেই যেন পাল্টে গেছে। নোয়েলের বাবা আর তার বউকে ধরে পেটায় না, নিত্যদিনের ঝগড়াঝাটিও বন্ধ। তারা এখন স্টিক এবং রোস্ট খায়। ডিনার শেষে নোয়েলের বাবা চামড়ার পাউচ থেকে সুগন্ধি তামাক বের করে নতুন পাইপ ধরায়। সে একটি নতুন সানডে সুট কিনেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হচ্ছে। নোয়েল এসব কথা জানতে পারে বাবা এবং তার বন্ধুদের আড্ডা থেকে। তাদের জীবন ও জীবিকার ওপর যে আসন্ন একটা হুমকি আসছে সে-ব্যাপারে সবাই সতর্ক। তবে জ্যাকুইস পেজের চেহারা দেখে মনে হয় না সে শঙ্কিত।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলারের বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করল। দিনদুই পরে গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। রাতারাতি উর্দিতে ভরে গেল রাস্তাঘাট। তবে ফ্রান্সের মানুষ যুদ্ধের ভয়ে ভীত নয়। অন্য দেশগুলো জার্মানবাহিনীর ভয়ে থরহরিকম্প হতে পারে কিন্তু ফ্রান্স নিজেকে অপরাজেয় মনে করে। ম্যাগিনট লাইন পেরিয়ে হাজার বছরেও কেউ ফ্রান্সের ওপর হামলা চালাতে পারবে না বলে ফরাসিদের বিশ্বাস। জারি করা হল কারফিউ, শুরু হয়ে গেল রেশনিং ব্যবস্থা। তবে এসবের কিছুই জ্যাকুইস পেজকে বিচলিত করতে পারছে না। সে যেন আগের চেয়ে আরো শান্ত হয়ে গেছে।

তবে একদিন সে রাগে বিস্ফোরিত হল নোয়েলকে রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে একটি ছেলেকে চুমু খেতে দেখে। এ ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে ডেটিং-এ যায় নোয়েল। রান্নাঘরের আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ, চুম্বনরত তরুণ-তরুণী সভয়ে দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছে জ্যাকুইস পেজ।

'বেরোও,' ভয়ে নীল হয়ে যাওয়া ছেলেটির উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আমার মেয়ের দিকে আর কক্ষনো হাত বাড়াবি না, নোংরা শুয়োর!'

পালিয়ে গেল আতঙ্কিত ছেলেটা। নোয়েল বাবাকে বোঝাতে চাইল সে ভুল কিছু করেনি, কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত জ্যাকুইস পেজ কোনো ব্যাখ্যা শুনতে নারাজ।

'ওকে কেউ চেনে না,' গর্জে উঠল সে। 'আমার প্রিন্সেসের যোগ্য সে নয়।'

নোয়েলের সে রাতে ঘুম হল না। সারারাত জেগে ভাবল বাবা তাকে কতটা ভালোবাসে। কসম খেল বাবা কষ্ট পায় এমন কাজ জীবনেও করবে না।

একদিন দোকান বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে আগে একজন খদ্দের এল। ল্যানচন নোয়েলকে কয়েকটি ড্রেস দেখাতে বলল। নোয়েলের যখন কাজ শেষ হল ততক্ষণে সবাই চলে গেছে শুধু ল্যানচন আর তার স্ত্রী বাদে। সে অফিসে বসে নোট লিখছে। নোয়েল খালি ড্রেসিংরুমে ঢুকল পোশাক পাল্টাতে। ব্রা এবং প্যান্টি-পরা অবস্থায় সে, এমন সময় সেখানে আবির্ভাব ঘটল ল্যানচনের। সে নোয়েলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। নোয়েল পোশাকের দিকে হাত বাড়াল। তবে জামা পরার আগেই বিদ্যুৎ পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে এল ল্যানচন, নোয়েলের দুই পায়ের ফাঁকে গলিয়ে দিল হাত। ঘেন্নায় রি রি করে উঠল শরীর, যেন একটা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে গায়ে। হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল নোয়েল কিন্তু ল্যানচনের গায়ে অনেক শক্তি। সে খামচে ধরে থাকল নোয়েলের দুই উরুর সন্ধিস্থল। ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল দেখল নোয়েল।

'তুমি সুন্দর,' ফিসফিস করল লোকটা। 'অপূর্ব!'

এমন সময় ডাক দিল ল্যানচনের স্ত্রী। বেজার মুখে নোয়েলকে ছেড়ে দিল ল্যানচন, দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাড়ি ফেরার পথে নোয়েল চিন্তা করল ব্যাপারটা সে বাবাকে জানাবে কি জানাবে না। এ ঘটনা জানতে পারলে বাবা হয়তো খুন করে ফেলবে ল্যানচনকে।

লোকটার প্রতি প্রবল ঘৃণা হচ্ছে নোয়েলের, তার ধারেকাছেও যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু চাকরিটা তার দরকার। তাছাড়া চাকরি ছেড়ে দিলে বাবা হতাশ হতে পারে। নোয়েল সিদ্ধান্ত নিল এবারের ঘটনা সে বাবাকে জানাবে না, নিজেই সামলে নেবে ব্যাপারটা।

ওই শুক্রবার ম্যাডাম ল্যানচনের কাছে ফোন এল ভিচিতে তার মা অসুস্থ। ল্যানচন স্ত্রীকে রেলস্টেশনে নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিল এবং ঝড়ের বেগে ফিরে এল দোকানে। নোয়েলকে অফিসে ডেকে পাঠাল। বলল ওকে নিয়ে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে শহরের বাইরে যাবে। নোয়েল হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার মালিকের দিকে, ভেবেছে ঠাট্টা করছে লোকটা।

'আমরা ভিয়েনা যাব,' তোতলাচ্ছে ল্যানচন, 'ওখানে পৃথিবীর অন্যতম সেরা রেস্টুরেন্ট আছে— লো পিরামিড। খুব দামি তবে তাতে কিছু এসে যায় না। যারা আমার কথা শোনে তাদের জন্য আমি দেদারসে খরচ করতে কার্পণ্য করি না। তুমি কত তাড়াতাড়ি রেডি হতে পারবে?'

কটমট করে লোকটার দিকে তাকাল নোয়েল। 'কক্ষনো না।' শুধু এটুকুই বলতে পারল সে। 'জীবনেও না।' ঘুরে দাঁড়াল নোয়েল, একছুটে চলে এল দোকানে। তার দিকে এক

মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মশিউ ল্যানচন, চেহারা রাগে লাল, তারপর ডেস্ক থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল ফোন।

একঘণ্টা বাদে নোয়েলের বাবা ঢুকল দোকানে। সোজা হেঁটে গেল মেয়ের দিকে। পিতাকে দেখে উদ্ভাসিত হল কন্যার মুখ, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাবা নিশ্চয় টের পেয়েছে নোয়েলের কোনো সমস্যা হয়েছে, ঝামেলা থেকে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে। ল্যানচন তার অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল। নোয়েলের বাবা মেয়ের হাত ধরে দ্রুত ঢুকে পড়ল ল্যানচনের অফিসে। নোয়েলের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'পাপা, তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি,' বলল নোয়েল। 'আমি—'

'মশিউ ল্যানচন বললেন তিনি তোমাকে চমৎকার একটি প্রস্তাব দিয়েছেন আর তুমি নাকি তা প্রত্যাখ্যান করেছ।'

হতভম্ব হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল নোয়েল, 'প্রস্তাব? উনি আমাকে তাঁর সঙ্গে ছুটি কাটাতে বলেছেন।'

'আর তুমি না করে দিয়েছ?'

নোয়েল জবাব দেয়ার আগেই তার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল বাপ। বেকুব হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল নোয়েল, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, শুনল বাবা চেঁচাচ্ছেন, 'নির্বোধ! নির্বোধ তুই এখনই নিজের স্বার্থ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিস, হারামজাদী!' আবার চড় কষাল সে।

ত্রিশ মিনিট পরে নোয়েলের বাবা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখল গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ওরা। নোয়েল এবং মশিউ ল্যানচন চলেছে ভিয়েনায়।

হোটেলকক্ষটি ডাবল বেডের। বেশ বড় বিছানা। ঘরে সস্তা আসবাব, এককোনায় ওয়াশস্ট্যান্ড এবং বেসিন রয়েছে। মশিউ ল্যানচন খোলামকুচির মতো টাকা ওড়ানোর বান্দা নয়। সে বেলবয়কে যৎসামান্য বকশিশ দিল। ছেলেটা চলে যাওয়ামাত্র সে লাফ মেরে চলে এল নোয়েলের সামনে, টান মেরে ছিঁড়তে লাগল জামা-কাপড়। গরম, ভেজা হাত দিয়ে চেপে ধরল নোয়েলের বুক, মুচড়ে দিল জোরে।

'মাই গড, তুমি যে কী সুন্দরী!' হাঁপাচ্ছে সে। কোমর থেকে টান মেরে নামিয়ে আনল নোয়েলের স্কার্ট এবং প্যান্টি। ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিল বিছানায়। নোয়েল চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। নড়াচড়া করছে না, যা ঘটছে সে-ব্যাপারে যেন সচেতন নয়, যেন একধরনের শকের মধ্যে আছে ও। গাড়িতে বসে একটা কথাও বলেনি সে। ল্যানচন দ্রুত কাপড় ছাড়ল, ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেতে, তারপর বিছানায়, নোয়েলের পাশে উঠে এল। যা ভেবেছিল তার চেয়েও দারুণ শরীর নোয়েলের।

'তোমার বাবা বললেন তোমাকে নাকি এখন পর্যন্ত কেউ করেনি,' খিকখিক হাসল ল্যানচন। 'পুরুষের শরীর কী জিনিস আজ তুমি তা টের পাবে।' বেলুনের মতো ফোলা পেট নিয়ে সে চড়ে বসল নোয়েলের গায়ের ওপর, দু পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল শক্ত পুরুষাঙ্গ। জোরে জোরে কোমর নাড়তে লাগল। নোয়েল কিছুই অনুভব করছে না। তার মনে পড়ে যাচ্ছে বাবাকে। বাবার চিৎকার ভাসছে কানে : *মশিউ ল্যানচনের মতো ভদ্রলোক তোমাকে ছুটি কাটাতে নিয়ে যেতে চাইছেন এজন্য তোমার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ওনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। আমার মুখ চেয়ে এবং তোমার নিজের কথা ভেবে কাজটা করবে।*

গোটা দৃশ্যই নোয়েলের কাছে মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। সে নিশ্চিত ছিল বাবা ভুল বুঝেছে। কিন্তু নোয়েল ব্যাখ্যা করতে গেলে আবার গায়ে হাত তুলেছে সে। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়েছে, '*যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে কাজ করবে। তোমার মতো যদি অন্য মেয়েরা সুযোগ পেত, কৃতজ্ঞতায় গদগদ হত।*'

সুযোগ। ল্যানচনের দিকে তাকাল নোয়েল। চৌকোনা নোংরা একটা শরীর, জানোয়ারের মতো মুখটা থেকে শীৎকার বেরিয়ে আসছে, শুয়োরের মতো কুঁৎকুঁতে চোখে জান্তব উল্লাস। এই কিনা রাজকুমার যার কাছে বাবা তাকে বিক্রি করে দিল। তার প্রিয় বাবা যাকে রীতিমতো পুজো করত নোয়েল। ওর মনে পড়ে গেল টেবিলে স্টিক আর রোস্ট, বাবার নতুন পাইপ এবং সুটের কথা। ইচ্ছে করল বমি করে দেয়।

নোয়েলের ইচ্ছে করল সে যদি এখন মরে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিতে পারত

তাহলে খুব ভালো হত। তার রাজকুমারীর মৃত্যু ঘটেছে, সে জন্ম নেবে একটা বেশ্যা হিসেবে। ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিকতা এবং যা ঘটছে সে-ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল নোয়েল। ওর সমস্ত অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রবল ঘৃণা। এমন ঘৃণা যার সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় ছিল না নোয়েলের। বাবা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কোনোদিনই সে বাবাকে ক্ষমা করবে না। তবে ল্যানচনের প্রতি ঘৃণা জাগছে না তার। সকল পুরুষের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে ল্যানচনের মধ্যেও তা আছে।

নোয়েল সিদ্ধান্ত নিল এখন থেকে দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তর ঘটাবে। এটা কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা শিখবে। তার বাবা অবশ্য ঠিকই বলত। নোয়েল রাজকুমারী। এ পৃথিবী তার। পৃথিবীকে কীভাবে হাতের মুঠোয় পোরা যায় তা এখন সে জানে। খুব সহজ। পুরুষ পৃথিবী শাসন করে, কারণ তাদের আছে শক্তি, টাকা এবং ক্ষমতা। পুরুষদেরকে শাসন করতে হবে। অন্তত একজনকে। তবে সেই একজনকে শাসন করার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। অনেককিছু শিখতে হবে নোয়েলকে। আর এটা মাত্র শুরু।

মশিউ ল্যানচনের দিকে মনোযোগ ফেরাল সে। লোকটার নিচে শুয়ে আছে নোয়েল এখন টের পাচ্ছে পুরুষাঙ্গ কী জিনিস এবং ওটা নারীদের কী করতে পারে।

এত সুন্দর একটা শরীর পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ল্যানচন। লক্ষ্যও করেনি নোয়েল স্রেফ শুয়ে আছে তার হোঁৎকা মোটা দেহের নিচে। তবে এতে কিছু আসে যায় না ল্যানচনের। নোয়েলের চোখের দিকে তাকিয়েই সে যেরকম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এমন তীব্র কামনা গত কয়েক বছরে কারো প্রতি অনুভব করেনি। মধ্যবয়সী স্ত্রীর ঢলঢলে শরীর আর মার্সেইর বেশ্যাগুলোর ক্লান্ত দেহ ছেনে অভ্যস্ত ল্যানচন হঠাৎ এই তাজা, তরুণীকে পেয়ে ভাবছে তার জীবনে যেন একটা মিরাকল ঘটে গেছে।

তবে ল্যানচনের জীবনে মিরাকলের মাত্র শুরু। নোয়েলের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিলিত হবার পরে মেয়েটি তাকে বলল, 'চুপচাপ শুয়ে থাকুন।' সে নিজের জিভ, মুখ এবং হাত দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করে দিল। ল্যানচনের শরীরের সংবেদনশীল এলাকাগুলোয় ঘুরে বেড়াতে লাগল নোয়েলের জিভ, মুখ এবং হাত। ল্যানচন প্রবল আনন্দে 'আহ্! উহ্' করে গোঙাতে লাগল। মোচড় খাচ্ছে শরীর। কাজটা খুব সহজ। এটা নোয়েলের স্কুল, এটা তার শিক্ষা। এটা ক্ষমতার শুরু।

তিনদিন থাকল ওরা ওই হোটেলে। তবে ল্যানচন নোয়েলকে নিয়ে লো পিরামিডে গেল না। পুরোটা সময় তারা হোটেলে কাটাল। সারা দিনরাত ল্যানচন সেক্স সম্পর্কে যেটুকু জানে তা শেখাল নোয়েলকে।

মার্সেইতে যখন ফিরে এল ওরা, ল্যানচন তখন গোটা ফ্রান্সের সবচেয়ে সুখি

মানুষ। এর আগে সে ক্যাবিনেট পার্টিকুনিয়ার্স নামে একটি রেস্টুরেন্টের শপগার্লের প্রেমে পড়েছিল। তবে স্বল্প কদিনের প্রেম ছিল ওটা। সে বেশ্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু নোয়েলের মতো তৃপ্তি এ পর্যন্ত কেউ তাকে দিতে পারেনি। সে নোয়েলকে বলল, 'তোমাকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দেব, নোয়েল। তুমি রাঁধতে জানো?'

'জানি।'

'বেশ। আমি প্রতিদিন লাঞ্চের সময় আসব এবং প্রেম করব। হপ্তায় দু-তিন রাত তোমার সঙ্গে ডিনার করব।' নোয়েলের হাঁটু চাপড়ে দিল সে। 'শুনে কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো লাগছে,' বলল নোয়েল।

'তোমাকে হাতখরচাও দেব। তবে বেশি দিতে পারব না,' দ্রুত যোগ করল ল্যানচন। 'অবশ্য যা দেব তা দিয়ে তুমি মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনতে পারবে। তবে আমাকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতে পারবে না। তুমি এখন থেকে আমার।'

'তুমি যা বলো, অগাস্তি,' বলল নোয়েল।

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল ল্যানচন। আবার যখন কথা বলল, নরম শোনাল কণ্ঠ। 'আমি আগে কখনো কারো জন্য এতটা অনুভব করিনি। এবং জানো কেন?'

'না, অগাস্তি।'

'কারণ তুমি আমার ভেতরে তারুণ্যের জোয়ার বইয়ে দিয়েছ। তুমি আর আমি মিলে দারুণ একটা জীবন যাপন করব।'

সন্ধ্যার পরে ওরা মার্সেই পৌঁছুল। নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে ল্যানচন, নিজের স্বপ্নে বিভোর। নোয়েল তারটা।

'কাল সকাল নটার মধ্যে দোকানে চলে এসো,' বলল ল্যানচন। তারপর একমুহূর্ত ভেবে যোগ করল, 'অবশ্য ক্লান্ত বোধ করলে খানিক দেরিতে এলেও চলবে। ঠিক আছে, সাড়ে নটায় এসো।'

'ধন্যবাদ, অগাস্তি।'

পকেট থেকে একতাড়া ফ্রাঁ বের করে নোয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিল ল্যানচন। 'নাও। এটা রাখো। কাল বিকেলের মধ্যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে বের করবে।'

নোয়েল ল্যানচনের হাতে ধরা নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'কোনো সমস্যা?' জানতে চাইল ল্যানচন।

'আমি খুব সুন্দর কোনো জায়গায় থাকতে চাই,' বলল নোয়েল। 'যেখানে দুজনে মিলে স্ফূর্তি করতে পারব।'

'কিন্তু আমার অত টাকা নেই,' আপত্তি জানাল ল্যানচন।

সমঝদারের ভঙ্গিতে হাসল নোয়েল, একটা হাত রাখল লোকটার মোটা

তাতে। অনেকক্ষণ নোয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকল ল্যানচন। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি ঠিকই বলেছ,' বলল সে। ওয়ালেট বের করে টাকা বের করতে লাগল। সেইসঙ্গে নোয়েলকে লক্ষ করছে।

নোয়েলের চেহারায় যখন সন্তুষ্টির ভাব ফুটল, ওয়ালেট বন্ধ করল ল্যানচন। সে ধূর্ত ব্যবসায়ী। জানে টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে বটে তবে এতে নোয়েল তাকে ছেড়ে যাবে না।

নোয়েল দেখল খুশিমনে চলে গেল ল্যানচন। সে দোতলায় উঠে এল। নিজের জিনিসপত্র গোছাল, লুকানো জায়গা থেকে বের করল জমানো অর্থ। ওইদিন রাত দশটার ট্রেনে সে রওনা হয়ে গেল প্যারিসের উদ্দেশে।

পরদিন ভোরে প্যারিসে পৌঁছাল ট্রেন। আগের যাত্রীদের ভিড়ে জনারণ্যে পরিণত হয়েছে পিএলএম স্টেশন। এর মধ্যে প্যারিস ত্যাগ করতে ইচ্ছুক প্যাসেঞ্জারের সংখ্যাও কম নেই। চিৎকার-চেঁচামেচি, হাউকাউতে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। মানুষজনের ধাক্কা খেতে খেতে এগোতে হচ্ছে নোয়েলকে। তবে এজন্য ও কিছু মনে করছে না। যে মুহূর্তে সে ট্রেন থেকে নেমেছে, নগরী-দর্শনের আগেই মনে হয়েছে এটাই তার বাড়ি। মার্সেই তার কাছে অচেনা লাগে, কিন্তু প্যারিসকে মনে হয় নিজের শহর। ট্রেন স্টেশনের ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার আর উত্তেজনা বেশ উপভোগ করছে নোয়েল। এসবই যেন তার পরিচিত। তাকে এখন যা করতে হবে তা হল ঠাণ্ডা রাখতে হবে মাথা। সুটকেস হাতে তুলে নিল নোয়েল, পা বাড়াল এক্সিটের দিকে।

বাইরে, উজ্জ্বল সূর্যালোকে গাড়িঘোড়ার ভিড় দেখে মাথা ঘুরে গেল নোয়েলের। ইতস্তত করছে। হঠাৎই উপলব্ধি করতে পারছে ওর আসলে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। স্টেশনের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ-ছটা ট্যাক্সি। সে প্রথম ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

'কোথায় যাবেন?'

ইতস্তত করল নোয়েল। 'সস্তা কোনো হোটেলের কথা জানা আছে তোমার?'

ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওকে। 'শহরে নতুন এসেছেন?'

'হুঁ।'

মাথা দোলাল ড্রাইভার। 'আপনার বোধহয় চাকরি-বাকরি দরকার।'

'হ্যাঁ।'

'একটা কাজের ব্যবস্থা সম্ভবত করে দিতে পারব,' বলল সে। 'মডেলিং করেছেন কখনো?'

নোয়েলের কলজে লাফিয়ে উঠল, 'করেছি।'

'আমার বোন এখানকার বড় একটি ফ্যাশন হাউজে কাজ করে।' জানাল

ড্রাইভার। 'আজ সকালেই জানাল তাদের একটা মেয়ে চলে গেছে। জায়গাটা খালি আছে কিনা দেখবেন একবার?'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' বলল নোয়েল।

'ওখানে নিয়ে গেলে দশ ফ্রাঁ দিতে হবে।'

ভুরু কোঁচকাল নোয়েল।

'তবে খরচা উঠে যাবে,' প্রতিশ্রুতি দিল ড্রাইভার।

'ঠিক আছে,' সিটে হেলান দিল নোয়েল। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি বের করে আনল ড্রাইভার, মিশে গেল উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করা গাড়ির ভিড়ে। ছুটল শহরের কেন্দ্রস্থলে। গাড়ি চালানোর সময় বকবক করে গেল ড্রাইভার, কিন্তু নোয়েলের কানে একটা শব্দও ঢুকছে না। সে দু-চোখ ভরে গিলছে শহরের দৃশ্য। ব্ল্যাকআউটের কারণে প্যারিস এখন স্বাভাবিকের চেয়ে ম্লান, তবে নোয়েলের কাছে এটাকে খাঁটি জাদুর শহর মনে হচ্ছে। এ শহরের একটা আভিজাত্য, স্টাইল, এমনকি সুগন্ধও রয়েছে।

নোতরদাম পাশ কাটাল ওরা। রাইট ব্যাংকের পন্ট নফ নিউফ পার হয়ে মার্শাল ফচ বুলেভার্ডের দিকে এগোল। দূরে দৃশ্যমান হয়ে উঠল আইফেল টাওয়ার। শহরটাকে যেন নেতৃত্ব দিচ্ছে। রিয়ারভিউ মিররে নোয়েলের মুগ্ধ চেহারা লক্ষ করল ড্রাইভার।

'সুন্দর, না?'

'অপূর্ব,' শান্তগলায় বলল নোয়েল। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এ শহরে এসেছে। রাজকুমারীর বসবাসের যোগ্য এ শহর... তার বসবাসের যোগ্য।

রু ডি প্রভেন্সে, ধূসর পাথরে তৈরি একটি ভবনের সামনে থামল ট্যাক্সি।

'চলে এসেছি,' ঘোষণা দিল ড্রাইভার। 'মিটারে ভাড়া উঠেছে দুই ফ্রাঁ। আর আমাকে দেবেন দশ ফ্রাঁ।'

'চাকরিটা এখনো খালি আছে কিনা কী করে জানব?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'বললামই তো আজ সকালেই একটা মেয়ে চলে গেছে। ভেতরে যেতে না চাইলে চলুন আপনাকে স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।'

'না,' দ্রুত বলল নোয়েল। খুলল পার্স, বারো ফ্রাঁ বের করে ড্রাইভারকে দিল। টাকার ওপর একবার চোখ বুলাল ড্রাইভার, তারপর তাকাল নোয়েলের দিকে। বিব্রতবোধ করল নোয়েল। পার্স থেকে আরেকটা এক ফ্রাঁ'র নোট বের করে লোকটাকে দিল।

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, দেখছে ট্যাক্সি থেকে সুটকেস বের করছে নোয়েল।

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে, নোয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বোনের নাম কী?'

'জ্যানেট।'

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকল নোয়েল। দেখছে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটি। তারপর বিল্ডিঙের দিকে নজর ফেরাল সে। সামনে কোনো সাইনবোর্ড নেই। নোয়েল ভাবল ফ্যাশনেবল ড্রেস হাউসের সাইনবোর্ডের দরকার হয় না। সবাই জানে এ প্রতিষ্ঠানটি কোথায়। সুটকেস নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল নোয়েল। বেল বাজাল। কিছুক্ষণ পরে খুলে গেল দরজা। কালো অ্যাপ্রন পরা এক চাকরানি উদয় হল দোরগোড়ায়। ফাঁকা চোখে তাকাল সে নোয়েলের দিকে। 'বলেন?'

'এক্সকিউজ মি,' বলল নোয়েল, 'শুনলাম এখানে মডেলিং-এর একটা কাজ খালি আছে।'

চোখ পিটপিট করল মহিলা। 'কে পাঠিয়েছে আপনাকে?'

'জ্যানেটের ভাই।'

'ভেতরে আসুন।' সে মেলে ধরল দরজা। অষ্টাদশ শতকের ঢঙে নির্মিত রিসেপশন হলে পা রাখল নোয়েল। ছাদ থেকে প্রকাণ্ড একটি ব্যাকারাট ঝাড়বাতি ঝুলছে। হলঘরে ছিটিয়ে রয়েছে আরো কয়েকটি। খোলা একটি দরজা দিয়ে নোয়েল দেখতে পেল একটা বসার ঘর। নানান অ্যান্টিক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ঘরটি। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। চমৎকার, সুদৃশ্য একটি টেবিলে পড়ে আছে ফিগারো এবং *লে চো ডি প্যারিস*-এর কপি। 'এখানে অপেক্ষা করুন। খোঁজ নিচ্ছি মাদাম ডেলিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কিনা।'

'ধন্যবাদ,' বলল নোয়েল। মেঝেতে নামিয়ে রাখল সুটকেস। হেঁটে গেল দেয়ালে ঝোলানো বড়সড় আয়নাটির দিকে। ট্রেনভ্রমণে ওর পরনের জামা-কাপড় কুঁচকে আছে। ফ্রেশ-ট্রেশ না হয়ে হুট করে এখানে এভাবে চলে আসা মোটেই উচিত হয়নি, ভাবছে ও। চেহারা সুন্দর দেখানোটা জরুরি। তবে আয়নায় ওকে দেখতে সুন্দরই লাগছে।

ঘুরল নোয়েল। আয়নায় দেখতে পেয়েছে একটি মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছ নিচে। মেয়েটির ফিগার চমৎকার, মুখশ্রীও সুন্দর, পরনে লম্বা, বাদামি রঙের স্কার্ট এবং উঁচুগলার ব্লাউজ। এখানকার মডেলরা নিশ্চয় খুব উঁচুদরের। নোয়েলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল মেয়েটি, চলে গেল ড্রেসিংরুমে। একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন মাদাম ডেলিস। চল্লিশের কোঠায় বয়স ভদ্রমহিলার, বেঁটে, মোটা, চাউনি শীতল। তার পরনের গাউনটির দাম কমপক্ষে দু হাজার ফ্রাঁ।

'রেজিনা বলল তুমি চাকরি খুঁজছ,' বললেন তিনি।

'জি, ম্যাম,' বলল নোয়েল।

'কোত্থেকে এসেছ?'

'মার্সেই।'

নাক কোঁচকালেন মাদাম ডেলিস। 'মাতাল নাবিকদের খোঁয়াড়।'

নোয়েলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ওর কাঁধ চাপড়ে দিলেন মাদাম ডেলিস। 'এতে কিছু আসে যায় না, মাই ডিয়ার। বয়স কত তোমার?'

'আঠারো।'

মাথা দোলালেন মাদাম। 'ভালো। মনে হয় আমার খদ্দেররা তোমাকে পছন্দ করবেন। প্যারিসে আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?'

'নাহ্।'

'চমৎকার। তুমি কি এখনই কাজ শুরু করে দিতে চাও?'

'জি,' আগ্রহ নিয়ে জবাব দিল নোয়েল।

ওপর থেকে ভেসে এল হাসির শব্দ। লালচুলের একটি মেয়েকে বগলদাবা করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল মোটা, মধ্যবয়সী এক লোক। মেয়েটির পরনে পাতলা নেগলিজি।

'এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল?' জিজ্ঞেস করলেন মাদাম ডেলিস।

'অ্যাঞ্জেলার মাল আউট করে দিয়েছি আমি,' খ্যাকখ্যাক হাসল লোকটা। নোয়েলের দিকে চোখ আটকে গেল তার।

'এই ছোট্ট সুন্দরীটি কে?'

'এর নাম ইভেট, আমাদের নতুন মেয়ে,' বললেন মাদাম ডেলিস। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে যোগ করলেন, 'ও অ্যান্তিব্স্ থেকে এসেছে। এক প্রিন্সের মেয়ে।'

'আমি কখনো কোনো প্রিন্সেসকে লাগাইনি,' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'কত দেব?'

'পঞ্চাশ ফ্রাঁ।'

'ঠাট্টা করছেন। ত্রিশ দেব।'

'চল্লিশ। বিশ্বাস করুন, পয়সা উসুল হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।'

নোয়েলের দিকে ফিরল ওরা। অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা প্যারিসের রাস্তায় হেঁটে বেড়াল নোয়েল। সে হাঁটল চ্যাম্পস-এলিসিস-এ, ঘুরে বেড়াল লিডো আর্কেড-এ, প্রতিটি দোকানে উঁকি দিয়ে দেখল অবিশ্বাস্য সুন্দর জুয়েলারি, ড্রেস, চামড়ার জিনিসপত্র, পারফিউম। তার মনে হচ্ছে এসব জিনিসের সে মালিক হবে একদিন। নোয়েল ঘুরে বেড়াল বোয়া, রু ডি ফবোর্গ-সেন্ট-অনর এবং ভিক্টর হুগো এভিন্যুতে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেল সে। খিদে পেয়েছে। মাদাম ডেলিসের বাড়িতে পার্স এবং সুটকেস ফেলে রেখে এসেছে নোয়েল। কিন্তু ওখানে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। মহিলার কাছ থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসার ব্যবস্থা সে করবে।

যা ঘটেছে সেজন্য মোটেই মর্মাহত হয়নি নোয়েল। সেবাদাসী এবং বেশ্যার মধ্যে পার্থক্য সে জানে। বেশ্যারা ইতিহাস বদলাতে পারেনি, সেবাদাসী কিংবা রাজনর্তকীরা পেরেছে। নোয়েলের কাছে একটি পয়সাও নেই। কাল যেভাবেই হোক একটি কাজ জুটিয়ে নিতে হবে ওকে। কিন্তু আজকের দিনটা তো চলতে হবে। আকাশে সাঁঝের ছায়া, সম্ভাব্য বিমানহামলার ভয়ে দোকানদার এবং হোটেলের দারোয়ানরা যে-যার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কালো পর্দা টেনে দিচ্ছে। পেটে দাউ দাউ জ্বলছে খিদের আগুন। এ সমস্যার সমাধানের জন্য কাউকে খুঁজে বের করতে হবে নোয়েলকে। এক লোককে জিজ্ঞেস করে ব্রিলন হোটেলের দিকে পা বাড়াল ও। বাইরে জানালায় লোহার শাটার ফেলা, তবে ভেতরে, লবিতে চোখ-ধাঁধানো আভিজাত্যের ছড়াছড়ি।

নোয়েল প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে হোটেলে ঢুকল। যেন এখানেই সে থাকে। এলিভেটরের মুখোমুখি একটা আসন নিয়ে বসল। এরকম কাজ আগে কখনো করেনি সে। ফলে স্বভাবতই খানিকটা নার্ভাস। নোয়েলের মনে পড়ছে কত সহজে সে অগাস্তি ল্যানচনকে ধোঁকা দিয়েছে। পুরুষরা মোটেই জটিল নয়। মেয়েদেরকে একটি কথা মনে রাখলেই চলবে : পুরুষদের পুরুষাঙ্গ যখন উত্থিত অবস্থায় থাকে তখন ওরা ভেতরে থাকে নরম আর পুরুষাঙ্গ নরম থাকার সময় ওরা থাকে শক্ত। কাজেই তুমি যা চাও তা পাবার জন্য ওদের পুরুষাঙ্গ শক্ত রাখো। লবির চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে নোয়েল শিকার খুঁজল। একাকী ডিনার করতে এসেছে এমন কাউকে দরকার।

'ক্ষমা করবেন, মাদমোয়াজেল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নোয়েল। বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, পরনে গাঢ় রঙের সুট। নোয়েল জীবনে কোনো গোয়েন্দা দেখেনি। তার সন্দেহ নেই এ লোক গোয়েন্দা।

'মাদমোয়াজেল কি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন?'

'হ্যাঁ,' কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল নোয়েল। 'এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

হঠাৎ নিজের অসংখ্য-ভাঁজ-খাওয়া পোশাক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল নোয়েল। ওর হাতে পার্সও নেই।

'আপনার বন্ধু কি এ হোটেলে উঠেছেন?'

আতঙ্কিত বোধ করল নোয়েল, 'না—ঠিক তা নয়,' নোয়েলকে একমুহূর্ত পরখ করল গাঢ় সুট, কথা বলার সময় সময় কঠোর শোনাল কণ্ঠ। 'আপনার পরিচয়পত্র দেখতে পারি?'

'আ—ওটা আমার কাছে নেই,' তোতলাল নোয়েল, 'হারিয়ে ফেলেছি।'

গোয়েন্দা বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার একটু আসতে হবে, মাদমোয়াজেল।'

সে শক্তহাতে চেপে ধরল নোয়েলের নরম বাহু। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল। এমন সময় আরেকজন ধরল ওর অপর হাত। বলল, 'দুঃখিত, আমি দেরি করে ফেলেছি, চেরি। কিন্তু তুমি তো বিশ্রী ককটেল পার্টিগুলো সম্পর্কে জানোই। ওখানে জোর না করলে বেরুনোর সুযোগ নেই। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ?'

বিস্মিত নোয়েল পাঁই করে ঘুরল। তাকাল বক্তার দিকে। লোকটা লম্বা, পাতলা, কঠোর চেহারা। পরনে অদ্ভুত একটা ইউনিফর্ম। তার চুলের রঙ নীলচে-কালো, চোখ যেন ঝড়ের সাগর, পাপড়িগুলো লম্বা এবং ঘন। দারুণ জীবন্ত একটা মুখ। চিবুকে গভীর একটা খাঁজও আছে। লোকটাকে দেখা মাত্র গোয়েন্দার মুঠি আলগা হয়ে গেল নোয়েলের গা থেকে।

গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে এল লোকটা, 'ও কি তোমাকে বিরক্ত করছে?' ফরাসিতে প্রশ্ন করল সে। কণ্ঠস্বর ভরাট।

'ন্-না,' জবাব দিল নোয়েল। হতভম্ব।

'মাফ করবেন, স্যার,' বলল হোটেল-ডিটেকটিভ।

'আমারই বোঝার ভুল হয়েছে।' নোয়েলের দিকে ফিরল সে। 'মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল।'

আগন্তুক ফিরল নোয়েলের দিকে। 'একে কি মাফ করে দেয়া যায়?'

ঢোক গিলল নোয়েল, মাথা ঝাঁকাল দ্রুত।

লোকটা গোয়েন্দার দিকে তাকাল। 'মাদমোয়াজেলের মনে অশেষ দয়া। ভবিষ্যতে কারো সঙ্গে এরকম আচরণ করার আগে দশবার ভেবে দেখবে।' নোয়েলের হাত ধরে সে পা বাড়াল দরজার দিকে।

রাস্তায় চলে এল ওরা। নোয়েল বলল, 'আ-আমি জানি না আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব।'

'পুলিশ আমার দু-চোখের বিষ,' মুচকি হাসল আগন্তুক, 'আপনাকে ট্যাক্সি ডেকে দেব?'

নোয়েল লোকটার দিকে তাকাল, পরিস্থিতির কথা মনে করতে আবার সেই ভয়টা ফিরে এল।

'না।'

'ঠিক আছে। শুভরাত্রি,' সে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে গেল। ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আগের জায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে নোয়েল, বিস্ফারিত দৃষ্টি তার দিকে। হোটেল-ডিটেকটিভ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে সব। ইতস্তত করল আগন্তুক, ফিরে এল নোয়েলের কাছে। 'এখান থেকে কেটে পড়ুন।' পরামর্শ দিল সে। 'আমাদের বন্ধুটির আপনার প্রতি এখনো কৌতূহল যায়নি।'

'আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই,' বলল নোয়েল। মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক, হাত ঢোকাল পকেটে।

'আমার টাকা লাগবে না,' দ্রুত বলে উঠল নোয়েল। অবাক চোখে নোয়েলকে দেখল যুবক, 'আপনি আসলে কী চান?'

'আপনার সঙ্গে ডিনার করতে চাই।'

হাসল সে, 'দুঃখিত। আমার একটা ডেট আছে। আর ইতোমধ্যে দেরিও হয়ে গেছে।'

'তাহলে চলে যান,' বলল নোয়েল। 'আমি ঠিক থাকব।' টাকাগুলো পকেটে ঢোকাল আগন্তুক। 'ঠিক আছে, হানি। অ ভোয়া (বিদায়)।' ঘুরে দাঁড়াল সে, আবার কদম বাড়াল ট্যাক্সির দিকে। নোয়েল লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝতে পারছে না ভুলটা কোথায় করেছে ও। ও জানে বোকার মতো আচরণ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ছাড়া তো উপায়ও ছিল না ওর। লোকটার দিকে যখন প্রথম তাকাল নোয়েল, মনের মাঝে কী যেন কী ঘটে গিয়েছিল ওর, এমন অনুভূতি কখনো হয়নি তার, আবেগের ঢেউটা এমন শক্তিশালী ওকে দারুণভাবে ছুঁয়ে গেছে।

নোয়েল হোটেলের দিকে তাকাল। হনহন করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে ব্যাটা। এবার ওকে কোনো যুক্তি দিয়ে কাটানো যাবে না। কাঁধে কার যেন হাতের স্পর্শ পেল নোয়েল। ঘুরল। সেই যুবক। ওর হাত ধরে নিয়ে চলল ট্যাক্সিতে। ঝট করে খুলে ফেলল দরজা, প্রায় ধাক্কা মেরে নোয়েলকে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। ড্রাইভারকে একটা ঠিকানা দিল। ছুটল ট্যাক্সি গোয়েন্দাকে ফুটপাতে রেখে। সে গাড়ির দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল। 'আপনার ডেটের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল। 'এটা একটা পার্টি,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'একজন যোগ হলে কোনো ক্ষতি নেই। আমি ল্যারি ডগলাস। আপনি?'

'নোয়েল পেজ।'

'আপনি কোত্থেকে এসেছেন, নোয়েল?'

নোয়েল ঘুরে তাকাল বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়ার দিকে। 'অ্যান্টিকস, আমি এক প্রিন্সের মেয়ে।'

হেসে ফেলল যুবক, ঝিকিয়ে উঠল সাদা দাঁত।

'গুড ফর ইউ, প্রিন্সেস।'

'আপনি ইংরেজ?'

'আমেরিকান।'

আগন্তুকের ইউনিফর্ম দেখল নোয়েল, 'আমেরিকায় তো যুদ্ধ হচ্ছে না।'

'আমি ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সে আছি।' ব্যাখ্যা করল সে।

'আমেরিকান কিছু বৈমানিক নিয়ে ওরা একটা দল করেছে। নাম ঈগল

স্কোয়াড্রন।'

'কিন্তু আপনারা কেন ইংল্যান্ডের জন্য লড়াই করবেন?'

'কারণ ইংল্যান্ড আমাদের জন্য লড়ছে,' জবাব দিল সে। 'তবে আমরা এটা এখনো জানি না।'

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'এসব ঘটছে বিশ্বাস হচ্ছে না। হিটলার একটা ক্লাউন।'

'হয়তো বা। তবে সে ক্লাউন হলেও জানে জার্মানরা কী চায় : শাসন করতে চায় দুনিয়া।'

ল্যারি হিটলারের যুদ্ধকৌশল নিয়ে আলোচনা করল, ব্যাখ্যা করল কেন হঠাৎ করে লিগ অভ নেশন্স থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিল, বলল জাপান এবং ইটালির সঙ্গে জার্মানির প্রতিরক্ষা-চুক্তির কথা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনছে নোয়েল। শুনতে ভালোই লাগছে তবে তারচে' ভালো লাগছে ল্যারির বলার ঢঙ। কথা বলার সময় উৎসাহে ঝলমল করছে যুবকের কালো চোখ।

এমন কারো সঙ্গে কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি নোয়েলের। ল্যারি খোলামেলা, উষ্ণ; জীবন সে উপভোগ করতে জানে, তার আশপাশের মানুষজনও যেন আনন্দের ভাগীদার হতে পারে সেদিকেও তার তীক্ষ্ণ নজর। চুম্বকের মতো ল্যারি, সবাইকে টানছে নিজের অক্ষপথে।

রু চেমিন ভার্টে পৌঁছুল ওরা। এখানেই ল্যারির পার্টি হচ্ছে। মানুষজন হাসছে, কথা বলছে, চিল্লাচিল্লি করছে। বেশিরভাগ বয়সে তরুণ। আমন্ত্রণকর্ত্রীর সঙ্গে নোয়েলের পরিচয় করিয়ে দিল ল্যারি। মহিলার মাথার চুল লাল, সেক্সি, চেহারায় খাই-খাই একটা ভাব আছে। পরিচয়পর্ব শেষে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল নোয়েল। লক্ষ করল ল্যারির পাশে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলেছে অল্পবয়েসী মেয়েরা, তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। তবু কোনো অহংবোধ নেই ল্যারির মধ্যে। যেন জানেই না কতটা আকর্ষণীয় চেহারা ওর।

একজন একটা ড্রিংক তুলে দিল নোয়েলের হাতে। আরেকজন খাবারের প্লেট নিয়ে এল। হঠাৎই খিদে চলে গেছে নোয়েলের। আমেরিকান যুবকের সঙ্গে থাকতে মন চাইছে ওর, ইচ্ছে করছে মেয়েদের ভিড় ঠেলে ওকে সরিয়ে নিয়ে আসতে। পুরুষরা এগিয়ে এল নোয়েলের সঙ্গে কথা বলতে। তবে নোয়েলের মন ভেসে বেড়াচ্ছে অন্য কোথাও। পার্টিতে আসার পর থেকে আমেরিকান যেন ভুলেই গেছে নোয়েলের কথা, যেন ওর কোনো অস্তিত্বই নেই। কেন সে মনে রাখবে ওকে? ভাবল নোয়েল। পার্টিতে মেয়েদের অভাব নেই। ওই যুবকের বয়েই গেছে নোয়েলের সঙ্গে থাকতে। দুই পুরুষ নোয়েলের সঙ্গে আলাপচারিতা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না নোয়েল। ঘরটা হঠাৎই অসহ্যরকম গরম লাগতে শুরু করেছে। এখান থেকে কেটে পড়ার রাস্তা খুঁজল নোয়েল।

একটা কণ্ঠ ওর কানে কানে বলল, 'চলো যাই,' কিছুক্ষণ পরে নোয়েল এবং আমেরিকান বেরিয়ে এল রাস্তায়, রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়। নগরী অন্ধকার। অদৃশ্য জার্মানদের ভয়ে চুপচাপ। গাড়িগুলো রাস্তা ধরে ছুটে যাচ্ছে যেন কালো সাগরের বুক ভেদ করে চলেছে নির্বাক মাছ।

ট্যাক্সি মিলল না। কাজেই হাঁটা ধরল ওরা। দেস ভিক্টোরিজ-এ ডিনার করল দুজনে। খাওয়ার সময় বুঝতে পারল নোয়েল ওর আসলে অনেক খিদে লেগেছে। আমেরিকান ওর মুখোমুখি বসেছে। নোয়েল ভাবছে ওর বুকে এমন উথালপাথাল ঢেউ উঠছে কেন। যুবক যেন ওর বুকের ভেতরের ফল্গুধারা স্পর্শ করেছে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল না নোয়েল। ওর এমন খুশিখুশি লাগছে। আগে কখনো লাগেনি।

নানান বিষয় নিয়ে গল্প করল ওরা। নিজের অতীত নোয়েলের কাছে তুলে ধরল ল্যারি। বলল সে দক্ষিণ বোস্টন থেকে এসেছে। ওরা বোস্টন আইরিশ। তার মার জন্ম কেরি কাউন্টিতে।

'তুমি এত ভালো ফরাসি বলতে শিখলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'ছেলেবেলায় ক্যাপডি অ্যান্টিকসে গরমের ছুটি কাটাতে যেতাম। আমার বাবা ছিলেন স্টক মার্কেট টাইকুন।' তারপর সে আমেরিকার স্টক মার্কেট নিয়ে বলল। অনেক কিছুই বুঝতে পারল না নোয়েল। তবে ল্যারির কথা শুনতে ভালো লাগছিল ওর।

'তুমি থাকো কোথায়?'

'কোথাও না,' ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং মাদাম ডেলিসের গল্প শোনাল নোয়েল। বলল ডেলিসের আস্তানার মোটু বিশ্বাস করেছিল নোয়েল সত্যি রাজকুমারী। ওর জন্য চল্লিশ ফ্রাঁ দিতে চেয়েছে। উঁচুগলায় হেসে উঠল ল্যারি।

'বাড়িটা দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারব।'

'চলো, প্রিন্সেস।'

রু ডি প্রভেন্সের বাড়িতে পৌঁছুল ওরা। সেই একই চাকরানি খুলে দিল দরজা। তরুণ আমেরিকানকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা, পরমুহূর্তে আঁধার ঘনাল পাশে নোয়েলকে লক্ষ করে।

'মাদাম ডেলিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' বলল ল্যারি। রিসেপশন হলে ঢুকে পড়ল নোয়েলকে নিয়ে। ড্রইংরুমে অনেক মেয়ে বসে আছে। চলে গেল চাকরানি। কিছুক্ষণ পরে ঢুকল মাদাম ডেলিস। 'গুড ইভনিং, মশিউ,' বলল সে ল্যারিকে। ফিরল নোয়েলের দিকে। 'তুমি! আশা করি মত পরিবর্তন করেছ।'

'করেনি,' হাসিমুখে জানাল ল্যারি। 'আপনার কাছে প্রিন্সেসের কিছু জিনিস রয়ে গেছে।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মাদাম ডেলিস।

'ওর সুটকেস আর পার্স।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল মাদাম ডেলিস। তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে। কিছুক্ষণ পরে চাকরানি ঢুকল ঘরে, হাতে নোয়েলের পার্স এবং সুটকেস।

'ধন্যবাদ,' বলল ল্যারি। ফিরল নোয়েলের দিকে, 'চলো, প্রিন্সেস।'

রু লাফায়েত্তিতে ল্যারির আস্তানায় চলে এল নোয়েল। এটা ছোট একটা হোটেল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। কেউ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেনি, কিন্তু ঘটনাটা অনিবার্য ছিল। সে রাতে দুজনে প্রেম করল। যেন বুনো আনন্দের বিস্ফোরণে ভেসে গেল দুজনই। সুখের সাগরে ভাসতে লাগল নোয়েল। সারারাত ল্যারির বাহুতে মাথা রেখে ঘুমাল ও, ওকে জড়িয়ে ধরে। স্বপ্নের চেয়ে সুখময় লাগল মুহূর্তগুলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জাগল ওরা। প্রেম করল। তারপর বেরুল শহর দেখতে। গাইড হিসেবে চমৎকার ল্যারি। প্যারিস মজার একটি খেলনা হিসেবে ধরা দিল নোয়েলের বিস্মিত চোখে। তুইলিরিসে লাঞ্চ করল ওরা, বিকেল কাটাল ম্যাল মেইসন-এ, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ঘুরে বেড়াল নোতরদামের শেষ মাথায়, দেস ভোগেস-এ। এটা প্যারিসের প্রাচীনতম অঞ্চল। এ এলাকা তৈরি করে গেছেন রাজা ত্রয়োদশ লুই।

ল্যারি নোয়েলকে নিয়ে গেল মবার্টে, বর্ণিল রাস্তার বাজার দেখাল। দেলা মেজিসেরিতে খাঁচাবন্দি নানান রঙের হাজারও পাখি এবং পশু দেখল নোয়েল মুগ্ধচোখে। গেল মার্শে ডি বুসি'র হকার্স মার্কেটে, মন্টপার্নাসের ডু পন্টে। ডিনার করল বাতু মুশেতে। সকাল চারটায় কসাই এবং ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে লে হ্যালেতে পেঁয়াজের স্যুপ খেল।

পথ চলতে কত মানুষের সঙ্গে যে ভাব জমিয়ে ফেলল ল্যারি! ওর হাসিখুশি স্বভাবই মানুষকে ওর প্রতি সহজে আকৃষ্ট করে। নোয়েলকে হাসতে শেখাল সে। নোয়েল জানত না তার মধ্যে এত হাসি লুকিয়ে আছে। এ যেন দেবতার উপহার, ল্যারির প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল নোয়েল। ওর প্রেমে পড়ে গেল।

সকালবেলা ওরা ফিরে এল হোটেলরুমে। নোয়েল বেজায় ক্লান্ত, তবে ল্যারি তখনো প্রাণশক্তিতে ভরপুর। নোয়েল বিছানায় শুয়ে পড়ল। ল্যারি জানালায় দাঁড়াল। প্যারিসের সূর্যোদয় দেখছে।

'আমি প্যারিস ভালোবাসি,' বলল সে। 'এ যেন মানুষের তৈরি এক মন্দির। এ হল সুন্দর, খাবার এবং প্রেমের শহর।' নোয়েলের দিকে ফিরে মুচকি হাসল। 'আমি কিন্তু অন্যকিছু ভেবে বলিনি।'

নোয়েল ওকে দেখছে। জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে এল ল্যারি, শুয়ে পড়ল নোয়েলের পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরল নোয়েল। ওর শরীরের ঘ্রাণ নিল।

বাবার কথা মনে পড়ল। সে ওর সঙ্গে কী বিশ্বাসঘাতকতাটাই না করেছে। নোয়েল বাবাকে আর অগাস্তি ল্যানচনকে দিয়ে সকল পুরুষমানুষকে বিচার করেছে। নোয়েল এখন জানে ল্যারি ডগলাসের মতো পুরুষও আছে। এবং জানে ওর জীবনে আর কোনো পুরুষের দরকার হবে না।

'তুমি জানো পৃথিবীর সেরা মানুষ কে, প্রিন্সেস?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'তুমি,' জবাব দিল নোয়েল।

'উইলবার এবং অরভিল রাইট। তারা মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দিয়েছে। তুমি কখনো প্লেনে চড়েছ?' মাথা নাড়ল নোয়েল। 'মন্টাকে আমাদের একটি সামার প্লেস ছিল—লং আইল্যান্ডের শেষ মাথায়— ছেলেবেলায় দেখতাম সৈকতের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে সিগালের দল। আমার মনও ওদের সঙ্গে উড়ে বেড়াত। আমি হাঁটতে শেখার আগেই বৈমানিক হতে চেয়েছি। আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু আমাকে পুরোনো একটি বাইপ্লেনে চড়িয়েছিল একদিন। তখন আমার বয়স নয়। চোদ্দবছর বয়সে আমি প্রথম আকাশে ওড়ার ট্রেনিং নিই। যখন আকাশে থাকি, মনে হয় বেঁচে আছি।'

একটু বিরতির পরে যোগ করল ল্যারি। 'বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। জার্মানি গোটা পৃথিবী দখল করে নিতে চায়।'

'ওরা ফ্রান্স দখল করতে পারবে না, ল্যারি। ম্যাগিনট লাইন পার হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

নাক কোঁচকাল ল্যারি। 'আমি ওটা বহুবার পার হয়েছি।' ওর দিকে নোয়েল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে দেখে ব্যাখ্যা করল, 'আকাশপথে, প্রিন্সেস। আকাশে লড়াই হবে... আমার লড়াই।'

আরো পরে একদম স্বাভাবিক গলায় বলল ল্যারি, 'আচ্ছা, আমরা বিয়ে করে ফেললেই তো পারি?'

অমন সুখের মুহূর্ত জীবনে আসেনি নোয়েলের।

রোববার অলস একটি দিন। মন্তমার্তের একটি ছোট, আউটডোর ক্যাফেতে ওরা নাস্তা খেল। তারপর ফিরে এল ঘরে। সারাদিন কাটাল বিছানায়। কেউ এমন রমণপ্রিয় হতে পারে অভিজ্ঞতা না হলে বিশ্বাস করত না নোয়েল। যখন প্রেম করে, মনে হয় জাদুর মতো ঘটছে সবকিছু। তবে নোয়েল স্রেফ ল্যারির পাশে শুয়ে ওর কথা শুনেও তৃপ্তি লাভ করে। ওকে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে যখন ঘরে অনবরত পায়চারি করতে থাকে ল্যারি। ওর পাশাপাশি, কাছাকাছি আছে এটাই দারুণ সৌভাগ্যের মনে হয় নোয়েলের। ব্যাপারটা ওর কাছে মাঝে মাঝে অদ্ভুত লাগে। বাবা ওকে আদর করে প্রিন্সেস ডাকত। এখন ল্যারি ডাকছে। ল্যারির সঙ্গে যখন থাকে নোয়েল, নিজেকে ভিন্ন কিছু মনে হয়। ল্যারি নোয়েলের মনে পুরুষের

প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। ল্যারি ওর পৃথিবী। নোয়েল জানে ওর আর কিছুর দরকার হবে না। মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ওর কপালে এত সুখ ছিল। ল্যারিরও অনুভূতি একইরকম।

'যুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে পারব না আমি,' বলল সে নোয়েলকে। 'জাহান্নামে যাক সব। মানুষ পরিকল্পনা করেই তো বদলানোর জন্য। কি ঠিক বলিনি, প্রিন্সেস?'

মাথা দোলাল নোয়েল। সুখে আত্মহারা ও। যেন ভেতরে বিস্ফোরিত হবে সুখ।

'গ্রামের কোনো চার্চে গিয়ে বিয়ে করে ফেলি চলো,' প্রস্তাব দিল ল্যারি। 'নাকি ধুমধাম করে বিয়েটা হোক চাইছ?'

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'গ্রামের চার্চের বিয়েতে কোনো আপত্তি নেই আমার।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ল্যারি। 'তবে তাই হোক। আজ রাতে স্কোয়াড্রনে রিপোর্ট করতে হবে। আগামী শুক্রবার তোমার সঙ্গে এখানে দেখা করব আমি। কেমন লাগছে?'

'আ-আমি জানি না এতদিন তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব কিনা।' কেঁপে গেল নোয়েলের কণ্ঠ।

ল্যারি জড়িয়ে ধরল ওকে, 'ভালোবাসো আমাকে?'

'আমার জীবনের চেয়েও বেশি,' বলল নোয়েল।

ঘণ্টাদুই পরে ইংল্যান্ডের পথে রওনা হল ল্যারি। নোয়েল এয়ারপোর্টে যেতে চাইলেও সঙ্গে নিল না ওকে। 'বিদায় টিদায় ভালো লাগে না আমার,' বলল সে। নোয়েলকে অনেকগুলো টাকা দিল। 'একটা বিয়ের গাউন কিনে নিয়ো, প্রিন্সেস। আগামী হপ্তায় দেখা হবে।' চলে গেল ল্যারি।

পরবর্তী হপ্তাটা একটা ঘোরের মধ্যে কাটল নোয়েলের। সে আর ল্যারি যেখানে যেখানে গিয়েছে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা স্বপ্নসুখে বিভোর থেকেছে, সেসব জায়গায় গেল ও। দিনগুলো ভয়ানক ক্লান্তিকর ঠেকছে, মিনিটগুলো পারই হতে চায় না। নোয়েলের মনে হল ও পাগল হয়ে যাবে।

বিয়ের পোশাক কিনতে ডজনখানেক দোকানে হানা দিল নোয়েল। অবশেষে পছন্দের জিনিসটি পেয়ে গেল মেডেলিন ভিয়োনেট-এ। সাদা অর্গানজার চমৎকার একটি পোশাক। উঁচুগলার বডিস, লম্বা আস্তিন, তাতে ছটি মুক্তোর বোতাম শোভা পাচ্ছে, তিনটে ক্রিনোলাইনের ঘাগরা। যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি দাম ড্রেসটার। তবে কিনে নিতে দ্বিধা করল না নোয়েল। ল্যারি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল ড্রেস কিনতে সেটা পুরোটা তো লাগলই, নিজের জমানো টাকারও বেশিরভাগ বেরিয়ে গেল। ওর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এখন শুধু ল্যারি। ওকে কীভাবে

খুশি করা যায় সারাক্ষণ তাই ভাবছে নোয়েল। নিজেকে স্কুলছাত্রীর মতো লাগে ওর।

অপেক্ষার প্রহর গোনা খুব কষ্টের। এই অসহ্য বেদনা সয়ে শুক্রবারের জন্য দিন গুনছে নোয়েল। অবশেষে এল প্রত্যাশিত সেইদিন। খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগল নোয়েল। দু'ঘণ্টা লাগল গোসল আর কাপড় পরতে। একবার ওটা পরে, আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পছন্দ হয় না। নাক কুঁচকে আরেকটা ড্রেস বাছাই করে। চিন্তা করে কোন্ পোশাক পরে ল্যারির সামনে দাঁড়ালে ও সবচেয়ে খুশি হবে। বিয়ের পোশাকটাও একবার পরল নোয়েল, খুলে ফেলল সাথে সাথে। যদি খারাপ কিছু ঘটে! উত্তেজনায় অস্থির নোয়েল।

সকাল দশটায় বেডরুমের লম্বা, বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াল নোয়েল। এত সুন্দর নিজেকে জীবনে লাগেনি। এই উপহার ল্যারিকে তুলে দিতে পারবে ভেবে ভীষণ আনন্দিত ও।

দুপুর নাগাদও ল্যারি এসে পৌঁছুল না। নোয়েল প্রতি দশ মিনিট অন্তর ডেস্কে ফোন করতে লাগল ওর নামে কোনো ম্যাসেজ আছে কিনা জানার জন্য। ছটার সময়ও কোনো খবর এল না ল্যারির কাছ থেকে। মাঝরাতেও ফোন করল না ল্যারি। নোয়েল তখন জবুথবু হয়ে বসে আছে চেয়ারে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফোনের দিকে। প্রার্থনা করছে যেন বেজে ওঠে ফোন। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত শরীরে ভর করল ঘুম। নোয়েল জাগল পরদিন শনিবার, সকালবেলা। ওর সারা গা আড়ষ্ট, ঠাণ্ডা। যে পোশাকটা এত যত্ন করে বাছাই করেছে, ভাঁজ টাজ পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

ড্রেস বদলাল নোয়েল। সারাদিন ঘরে থাকল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। মনকে বোঝাল এখানে এভাবে বসে থাকলে ওর ল্যারি চলে আসবে। যদি এখান থেকে উঠে যায় ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে ল্যারির জীবনে। শনিবারের দীর্ঘ সকাল অসহ্য ধীরগতিতে মোড় নিল বিকেলে, নোয়েলের সন্দেহ হতে লাগল ল্যারি নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছে। হয়তো ক্রাশ করেছে ওর প্লেন, ল্যারি মাঠে পড়ে আছে কিংবা হাসপাতালে, মারাত্মক আহত অথবা মরেই গেছে। নানা অশুভ দৃশ্য ভেসে উঠল নোয়েলের মনের চোখে। সারারাত জানালার ধারে বসে রইল ও, অসুস্থ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ঘর ছেড়ে যেতে ভয় লাগছে। জানে না কীভাবে ল্যারির খবর পাবে।

রোববার দুপুরেও যখন ল্যারির কোনো খবর মিলল না আর সহ্য করতে পারল না নোয়েল। ল্যারিকে ফোন করবে ও। কিন্তু কীভাবে? যুদ্ধ চলছে। দেশের বাইরে ফোন করা এখন খুবই কঠিন। ও জানেও না ল্যারি কোথায় আছে। শুধু জানে রয়্যাল এয়ারফোর্সের পাইলট ওর প্রেমিক, আমেরিকান স্কোয়াড্রনের সদস্য। ফোন তুলল নোয়েল। কথা বলল সুইচবোর্ড অপারেটরের সঙ্গে।

'সম্ভব না,' প্রাণশূন্য গলায় জানিয়ে দিল অপারেটর।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল নোয়েল। ওর কথা শুনে নাকি কণ্ঠে নিদারুণ হতাশা উপলব্ধি করতে পেরে, জানে না নোয়েল, ঘন্টাদুই বাদে লন্ডনে যুদ্ধ-মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল অপারেটর। ওরা জানাল ল্যারিকে তারা সাহায্য করতে পারবে না, তবে হোয়াইট হলে বিমান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারবে। ওরা কমব্যাট অপারেশনে লাইন দিয়ে দেবে। কিন্তু ওখান থেকে কোনো তথ্য পাবার আগেই লাইন গেল কেটে। আরো চার ঘণ্টা পরে আবার যখন সংযোগ পেল নোয়েল ততক্ষণে মৃগী রোগীর মতো দশা হয়েছে তার। এয়ার অপারেশন্স বলল তারা কোনো তথ্য দিতে পারবে না। যুদ্ধ-মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিল। 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি।' ফোনে চেঁচিয়ে উঠল নোয়েল। ফোঁপাতে শুরু করল, ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে ইংরেজ কণ্ঠটি বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ, মিস, কাঁদবেন না। এক মিনিট ধরুন।'

রিসিভার হাতে ধরে থাকল নোয়েল, জানে কোনো আশা নেই, নিশ্চিত হয়ে গেছে ল্যারি মারা গেছে। তবে ও কোনোদিনই জানতে পারবে না কোথায় এবং কীভাবে মারা গেল ল্যারি। রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে, এমন সময় সেই কণ্ঠটা আনন্দিত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি যা খুঁজছেন আমরা তা পেয়ে গেছি, মিস। ওটা ঈগল স্কোয়াড্রন। ওরা ইয়াংকি, ইয়র্কশায়ারের এয়ারবেস-এ থাকে। আমি ওদের এয়ারফিল্ড, চার্চ কেন্টনে লাইন লাগিয়ে দিচ্ছি। ওরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।' তারপর ডেড হয়ে গেল লাইন।

রাত এগারোটার সময় নোয়েলের ঘরের ফোন বেজে উঠল। খনখনে একটা কণ্ঠ বলল, 'চার্চ ফেন্টন এয়ারবেস।' লাইনটা এমন বাজে, লোকটার কথা প্রায় শুনতেই পাচ্ছে না নোয়েল। যেন সাগরতল থেকে কথা বলছে। লোকটাও নিশ্চয় নোয়েলের কথা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না।

'জোরে বলুন, প্লিজ,' বলল সে। নোয়েলের নার্ভ এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে নিজের কণ্ঠও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

'আমি খুঁজছি—' এ লোকের পদবি সে জানে না। লেফটেন্যান্ট? ক্যাপ্টেন? মেজর? 'আমি ল্যারি ডগলাসকে খুঁজছি। আমি তার বাগদত্তা।'

'আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, মিস। আরেকটু জোরে বলবেন দয়া করে?'

আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে নোয়েল, চিৎকার করে শব্দগুলো উচ্চারণ করল আবার। এমন সময় অবিশ্বাস্যভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল লাইন, লোকটার কণ্ঠ এমন স্পষ্ট শোনা গেল যেন সে পাশের ঘর থেকে কথা বলছে। 'লেফটেন্যান্ট ল্যারি ডগলাস?'

'জি,' রিসিভার শক্ত করে চেপে ধরল নোয়েল।

'এক মিনিট, প্লিজ।'

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো মনে হল যেন অনন্তকাল। অবশেষে কণ্ঠটি আবার ফিরে এল লাইনে। 'লেফটেন্যান্ট ডগলাস ছুটিতে গেছেন। খুব জরুরি হলে লন্ডনে, হোটেল স্যাভয়ের বলরুমে যোগাযোগ করতে পারেন। উনি জেনারেল ডেভিসের পার্টিতে আছেন।' কেটে গেল লাইন।

পরদিন সকালে কাজের মেয়ে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখল মেঝেতে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে নোয়েল। তার দিকে একমুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল চাকরানি। ভাবল এ মেয়ে যেমন পড়ে আছে তেমন থাকুক। এর কী হয়েছে তা দেখার দায় তার নেই। তবু নোয়েলের দিকে এগিয়ে গেল সে। হাত রাখল কপালে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। ঘোঁতঘোঁত করতে করতে মহিলা চলে এল হলঘরে। পোর্টারকে বলল নোয়েলের ঘরে ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিতে। এক ঘণ্টা বাদে অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল নোয়েলের হোটেলের সামনে। দুই তরুণ ইন্টার্নি স্ট্রেচার নিয়ে সোজা এগোল নোয়েলের ঘরে। নোয়েল ততক্ষণে পুরোপুরি অজ্ঞান। এক তরুণ ইন্টার্নি নোয়েলের চোখের পাতা উল্টে দেখল, বুকে লাগাল স্টেথিস্কোপ। শুনল হৃদস্পন্দন। 'নিউমোনিয়া,' সঙ্গীকে বলল সে। 'ওকে নিয়ে চলো।'

নোয়েলকে স্ট্রেচারে তুলে নিল ওরা। পাঁচ মিনিট পরে হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। নোয়েলকে অক্সিজেন দিতে হল। চারদিন অজ্ঞান হয়ে থাকল ও। মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান ফিরল। নোয়েলের মনে হচ্ছিল ওকে নিয়ে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে। ভয়ংকর জিনিসগুলো ভাসতে ভাসতে ওর কাছে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে দূরে। হঠাৎ যেন সবকিছু পরিষ্কার মনে পড়ে গেল নোয়েলের। ল্যারি ডগলাস। কাঁদতে শুরু করল নোয়েল। কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠল। আধা-ঘুমের জগতে তলিয়ে গেল ক্লান্ত শরীর নিয়ে। টের পেল একটা হাত আদর করে ধরে রেখেছে ওকে। নোয়েলের মনে হল—ফিরে এসেছে ল্যারি, সবকিছু আবার ঠিক হয়ে গেছে। চোখ মেলে চাইল নোয়েল। দেখল সাদা ইউনিফর্ম-পরা এক লোক তার নাড়ি পরীক্ষা করছে।

'ওয়েল, ওয়েলকাম ব্যাক,' হাসিমুখে বলল সে।

'আমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'ল'হোটেল-ডিউ, সিটি হসপিটাল।'

'এখানে আমি কী করছি?'

'সুস্থ হয়ে উঠছেন। আপনার ডাবল নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি ইসরায়েল কাৎজ।' লোকটি বয়সে তরুণ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, গভীর, বাদামি চোখ।

'আপনি আমার ডাক্তার?'

'ইন্টার্ন,' জবাব দিল সে, 'আমিই আপনাকে নিয়ে এসেছি।' হাসল সে।

'আপনি বেঁচে উঠছেন বলে আমরা খুব খুশি হয়েছি। ভাবিনি আপনাকে ফিরে পাব।'

'কদ্দিন ধরে আমি এখানে?'

'চারদিন।'

'আমার একটা কাজ করে দেবেন?' চিঁচি শোনাল নোয়েলের কণ্ঠ।

'সম্ভব হলে করব।'

'হোটেল লাফায়েত্তিতে একটা ফোন করুন। ওদেরকে বলুন—' ইতস্তত করল নোয়েল। 'ওদেরকে বলুন আমার জন্য কোনো ম্যাসেজ আছে কিনা।'

'আমি আসলে খুব ব্যস্ত—'

নোয়েল ডাক্তারের হাত খামচে ধরল। 'প্লিজ। বিষয়টা খুব জরুরি। আমার প্রেমিক আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।'

মুচকি হাসল ডাক্তার। 'এজন্য তাকে দোষ দিতে পারি না। ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমি দেখব।' প্রতিশ্রুতি দিল সে। 'এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন।'

'আপনার কাছ থেকে খবর না-পাওয়া পর্যন্ত ঘুম আসবে না আমার।'

চলে গেল ডাক্তার। নোয়েল তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ল্যারি অবশ্যই ওর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ওদের দুজনের মধ্যে ভয়ানক ভুল-বুঝাবুঝি হয়ে গেছে। ল্যারি ওকে সব ব্যাখ্যা দেবে। তারপর সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে।

দুইঘণ্টা পরে ফিরল ইসরায়েল কাৎজ। হেঁটে এল নোয়েলের বিছানার পাশে। একটা সুটকেস নামিয়ে রাখল। 'আপনার জামা-কাপড় নিয়ে এলাম। আমি নিজেই গিয়েছিলাম হোটেলে।'

মুখ তুলে চাইল নোয়েল। ওর চেহারায় তীব্র উৎকণ্ঠা।

'আমি দুঃখিত,' বিব্রত গলা ডাক্তারের, 'আপনার জন্য কোনো ম্যাসেজ নেই।'

অনেকক্ষণ ডাক্তারের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল নোয়েল। তারপর মুখ ঘোরাল দেয়ালে। ফাঁকা দৃষ্টি।

দিন দুই পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল নোয়েল। ইসরায়েল কাৎজ ওকে বিদায় জানাতে এল। 'আপনার যাবার কোনো জায়গা আছে?' জানতে চাইল সে, 'অথবা কোনো চাকরি?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল নোয়েল।

'আপনি কী কাজ জানেন?'

'আমি একজন মডেল।'

'আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং মাদাম ডেলিসের কথা মনে পড়ে গেল নোয়েলের।

'আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই,' বলল সে।

একটুকরো কাগজে একটা নাম লিখল ড. কাৎজ। 'মত বদলালে এখানে চলে যাবেন। এটা ছোটখাটো একটা ফ্যাশন হাউজ। আমার এক খালা এর মালিক। আমি আপনার কথা বলব তাঁকে। টাকাপয়সা আছে কিছু সঙ্গে?'

চুপ করে থাকল নোয়েল।

'এটা রাখুন,' পকেট থেকে কয়েকটি ফ্রাঁ বের করল ডাক্তার। নোয়েলের হাতে গুঁজে দিল। 'দুঃখিত, আর দিতে পারলাম না। ইন্টার্নিদের বেতন খুব বেশি নয়।'

'ধন্যবাদ,' বলল নোয়েল।

রাস্তার ছোট একটি ক্যাফেতে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিল নোয়েল এরপরে কী করবে। ও এটুকু জানে ওকে টিকে থাকতে হবে। এখন বাঁচতেই হবে। প্রচণ্ড ঘৃণা উৎসারিত হচ্ছে ওর শরীর থেকে। ও যেন ছাইচাপা আবেগের আগুন থেকে উঠে আসা ফিনিক্স। ল্যারি ডগলাসকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না নোয়েল। কীভাবে, কখন শোধ নেবে জানে না ও, শুধু জানে একদিন ঘটনাটা ঘটাবে।

নোয়েলের এখন একটা চাকরি দরকার, প্রয়োজন ঘুমাবার জায়গা। পার্স খুলল ও। তরুণ ইন্টার্নির দেয়া কাগজের টুকরো বের করল। একমুহূর্ত দেখল ওটাকে, তারপর নিয়ে নিল সিদ্ধান্ত। ওইদিন বিকেলে ইসরায়েল কাৎজ-এর খালার ফ্যাশন হাউজে গেল নোয়েল। রু বুরসাল্টে ছোট, দ্বিতীয় রেটের একটি ফ্যাশন হাউজ চালান খালা।

খালা বয়সে প্রৌঢ়া, ধূসররঙের চুল মাথায়। তাঁর চেহারা ডাইনির মতো কিন্তু অন্তর দেবীর মতো। ফ্যাশন হাউজের প্রতিটি মেয়ে তাঁকে খুবই পছন্দ করে। খালাকে সবাই 'ম্যাডাম রোজ' বলে ডাকে। নোয়েলকে তিনি একমাসের অগ্রিম বেতন দিয়ে দিলেন, ছোট একটি বাড়িও খুঁজে দিলেন। প্রথমেই নোয়েল সুটকেস খুলে বিয়ের পোশাক বের করল। সে ওটা ক্লজিটের সামনে রাখল। যাতে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওটাকে দেখে। এবং রাতে ঘুমাতে যাবার আগে।

শারীরিক চিহ্নগুলো ফুটে ওঠার আগেই নোয়েল বুঝতে পারল সে মা হতে চলেছে। পরীক্ষা করার দরকার হল না, পিরিয়ড বন্ধ হবার আগেই উপলব্ধি ঘটল সে গর্ভবতী। ওর জরায়ুতে নতুন জীবনের স্পন্দন টের পেল নোয়েল। রাতে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে ও, ভাবে বিষয়টি নিয়ে। বুনো জন্তুর মতো জ্বলজ্বল করে চোখ।

মডেলিং এজেন্সিতে প্রথম ছুটির দিনে নোয়েল ফোন করল ইসরায়েল ক্যাৎজকে। লাঞ্চের দাওয়াত দিল।

'আমি প্রেগন্যান্ট,' বলল ও।

'কী করে জানলে? তুমি কোনো টেস্ট করিয়েছ?'

'আমার টেস্টের প্রয়োজন নেই।'

মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'নোয়েল, অনেক মহিলাই মা না হয়েও ভাবে সে মা হতে চলেছে। কদ্দিন ধরে মাসিক বন্ধ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল নোয়েল, অধৈর্য শোনাল কণ্ঠ। 'তোমার সাহায্য দরকার।'

চোখ গোল গোল হয়ে গেল ডাক্তারের। 'বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলতে চাইছ? সন্তানের বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছ?'

'সে এখানে নেই।'

'তুমি জানো গর্ভপাত অবৈধ। আমি মহাবিপদে পড়ে যেতে পারি।'

ওকে একমুহূর্ত পরখ করল নোয়েল। 'তোমাকে কত দিতে হবে?' মুখ শক্ত হয়ে গেল ইসরায়েল কাৎজের। 'সবকিছুই কি টাকা দিয়ে পাওয়া যায়, নোয়েল?'

'অবশ্যই,' সরল গলা নোয়েলের। 'সবকিছুই টাকা দিয়ে বেচা-কেনা করা যায়।'

'তোমাকে সহ?'

'হ্যাঁ। তবে আমার দাম অনেক। আমাকে সাহায্য করবে?'

দীর্ঘ ইতস্তত। 'ঠিক আছে। আগে কিছু পরীক্ষা করতে হবে।'

'বেশ।'

ইসরায়েল কাৎজ ওই হপ্তাতেই নোয়েলকে নিয়ে গেল হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে। দিনদুই পরে পাওয়া গেল টেস্টের রেজাল্ট। নোয়েলের কর্মস্থলে ফোন করল কাৎজ।

'ঠিকই বলেছ তুমি।' বলল সে। 'মা হতে চলেছ তুমি।'

'আমি জানি।'

'হাসপাতালে তোমার অপারেশনের ব্যবস্থা করেছি। ওদেরকে বলেছি তোমার স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে এবং তোমার পক্ষে এখন বাচ্চা নেওয়া সম্ভব না। আগামী শনিবার আমরা অপারেশন করব।'

'না।' বলল নোয়েল।

'শনিবার কি তোমার জন্য খারাপ দিন?'

'আমি এখনো গর্ভপাতের জন্য প্রস্তুত নই, ইসরায়েল। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তোমার ওপর ভরসা রাখা যায় কিনা।'

ম্যাডাম রোজ নোয়েলের মাঝে পরিবর্তনটা লক্ষ করলেন। ওর চেহারা থেকে যেন ফুটে বেরুচ্ছে জ্বলজ্বলে একটা আভা। নোয়েল কাজ করছে সারাক্ষণ মুখে একটুকরো হাসি ঝুলিয়ে রেখে। রহস্যময় হাসি। যেন কিছু গোপন করতে চাইছে।

'তুমি কোনো প্রেমিক খুঁজে পেয়েছ,' বললেন ম্যাডাম রোজ। 'তোমার চোখ

সে কথাই বলে।'

মাথা ঝাঁকাল নোয়েল। 'জি, ম্যাডাম।'

'তোমার জন্য ভালোই হবে। ওকে ধরে রাখো।'

'রাখব,' প্রতিশ্রুতি দিল নোয়েল। 'যদ্দিন পারি।'

তিন হপ্তা বাদে ইসরায়েল কাৎজ ফোন করল নোয়েলকে। 'অনেকদিন তোমার খোঁজখবর পাই না, ভাবছিলাম আমাকে ভুলেই গেলে কিনা।'

'না,' বলল নোয়েল। 'সারাক্ষণ আমি এটাকে নিয়ে ভাবি।'

'কেমন লাগে ভাবতে?'

'দারুণ।'

'আমি ক্যালেন্ডার দেখছিলাম। চলো, কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।' বলল নোয়েল।

আবার তিন হপ্তা বাদে নোয়েলকে ফোন করল ডাক্তার। 'আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে?' জানতে চাইল সে।

'যাব।'

ঠিক হল রু ডি চ্যাট উই পেশে'র সস্তা একটি ক্যাফেতে মিলিত হবে ওরা। নোয়েল অবশ্য দামি রেস্টুরেন্টের কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারের স্বল্প বেতনের কথা মনে পড়ায় আর বলেনি।

নোয়েল ক্যাফেতে পৌঁছে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে ডাক্তার। ডিনারের সময় নানান অর্থহীন বিষয় নিয়ে টুকটাক কথা হল। কফি পানের সময় প্রশ্নটা করে ফেলল ইসরায়েল কাৎজ।

'তুমি এখনো গর্ভপাত করতে চাইছ?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল নোয়েল। 'অবশ্যই।'

'তাহলে এখুনি করে ফ্যালো। তোমার দু মাসেরও বেশি চলছে।'

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'না, এখনো না, ইসরায়েল।'

'এই প্রথম মা হতে চলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একটা কথা বলি, নোয়েল। তিন মাস পর্যন্ত অ্যাবরশনে কোনো সমস্যা নেই। কারণ এ সময়ের মধ্যে ভ্রূণ পুরোপুরি সংগঠিত হয় না। সাধারণ একটু কাটাছেঁড়া করলেই চলে। কিন্তু তিনমাস পরে—' ইতস্তত করল সে—'ওটা অপারেশন করে বের করতে হয়। এবং সেটা বেশ বিপজ্জনক। যত দিন যাবে, বিপদের মাত্রা ততই বাড়বে। আমি চাই তুমি অপারেশনটা এক্ষুনি করে ফ্যালো।'

সামনে ঝুঁকে এল নোয়েল। 'বাচ্চাটা কেমন হবে?'

'এখন?' কাঁধ ঝাঁকাল কাৎজ। 'স্রেফ কতগুলো কোষ। তবে পরিপূর্ণ মানবশরীর গড়ে তোলার জন্য সমস্ত নিউক্লিয়াস তার মধ্যে আছে।'

'আর তিন মাস পরে?'

'ভ্রূণ মানুষে রূপ নিতে শুরু করবে।'

'অনুভব করতে পারবে?'

'শব্দ করবে, হাত-পা ছুঁড়বে।'

ডাক্তারের চোখে চোখ রাখল নোয়েল। 'ব্যথা অনুভব করতে পারবে?'

'মনে হয়। তবে ওটা অ্যামনিয়োটিক স্যাক দ্বারা সুরক্ষিত।' হঠাৎ অস্বস্তি লেগে উঠল কাৎজের। 'ওকে আঘাত করা হলে মা-ই বেশি ভুগবে।'

টেবিলে চোখ নামাল নোয়েল। নিশ্চুপ। ভাবছে।

ইসরায়েল কাৎজ ওকে একমুহূর্ত দেখল। তারপর লাজুক গলায় বলল, 'নোয়েল, তুমি যদি বাচ্চাটাকে রাখতে চাও এবং ভয় পাও ওর কোনো বাবা নেই ভেবে তো ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। বাচ্চার একটা নাম দিতে চাই।'

বিস্মিত দেখাল নোয়েলকে। 'তোমাকে আগেই বলেছি এ বাচ্চা আমি রাখতে চাই না। আমি গর্ভপাত করাব।'

'তাহলে, ঈশ্বরের দোহাই, করাও!' চেঁচিয়ে উঠল ইসরায়েল। লোকজন ওকে লক্ষ করছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গলা নামাল। 'যদি আরও দেরি করো, ফ্রান্সের এমন কোনো ডাক্তার নেই যে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমার কথা বুঝতে পারছ? দেরি করলে মারা যাবে তুমি!'

'বুঝতে পারছি!' শান্ত গলা নোয়েলের। 'বাচ্চাটা রেখে দিতে চাইলে কী ধরনের ডায়েট নিয়ে চলতে হবে?'

মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দিল ডাক্তার, হতভম্ব। 'প্রচুর দুধ, ফল এবং চর্বিছাড়া মাংস খেতে হবে।'

সে রাতে বাড়ির কাছের বাজারে গেল নোয়েল। দুই কোয়ার্ট দুধ আর বড় এক বাক্স তাজা ফল কিনল।

দশদিন পরে ম্যাডাম রোজের অফিসে গেল নোয়েল। বলল সে গর্ভবতী। কদিনের ছুটি চাইল।

'কদ্দিন?' নোয়েলকে দেখছেন ম্যাডাম রোজ।

'ছয়/সাত হপ্তা।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ম্যাডাম রোজ। 'তুমি কি নিশ্চিত যে ঠিক কাজটাই করছ?'

'আমি নিশ্চিত,' জবাব দিল নোয়েল।

'আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি?'

'জি না।'

'ঠিক আছে। তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো। আমি ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি তোমার বেতনটা অগ্রিম দিয়ে দিতে।'

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম।'

পরের চার হপ্তা ঘর ছেড়ে বেরুল না নোয়েল, শুধু মুদি সদায় কেনা ছাড়া। ওর একটুও খিদে পায় না বা তৃষ্ণার্ত বোধ করে না। তবে বাচ্চার জন্য প্রচুর দুধ গিলছে ও, খাচ্ছে ফল। বাড়িতে সে একা নয়, সঙ্গে আছে তার সন্তান। বাচ্চার সঙ্গে সে অনবরত কথা বলে। নোয়েল জানে এটা ছেলে, যেভাবে জানত সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। ছেলের নাম রাখল ল্যারি।

'তুমি বলবান আর শক্তিশালী হবে,' দুধ খেতে খেতে বলে নোয়েল। 'আমি চাই তুমি স্বাস্থ্যবান হবে... স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী, যখন তুমি মারা যাবে।' প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে ল্যারি ও তার ছেলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের পরিকল্পনা আঁটে নোয়েল। শরীরের ভেতরে যে জিনিসটা আছে ওটা তার শরীরের অংশ নয়। এটা ল্যারির জিনিস এবং নোয়েল এটাকে খুন করবে। ল্যারি এই একটা জিনিসই ফেলে রেখে গেছে। নোয়েল এটাকে ধ্বংস করবে, যেভাবে ল্যারি ওকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

ইসরায়েল কাৎজ নোয়েল সম্পর্কে কত কম জানে! আকারহীন ভ্রূণের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই, যে কিছুই জানে না, সে ল্যারির বংশধরকে টের পাইয়ে দিতে চায় নোয়েল তার কী দশা করবে। তাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দেবে যে কষ্ট নোয়েল সয়েছে। বিয়ের পোশাকটা এখনো ওর বিছানার কাছে ঝুলছে, শয়তানের রক্ষাকবচ, মনে করিয়ে দেয় ল্যারির বিশ্বাসঘাতকতা। প্রথমে ল্যারির ছেলে, তারপর ল্যারি।

প্রায়ই বেজে ওঠে ফোন। বিছানায় শুয়ে নিজের চিন্তায় মগ্ন নোয়েল ফোন ধরে না। জানে ডাক্তার ফোন করেছে।

একদিন সন্ধ্যায় কেউ কড়া নাড়ল দরজায়। বিছানায় শুয়ে আছে নোয়েল, অগ্রাহ্য করল। কিন্তু কড়া নাড়ার শব্দ বেড়েই চলেছে। শেষে উঠল ও। খুলল দরজা।

ইসরায়েল কাৎজ। চেহারায় উদ্বেগ। 'মাই গড, নোয়েল তোমাকে কতদিন ধরে ফোন করছি!'

নোয়েলের স্ফীত উদরের দিকে চোখ চলে গেল তার।

'ভাবলাম কোথাও গিয়ে কাজটা করিয়ে এসেছ কিনা।'

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'না, কাজটা তুমি করবে।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল ইসরায়েলের চোখ। 'আমি তোমাকে যা বলেছি কিছুই কি বুঝতে পারোনি? অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন কেউই কিছু করতে পারবে না।'

টেবিলে দুধের খালি বোতল এবং তাজা ফল দেখল ডাক্তার। চোখ ফেরাল নোয়েলের দিকে। 'তুমি বাচ্চাটা চাইছ। কিন্তু স্বীকার করছ না কথাটা?'

'ও এখন কেমন হয়েছে, ইসরায়েল?'

'কে?'

'বাচ্চা। ওর চোখ এবং নাক হয়েছে? হাত-পায়ের আঙুল গজিয়েছে? ব্যথা টের পায়?'

'ফরগডস শেক, নোয়েল, স্টপ ইট। তুমি কথা বলছ... এমনভাবে... যেন...'

'কী?'

'কিছু না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'তোমাকে বোঝা আমার কম্ম নয়।'

মৃদু হাসল নোয়েল। 'না, তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না।'

একমুহূর্ত ভাবল ইসরায়েল কাৎজ। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'ঠিক আছে। তোমার জন্য আমি ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুলিয়ে দিচ্ছি গলা। তুমি যদি গর্ভপাত চাও-ই, তবে সেরে ফেলা যাক কাজটা। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে সে আমাকে সাহায্য করবে। সে...'

'না।'

বিস্মিত হল ডাক্তার।

'ল্যারি এখনো প্রস্তুত নয়।' বলল নোয়েল।

তিন সপ্তাহ পরে, ভোর চারটায়, দরজায় দারোয়ানের প্রবল কড়ানাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ডাক্তার ইসরায়েল কাৎজের। 'টেলিফোন! মশিউ' চেঁচাচ্ছে সে, 'আপনাকে যে ফোন করেছে তাকে জানিয়ে দেন এখন মাঝরাত। এ সময় ভদ্রলোকরা ঘুমায়!'

ইসরায়েল টলতে টলতে নামল বিছানা থেকে, হলঘরে চলল ফোন ধরতে। এসময়ে কে ফোন করল! সে ফোন তুলল।

'ইসরায়েল?'

অপরপ্রান্তের কণ্ঠ চিনতে পারল না ডাক্তার।

'জি?'

'এখন...' ফিসফিস করল ভূতুড়ে কণ্ঠটা।

'কে বলছেন?'

'এখন। এখুনি চলে এসো, ইসরায়েল...'

গলার স্বর এমন অপার্থিব, ভৌতিক, শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজল নামল ডাক্তারের। 'নোয়েল?'

'এখুনি...'

'ফর ক্রাইস্টস শেক,' বিস্ফোরিত হল ইসরায়েল। 'আমি পারব না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তুমি মরবে। আর এ দায়দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তুমি

হাসপাতালে যাও।'

ক্লিক করে একটা শব্দ হল। ওধারে নামিয়ে রাখা হয়েছে ফোন। রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকল ডাক্তার। তারপর ঠকাশ করে রেখে দিল। ফিরে এল নিজের ঘরে। মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। জানে এখন কিছুই করতে পারবে না সে। কেউ পারবে না। নোয়েলের সাড়ে পাঁচ মাস চলছে। বারবার ওকে সাবধান করে দিয়েছে কাৎজ। কিন্তু কানে তোলেনি নোয়েল। বেশ, এটা তার দোষ। কিছু ঘটলে তার জন্য কাৎজ দায়ী থাকবে না।

সে দ্রুত পোশাক পরতে লাগল। গা-হাত-পা হিম হয়ে আসছে ভয়ে।

ইসরায়েল নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখল রক্তের পুকুরে ভাসছে মেয়েটা। শুয়ে আছে মেঝেতে। মুখটা কাগজের মতো সাদা। তবে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন ফুটে নেই চেহারায়। পরনে বিয়ের পোশাক। তারপাশে হাঁটু গেড়ে বসল ডাক্তার। 'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কীভাবে—' থেমে গেল সে, চোখ আটকে গেছে রক্তাক্ত একটা কোট হ্যাঙারের দিকে। মুচড়ে লোহার রডের মতো খাড়া করে রাখা জিনিসটা পড়ে আছে নোয়েলের পায়ের কাছে।

'ঈশ্বর!' রাগের হল্কা উঠে এল শরীর বেয়ে, একই অসহায়ত্বের হতাশা গ্রাস করল ডাক্তারকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, নষ্ট করার সময় নেই একমুহূর্ত।

'আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকছি,' সিধে হতে লাগল ডাক্তার। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল নোয়েল। কী শক্তি গায়ে! টেনে নিজের পাশে বসিয়ে দিল আবার।

'ল্যারির ছেলে মারা গেছে,' বলল নোয়েল। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

নোয়েলের জীবন বাঁচাতে ছয়জন ডাক্তারের একটা দল টানা পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টা করে গেলেন। ওর সেপটিক হয়ে গেছে হ্যাঙার দিয়ে শরীরের ভেতরে খোঁচাখুঁচির কারণে, ছিঁড়ে গেছে জরায়ু, রক্তে সৃষ্টি হয়েছে দূষণ, সেইসঙ্গে রয়েছে শক। ডাক্তাররা সবাই এ ব্যাপারে একমত এ মেয়ের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে সন্ধ্যা ছটার সময় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এল নোয়েল। দু দিন পরে বিছানায় উঠে বসল সে। কথা বলতে পারছে। তাকে দেখতে এল ইসরায়েল।

'ডাক্তাররা বলছেন তোমার বেঁচে যাওয়াটা একটা মিরাকল, নোয়েল।'

মাথা নাড়ল নোয়েল। তার তো এখন মরার সময় হয়নি। ল্যারির ওপরে প্রথম শোধটা নিয়েছে সে, এ তো মাত্র শুরু। আরো ঘটনা বাকি আছে। তবে আগে ল্যারিকে ওর খুঁজে বের করতে হবে। সময় লাগবে। তবে ল্যারিকে ও খুঁজে বের করবেই।

ক্যাথেরিন
শিকাগো : ১৯৩৯-১৯৪০

৩

গোটা ইউরোপ জুড়ে বেড়ে চলেছে যুদ্ধের দামামা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তার ঢেউ এসে লাগছে। নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কয়েকটি ছেলে ROTC-তে যোগ দিয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্ররা মিছিল করছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছে। আর্মড ফোর্সে কজন সিনিয়র ছাত্রকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আমেরিকার জনগণ শান্তি ও তৃপ্তির মাঝে বসবাস করলেও ভেতরে ভেতরে একটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমে স্পষ্ট আকৃতি নিয়ে চলছিল।

অক্টোবরের এক বিকেলে রুস্ট-এ ক্যাশিয়ারের কাজ করছে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। ভাবছে যুদ্ধ তার জীবনে কোনো পরিবর্তনের সূচনা করবে কিনা। তবে একটা পরিবর্তন আসবে এবং সেটা যত শীঘ্রি সম্ভব ঘটাতে চায় ক্যাথেরিন। সে পুরুষের বাহুলগ্না হতে চায়, জানতে চায় পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে কেমন লাগে। এর মধ্যে শারীরিক প্রয়োজন তো আছেই, তারচেয়েও বড় কথা ক্যাথেরিনের মনে হচ্ছে সে খুব দারুণ একটি অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে। মাই গড, যদি এমন হয় সে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে কুমারী অবস্থাতেই মারা গেল! নাহ্, ওর কিছু একটা করতেই হবে। এবং এখুনি।

রুস্ট-এর চারপাশে সতর্ক চোখ বুলাল ক্যাথেরিন। যে মুখটি খুঁজল পেল না। একঘণ্টা পরে জাঁ-অ্যানকে নিয়ে ক্যাফেতে ঢুকল রন পিটারসন। ওকে দেখে শরীরে শিহরণ জাগল ক্যাথেরিনের, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড দমাদম পিটতে লাগল। পাশ দিয়ে ওরা যাবার সময় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল সে, চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল রন তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে নিজের পছন্দের জায়গায় বসেছে। ঘরের চারপাশে বড় বড় ব্যানার টাঙানো : 'Try our Double Hamburger Special'... 'Try our lover's Delight'... 'Try our Triple Malt.'

বুক ভরে শ্বাস নিল ক্যাথেরিন, হেঁটে গেল রনের বুথের দিকে। মেনুতে চোখ বুলাচ্ছে সে, কী পছন্দ করবে ভাবছে।

'বুঝতে পারছি না কী নেব,' বলল রন।

'তোমার কি অনেক খিদে পেয়েছে?' জানতে চাইল অ্যান।

'খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট।'

'তাহলে এটা নাও,' দুজনেই মুখ তুলে চাইল। বিস্মিত। বুথ-এ দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথেরিন। রন পিটারসনের হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে ঘুরল সে, ফিরে এল ক্যাশ-রেজিস্ট্রারে।

কাগজের ভাঁজ খুলল রন, ফেটে পড়ল হাসিতে। ঠাণ্ডা চোখে ওকে দেখল জাঁ-অ্যান।

'এত হাসাহাসির কী হল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ব্যক্তিগত,' মুচকি হাসল রন। কাগজের টুকরোটা চালান করে দিল পকেটে।

একটু পরে বুথ ছাড়ল ওরা দুজন। বিল মেটানোর সময় কিছু বলল না রন। তবে গভীর অর্থবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে ক্যাথেরিনের দিকে। ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটিয়ে জাঁ-অ্যানকে বগলদাবা করে বেরিয়ে এল ক্যাফে থেকে। ক্যাথেরিন ওদের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বোধের মতো। কীভাবে একটি ছেলের হাতে চিরকুট গুঁজে দিতে হয় তাও জানে না সে।

ডিউটি শেষ হবার পরে কোট গায়ে চড়াল ক্যাথেরিন, নতুন শিফটের মেয়েটিকে স্বাগত জানাল, বেরিয়ে এল বাইরে। শরতের উষ্ণ একটি সন্ধ্যা। লেক থেকে ভেসে আসা শীতল বাতাসে জুড়িয়ে যায় শরীর। আকাশটা বেগুনি মখমলের মতো। নরম তারাগুলো যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। এই চমৎকার সন্ধ্যায় কী কী করা যেতে পারে মনে মনে তার একটা তালিকা বানিয়ে ফেলল ক্যাথেরিন।

আমি বাসায় গিয়ে চুল ধুতে পারি।

লাইব্রেরিতে ঢুকে আগামীকালের ল্যাটিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া যায়।

ছবি দেখতে যেতে পারি।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রথম যে নাবিককে চোখে পড়বে তাকে ধর্ষণ করা যায়।

ক্যাম্পাসের রাস্তা ধরে লাইব্রেরির দিকে পা বাড়াল ক্যাথেরিন। একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন।

'হাই, ক্যাথি, হনহন করে কোথায় চললে?'

রন পিটারসন। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। ক্যাথেরিনের বুকের ভেতরে কলজেটা এমনভাবে লাফাতে লাগল যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল ও।

'ব্লাগ,' বিড়বিড় করল ক্যাথেরিন।

'কোথায়?'

ওকে তালিকাটার কথা জানিয়ে দেবে ক্যাথেরিন! গড, না! ওকে স্রেফ উন্মাদ ভাববে ছেলেটা। অবশেষে বড় একটা সুযোগ এসেছে। ভুল কোনো পদক্ষেপ নিয়ে এটাকে হারাতে চায় না সে। ক্যাথেরিন তাকাল রনের দিকে। 'নাথিং স্কোয়াড' ছবির নায়িকা ক্যারল লোমবার্ডের মতো উষ্ণ, প্রেমময় দৃষ্টি ওর চোখে।

'বিশেষ কোথাও যাচ্ছি না,' ক্যাথেরিনের গলায় আমন্ত্রণের সুর স্পষ্ট।

রন লক্ষ করছে ওকে, এখনো যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'বিশেষ কোথাও যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করল ও।

এই তো ঘটল ঘটনা। প্রস্তাব এল। পয়েন্ট অব নো রিটার্ন।

'নাম বলো,' বলল ক্যাথেরিন। 'এবং আমি তোমার,' কথাটা বলেই ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হল ও। খুব নাটকীয় শোনাল কথাটা। এমনভাবে কেউ বলে না, শুধু ফ্যানি হার্স্টের বস্তাপচা উপন্যাসে ছাড়া। রন নিশ্চয়ই মুখ বাঁকিয়ে এখন চলে যাবে।

কিন্তু রন তা করল না। বরং হাসি ফুটল মুখে। ক্যাথেরিনের হাত ধরল, 'চলো, যাই।'

ক্যাথেরিন ওর পাশাপাশি হাঁটছে। অভিভূত। ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে রীতিমতো। রন যদি টের পেয়ে যায় ও কুমারী তাহলে কম্ম সাবাড়। ও যখন ওকে নিয়ে বিছানায় উঠবে তখন কী কথা বলবে ক্যাথেরিন? মিলনের সময় কি লোকে সত্যিকথা বলে, নাকি কাজটা শেষ হয়ে যাবার পরে বলে?

'ডিনার করেছ?' জানতে চাইল রন।

'ডিনার?' ওর দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। ভাবছে। ও কি বলবে ডিনার করেছে? হ্যাঁ বললে হয়তো সোজা ওকে বিছানায় নিয়ে তুলবে রন। 'না,' তাড়াতাড়ি বলল ক্যাথেরিন। 'করিনি।'

'বেশ। চাইনিজ খাবার ভালো লাগে তোমার?'

'খুব ভালো লাগে।' যদিও চাইনিজ ক্যাথেরিনের দু-চোখের বিষ।

'এস্তেসে ভালো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে। লাম ফং। ওখানে খেয়েছ কখনো?'

'না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

রন ক্যাথেরিনকে নিয়ে ওর গাড়ির সামনে চলে এল। মেরুন রঙের রিও কনভার্টিবল। ক্যাথেরিনের জন্য দরজা খুলে দিল। ক্যাথেরিন সেই আসনে বসল যেখানে অন্য মেয়েরা বসার সুযোগ পায় বলে এতদিন ঈর্ষা করে এসেছে সে। রন হাসিখুশি, সুদর্শন, একজন টপ অ্যাথলেট। এবং সেক্স ম্যানিয়াক। ওদেরকে নিয়ে একটা সিনেমা বানানো যায়। *দ্য সেক্স ম্যানিয়াক অ্যান্ড দ্য ভার্জিন*। সিনেমায় ক্যাথেরিন রনকে নিয়ে হেনরিচির মতো রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেত। রন হয়তো ভাবত

ওরকম মেয়েকেই আমি আমার মার কাছে নিয়ে যেতে চাই।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল রন।

ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল ক্যাথেরিন, 'তোমার কথা।'

মুচকি হাসল রন। 'তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ, ক্যাথি।'

'কীরকম?'

'আমি সবসময় ভাবতাম তুমি সুন্দরী একটা ঠাণ্ডা মাছ—মানে, পুরুষদের প্রতি তোমার কোনো আগ্রহ নেই।'

তুমি আসলে বলতে চেয়েছ আমি সমকামী, ভাবল ক্যাথেরিন, মুখে বলল, 'আমি সময় এবং পরিবেশকে প্রাধান্য দিই।'

'আমি খুশি যে আমাকে প্রাধান্য দিয়েছ।'

'আমিও।' কথা সত্য। ক্যাথেরিন নিশ্চিত লাভার হিসেবে রন দারুণ হবে। তার খেলুড়ে প্রকৃতির কথা প্রতিটি ক্ষুধার্ত মেয়ের জানা। যৌন-অনভিজ্ঞ কারো সঙ্গে জীবনের প্রথম মিলনের অভিজ্ঞতা ক্যাথেরিনের জন্য যন্ত্রণারই হত। কারণ এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সে নিজেও কিছু জানে না। আজ রাতের পর থেকে নিজেকে আর সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিন বলে ডাকবে না সে। বিছানায় দারুণ খেল দেখাবে ক্যাথেরিন। সে বাবা-মাকে লুকিয়ে সবুজ প্রচ্ছদের যেসব বই কৈশোরে পড়েছে আজ সেরকম ঘটনা তার জীবনে ঘটতে চলেছে। তার দেহযন্ত্র সংগীতের মূর্ছনা তুলবে। ক্যাথেরিন জানে প্রথমবারে একটু ব্যথা লাগে। তবে রনকে তা জানতে দেবে না। সে প্রবলভাবে কোমর নাড়াবে কারণ নারী পাথরের মূর্তি হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে পুরুষ মোটেই পছন্দ করে না। রন যখন ওর শরীরে ঢুকবে ব্যথা সামাল দেয়ার জন্য ঠোঁট কামড়াবে এবং শীৎকার দেবে।

'কী?'

রনের দিকে ফিরল ক্যাথেরিন। বুঝতে পারল ও জোরে চিৎকার করে ফেলেছে। 'আ-আমি তো কিছু বলিনি।'

'চিৎকার করে উঠলে যে?'

'করেছি নাকি?' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ক্যাথেরিন।

'তুমি দেখছি ভাবনার অতলে ডুবে আছ।'

নাহ্, ক্যাথেরিন যা করছে তা ঠিক না। ওকে জাঁ-অ্যানের মতো আচরণ করতে হবে। রনের হাতে হাত রাখল সে, কাছে ঘেঁষে এল। 'আমি তোমার কাছেই আছি।'

ক্যালামিটি জেন ছবিতে জিন আর্থারের মতো বলার চেষ্টা করল ও।

ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল রন, খানিকটা হতবুদ্ধি দেখাল ওকে। তবে ক্যাথেরিনের চেহারায় শুধু উষ্ণতা দেখতে পেল।

লুম ফং বিষণ্ণ চেহারার একটি চাইনিজ। রেললাইনের নিচে। ডিনারের

পুরোটা সময় মাথার ওপরে ট্রেন যেতে শুনল ওরা। রেস্টুরেন্টের বাসনকোসনগুলো সেই শব্দে ঝনঝন করে বাজল। আমেরিকায় এরকম হাজারো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ছড়িয়ে আছে। তবে ক্যাথেরিন উপভোগ করল সময়টা। রনের জন্যই।

ছোটখাটো গড়নের এক চীনা ওয়েটার এসে জানতে চাইল ওরা কী পান করবে। ক্যাথেরিন হুইস্কি পছন্দ করে না। সে শেরি চাইল। 'স্কচ এবং সোডা,' বলল রন।

মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে চলে গেল চীনা।

'জানি না আমাদের বন্ধুত্ব কেন আরো আগে গড়ে ওঠেনি,' বলল রন। 'সবাই বলে গোটা ভার্সিটির মধ্যে তোমার মাথা সবার চেয়ে শার্প।'

'আরে লোকে বাড়িয়ে বলে।'

'আর তুমি যথেষ্ট সুন্দরীও।'

'ধন্যবাদ।' 'অ্যালিস অ্যাডামস' ছবিতে ক্যাথেরিন হেপবার্নের মতো করে বলার চেষ্টা করল ও। নিজেকে ও আর ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার ভাবছে না। ভাবছে সেক্স মেশিন।

ড্রিঙ্ক নিয়ে এল ওয়েটার। নার্ভাস এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে ফেলল ক্যাথেরিন। রন তাকে অবাক হয়ে লক্ষ করছে।

'আস্তে খাও,' সতর্ক করে দিল ও। 'মাথা ঘুরবে।'

'আমার কিছু হবে না,' ওকে আশ্বস্ত করল ক্যাথেরিন গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর ফুটিয়ে তুলে।

'আরেকটা ড্রিঙ্ক,' ওয়েটারকে বলল রন। টেবিলের ওপর বাড়িয়ে দিল হাত। মুঠোয় পুরে নিল ক্যাথেরিনের নরম হাত। মসৃণ ত্বকে খেলা করছে ওর আঙুল। শিরশির করে উঠল ক্যাথেরিনের গা। যেভাবে লিখেছে বইতে। সম্ভবত আজ রাতের পরে বেচারি, ভোঁতা কুমারী মেয়েদেরকে উপদেশ দিয়ে একটা সেক্স ম্যানুয়াল রচনা করবে ক্যাথেরিন। দ্বিতীয় ড্রিঙ্কের শেষে এদের জন্য রীতিমতো দুঃখ হতে লাগল ওর। মুচকি মুচকি হাসছে।

'করুণা লাগছে আমার।'

'কিসের জন্য করুণা?'

উঁচুগলায় বলল ক্যাথেরিন, 'পৃথিবীর সমস্ত কুমারী মেয়ের জন্য দুঃখ লাগছে আমার।'

দাঁত বের করে হাসল রন, 'আই'ল ড্রিঙ্ক টু দ্যাট।' গ্লাস উঁচু করল সে। ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যাথেরিন। রনের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছে। রন জানতে চাইল ক্যাথেরিন আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবে কিনা। প্রত্যাখ্যান করল ক্যাথেরিন। সে ভাবছে রনকে নিয়ে বিছানায় ওঠার পরে কী ঘটবে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে শরীর। রন কি প্রটেকশনের ব্যবস্থা করবে? রনের মতো

অভিজ্ঞ মানুষ নিশ্চয় চাইবে না ক্যাথেরিন গর্ভবতী হয়ে পড়ুক। নাকি রন ক্যাথেরিনকে তার মতো অভিজ্ঞ ভেবে বসে আছে। ভাবছে ক্যাথেরিন নিশ্চয় কোনো প্রটেকশনের ব্যবস্থা নিয়েই এসেছে।

পঁচাত্তর ডলার মূল্যের ছয়-কোর্সের ডিনারের অর্ডার দিল রন। খাওয়ার ভাব করল ক্যাথেরিন। কিন্তু খেতে পারছে না। এমন আড়ষ্ট হয়ে আছে খাবারে কোনো স্বাদই পাচ্ছে না। হঠাৎই জিভ শুকিয়ে গেছে ওর। তালুতে কোনো সাড়া নেই। ওর স্ট্রোক হয়ে যায়নি তো? স্ট্রোকের পরে সেক্স করলে নির্ঘাত মারা যাবে ক্যাথেরিন। রনকে ওর সাবধান করে দেয়া উচিত। ওর বিছানায় মৃত নারী! রনের সাংঘাতিক দুর্নাম হয়ে যাবে। নাকি সুনাম বাড়বে?

'কী হল?' জিজ্ঞেস করল রন, 'চেহারা এমন শুকনো লাগছে কেন?'

'আমি ঠিকই আছি,' বলল ক্যাথেরিন। 'তোমার সঙ্গে আছি, খুব উত্তেজনা বোধ করছি।'

রন সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে ক্যাথেরিনকে। ওর সুন্দর মুখ ছুঁয়ে চোখ নেমে এল উদ্ধত বুকে। দুই বুকের খাঁজে অনেকক্ষণ আটকে রইল দৃষ্টি। 'আমারও একইরকম অনুভূতি হচ্ছে', বলল ও।

ওয়েটার বাসনকোসন নিয়ে গেছে, বিল মিটিয়ে দিয়েছে রন। কিন্তু টেবিল ছেড়ে নড়ার লক্ষণ নেই ক্যাথেরিনের, 'তুমি আর কিছু খাবে?'

গভীর দম নিল ক্যাথেরিন, 'না।'

'তাহলে চলো,' সিধে হল রন। তাকে অনুসরণ করল ক্যাথেরিন। ওর পা কাঁপছে।

রাতের উষ্ণ বাতাস হঠাৎ একধরনের স্বস্তি এনে দিল ক্যাথেরিনের মাঝে।

ও আজ রাতে আমাকে নিয়ে বিছানায় যাচ্ছে না। প্রথম ডেটে কোনো পুরুষ এটা করে না। ও আবার আমাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাবে, তখন আমরা ঘনিষ্ঠ হব, পরস্পরকে আরো ভালোভাবে চিনতে-জানতে পারব। হয়তো আমরা প্রেমেও পড়ে যাব—ভীষণ প্রেম—ও আমাকে তার বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে... আমি আর নির্বোধের মতো আতঙ্কে ভুগব না।

'মোটেলে যেতে আপত্তি নেই তো?' জিজ্ঞেস করল রন।

ক্যাথেরিন ওর দিকে মুখ তুলে চাইল, বাক্যহারা। ইশ্, স্বপ্নটার এমন অপমৃত্যু ঘটল! এই শালা দেখছি ওকে মোটেলে নিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু ক্যাথেরিনও তো তেমনটাই চাইছে, না? এজন্যই তো সে ওই চিরকুটটা লিখেছিল রনকে।

রনের হাত এখন ক্যাথেরিনের কাঁধে, কাঁধ বেয়ে নেমে আসছে বাহুতে। চকিতে গরম ভাব অনুভব করল ক্যাথেরিন। ঢোক গিলল ও, 'কোনো আপত্তি নেই।'

'তাহলে চলো।'

রনের গাড়িতে উঠল দুজনে। পশ্চিমদিকে গাড়ি ছোটাল রন। ক্যাথেরিনের শরীর হঠাৎ বরফখণ্ডে পরিণত হয়েছে, তবে মনটা যেন তীব্র জ্বর ওঠার গতিতে ছুটে চলেছে। সে বাবা-মার সঙ্গে শেষবার মোটেলে গিয়েছিল আটবছর বয়সে। এখন সে অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে আবার মোটেলে যাচ্ছে। অচেনাই তো! রনকে ক্যাথেরিন কতটুকুই-বা চেনে? শুধু জানে সে জনপ্রিয়, সুদর্শন এক যুবক।

রন ক্যাথেরিনের হাত পুরে নিল মুঠোয়। 'তোমার হাত কী ঠাণ্ডা!'

'হাত ঠাণ্ডা কিন্তু পা গরম,' বলল ক্যাথেরিন। ওহ্ গড, ভাবল ও, আবার শুরু করলাম আমি।

দক্ষিণে, ক্লার্ক স্ট্রিটের দিকে মোড় নিল রন।

রাস্তার দুপাশে বড় নিয়ন সাইন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে রাতের আঁধারে : 'EASY RFST MOTEL' 'OVER NIGHT MOTEL' 'COME INN' 'TRAVELLERS RFST' ইত্যাদি।

'ওই মোটেলটা সবচেয়ে ভালো,' একটা সাইনবোর্ডে হাত তুলে দেখাল রন।

'PARADISE INN—VACANCY'

ওটা একটা প্রতীক। বলছে স্বর্গে জায়গা খালি আছে। আর ওখানে প্রবেশ করতে চলেছে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।

সাদা, হোয়াইট ওয়াশ করা ছোট একটা অফিসের সামনে গাড়ি থামাল রন। অফিসের সাইনবোর্ড ঝুলছে : *ঘণ্টা বাজিয়ে ঢুকে পড়ুন ভেতরে।* অফিসের সামনে একটি উঠোন। তাতে সার-সার কাঠের বাংলো।

'পছন্দ হয়?' জানতে চাইল রন।

এ যেন দান্তের ইনফার্নো। রোমের কলোসিয়ামের মতো যেখানে খ্রিস্টানদের সিংহের মুখে ছুড়ে ফেলে দেয়া হত।

কুঁচকিতে সেই উত্তেজনা আবার টের পেল ক্যাথেরিন। 'দারুণ,' বলল ও, 'সত্যিই দারুণ।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসল রন। 'আমি আসছি এখুনি।' সে একটা হাত রাখল ক্যাথেরিনের হাঁটুতে, হাতটা উঠে এল উরুতে, দ্রুত চুমু খেল ওর ঠোঁটে, তারপর ঝট করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ঢুকল অফিসে। ক্যাথেরিন বসে রইল নিজের জায়গায়। মনটাকে ফাঁকা করার চেষ্টা করছে।

দূরে শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। ওহ্, মাই গড, ভাবল ক্যাথেরিন, আবার রেইড! এরা সবসময় রেইড দিয়ে রাখে।

ম্যানেজারের অফিসের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল রন। হাতে চাবি। ক্রমে কাছিয়ে আসা সাইরেনের বিকট নিনাদ যেন কানেই যায়নি ওর। ক্যাথেরিনের পাশে চলে এল রন। খুলল দরজা।

'নেমে এসো।' বলল সে।

'শুনতে পাচ্ছ না?'

'কী শুনব?'

সাইরেনের শব্দ ওদের পাশ কাটিয়ে ক্রমে দূরে সরে গেল। ধ্যাৎ, ও তো পাখির ডাক।

রনের চেহারায় অধৈর্যের ছাপ। 'কী হল?'

'না, কিছু না,' দ্রুত বলল ক্যাথেরিন। 'আসছি আমি!' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পা বাড়াল বাংলোর দিকে।

'আশা করি আমার লাকি নাম্বারটা পেয়েছ তুমি,' উদ্ভাসিত কণ্ঠে বলল ক্যাথেরিন।

'কী বললে?'

ক্যাথেরিন তাকাল রনের দিকে। বুঝতে পারল আসলে কিছুই বলেনি ও। ওর মুখের ভেতরটা একদম শুকিয়ে আছে। 'কিছু না,' কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

বাংলোর দরজায় পৌঁছে গেল ওরা। নাম্বার তেরো। ক্যাথেরিন মনে-মনে যা ভেবেছে তাই। কোনো সন্দেহ নেই ও গর্ভবতী হতে চলেছে। ঈশ্বর সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিনকে শাস্তি দেবেন।

দরজা খুলল রন। মেলে ধরল ক্যাথেরিনের জন্য। সুইচ টিপে জ্বালল বাতি। ভেতরে ঢুকল ক্যাথেরিন। যা দেখল বিশ্বাস হচ্ছে না। ঘরের বিছানাটা প্রকাণ্ড। আসবাব বলতে এককোনায় বদখত চেহারার একটা আরামকেদারা, আয়নাসহ ছোট একটি ড্রেসিং টেবিল এবং বিছানার পাশে মরাটে একটা রেডিও। কোনো ছেলে কোনো মেয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এরকম ঘরে ঢুকবে না। সস্তা মিলনকুঞ্জ। রন কী করছে দেখার জন্য ঘুরল ক্যাথেরিন। সে দরজার হুড়কো লাগিয়ে দিচ্ছে। বেশ। ভাইস স্কোয়াড ওদেরকে ধরতে চাইলে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে। ক্যাথেরিন কল্পনায় দেখতে পেল তাকে নগ্ন অবস্থায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে দুই পুলিশ, তার ছবি তুলছে একজন আলোকচিত্রী পরদিন শিকাগো ডেইলি নিউজ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপে দেয়ার জন্য।

রন চলে এল ক্যাথেরিনের কাছে, জড়িয়ে ধরল কোমর। 'নার্ভাস লাগছে?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ক্যাথেরিন যা দেখলে মার্গারেট সুলিভানও ঈর্ষা করতেন। 'নার্ভাস? রন, বোকার মতো কথা বোলো না।'

ওকে এখনো লক্ষ করছে রন, যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'তুমি এটা আগেও করেছ, ক্যাথি। করোনি?'

'আমি হিসেব করে রাখিনি।'

'সারাটা সন্ধ্যা তোমাকে নিয়ে নানান অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছে আমার।'

'কীরকম অনুভূতি?' জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

'ঠিক জানি না,' বিভ্রান্ত শোনাল রনের কণ্ঠ।

'কখনো তোমাকে মনে হয়েছে খুব সেক্সি, আবার পরমুহূর্তে বরফের মতো ঠাণ্ডা। যেন তোমার মন এখানে নেই, চলে গেছে দূরে কোথাও। যেন দুজন মানুষ তুমি। আসল ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার কোন্‌টা?'

বরফের মতো ঠাণ্ডা, মনে মনে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল ক্যাথেরিন। মুখে বলল, 'আসল ক্যাথেরিনকে দেখাচ্ছি তোমাকে।' সে রনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ঠোঁটে।

চুমুটা আরো জোরে ফিরিয়ে দিল রন। ওকে আরো নিবিড়ভাবে টেনে নিল নিজের কাছে। হাত উঠে এল ক্যাথেরিনের বুকে, আদর করল, ওর মুখে ঢুকিয়ে দিল জিভ। দারুণ গরম হয়ে উঠল ক্যাথেরিনের শরীর। *অবশেষে সত্যি ঘটতে চলেছে ঘটনা!* ভাবছে ও। রনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তীব্র উত্তেজনা দেহে। অসহ্য এক সুখ।

'কাপড় খোলো,' ঘরঘরে গলায় বলল রন। ক্যাথেরিনকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল এক কদম। ব্যস্ত হাতে খুলছে নিজের জ্যাকেট।

'না,' বলল ক্যাথেরিন, 'আমাকে খুলতে দাও,' ওর কণ্ঠে নয়া আত্মবিশ্বাস। ও রনকে এমন সুখ দেবে যা রন কল্পনাও করেনি। জ্যাকেট খুলে ফেলে দিল বিছানায়। হাত বাড়াল টাইয়ের দিকে।

'দাঁড়াও,' বাধা দিল রন। 'আমি তোমার শরীর দেখতে চাই।'

ক্যাথেরিন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রনের দিকে, ঢোক গিলল। ধীরে ধীরে হাত এগিয়ে গেল জিপারে, মাথা গলিয়ে খুলে ফেলল জামা। রনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল ব্রা, স্লিপ, প্যান্টি আর মোজা পরে।

'খোলো,' আদেশ করল রন।

একমুহূর্ত ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। স্লিপ থেকে মুক্ত করল নিজেকে।

'দারুণ। চালিয়ে যাও।'

ধীরে ধীরে বিছানায় বসল ক্যাথেরিন। সেক্সি একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে খুলল জুতো এবং মোজা। হঠাৎ টের পেল ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রন। খুলছে ব্রা'র ফিতে। বিছানায় বক্ষবন্ধনী খসে পড়তে দিল ক্যাথেরিন। ওকে খাড়া করাল রন, কোমর থেকে টেনে নামাচ্ছে প্যান্টি। গভীর দম নিয়ে চোখ বুজল ক্যাথেরিন, কল্পনা করল সে অন্য কোথাও আছে, অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে, যে ওকে ভালোবাসে, যাকে ও ভালোবাসে, যে ওর সন্তানের পিতা হবে, যে ওর জন্য লড়াই করবে, ওর জন্য খুন করতেও দ্বিধা করবে না, যে সবসময় প্রয়োজনে ওর দিকে বাড়িয়ে রাখবে সাহায্যের হাত... যে রন পিটারসনের মতো হারামজাদাকে খুন করবে। কারণ এই বিশ্রী, দমবন্ধ করা ঘরে ক্যাথেরিনকে নিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছে রন। মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দেয়া হল ক্যাথেরিনের প্যান্টি। চোখ মেলে চাইল ও।

রন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। 'মাই গড, ক্যাথি, তুমি সুন্দর।' বলল সে। 'তুমি সত্যি অপূর্ব!' ঝুঁকে ক্যাথেরিনের বুকে চুমু খেল। ক্যাথেরিনের মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু এখন থামাবার সময় নেই। ব্যস্ত হাতে টাই খুলে ফেলেছে রন, হাত রেখেছে জামায়। জ্বলজ্বল করছে চেহারা। কোমরের বেল্ট খুলে ফেলল রন, খুলল টাউজার্স। বিছানায় বসে জুতো এবং মোজা খুলতে লাগল। 'আই মিন ইট, ক্যাথেরিন,' আবেগে কেঁপে গেল ওর গলা। 'তোমার মতো খাসা শরীর জীবনেও দেখিনি আমি।'

ওর কথাগুলো ক্যাথেরিনের কুঁচকির যন্ত্রণাটা বাড়িয়ে তুলল। সিধে হল রন, মুখে চওড়া হাসি। শরীর থেকে খসে পড়তে দিল শর্টস। ওর পুরুষাঙ্গ লৌহকঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশাল। চারপাশে লোমের জঙ্গল। এমন প্রকাণ্ড অবিশ্বাস্য জিনিস জীবনে দেখেনি ক্যাথেরিন।

'কী, কেমন দেখছ?' অহংকার রনের কণ্ঠে।

কিছু না-ভেবেই ক্যাথেরিন বলল, 'স্লাইসড অন রাই। হোল্ড দ্য মাস্টার্ড অ্যান্ড লেটুস।'

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ক্যাথেরিন। দেখল উত্থিত জিনিসটা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল ফণা, মিইয়ে যাচ্ছে।

ক্যাম্পাসে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

ইউরোপে কী ঘটছে তা নিয়ে যেন এই প্রথম সবাই সচেতন হয়ে উঠছে। সবার ধারণা আমেরিকা এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। হিটলারের হাজার বছরের রাইখ হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।

নাৎসি বাহিনী ডেনমার্ক দখল শেষে হামলা চালিয়েছে নরওয়েতে।

সেক্স এবং জামাকাপড় নিয়ে ক্যাম্পাসে এখন খুবই কম আলোচনা হয়। ছাত্রদের প্রায়ই দেখা যায় আর্মি এবং নেভির ইউনিফর্ম গায়ে ভার্সিটিতে হাজির হচ্ছে।

একদিন সেন থেকে আসা ক্যাথেরিনের ক্লাসমেট সুসি রবার্টস ওর সামনে এসে দাঁড়াল। 'তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে এসেছি, ক্যাথি। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ক্লনডাইকে।'

'ক্লনডাইক?'

'ওয়াশিংটন ডিসি। ওখানে মেয়েরা সোনার খনি পেয়েছে। প্রতি একশো পুরুষের জন্য একজন নারী। তুমি এখানে পড়ে থাকবে কী জন্য? বিশাল একটা পৃথিবী অপেক্ষা করছে ওখানে।'

'আমি এখন যেতে পারব না,' বলল ক্যাথেরিন। ও নিজেও জানে না কারণটা কী। শিকাগোতে ওর কোনো বন্ধন নেই। ওমাহায় ওর বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। মাসে দুয়েকবার ফোনে কথা হয়। বাবার গলা শুনে মনে হয় তিনি কারাগারে আছেন।

ক্যাথেরিন এখন স্বাধীন। কোথাও হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। ওয়াশিংটনের কথা ভাবতেই উত্তেজনা জাগল। সে সন্ধ্যায় ফোন করল বাবাকে। জানাল স্কুল ছাড়ছে সে, কাজ করতে ওয়াশিংটন যাবে। বাবা জানতে চাইলেন ক্যাথেরিনের ওমাহা আসার ইচ্ছে আছে কিনা। তবে বাবার কণ্ঠে পরিষ্কার অনিচ্ছা টের পেল ক্যাথেরিন। তিনি চাইছেন না মেয়ে তার কাছে গিয়ে ফাঁদে আটকে যাক। যেভাবে তিনি বন্দি হয়ে আছেন।

পরদিন সকালে ছাত্রীদের ডিনের সঙ্গে দেখা করল ক্যাথেরিন। বলল সে স্কুল ছাড়ছে। সুসি রবার্টসকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল ক্যাথেরিন। পরদিন চেপে বসল ওয়াশিংটন ডিসির ট্রেনে।

নোয়েল
প্যারিস : ১৯৪০

৪

জুন ১৪, ১৯৪০। শনিবার। জার্মান ফিফথ আর্মি ঢুকে পড়ল প্যারিসে সবাইকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে। ম্যাগিনট লাইন যুদ্ধের ইতিহাসে চরমতম ব্যর্থতার পরিচয় দিল, পৃথিবীর দুর্ধর্ষতম সেনাবাহিনীর সামনে দারুণ অসহায় এবং অরক্ষিত হয়ে পড়ে রইল ফ্রান্স।

প্যারিসের আকাশ ঢেকে গেল অজানা আতঙ্কের ধূসর আলখেল্লায়। আটচল্লিশ ঘণ্টার অবিরাম গুলিবর্ষণের শব্দ ভেঙে দিল প্যারিসের অস্বাভাবিক নীরবতা। শহরের বাইরে থেকে ভেসে আসা কামানের গর্জন আত্মা কাঁপিয়ে দিল প্যারিসবাসীর। রেডিও, সংবাদপত্র এবং লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল নানান গুজব। বশরা ফরাসি উপকূলে হামলা চালাচ্ছে... মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে লন্ডন... ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন হিটলার... ভয়ংকর এক বোমা মেরে প্যারিস উড়িয়ে দেয়ার মতলব করেছে জার্মানরা। প্রথমদিকে গুজবগুলো আতঙ্কের সৃষ্টি করত। কিন্তু আতঙ্কের গল্প শুনতে শুনতে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল প্যারিসবাসীর। তারা আর এসব শুনতে চায় না। খবরের কাগজগুলো এ-ধরনের গুজব ছাপা বন্ধ করে দিল, রেডিও স্টেশনও কোনো গুজব প্রচার থেকে বিরত রইল। প্যারিসবাসী উপলব্ধি করল এবারে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। ধূসর মেঘটাকে সংকেত বলে মনে হল।

আর ঠিক তখন জার্মান পতঙ্গের পাল ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকতে লাগল শহরে।

প্যারিস হঠাৎ ভরে গেল বিদেশি উর্দি আর অচেনা মানুষজনে। তারা জিভে বাধিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলে, নাৎসি পতাকা লাগানো বড় বড় মার্সিডিস লিমোজিন নিয়ে তীব্রগতিতে ছুটে বেড়ায় দুপাশে-গাছ-লাগানো চওড়া এভিন্যুগুলো দিয়ে। এরা হল Uber mensch, দুনিয়া দখল করাই যেন তাদের নিয়তি।

দু হপ্তার মধ্যে অবিশ্বাস্য একটা পরিবর্তন দেখা গেল শহরে। প্যারিসের যেদিকে তাকাও জার্মানদের চিহ্ন। ফরাসি নেতাদের মূর্তি ফেলে দেয়া হয়েছে,

রাষ্ট্রীয় সমস্ত ভবনে স্বস্তিকার চিহ্নঅলা পতাকা উড়ছে। তারা সবকিছু বদলে দেয়ার হাস্যকর উন্মাদনায় মেতে উঠল। গরম এবং ঠাণ্ডা পানির ট্যাপ হয়ে গেল heiss এবং Ralt। স্ট্রাসবার্গের প্লেস ডি ব্রগলি পেল নতুন নাম : অ্যাডলফ হিটলার প্লাৎজ। লাফায়েত্তি, নি এবং ক্লেবারের স্ট্যাচু ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিল নাৎসিরা। মৃতদের শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি মনুমেন্টের লেখা তুলে সেখানে খোদাই করা হল : GEFALLEN FUR DEUTSCH—LAND।

জার্মান অকুপেশন ট্রুপ বেশ মজা করছে। ফরাসি খাবার দামি এবং খুব বেশি সস দেয়া হলেও ওগুলোই তারা বেশি বেশি খাচ্ছে। প্যারিস যে বদলেয়ার, দুমা এবং মলিয়ের-এর শহর তা সেনাবাহিনী মোটেই গ্রাহ্য করছে না। প্যারিস তাদের কাছে রঙমাখা, স্কার্ট পাছার ওপরে তোলা বেশ্যাদের শহর। তারা মেয়েদেরকে যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করল। স্টর্ম টুপাররা কিশোরীদেরকে তাদের সঙ্গে বিছানায় যেতে বাধ্য করল, কখনো কখনো বেয়োনেটের ভয় দেখিয়ে। ওদিকে তাদের নেতারা, গোয়েরিং এবং হিমলার, বলাৎকার করলেন লুভর মিউজিয়াম, লুঠ করলেন দামি দামি সব ছবি।

ফ্রান্সের এই সংকটকালে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল দুর্নীতি, সেইসঙ্গে নায়কত্বও। আন্ডারগ্রাউন্ডের গোপন অস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠল Pompiers। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট। জার্মানরা তাদের বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ডজন ডজন বিল্ডিং দখল করেছে। এগুলো গেস্টাপোসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই ভবনগুলোর লোকেশন সবার জানা। সেন্ট রেমির এক আন্ডারগ্রাউন্ড রেজিস্টান্স হেডকোয়ার্টার্সে রেজিস্টান্স লিডাররা প্রতিটি ভবনের নকশা খুঁটিয়ে দেখলেন। এরপর এক্সপার্টদের লাগিয়ে দেয়া হল তাদের টার্গেট ভেদ করার জন্য। ওইদিনই দ্রুতগতির কোনো গাড়ি কিংবা নিরীহ চেহারার বাইসাইকেল আরোহী ভবনগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে ছুড়ে দিল ঘরে-তৈরি বোমা। ওইসময় ক্ষয়ক্ষতি হল সামান্যই। তবে আসল ঘটনা ঘটনার তখনো বাকি।

পমপিয়ার্সদের জার্মানরা জানত দমকল বাহিনীর লোক হিসেবে। ভবনে আগুন লেগে গেলে তারা এদেরকে ডেকে পাঠাত। পমপিয়ার্স হাইপ্রেশার হোসপাইপ, কুঠার ইত্যাদি নিয়ে লেগে যেত আগুন নেভাতে। জার্মানরা সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখত তাদের কর্মকাণ্ড। আর দমকল বাহিনী এ সুযোগ কাজে লাগাত। তারা জার্মানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ছুড়ে দিত আগুনবোমা। এভাবে তারা ভেরমাখ্ট এবং গেস্টাপোর দুর্গে সংরক্ষিত মূল্যবান বহু রেকর্ড ধ্বংস করে ফেলল। ঘটনা বুঝে উঠতে জার্মান হাইকমান্ডের ছয়মাসেরও বেশি সময় লেগে গেল। ততদিনে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। গেস্টাপো প্রমাণ করতে পারল না কিছুই, তবে পমপিয়ার্সের সদস্যদের ধরে ধরে রুশ সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়া হল লড়াই করার জন্য।

খাবার থেকে শুরু করে সাবান, সবকিছুরই ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছিল। গ্যাসোলিন নেই, নেই মাংস, দুগ্ধজাত কোনো পণ্য। জার্মানরা সব দখল করে রেখেছে। লাক্সারি পণ্যের দোকান খোলা বটে তবে সেখানকার খদ্দের শুধু সেনাবাহিনী। তারা জিনিস কেনে কিন্তু পয়সা দেয় না।

'এর দাম কে দেবে?' কাতরে ওঠে ফরাসি দোকানদার। দাঁত কেলিয়ে হাসে জার্মানরা। 'ব্যাংক অভ ইংল্যান্ড।'

তবে যেসব ফরাসির টাকা এবং প্রভাব আছে তাদের কিন্তু এসব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে না। কারণ তাদের জন্য রয়েছে ব্ল্যাকমার্কেট।

প্যারিস দখল হয়ে গেলেও নোয়েল পেজের জীবনে তার খুব একটা প্রভাব পড়ল না। সে রু ক্যানবনে চ্যানেল-এ মডেলিং করে। এটি দেড়শো বছরের প্রাচীন একটি ভবন, বাইরে থেকে মনে হয় খুব সাধারণ, তবে ভেতরের সাজসজ্জা চমৎকার। এ যুদ্ধ, অন্য সব যুদ্ধের মতোই বেশকিছু মানুষকে রাতারাতি কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছে। কাজেই খদ্দেরের অভাব নেই কোনো। তবে খদ্দেরের সংখ্যা জার্মানই বেশি। কাজ না থাকলে চ্যাম্পস-এলিসিজ-এর বাইরের ছোট ক্যাফেতে বসে চুপচাপ সময় কাটিয়ে দেয় নোয়েল অথবা পন্ট নিউফের কাছে লেফট ব্যাঙ্কে ঘুরে বেড়ায়। জার্মান উর্দিপরা শত শত সৈন্য। তাদের অনেকেরই সঙ্গী ফরাসি তরুণী। ফরাসি সিভিলিয়ানদের বয়স বেশি, বুড়ো। কেউ কেউ খোঁড়া। নোয়েলের ধারণা তরুণ সেনাদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। উর্দিপরা না-থাকলেও ওদেরকে একনজর দেখেই নোয়েল বলতে পারে ওরা জার্মান। এদের চেহারায় দুর্বিনীত, উদ্ধত ভাব, যেন আলেকজান্ডারের মতো বিশ্বজয় করতে নেমেছে। এদেরকে নোয়েল ঘৃণাও করে না, পছন্দও করে না। এরা নোয়েলকে এখন পর্যন্ত স্পর্শ করার চেষ্টা করেনি।

নোয়েল ভেতরে ভেতরে নানান পরিকল্পনা আঁটছে। নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে সে সচেতন, জানে কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে এক গোয়েন্দা ভাড়া করার সিদ্ধান্ত নিল। এক মডেলের ডিভোর্স পেতে সাহায্য করেছে লোকটা। নাম ক্রিশ্চিয়ান বারবেট। সে রু সেন্ট লাজারে-র ক্ষুদ্র, জীর্ণ একটি অফিস চালায়। তার দরজায় টাঙানো সাইনবোর্ডে লেখা :

ENQUETES
PRIVEES ET COMMERCIALES
RE CHERECHES
RENSEIGNEMENTS
CONFIDENTIELS
FILATURES
PREUVES

সাইনবোর্ডটি আকারে অফিসের চেয়েও বড়। বারবেট বেঁটেখাটো, টাকমাথা, হলুদ, ভাঙা দাঁত, কুঁৎকুঁতে চোখ, আঙুলে নিকোটিনের দাগ।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে নোয়েলকে।

'ইংল্যান্ডে এক লোকের সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার,' জবাব দিল নোয়েল।

সন্দেহ ফুটল গোয়েন্দার চোখের তারায়। 'কী ধরনের তথ্য?'

'সবরকমের। সে বিয়ে করেছে কিনা, কার সঙ্গে প্রেম করছে। আমি তাকে নিয়ে একটা ক্র্যাপ বুক করতে চাই।'

খ্যাচখ্যাচ করে উরু চুলকাল বারবেট, স্থিরদৃষ্টি নোয়েলের দিকে।

'এ লোক কি ইংরেজ?'

'আমেরিকান। RAF-এর ঈগল স্কোয়াড্রনের পাইলট।'

টাক মাথার তালু ঘষল বারবেট। 'আমি জানি না পারব কিনা।' ঘোঁতঘোঁত করল সে। 'এখন যুদ্ধ চলছে। ওরা যদি জানতে পারে ইংল্যান্ডের এক পাইলট সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছি আমি—' গলার স্বর নেমে এল বারবেটের, কাঁধ ঝাঁকাল। 'জার্মানরা আগে আমাকে গুলি করবে তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।'

'আমার কোনো সামরিক তথ্যের প্রয়োজন নেই,' তাকে আশ্বস্ত করল নোয়েল। পার্স খুলে একতাড়া ফরাসি নোট বের করল। বারবেট ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওদিকে।

'ইংল্যান্ডে আমার কানেকশন আছে,' সতর্কভঙ্গিতে বলল সে, 'তবে খরচ বেশি পড়বে।'

এভাবে শুরু হয়ে গেল কাজ।

তিনমাস বাদে বেঁটে ডিটেকটিভ ফোন করল নোয়েলকে। সে গোয়েন্দার অফিসে ঢুকেই প্রশ্ন করল, 'ও কি বেঁচে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল বারবেট। স্বস্তির ঝিরঝিরে পরশ অনুভব করল নোয়েল শরীরে। বারবেট ভাবল, *তোমাকে যে ভালোবাসে সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।*

'আপনার বয়ফ্রেন্ড বদলি হয়ে গেছেন,' জানাল সে।

'কোথায়?'

ডেস্কে রাখা প্যাডে চোখ বুলাল বারবেট। 'উনি RAF-এর ৬০৯তম স্কোয়াড্রনে ছিলেন। তাকে ইস্ট অ্যাংগনিয়ার মার্টলসহ্যাম ইস্ট-এর ১২১তম স্কোয়াড্রনে বদলি করা হয়েছে। উনি এখন চালাচ্ছেন হারি—'

'সে কোন্ প্লেন চালাচ্ছে জানতে চাই না আমি।'

'কিন্তু আপনি তো তথ্য পাবার জন্য পয়সা দিয়েছেন,' বলল বারবেট। 'পয়সা উসুল করবেন না?' আবার চোখ ফেরাল নোটে। 'উনি হারিকেন চালাচ্ছেন। এর আগে চালিয়েছেন আমেরিকান বাফেলো।'

আরেকটা পৃষ্ঠার ওপর ঝুঁকল গোয়েন্দা। 'এখানে কিছু ব্যক্তিগত তথ্য আছে।'

'বলে যান,' বলল নোয়েল।

কাঁধ ঝাঁকাল বারবেট। 'উনি যেসব মেয়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছেন তাদের একটা তালিকা করেছি আমি। এটা আপনার কাজে লাগবে কিনা—'

'আমি আপনাকে বলেছি—সবরকম তথ্য আমার চাই।'

নোয়েলের গলা এমন অদ্ভুত শোনাল, অবাক লাগল বারবেটের। এর মধ্যে স্বাভাবিক কিছু নেই, অস্বাভাবিক, রহস্যময় কিছু একটা আছে। ক্রিশ্চিয়ান বারবেট তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা। কাজও করে তৃতীয় শ্রেণীর ক্লায়েন্টদের নিয়ে। তবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই অপূর্ব সুন্দরী নারীর মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা অস্বস্তিকর। বারবেট প্রথমে ভেবেছিল এ বোধহয় তাকে কোনো গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়াতে চাইছে। তারপর ভেবেছে মহিলা অবহেলিত স্ত্রী, স্বামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ চাইছে। কিন্তু ভুল ভেবেছে বারবেট। এখন বুঝতে পারছে না এ আসলে কী চাইছে। সে নোয়েলের হাতে ল্যারি ডগলাসের গার্লফ্রেন্ডদের তালিকা তুলে দিল। কাগজটা পড়ার সময় তার ভাবভঙ্গি লক্ষ করল। নোয়েল যেন লন্ড্রির লিস্ট পড়ল। কোনো ভাব ফুটল না চেহারায়।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইল নোয়েল। এরপরে যে-কথাটা বলল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না ক্রিশ্চিয়ান বারবেট।

'আমি খুব খুশি হয়েছি,' বলল নোয়েল।

নোয়েলের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল বারবেট। 'আরো কোনো তথ্যের দরকার হলে দয়া করে আমাকে ফোন করবেন।'

নোয়েল পেজ চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল বারবেট। বোঝার চেষ্টা করছে তার ক্লায়েন্ট আসলে কিসের পেছনে লেগেছে।

প্যারিসের নাট্যশালাগুলো আবার পূর্ণ হতে শুরু করল। জার্মানরা নিজেদের বিজয়ের গৌরব এবং সুন্দরী ফরাসি নারীদের দেখাতে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করতে লাগল: সুন্দরীরা তাদের বগলে যেন ট্রফির মতো শোভা পায়। ফরাসিরা নাটক দেখতে যায় কয়েক ঘন্টার জন্য। ভুলতে চায় যে তারা পরাজিত, অসুখী মানুষ।

মার্সেইতে কয়েকবার নাটক দেখেছে নোয়েল। অশিক্ষিত দর্শকশ্রেণীর জন্য চতুর্থশ্রেণীর অভিনেতাদের বস্তাপচা নাটক ছিল সেসব। কিন্তু প্যারিসের থিয়েটার তা থেকে ভিন্ন। মলিয়ের, রেসিন এবং ফোলেট-এর চমকপ্রদ রচনা নিয়ে তৈরি নাটক জ্যান্ত হয়ে ওঠে প্যারিসের মঞ্চে। শাসা গুইট্রি তাঁর প্রেক্ষাগৃহ খুলেছেন। নোয়েল তার অভিনয় দেখতে যায়। সে ফ্রাঁসোয়া মরিয়াস নামে সম্ভাবনাময় এক নাট্যকারের নাটক দেখল একদিন। গেল পিরানডেল্লোর 'Chacun La Verite' এবং রোসটান্ডের 'Cyrano de Bergeracl' দেখতে। তবে নোয়েলের সঙ্গে কেউ

থাকে না। সবাই তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, নোয়েল তখন পারিপার্শ্বিকতা বিস্মৃত হয়ে নাটকে মগ্ন। তার মনে হয় সেও যেন মঞ্চের অভিনেতাদের মতো অভিনয় করছে, এমন কিছুর ভান করছে আসলে সে তা নয়, মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে।

জাঁ পল সার্ত্রের 'Huis clos' দারুণ প্রভাবিত করল নোয়েলকে। নায়ক ফিলিপ্পি সোরেল, ইউরোপের অন্যতম আইডল। সোরেল দেখতে কুৎসিত, বেঁটে, মোটা, নাকটা ভাঙা, চেহারা বক্সারের মতো। কিন্তু যখন সে কথা বলতে থাকে, শুরু হয়ে যায় জাদু। তাকে একই সঙ্গে ব্যাঙ ও রাজকুমার মনে হয় নোয়েলের। হাঁ করে দেখে লোকটার অভিনয়। শুধু সোরেলের অভিনয় দেখার জন্য বারবার আসে নোয়েল, বসে সামনের সারিতে, লোকটার চুম্বকের মতো আকর্ষণ করার ক্ষমতার গোপন রহস্য জানতে চায়।

এক সন্ধ্যায়, বিরতির পরে প্রেক্ষাগৃহের এক কর্মচারী নোয়েলকে একটি চিরকুট দিল। তাতে লেখা, 'আপনাকে রাতের পর রাত দেখছি দর্শকসারিতে বসে আছেন। আজ সন্ধ্যার পরে ব্যাকস্টেজে চলে আসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। পি.এস.।' নোয়েল আরেকবার পড়ল চিঠিটা। মুখস্থ করে নিল প্রতিটি শব্দ। ফিলিপ্পি সোরেলকে সে পছন্দ করে বলে নয়, নোয়েল জানে ও যা চাইছে এটা তার শুরু।

নাটক শেষে ব্যাকস্টেজে গেল নোয়েল। স্টেজের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এক বুড়ো ওকে সোরেলের ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেল। মেকআপ আয়নার সামনে বসে আছে সোরেল, পরনে শুধু শর্টস, মেকআপ তুলছে। আয়নায় নোয়েলকে লক্ষ করল সে। 'অবিশ্বাস্য', বলল সোরেল, 'সামনাসামনি আপনাকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে দেখতে।'

'ধন্যবাদ, মশিউ সোরেল।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'মার্সেই।'

ওকে ভালো করে দেখার জন্য ঘুরল সোরেল। আপাদমস্তক দেখল। স্থির দাঁড়িয়ে রইল নোয়েল। 'চাকরি খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল অভিনেতা।

'না।'

'তাহলে?'

'আমি আপনাকে খুঁজছি।'

সাপার শেষে সোরেল নোয়েলকে রু মরিস-ব্যারেস-এর চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল। ফিলিপ্পি সোরেল দক্ষ প্রেমিক। নোয়েলের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ, তবে মেয়েটি বিছানায় এমন দক্ষ কল্পনাও করেনি।

'ক্রাইস্ট!' বলল সোরেল। 'তুমি ফ্যান্টাস্টিক। এসব শিখলে কোথেকে?'

নোয়েল একটু ভাবল। এটা শেখার প্রশ্ন নয়। অনুভূতির বিষয়। তার কাছে পুরুষের শরীর বাদ্যযন্ত্রের মতো, সে বাজাতে ভালোবাসে, নানান সুর তুলতে পছন্দ করে, নিজের শরীর ব্যবহার করে অসাধারণ মূর্ছনা তোলে।

'আমি জন্ম থেকেই এসব জানি,' সরল গলায় বলল নোয়েল।

নোয়েলের আঙুলের ডগা হালকাভাবে ছুঁয়ে গেল সোরেলের ঠোঁট, যেন উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি, বুকে নামল হাত, সেখান থেকে পেটে। লক্ষ করল সোরেলের পুরুষাঙ্গ আবার দাঁড়িয়ে গেছে।

বিছানা ছাড়ল নোয়েল। ঢুকল বাথরুমে। ফিরল একটু পরেই। মুখে পুরে নিল সোরেলের শক্ত লিঙ্গ। তার মুখ ভর্তি গরম জল।

'ওহ্, ক্রাইস্ট,' গুঙিয়ে উঠল সোরেল।

ওরা সারারাত প্রেম করল, সকালেও। সোরেল নোয়েলকে আমন্ত্রণ জানাল তার সঙ্গে থাকার জন্য।

ফিলিপ্পি সোরেলের সঙ্গে ছয় মাস থাকল নোয়েল। সে সুখী বা অসুখী কোনোটাই নয়। সে জানে সোরেল তার সঙ্গ খুবই উপভোগ করে। কিন্তু নোয়েলের কাছে এটা মোটেই গুরুত্ব বহন করে না। সে নিজেকে ছাত্রী ভাবছে, প্রতিদিন কিছু শিখে নিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সোরেল তার কাছে স্কুল আর নোয়েল সে স্কুলে যাচ্ছে নিজের বৃহৎ পরিকল্পনার ক্ষুদ্র অংশের বাস্তবায়নের জন্য। ওদের সম্পর্কটাকে ব্যক্তিগত কিছু মনে করছে না নোয়েল। সে দুবার ভুল করেছে। আর পুনরাবৃত্তি করবে না। নোয়েলের চিন্তাচেতনায় শুধু একজন—ল্যারি ডগলাস। নোয়েল যখন ডেস ভিক্টোরি কিংবা পার্ক অথবা রেস্টুরেন্টে যায়, যেসব জায়গায় ল্যারি তাকে নিয়ে গিয়েছিল, প্রবল ঘৃণায় রিরি করে ওঠে গা। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, শ্বাস নিতে রীতিমতো কষ্ট হয় নোয়েলের। ঘৃণার সঙ্গে আরেকটা অনুভূতি হয় ওর। কিন্তু অনুভূতিটির নাম জানে না ও।

সোরেলের সঙ্গে দুইমাস থাকার পরে একদিন বারবেটের কাছ থেকে ফোন পেল নোয়েল।

'আপনার জন্য আরেকটা খবর আছে,' বলল ক্ষুদ্রকায় গোয়েন্দা।

'ও ঠিক আছে তো?' দ্রুত জানতে চাইল নোয়েল।

আবার সেই অস্বস্তিবোধটা ফিরে এল বারবেটের মধ্যে।

'জি।' জবাব দিল সে।

স্বস্তিবোধ করল নোয়েল। 'আমি আসছি এখুনি।'

খবরটি দুটো অংশে বিভক্ত। প্রথম রিপোর্টে ল্যারি ডগলাসের সামরিক ক্যারিয়ার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সে পাঁচটি জার্মান প্লেন গুলি করে ভূপাতিত করেছে এবং যুদ্ধে প্রথম আমেরিকান হিসেবে পদকও পেয়েছে। তাকে

ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হয়েছে। দ্বিতীয় রিপোর্ট নোয়েলের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করল বেশি। লন্ডনের সমাজে সে এখন অত্যন্ত জনপ্রিয়, এক ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের কন্যার সঙ্গে তার বাগদান হয়ে গেছে। তারপর একটা তালিকা দেয়া হয়েছে, ল্যারি কোন্ কোন্ মেয়ের সঙ্গে বিছানায় গেছে। শোগার্ল থেকে মন্ত্রণালয়ের আন্ডার-সেক্রেটারির স্ত্রীও আছেন এ তালিকায়।

'আমি কি কাজ চালিয়ে যাব?' প্রশ্ন করল বারবেট।

'অবশ্যই,' জবাব দিল নোয়েল। পার্স থেকে একটি খাম বের করল। দিল বারবেটকে। 'কোনো খবর পেলেই আমাকে জানাবেন।'

চলে গেল নোয়েল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল বারবেট।

ফিলিপ্পি সোরেল যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত কী ঘটছে নোয়েলের মনে, দারুণ অবাক হয়ে যেত। নোয়েল যেন দেবতাজ্ঞানে পূজা করে সোরেলকে। তার জন্য সবকিছু করে, সুস্বাদু সব খাবার রান্না, বাজার হাট, ঘরদোর পরিষ্কার এবং যখন অস্থির থাকে সোরেল, বিছানায় তাকে সুখ দিয়ে অশান্ত মন শান্ত করে দেয় নোয়েল। আর নোয়েল সোরেলের কাছে কিছুই চায় না। এমন একজন যথার্থ রক্ষিতা পেয়ে খুশিতে বাগবাগ সোরেল। সে নোয়েলকে সবখানে নিয়ে যায়, তার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা নোয়েলের সঙ্গে গল্প করে আর ভাবে সোরেল সত্যি ভাগ্যবান।

একরাতে নাটক শেষে সাপার করছে ওরা, নোয়েল বলল, 'আমি অভিনেত্রী হতে চাই, ফিলিপ্পি।'

মাথা নাড়ল সোরেল। 'ঈশ্বর জানেন তুমি অপূর্ব সুন্দরী, নোয়েল। আমি এ জীবনে বহু অভিনেত্রী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তুমি একদম আলাদা। আমি চাই তুমি তাই থাকো। তোমার সঙ্গে কাউকে শেয়ার করতে চাই না আমি।' ওর হাত চাপড়ে দিল সে। 'তুমি যা চাইছ তা কি আমি তোমাকে দিচ্ছি না?'

'দিচ্ছ, ফিলিপ্পি,' জবাব দিল নোয়েল।

সে-রাতে বাড়ি ফিরে প্রেম করার ইচ্ছে জাগল সোরেলের। মিলন শেষে নিজেকে বিধ্বস্ত লাগল তার। যেন সমস্ত শক্তি শুষে নেয়া হয়েছে। নোয়েল এর আগে এতটা উত্তেজিত হয়নি কখনো। সোরেল মনে মনে নিজেকে অভিনন্দিত করল। ভাবল এ মেয়েটিকে ঠিকমতো গাইডেন্স দিতে হবে।

পরদিন রোববার নোয়েলের জন্মদিন। নোয়েলের সম্মানে ম্যাক্সিমে ডিনার পার্টি দিল ফিলিপ্পি। ওপরতলার বড় ডাইনিংরুম পুরোটাই ভাড়া করল সে। লাল মখমল আর কাঠের প্যানেলিং করা ঘরটি। অতিথিদের তালিকা বানাতে সোরেলকে সাহায্য করেছে নোয়েল। তবে সোরেলকে না জানিয়ে একটা নাম

ওতে জুড়ে দিয়েছে সে। পার্টিতে আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা মোট চল্লিশ। তারা নোয়েলের জন্মদিন উপলক্ষে টোস্ট করল, নিয়ে এসেছে দামি দামি উপহার। ডিনার শেষে আসন ছাড়ল সোরেল। সে প্রচুর ব্রান্ডি এবং শ্যাম্পেন গিলেছে। একটু একটু টলছে, কথাও জড়িয়ে আসছে।

'বন্ধুগণ,' বলল সে, 'আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারীটির সম্মানে পান করেছি এবং তাকে চমৎকার জন্মদিনের উপহার দিয়েছি। তবে তার জন্য একটি উপহার রেখেছি আমি তাকে অবাক করে দেয়ার জন্য।' নোয়েলের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর ফিরল অতিথিদের দিকে। 'নোয়েল এবং আমি বিয়ে করতে চলেছি।'

হাততালি দিয়ে উঠল অতিথিরা, পিঠ চাপড়ে দিল সোরেলের। হবু কনেকে 'উইশ' করল। নোয়েল অতিথিদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, বিড়বিড় করে 'ধন্যবাদ' বলছে। তবে একজন অতিথি আসন ছেড়ে উঠে এল না। সে ঘরের দূরপ্রান্তের একটি টেবিলে বসেছে, হাতের লম্বা হোল্ডারে জ্বলছে সিগারেট। পুরো দৃশ্যটা দেখছে চোখে কৌতুক নিয়ে। নোয়েল খেয়াল করেছে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ করছে। লোকটা লম্বা, ভয়ানক রোগা, চেহারাটা তীক্ষ্ণ। এখানে যা ঘটছে তাতে সে বেশ আমোদ পাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।

নোয়েলের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। হাসল নোয়েল।

এ হল আরমান্দ গটিয়ের। ফ্রান্সের অন্যতম সেরা পরিচালক। ফ্রেঞ্চ রে পারটরি থিয়েটার-এর দায়িত্বে রয়েছে সে। তার নির্দেশিত নাটক সারাবিশ্বে প্রশংসিত। গটিয়েরের নাটক বা সিনেমা যে সফল হবেই তাতে নিশ্চয়তা দেয়া যায়। অভিনেত্রীদের সঙ্গে তার খুবই ভালো সম্পর্ক। অন্তত আধডজন তারকা উপহার দিয়েছে গটিয়ের।

সোরেল নোয়েলকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি খুব অবাক হয়েছ, না, ডার্লিং?'

'হ্যাঁ, ফিলিপ্পি,' জবাব দিল নোয়েল।

'আমি এখুনি বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই। আমার ভিলায় হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।'

সোরেলের কাঁধের ওপর দিয়ে নোয়েল দেখল তার দিকে তাকিয়ে আছে গটিয়ের, সেই রহস্যময় হাসি ঠোঁটে। সোরেলের কয়েকজন বন্ধু এসে তাকে নিয়ে গেল। নোয়েল ঘুরে দেখল তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে গটিয়ের।

'অভিনন্দন,' বলল সে। স্পষ্ট ঠাট্টা গলায়। 'বঁড়শিতে বড় মাছ তুলেছেন।'

'তাই নাকি?'

'ফিলিপ্পি সোরেল বড় মাছই বটে।'

'কারো কারো জন্য হয়তো,' উদাস গলায় বলল নোয়েল।

বিস্মিত হল গটিয়ের, 'আপনি কি বলতে চাইছেন এ বিয়েতে আপনার আগ্রহ

নেই?'

'আমি আপনাকে কিছুই বলতে চাইছি না।'

'গুড লাক,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল সে।

'মশিউ গটিয়ের...'

থেমে গেল সে।

'আজ রাতে একবার দেখা করা যাবে?' শান্তগলায় জিজ্ঞেস করল নোয়েল। 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আরমন্দ গটিয়ের ওকে পরখ করল একমুহূর্ত। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

'আমি আপনার বাসায় আসব।'

'আসুন। ঠিকানা হল—'

'আমি ঠিকানা জানি। বারোটার সময়।'

'বারোটার সময়।'

রু মারবিউফে কেতাদুরস্ত একটি পুরানো অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে আরমন্দ গটিয়ের। দারোয়ান নোয়েলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল লবিতে। এলিভেটরে চেপে উঠে এল চারতলায়, লিফটম্যান দেখিয়ে দিল গটিয়েরের অ্যাপার্টমেন্টে। বেল টিপল নোয়েল। একটু পরে গটিয়ের স্বয়ং খুলে দিল দরজা। পরনে ফুল-আঁকা ড্রেসিং গাউন।

'আসুন।' বলল সে।

নোয়েল অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল। এমন আভিজাত্যে অনভ্যস্ত চোখও বুঝে নিল চমৎকারভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘর। আসবাবগুলো খুবই দামি।

'দুঃখিত, পোশাক পরার সময় পাইনি,' ক্ষমাপ্রার্থনা করল গটিয়ের। 'ফোনে কথা বলছিলাম।'

নোয়েল তার দিকে তাকাল। 'আপনার পোশাক না-পরলেও চলে।' সে কাউচে গিয়ে বসল।

হাসল গটিয়ের। 'একটা কৌতূহল আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, মিস পেজ। আমি কেন? আপনার সঙ্গী বিখ্যাত এবং ধনী মানুষ। আপনি চাইলে আমার চেয়ে বয়সে অনেক তরুণ এবং পয়সাঅলাদের পেতে পারেন। কিন্তু আপনি আসলে কী চান আমার কাছে?'

'আমি চাই আপনি আমাকে অভিনয় শেখাবেন,' বলল নোয়েল।

একমুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল আরমন্দ গটিয়ের। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আপনি আমাকে হতাশ করলেন। আমি আপনার কাছ থেকে অন্যকিছু আশা করছিলাম।'

'আপনার কাজ তো অভিনেতাদের নিয়ে।'

'অভিনেতাদের নিয়ে, অ্যামেচার নয়। কখনো অভিনয় করেছেন?'

'না, তবে আপনি শিখিয়ে দেবেন।' মাথা থেকে হ্যাট নামাল নোয়েল, খুলল হাত মোজা। 'আপনার বেডরুমটা কোন্‌দিকে?'

ইতস্তত করল গটিয়ের। তার জীবনে অনেক সুন্দরী নারী এসেছে যারা নাটক করতে চায়, সিনেমায় অভিনয় করতে চায়। এদেরকে সবসময়ই একটা যন্ত্রণা মনে হয়েছে গটিয়েরের কাছে। এরকম আরেকজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা বোকামো হবে, জানে ও। তবে এর সঙ্গে না-জড়ালেও চলবে। এই সুন্দরীটি সেধে নিজেকে বিকিয়ে দিতে চাইছে। একে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ভোগ করার পরে বিদায় জানিয়ে দিলেই হল।

'ওদিকে,' হাত তুলে একটা দরজা দেখাল গটিয়ের।

নোয়েলকে বেডরুমে ঢুকে যেতে দেখল গটিয়ের। চিন্তা করল সোরেল যদি জানতে পারে তার হবু বউ এখানে রাত কাটিয়েছে, কী কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসবে সে। গটিয়ের ব্রান্ডি পান করল, তারপর অনেকগুলো ফোন করল। শেষে যখন বেডরুমে ঢুকল দেখল তার জন্য বিছানায় অপেক্ষা করছে নোয়েল। নগ্ন। মনে মনে স্বীকার করল গটিয়ের—এমন মাথা-খারাপ-করা দেহসৌষ্ঠব জীবনে দেখেনি সে। এ যেন প্রকৃতির দান। নোয়েলের মুখখানা অপূর্ব, শরীরের কোথাও কোনো খুঁত নেই। গায়ের রঙ মধুর মতো, দু পায়ের সন্ধিস্থলের চুলগুলো সোনালি।

নোয়েল ওকে লক্ষ করছে, কাপড় খুলতে লাগল গটিয়ের। মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। এগিয়ে গেল বিছানায়। 'বলব না তুমি সুন্দরী,' বলল গটিয়ের। 'কারণ এ-কথাটা তুমি নিশ্চয় ইতোমধ্যে বহুবার শুনেছ।'

'সৌন্দর্য মূল্যহীন,' কাঁধ ঝাঁকাল নোয়েল। 'যদি-না তা আনন্দদানে ব্যবহার করা হয়।'

গটিয়ের হাসল। 'ঠিক বলেছ। তাহলে তোমার সৌন্দর্য কীরকম ব্যবহার করতে পারো দেখি।' সে বসল নোয়েলের পাশে।

বেশিরভাগ ফরাসির মতো আরমন্দ গটিয়েরও নিজেকে দুর্দান্ত খেলুড়ে ভেবে গর্ববোধ করে। সে জার্মান এবং আমেরিকানদের গল্প শুনেছে। তারা নাকি লাফ মেরে মেয়েদের ওপর চড়াও হয়, দ্রুত রেতঃপাত ঘটিয়ে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে কেটে পড়ে। ভালোবাসাবাসির এহেন নমুনায় বিস্মিত গটিয়ের। আমেরিকানরা এরকম দ্রুত মিলনের একটা নামও দিয়েছে। 'দুমদাম, থ্যাংক ম্যাম।' আরমন্দ গটিয়ের কোনো নারীর সঙ্গে মানসিক আবেগ নিয়ে জড়িয়ে পড়লে মিলন সর্বোচ্চ সুখময় করে তুলতে নানান কাণ্ডকারখানা করে। সে নারীকে ডিনারের দাওয়াত দেয়, সেখানে সঠিক মদ পরিবেশন করা হয়। তার ঘরে মৌ মৌ করে সুগন্ধি, ধীরলয়ে বেজে চলে সংগীত। সে আস্তে ধীরে, অত্যন্ত যত্ন নিয়ে জাগিয়ে তোলে

নারীকে।

তবে নোয়েলের ক্ষেত্রে এসব নিয়মকানুন কিছুই অনুসরণ করা গেল না। কারণ একরাতের সম্পর্কে পারফিউম বা মিউজিকের প্রয়োজন নেই। ও এখানে এসেছে স্রেফ শয্যাসঙ্গিনী হতে। মেয়েটা যদি ভেবে থাকে দু পায়ের আমন্ত্রণে আরমন্দ গটিয়েরকে মুগ্ধ করে ফায়দা লুটবে, তাহলে মস্ত ভুল করেছে সে।

নোয়েলের গায়ে উঠতে যাচ্ছে গটিয়ের, ওকে বাধা দিল নোয়েল। 'দাঁড়াও,' ফিসফিস করল ও।

গটিয়ের বিস্মিত হয়ে দেখল বিছানার ধারের টেবিলে রাখা একজোড়া টিউব হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছে নোয়েল। এক হাতে টিউবের জিনিসটা মাখাল সে, তারপর গটিয়েরের লিঙ্গে ওটা ঘষতে লাগল।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করল গটিয়ের।

হাসল নোয়েল। 'দেখতে পাবে।' সে গটিয়েরের ঠোঁটে চুমু খেল, দ্রুত মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল জিভ। তারপর চাটতে শুরু করল ওর পেট, সারা শরীর। যেন হালকা মখমলের আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে। গটিয়ের টের পেল তার পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পা থেকে আঙুলে নেমে এল জিভ, চুষতে থাকল আঙুল। গটিয়েরের পুরুষাঙ্গ ভয়ানক শক্ত এবং খাড়া হয়ে গেছে। এবার ওর গায়ের ওপর উঠে বসল নোয়েল। গটিয়েরের পুরুষাঙ্গ ঢুকে গেল নোয়েলের যোনিতে। উষ্ণ, নরম যোনি। নোয়েলের মাখানো ক্রিম গটিয়েরের যৌন উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। সেইসঙ্গে তীব্র সুখবোধ হচ্ছে ওর। নোয়েল শরীর নাড়াতে লাগল। তার বাম হাত ব্যস্ত থাকল গটিয়েরের অণ্ডকোষে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠল ও-দুটো। তীব্র সুখে জ্ঞান হারাবার দশা হল গটিয়েরের।

সারারাত প্রেম করল ওরা। এবং প্রতিবারই মিলনের ভঙ্গি পাল্টাল নোয়েল। এরকম উত্তেজক অভিজ্ঞতা জীবনে হয়নি গটিয়েরের।

সকালে আরমন্দ গটিয়ের বলল, 'নড়াচড়ার মতো শক্তি যদি পাই, জামাকাপড় পরে তোমাকে নিয়ে নাস্তা খেতে যাব।'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' বলল নোয়েল। ক্লজিটের সামনে এসে দাঁড়াল, গটিয়েরের একটা রোব বের করে গায়ে চড়াল।

'তুমি বিশ্রাম নাও। আমি আসছি।'

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে নাস্তা-বোঝাই ট্রে নিয়ে ফিরল নোয়েল। ট্রেতে রয়েছে কমলার তাজা রস, লোভনীয় সসেজ এবং ওমলেট, মাখন-লাগানো গরম ক্রইস্যান্ট, জ্যাম এবং একপট কালো কফি।

'তুমি খাবে না?' জিজ্ঞেস করল গটিয়ের।

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'না।' সে একটা আরামকেদারায় বসে গটিয়েরের খাওয়া দেখল। গটিয়েরের ড্রেসিং গাউনে আরো সুন্দর লাগছে নোয়েলকে।

পোষাকের সামনের দিকটা চেরা, ওর চমৎকার বক্ষের গভীর খাঁজ দেখা যাচ্ছে। মাথার কেশ আলুথালু।

আরমন্দ গটিয়ের নোয়েল সম্পর্কে আগে যা ভেবেছিল, এখন বুঝতে পারছে তা ভুল ছিল। ও সস্তা মেয়েমানুষ নয়। ও অমূল্য সম্পদ। তবে এ-ধরনের সম্পদের সঙ্গে আগেও বহু পরিচয় হয়েছে গটিয়েরের। সে পরিচালক হিসেবে নিজের মেধা ও সময় এরকম কোনো অ্যামেচারের পেছনে ব্যয় করতে রাজি নয়। সে নোয়েল যতই সুন্দরী কিংবা বিছানায় দক্ষ হোক না কেন। গটিয়ের নিজের পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। অতীতেও সে কমপ্রোমাইজ করেনি, এখনো করবে না।

গতকাল সে ভেবেছিল রাতটা নোয়েলের সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন সকালে ভাগিয়ে দেবে। এখন নাস্তা খেতে খেতে ওকে লক্ষ করছে গটিয়ের এবং ভাবছে নোয়েলকে নিজের রক্ষিতা করে রাখবে কিনা। তবে ও যে অভিনেত্রী হতে চায় সে ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা চলবে না। ওকে খেলতে হবে সাবধানে। সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল গটিয়ের, 'তুমি কি ফিলিপ্পি সোরেলকে বিয়ে করবে?'

'অবশ্যই না,' জবাব দিল নোয়েল। 'বিয়েটা আমি মোটেই করতে চাইছি না।'

এবার আসল প্রসঙ্গ, 'তাহলে তুমি কী করতে চাইছ?'

'তোমাকে আগেই বলেছি,' শান্ত গলা নোয়েলের, 'আমি অভিনেত্রী হতে চাই।'

ক্রইস্যান্টে কামড় বসাল গটিয়ের। সময় নিল খেতে। 'অবশ্যই।' বলল ও। তারপর যোগ করল, 'অনেক ভালো ভালো নাট্যশিক্ষক আছেন। আমি তাঁদের কাছে তোমাকে পাঠাতে পারব, নোয়েল। ওঁরা তোমাকে...'

'না,' বলল নোয়েল। ওর কণ্ঠস্বর নরম শোনাল। তবে এটাই যেন চূড়ান্ত ঘোষণা। আরমন্দ গটিয়ের একমুহূর্তের জন্য ইচ্ছে করল মেয়েটাকে বলে কেটে পড়তে যেভাবে বহু মেয়েকে সে চলে যেতে বলেছে। কিন্তু রাতের অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। নোয়েলকে হাতছাড়া করা গর্দভের মতো কাজ হবে। ওর জন্য কিছুটা কমপ্রোমাইজ করা যায়ই।

'বেশ,' বলল গটিয়ের। 'তোমাকে একটা নাটক দেব পড়ার জন্য। মুখস্থ করার পরে আমাকে পড়ে শোনাবে। দেখব কতটা প্রতিভা তোমার আছে। এরপরে সিদ্ধান্ত নেব তোমাকে নিয়ে কী করা যায়।'

'ধন্যবাদ, আরমন্দ,' বলল নোয়েল। কণ্ঠে উল্লাস বা আনন্দ কিছুই নেই। স্রেফ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

নোয়েল পোশাক পরছে, আরমন্দ গটিয়ের নিজের পড়ার ঘরে ঢুকল। শেলফের ভল্যুম ঘেঁটে বের করল ইউরিপাইদিসের 'Ahdromache'. বিচিত্র এক টুকরো হাসি ফুটল মুখে। এ ক্ল্যাসিকের চরিত্রে অভিনয় করা সবচেয়ে কঠিন। সে

বেডরুমে এসে নাটকটা তুলে দিল নোয়েলের হাতে।

'এই নাও, মাই ডিয়ার,' বলল সে। 'পার্ট মুখস্থ করার পরে তোমার পরীক্ষা নেয়া হবে।'

'ধন্যবাদ, আরমন্দ। তুমি হতাশ হবে না।'

নোয়েল যে এ চরিত্রে অভিনয় করতে পারবে না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত গটিয়ের। মেয়েটার জন্য তার করুণা হল। অপারগতা প্রকাশ করার পরে সে নোয়েলকে সান্ত্বনা জানাবে, ব্যাখ্যা করবে অভিনয় সত্যি কঠিন জিনিস। সন্ধ্যায় নোয়েলকে ডিনারের আমন্ত্রণ দিল সে। চলে গেল নোয়েল।

নোয়েল ফিরে এল ফিলিপ্পি সোরেলের অ্যাপার্টমেন্টে। সোরেল তার জন্য অপেক্ষা করছিল। মদ খেয়ে পুরো টাল।

'কুত্তি,' চিৎকার করে উঠল সে, ' কোথায় ছিলি সারারাত?'

নোয়েল যাই বলুক কিছুই শুনবে না সোরেল। সে নোয়েলকে ধরে পেটাবে, তাকে বিছানায় নিয়ে যাবে, তারপর ওর ক্ষমা মিলবে।

কিন্তু নোয়েল ক্ষমাপ্রার্থনার ধারেকাছেও গেল না। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আরেকজন পুরুষের সঙ্গে ছিলাম, ফিলিপ্পি। আমার জিনিসপত্রগুলো নিতে এসেছি।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সোরেল। নোয়েল শোবার ঘরে ঢুকে গোছাতে লাগল জিনিসপত্র।

'ঈশ্বরের দোহাই, নোয়েল,' আকুতি করল সোরেল। 'চলে যেয়ো না! আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। আমরা বিয়ে করব।' পরবর্তী আধঘণ্টা নোয়েলের সঙ্গে সে তর্ক করল, ঝগড়া করল, হুমকি দিল, তোষামোদ করল, অনুনয় করল, কিন্তু নোয়েল কিছুই শুনল না। সে যখন চলে গেল অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে, বেকুব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সোরেল। বোধগম্য হচ্ছে না কেন তাকে ছেড়ে চলে গেল নোয়েল। সে জানে না সে কোনোদিনই নোয়েলের মন জয় করতে পারেনি।

নতুন নাটকের নির্দেশনা দিচ্ছে আরমন্দ গটিয়ের। দু হপ্তার মধ্যে প্রদর্শনী। সারাদিন তার কাটছে মঞ্চে, রিহার্সালে। পরিচালনার সময় গটিয়ের নাটক ছাড়া অন্য সমস্ত চিন্তা মন থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেয়। কাজে পুরো মনোযোগ দিতে পারাটা তার প্রতিভার অংশবিশেষ। প্রেক্ষাগৃহের চার দেয়াল আর অভিনেতা ছাড়া ওইসময় অন্য কোনোকিছু উত্তেজিত করে তুলতে পারে না তাকে। তবে আজকের দিনটাতে এর ব্যতিক্রম ঘটল। গটিয়ের শুধু নোয়েলের কথা ভাবছে, মনে পড়ছে অবিস্মরণীয় রাতটির কথা। একটা দৃশ্যের রিহার্সাল শেষ হয়ে গেল, অভিনেতারা অপেক্ষা করছে গটিয়েরের মন্তব্যের জন্য। গটিয়ের হঠাৎ বুঝতে পারল সে আসলে ওদিকে মনোযোগ দিতে পারছে না। নিজের ওপর রাগ হল খুব। কিন্তু

নোয়েলের নগ্ন শরীর ওকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে নাটকে মনোনিবেশ করাই সম্ভব হচ্ছে না। একটি নাটকীয় দৃশ্যের মাঝে হঠাৎ গটিয়েরের পুরুষাঙ্গ ফুঁসে উঠল। সে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল।

গটিয়ের বুঝতে চেষ্টা করল কেন এই মেয়েটি তার চিন্তায় বারবার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। নোয়েল নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কিন্তু পৃথিবীর সেরা সুন্দরীদের অনেকের সঙ্গেই ঘুমিয়েছে গটিয়ের। মিলনের ছলাকলায় দারুণ দক্ষ নোয়েল। তবে অন্য মেয়েরাও কম ছলাকলা জানত না। নোয়েলকে দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয় তবে প্রতিভাময়ী নয়; তার ব্যক্তিত্ব আনন্দদায়ক, জটিল নয়। তারপরও ওর মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না গটিয়ের। এমন সময় নোয়েলের 'না' বলার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। পেয়ে গেল একটা ক্লু। নোয়েলের মাঝে একটা শক্তি আছে যা দুর্নিবার। এই শক্তির কারণে ও যা চায় পেয়ে যায়। ওর ভেতরে এমন কিছু আছে যা এখনও কেউ স্পর্শ করতে পারেনি।

সারাটা দিন একধরনের হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে গেল গটিয়েরের। সে দারুণ আশা নিয়ে সন্ধ্যার অপেক্ষা করছে। সে নোয়েলকে এমনভাবে হতাশ করে তুলবে যাতে নোয়েলের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে।

সে রাতে আবার প্রেম করল ওরা। আগের রাতের চেয়েও ওকে তৃপ্তি দিল নোয়েল। পরদিন সকালে নোয়েলের প্রতি আরো বেশি আকর্ষণ বোধ করতে লাগল গটিয়ের।

নোয়েল আবার গটিয়েরের জন্য সাজিয়ে নিয়ে এল নাস্তা। এবারে বেকন, জ্যাম, ক্রেপস এবং গরম কফি।

'বেশ,' মনেমনে নিজেকে শোনায় গটিয়ের, 'তুমি এক তরুণীকে পেয়ে গেছ যে দেখতে কেবল সুন্দরীই নয়, সে প্রেম করতে জানে, রাঁধতেও পারে। ব্রাভো! কিন্তু একজন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য কি এটাই সব?'

নাটক নিয়ে একটা কথাও বলল না নোয়েল। গটিয়ের আশা করল ব্যাপারটা ও হয় ভুলে গেছে নয়তো পার্ট মুখস্থ করতে পারেনি। সকালে যাবার সময় বলল সন্ধ্যায় গটিয়েরের সঙ্গে ডিনার করবে সে।

'ফিলিপ্পির কবল থেকে মুক্তি পাবে?' জিজ্ঞেস করল গটিয়ের।

'ওকে আমি ছেড়ে চলে এসেছি,' সরল গলায় জবাব দিল নোয়েল। নিজের নতুন ঠিকানা দিল গটিয়েরকে।

রাতটা ওরা আবার একত্রে কাটাল। যখন প্রেম করে না তখন গল্প করে। বলা উচিত কথা বলে গটিয়ের, মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকা পালন করে নোয়েল। নোয়েল তার কথা শুনতে দারুণ আগ্রহী দেখে গটিয়েরও উৎসাহী হয়ে ওঠে। এমন সব বিষয় নিয়ে সে কথা বলে যা বহুবছর কারো সঙ্গে বলেনি। এমনসব

ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলে যা আগে কোনোদিন কাউকে বলেনি। নোয়েল নাটক নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না দেখে মনে মনে নিজেকে অভিনন্দিত করে গটিয়ের। সমস্যার এমন চমৎকার সমাধান!

সে রাতে ডিনার শেষে ওরা বিছানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হল। গটিয়ের পা বাড়াল বেডরুমে।

'এখন না,' বলল নোয়েল।

ঘুরল গটিয়ের। বিস্মিত।

'তুমি বলেছিলে আমার অভিনয় দেখবে।'

'ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ। অবশ্যই,' তোতলাল গটিয়ের, 'তুমি যখন রেডি হবে তখনই দেখব।'

'আমি রেডি।'

মাথা নাড়ল গটিয়ের। 'তুমি আমাকে নাটক পড়ে শোনাবে তা আমি চাই না, চেরি। চাই তুমি মুখস্থ করে সংলাপ বলবে। তাহলেই বুঝতে পারব অভিনেত্রী হিসেবে তোমার দৌড় কদ্দূর।'

'আমি মুখস্থ করে ফেলেছি,' জানাল নোয়েল।

অবিশ্বাস নিয়ে ওকে দেখল গটিয়ের। তিনদিনের মধ্যে গোটা পার্ট এই মেয়ে মুখস্থ করে ফেলেছে। এ তো অসম্ভব!

'শুনবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

না শুনে উপায় কি গটিয়েরের? 'অবশ্যই,' বলল সে। ঘরের মাঝখানে চলে এল সে। 'এটা হবে তোমার মঞ্চ। আর দর্শক এখানে।' সে আরামদায়ক একটা সোফায় বসে পড়ল।

অভিনয় শুরু করল নোয়েল। শিরশির করে উঠল গটিয়েরের গা। প্রকৃত ট্যালেন্টদের মুখোমুখি হলে এরকম অনুভূতি হয় তার। আর নোয়েল প্রকৃত একজন ট্যালেন্ট। খুব ভালো অভিনেত্রী ওকে বলা যাবে না। প্রতিটি নড়াচড়ায় ফুটে উঠছে অনভিজ্ঞতা। তবে ওর মধ্যে দুর্লভ সততা রয়েছে, রয়েছে প্রাকৃতিক প্রতিভা, যে কারণে ওর প্রতিটি সংলাপ প্রক্ষেপণ অর্থবোধক এবং বর্ণিল হয়ে উঠল।

সংলাপ বলা শেষ হল নোয়েলের। উচ্ছ্বসিত গলায় গটিয়ের বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি একদিন তুমি বিখ্যাত অভিনেত্রী হবে, নোয়েল। মন থেকে বলছি। তোমাকে জর্জেস ফেবারের কাছে পাঠাব আমি। সে গোটা ফ্রান্সের মধ্যে সেরা নাট্যগুরু। তার সঙ্গে কাজ করলে তুমি—'

'না।'

বিস্মিত হল গটিয়ের। সেই আগের বারের মতো নরম অথচ কঠিন 'না।' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

'না কেন?' হতবুদ্ধি গটিয়ের। 'ফেবারের কাছে যে-কেউ যেতে পারে না। তোমাকে সে নেবে কারণ আমি পাঠাচ্ছি।'

'আমি তোমার সঙ্গে কাজ করব,' বলল নোয়েল।

খুব রাগ হল গটিয়েরের। 'আমি কাউকে অভিনয় শেখাই না।' ধমকে উঠল সে। 'আমি শিক্ষক নই। আমি পেশাদার অভিনেতাদের নির্দেশনা দিই। তুমি যখন পেশাদার অভিনেত্রী হবে তখন তোমাকেও নির্দেশনা দেব।' রাগ নিয়ন্ত্রণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে গটিয়ের। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল নোয়েল। 'বুঝতে পেরেছি, আরমন্দ।'

'বেশ।'

সন্তুষ্ট হয়ে নোয়েলকে জড়িয়ে ধরল গটিয়ের। নোয়েল উষ্ণ চুমু খেল ওকে। ও অন্য মেয়েদের মতোই। ওকে শাসনে রাখতে হবে। তাহলে আর ওকে নিয়ে সমস্যা নেই।

ওই রাতে ওদের মিলনের আনন্দ আগের রাতগুলোকে ছাড়িয়ে গেল। ঝগড়া করার কারণে উত্তেজিত ছিল দুজনেই, এজন্য মজাটা বেশি পেয়েছে, ভাবল গটিয়ের।

সে নোয়েলকে বলল, 'তুমি সত্যি চমৎকার একজন অভিনেত্রী হবে, নোয়েল। তোমাকে নিয়ে আমি গর্ব করব।'

'ধন্যবাদ, আরমন্দ,' ফিসফিস করল নোয়েল।

পরদিন সকালে নাস্তা বানাল নোয়েল। গটিয়ের গেল নাটকের রিহার্সালে। নোয়েলকে ফোন করল সে ওখান থেকে। কোনো সাড়া পেল না। বাড়ি ফিরে দেখে ঘরে নেই নোয়েল। গটিয়ের ওর ফেরার অপেক্ষায় থাকল। সারারাত দুশ্চিন্তা নিয়ে জেগে রইল। কু ডাক ডাকছে মন— নোয়েলের অ্যাক্সিডেন্ট হল না তো! নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করার চেষ্টা করল। কোনো সাড়া নেই। টেলিগ্রাম পাঠাল। ফেরত এল। নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হয়ে গেল গটিয়ের। অনেকক্ষণ বেল টিপল। কেউ খুলল না দরজা।

গটিয়ের নোয়েলের চিন্তায় পাগল হয়ে গেল। রিহার্সাল পরিণত হল কসাইর দোকানে। সে রিহার্সালের সময় অভিনেতাদের সঙ্গে এমন চেঁচামেচি করতে লাগল যে তার স্টেজ ম্যানেজার বলতে বাধ্য হল রিহার্সাল বন্ধ করার জন্য। রাজি হল গটিয়ের। অভিনেতারা সবাই চলে যাওয়ার পরে সে একাকী বসে রইল মঞ্চে। বোঝার চেষ্টা করছে ওর আসলে কী হল। নিজেকে বোঝাতে চাইল নোয়েল স্রেফ আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো, সস্তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক স্বর্ণকেশী, যে অন্তঃকরণে শপগার্লের চেয়ে উঁচু নয়। এ মেয়ে কিনা তারকা হতে চায়! নোয়েলকে যতভাবে পারে ছোট করতে চাইল গটিয়ের। কিন্তু কোনোই লাভ হল না। বুঝতে পারছে নোয়েলকে তার পেতে হবে।

সে রাতে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল গটিয়ের। তাকে চিনতে পারার সুযোগ নেই এমন ছোট বার-এ ঢুকে আকণ্ঠ মদ গিলল। কীভাবে নোয়েলের খোঁজ পাওয়া যায় ভাবল বারবার। কিন্তু কোনো রাস্তা খুঁজে পেল না। ফিলিপ্পি সোরেল ছাড়া নোয়েলের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার মতো অন্য কাউকে চেনে না গটিয়ের। কিন্তু ওই লোকের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

নোয়েল অদৃশ্য হবার এক হপ্তা বাদে, আরমন্দ গটিয়ের সকাল চারটায় তার বাসায় হাজির হল। মাতাল। দরজা খুলে লিভিংরুমে ঢুকল। সবগুলো আলো জ্বলছে। নোয়েল একটা আরামকেদারায় পা মুড়ে বসে বই পড়ছে। পরনে গটিয়েরের একটা রোব। গটিয়েরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে। হাসল।

'হ্যালো, আরমন্দ।'

গটিয়ের নিষ্পলক তাকিয়ে রইল নোয়েলের দিকে। ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে কলজে, অসীম স্বস্তি অনুভব করছে সে, সুখের বন্যায় যেন ভেসে যাচ্ছে। বলল, 'কাল থেকে আমরা কাজ শুরু করব।'

ক্যাথেরিন
ওয়াশিংটন : ১৯৪০

৫

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের কাছে ওয়াশিংটন ডিসিকে মনে হচ্ছে সবচে' উত্তেজক নগরী। শিকাগো তার মনে হত হার্টল্যান্ড, কিন্তু ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র। শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। রাস্তায় নানান রঙের উর্দি দেখে খুবই অবাক হয়েছে ক্যাথেরিন। আর্মি, নেভি এয়ার কর্পস, মেরিন। প্রথমবারের মতো ক্যাথেরিন উপলব্ধি করতে পারছে যুদ্ধের বাস্তবতা।

ওয়াশিংটনে যুদ্ধের শারীরিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায় সর্বত্র। এখানেই যেন শুরু হবে লড়াই। এখানে যুদ্ধের ঘোষণা করা হবে, সংগঠিত হবে বাহিনী, গ্রহণ করা হবে চূড়ান্ত পরিকল্পনা। এ শহরের হাতে রয়েছে বিশ্বের নিয়তি। আর সে, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার তার অংশ হতে চলেছে।

সুসি রবার্টসের কাছে উঠেছে ক্যাথেরিন। চারতলায় একটি চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে সুসি। বাড়ির লিভিংরুমটা বেশ বড়সড়। তার সঙ্গেই রয়েছে ছোট দুটি বেডরুম, ছোট একটি বাথরুম এবং রান্নাঘর। সুসি ক্যাথেরিনকে দেখে খুবই খুশি। প্রথমেই সে বলল, 'জলদি সুটকেস খুলে তোমার সেরা ড্রেসটা পরে নাও। আজ রাতে ডিনার আছে।'

চোখ পিটপিট করল ক্যাথেরিন, 'কে এত জলদি তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দিল?'

'ক্যাথি, এটা ওয়াশিংটন। এখানে নিঃসঙ্গ পুরুষের সংখ্যা খুব বেশি।'

ওরা প্রথম ডিনার করল উইলার্ড হোটেলে। সুসির ডেট হলেন ইন্ডিয়ানার একজন কংগ্রেসম্যান, আর ক্যাথেরিনের ডেট অরিগন রাজ্যের একজন লবিয়িস্ট। দুজনই ওয়াশিংটনে আছেন স্ত্রীকে ছাড়া। ডিনার শেষে ওরা ওয়াশিংটন কান্ট্রি ক্লাবে গেল নাচতে। ক্যাথেরিন আশা করল লবিয়িস্ট ওকে কোনো কাজটাজ জুটিয়ে দেবেন। বদলে সে একটি গাড়ি এবং নিজের অ্যাপার্টমেন্টের প্রস্তাব পেল। ধন্যবাদের সাথে

এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ক্যাথেরিন।

সুসি কংগ্রেসম্যানকে নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, ক্যাথেরিন শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিছুক্ষণ পরে শুনল ওরা সুসির বেডরুমে যাচ্ছে। একটু বাদেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আপত্তি তুলতে লাগল সুসির খাট। শব্দটা আড়াল করতে মাথার ওপর বালিশ চেপে রাখল ক্যাথেরিন। কিন্তু শব্দ থামানো গেল না। কল্পনায় দেখল সুসি তার ডেটের সঙ্গে উন্মাদ হয়ে উঠেছে বিছানায়।

পরদিন সকালে ক্যাথেরিন ঘুম ভেঙে দেখে আগেই বিছানা ছেড়েছে সুসি। তাকে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত লাগছে। কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত।

কদিন পরে নাস্তার টেবিলে সুসি বলল, 'একটা চাকরির খবর আছে। তুমি ইচ্ছে করলে করতে পারো কাজটা। কাল রাতের পার্টিতে একটি মেয়ে বলল সে চাকরি ছেড়ে টেক্সাস চলে যাচ্ছে। ঈশ্বর জানেন টেক্সাস ছেড়ে আসা মানুষ আবার কেন ওখানে ফিরে যেতে চায়। আমি ক' বছর আগে আমোরিল্লো ছিলাম। সেখানে...'

'ও কী কাজ করত?' বাধা দিল ক্যাথেরিন।

'কে?'

'মেয়েটা,' ধৈর্য নিয়ে বলল ক্যাথেরিন।

'অহ্, ও বিল ফ্রেজারের অধীনে কাজ করত। বিল ফ্রেজার স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাবলিক রিলেশনের দায়িত্বে আছেন। নিউজউইক গত মাসে তাঁর ওপরে প্রচ্ছদ করেছে। মনে হচ্ছে সহজ এবং আরামের চাকরি। কাল রাতেই শুনলাম খবরটা। তুমি যদি আজই যেতে পারো, অন্য মেয়েদের আগেই কাজটা বাগিয়ে নিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল ক্যাথেরিন, 'উইলিয়াম ফ্রেজার, আমি আসছি।'

কুড়ি মিনিট বাদে স্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ক্যাথেরিন। গার্ড ওকে ফ্রেজারের অফিস দেখিয়ে দিল। এলিভেটরে চেপে ওপরে চলে এল ও। *পাবলিক রিলেশন্স। এরকম কাজই তো খুঁজছে ক্যাথেরিন।*

করিডরে, অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। আয়নায় একবার দেখে নিল মেকআপ ঠিকঠাক আছে কিনা। চলবে। এখনো সাড়ে নটা বাজেনি। নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি কেউ আসেনি। ক্যাথেরিন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

আউটার অফিসে গিজগিজ করছে মেয়ে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বা বসে রয়েছে, কয়েকজন দেয়ালে হেলান দেয়া। একসঙ্গে সবাই যেন কথা বলছে। ডেস্কের পেছনে বসা রিসেপশনিস্ট খামোকাই ওদেরকে চুপ করতে বলছে। কেউ শুনছে না তার কথা। 'মি. ফ্রেজার এ মুহূর্তে খুব ব্যস্ত আছেন,' ক্রমাগত ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে রিসেপশনিস্ট। 'কখন আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন জানি না।'

'উনি সেক্রেটারি নিচ্ছেন নাকি নিচ্ছেন না?' ঘেউ করে উঠল একটা মেয়ে।

'হ্যাঁ, কিন্তু...' সে হতাশ হয়ে চোখ বুলাল মেয়েদের দঙ্গলে।

'মাই গড! এ স্রেফ হাস্যকর।'

করিডরের দরজা খুলে গেল। ক্যাথেরিনকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে আরো তিনটি মেয়ে ঢুকল।

'চাকরিটা কেউ পেয়ে গেছে?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'উনি যদি একটা হারেম খুলে বসেন তাহলে আমাদের সবার চাকরি হয়ে যাবে,' মন্তব্য করল আরেকজন।

ভেতরের অফিসের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন একজন লোক। ছয় ফুটের কম হবেন উচ্চতায়। হপ্তায় তিন দিন অ্যাথলেটিক ক্লাবে গিয়ে মোটামুটি সুঠাম একটি শরীর ধরে রেখেছেন। তার কোঁকড়ানো সোনালি চুল চাঁদির কাছে ধূসর রঙ ধরেছে। উজ্জ্বল নীল চোখ। শক্ত চোয়াল।

'এখানে এত চেঁচামেচি কিসের, স্যালি?' তাঁর কণ্ঠ ভরাট এবং কর্তৃত্বসুলভ।

'কর্ম খালির খবর জেনে গেছে এরা, মি. ফ্রেজার।'

'যিশাস! আমি নিজেই মাত্র একঘণ্টা আগে জানতে পারলাম খবরটা।' সারা ঘরে চোখ বুলালেন তিনি। নজর আটকে গেল ক্যাথেরিনের ওপর। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'আমি সেক্রেটারি হব' স্টাইলের উষ্ণ একটি হাসি উপহার দিল। কিন্তু তাকে ছুঁয়ে দৃষ্টি ফিরে গেল রিসেপশনিস্টের কাছে। 'আমার 'লাইফ'-এর একটা কপি দরকার,' বললেন তিনি। 'তিন/চার হপ্তা আগে বেরিয়েছে সংখ্যাটা। প্রচ্ছদে স্ট্যালিনের ছবি।'

'আমি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি, মি. ফ্রেজার,' বলল রিসেপশনিস্ট।

'আমার ওটা এখুনি দরকার,' নিজের অফিসে পা বাড়ালেন তিনি।

'আমি টাইম-লাইফ ব্যুরোতে ফোন করছি,' জানাল রিসেপশনিস্ট। 'দেখি ওরা একটা কপি যোগাড় করে দিতে পারে কিনা।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন ফ্রেজার। 'স্যালি, সিনেটর বোরাহ্ লাইনে আছেন। তাঁকে ওই সংখ্যা থেকে একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে শোনাতে হবে। দুই মিনিটের মধ্যে আমার কপি চাই।' তিনি ঢুকে পড়লেন অফিসে, বন্ধ করে দিলেন দরজা।

ঘরভর্তি মেয়েরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। ক্যাথেরিন দ্রুত কী যেন ভাবছে। ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

'ভালো। একজন কমল,' বলল একটা মেয়ে।

রিসেপশনিস্ট ফোন তুলে তথ্য বিভাগে যোগাযোগ করল। 'টাইম-লাইফ ব্যুরোর নাম্বারটা দিন।' বলল সে। ঘরে নীরবতা নেমে এসেছে। সবাই তাকে লক্ষ করছে। 'ধন্যবাদ।' রিসিভার রেখে দিল সে। আবার তুলে ডায়াল করল।

'হ্যালো, স্টেট ডিপার্টমেন্টে মি. উইলিয়াম ফ্রেজারের অফিস থেকে বলছি। মি.

ফ্রেজারের লাইফ-এর গত সংখ্যাটা এখুনি দরকার। প্রচ্ছদে স্টালিনের ছবি... আপনারা পুরানো সংখ্যা রাখেন না? তাহলে কার সঙ্গে কথা বলব আমি?... আচ্ছা। ধন্যবাদ।' ফোন রেখে দিল সে।

'কপাল মন্দ, হানি,' মন্তব্য করল একটি মেয়ে।

আরেকজন যোগ করল, 'উনি আজ রাতে আমার বাসায় এলে তাঁকে পত্রিকাটা পড়ে শোনাব,' তার কথায় হেসে উঠল অন্যরা।

বেজে উঠল ইন্টারকম। স্যালি ইন্টারকমের বোতাম টিপে দিল।

'তোমার দু মিনিট শেষ হয়ে গেছে,' বলল ফ্রেজারের কণ্ঠ। 'পত্রিকা কই?'

বুক ভরে দম নিল রিসেপশনিস্ট। 'আমি এইমাত্র লাইফ-টাইম ব্যুরোর সঙ্গে কথা বললাম, মি. ফ্রেজার। বলল যত দ্রুত সম্ভব ওরা...'

ঠাস করে খুলে গেল দরজা। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ক্যাথেরিন। হাতে 'লাইফ' পত্রিকা, প্রচ্ছদে স্টালিনের ছবি। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে। রিসেপশনিস্টের হাতে দিল পত্রিকা। অবিশ্বাস নিয়ে পত্রিকার দিকে তাকিয়ে থাকল রিপেশনিস্ট। 'আ... আমি একটা সংখ্যা পেয়ে গেছি, মি. ফ্রেজার। এখুনি নিয়ে আসছি।' সে আসন ছেড়ে সিধে হল, ক্যাথেরিনকে কৃতজ্ঞ একটা হাসি দিল, তারপর দ্রুত কদমে ঢুকে পড়ল ফ্রেজারের অফিসে। ঘরভর্তি মেয়েরা বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগল ক্যাথেরিনকে।

পাঁচ মিনিট পরে ফ্রেজারের অফিসের দরজা খুলে গেল। আবির্ভূত হলেন ফ্রেজার এবং রিসেপশনিস্ট। রিসেপশনিস্ট আঙুল তুলে দেখাল ক্যাথেরিনকে। 'ওই মেয়েটা।'

উইলিয়াম ফ্রেজার ঘুরলেন ক্যাথেরিনের দিকে। 'একবার অফিসে আসবে, প্লিজ?'

'জি, স্যার।' ফ্রেজারের পেছন পেছন তার অফিসে ঢুকে পড়ল ক্যাথেরিন। অনুভব করল চাউনি দিয়ে ওকে ভস্ম করার চেষ্টা করছে অন্য মেয়েগুলো। দরজা বন্ধ করে দিলেন ফ্রেজার।

তাঁর অফিসকক্ষ টিপিকাল, ব্যুরোক্রেটিক ওয়াশিংটন অফিস। তবে তিনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী ঘরটি সাজিয়েছেন। প্রতিটি আসবাবে তাঁর সুরুচির পরিচয় সুস্পষ্ট।

'বসো, মিস...'

'আলেকজান্ডার, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।'

'স্যালি বলল লাইফ ম্যাগাজিনটা তুমিই নিয়ে এসেছ।'

'জি, স্যার।'

'তুমি নিশ্চয় তিন হপ্তার পুরানো সংখ্যাটা পার্সে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে না।'

'না, স্যার।'

'তাহলে এত জলদি এটা যোগাড় করলে কীভাবে?'

'আমি নাপিতের দোকানে গিয়েছিলাম। নাপিতের দোকান আর দাঁতের চেম্বারে সবসময় পুরোনো সংখ্যা পড়ে থাকে।'

'আচ্ছা,' হাসলেন ফ্রেজার। তার কঠিন মুখটাকে কম ভয়ংকর মনে হল। 'আমার মাথায় এ বুদ্ধি আসত বলে মনে হয় না,' বললেন তিনি। 'তোমার মাথায় বুঝি অনেক বুদ্ধি?'

রন পিটারসনের কথা মনে পড়ল ক্যাথেরিনের। 'না, স্যার। তেমন বুদ্ধি নেই।'

'তুমি সেক্রেটারির চাকরি খুঁজছ?'

'ঠিক তা নয়,' ক্যাথেরিন দেখল বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে ফ্রেজারের চেহারায়। 'আমি চাকরিটা করতে চাইছি স্রেফ আপনার সহকারী হিসেবে কাজ করার লোভে।'

'সেক্রেটারি কাজটা আজকেই শুরু করে দাও না কেন?' নীরস গলায় বললেন ফ্রেজার। 'কাল আমার সহকারী হবে।'

আশা নিয়ে তাঁর দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। 'আমি কি চাকরিটা পাচ্ছি?'

'ট্রায়ালে থাকবে,' ইন্টারকমের বোতাম টিপে বক্সের ওপর ঝুঁকলেন তিনি। 'স্যালি, তুমি মেয়েদেরকে বলে দাও কর্ম আর খালি নেই। শূন্যস্থান পূরণ হয়ে গেছে।'

'জি, আচ্ছা, মি. ফ্রেজার।'

ক্যাথেরিনের দিকে তাকালেন ফ্রেজার। 'হপ্তায় ত্রিশ ডলার চলবে?'

'ওহ্, হ্যাঁ, স্যার। ধন্যবাদ, মি. ফ্রেজার।'

'কাল সকাল নটা থেকে তোমার কাজ শুরু। স্যালি তোমাকে একটা পারসোনেল ফর্ম দেবে। ওটা পূরণ করে দিও।'

অফিস থেকে বের হয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট-এ চলে এল ক্যাথেরিন। লবির ডেস্কে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ওকে ভেতরে যেতে বাধা দিল।

'আমি উইলিয়াম ফ্রেজারের পার্সোনাল সেক্রেটারি,' গলায় গর্ব ফুটিয়ে বলল ক্যাথেরিন, 'স্টেট ডিপার্টমেন্টের। আমি কিছু তথ্য জানার জন্য এসেছি।'

'কী ধরনের তথ্য?'

'উইলিয়াম ফ্রেজারের ওপরে।'

একমুহূর্তে ওকে পরখ করল পুলিশের লোকটা। 'আপনার বস্ কি আপনাকে বিরক্ত করছে?'

'না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'আমি তার ওপরে একটা লেখা লিখব।'

পাঁচ মিনিট বাদে এক ক্লার্ক ক্যাথেরিনকে তাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে এল। পড়া শুরু করল ও।

একঘণ্টা পরে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম ফ্রেজার সম্পর্কে

যাবতীয় তথ্য পেয়ে গেল ক্যাথেরিন। ফ্রেজারের বয়স পঁয়তাল্লিশ, প্রিন্সটন থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন, ফ্রেজার অ্যাসোসিয়েটস নামে একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন। অত্যন্ত সফল এজেন্সি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে ফ্রেজার অ্যাসোসিয়েটস। সরকারের জন্য কাজ করতে প্রেসিডেন্টের অনুরোধে নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে একবছরের জন্য ছুটি নিয়েছেন। লিডিয়া ক্যাম্পিয়ন নামে এক ধনবতীকে বিয়ে করেছিলেন। লিডিয়ার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে চারবছর হল। তাদের কোনো সন্তান নেই। ফ্রেজার একজন কোটিপতি, জর্জটাউনে তাঁর একটি বাড়ি আছে, বার হার্বারে রয়েছে সামার প্লেস। তাঁর শখ টেনিস, বোটিং এবং পোলো। অনেক পত্রিকাই তাঁকে 'আমেরিকার সবচে যোগ্য ব্যাচেলর' হিসেবে অভিহিত করেছে।

ক্যাথেরিন বাড়ি ফিরে সুসংবাদটা জানাল সুসিকে। সুসি খবরটা সেলিব্রেট করার প্রস্তাব দিল। শহরে দুজন ধনী অ্যানাপোলিস ক্যাডেট এসেছে।

ক্যাথেরিনের ডেট হাসিখুশি, সুদর্শন একটি ছেলে। তবে সারা সন্ধ্যা সে ছেলেটির সঙ্গে উইলিয়াম ফ্রেজারের তুলনা করতে গিয়ে দেখল ফ্রেজারের কাছে এ ছেলে কিছুই না। ক্যাথেরিন ভাবল : ও কি ওর নতুন বসের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে? ফ্রেজারকে মানুষ হিসেবে পছন্দ করে ফেলেছে সে, তাঁর প্রতি তৈরি হয়েছে একটা শ্রদ্ধাবোধ।

ক্যাডেটরা দুই বান্ধবীকে নিয়ে গেল ওয়াশিংটনের বাইরে, ছোট একটি ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে। সেখানে চমৎকার ডিনার সারল ওরা। তারপর গেল 'আর্সেনিক অ্যান্ড ওল্ড লেস' দেখতে। ছবিটি খুব উপভোগ করল ক্যাথেরিন। রাতে ওদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিল দুই ক্যাডেট। সুসি ওদেরকে একটু বিশ্রাম নেয়ার আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু ওরা রাতটা এখানেই থেকে যাওয়ার মতলব করেছে দেখে ক্যাথেরিন বলল তার ক্লান্ত লাগছে, সে শুতে যাবে।

আপত্তি জানাল সুসি। 'এখনো তো শুরুই করিনি। এত তাড়াতাড়ি কেউ ঘুমাতে যায় নাকি?' সে তার ডেটের সঙ্গে কাউচে জড়াজড়ি করতে লাগল।

ক্যাথেরিনের ডেট ওর হাত ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'শিগগিরই একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে,' সে বাধা দেয়ার আগেই হাতটা চেপে ধরল দুই উরুর ফাঁকে। লোহার মতো শক্ত হয়ে আছে ওখানটা। ক্যাথেরিন হাত ছাড়িয়ে নিল। রেগে উঠতে গিয়েও নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। সোজা পা বাড়াল বেডরুমে। ঢুকল ঘরে। ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজা। তবে ঘুম আসছিল না ওর। মনে পড়ছে উইলিয়াম ফ্রেজারের কথা। কিছুক্ষণ পরে সুসির খাট এমন জোরে নড়তে শুরু করল, ঘুম আসা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় নতুন অফিসে হাজির হয়ে গেল ক্যাথেরিন। দরজা খোলা। রিসেপশন অফিসের আলো জ্বলছে। অফিস থেকে ভেসে এল পুরুষকণ্ঠ। ভেতরে ঢুকল ক্যাথেরিন।

উইলিয়াম ফ্রেজার ডেস্কে বসে মেশিনে ডিকটেশন দিচ্ছেন। ক্যাথেরিনকে দেখে বন্ধ করে দিলেন যন্ত্র। 'খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়েছ দেখছি।' বললেন তিনি।

'কাজ শুরু করার আগে সবকিছু একটু বুঝে নিতে চাইছি।'

'বসো,' ফ্রেজারের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, বিস্ময়বোধ করল কাথেরিন। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। বসল ক্যাথেরিন। 'আমি অপরের নাক গলানো পছন্দ করি না, মিস আলেকজান্ডার।'

লাল হয়ে গেল ক্যাথেরিনের চেহারা, 'আ-আমি বুঝতে পারলাম না।'

'ওয়াশিংটন ছোট শহর। এটা ঠিক শহরও নয়। গ্রাম। এখানে যা ঘটে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই তা জেনে যায়।'

'আমি এখনো ঠিক—'

'ওয়াশিংটন পোস্ট-এর অফিসে তুমি যাওয়ার দুই মিনিট পরে প্রকাশক আমাকে ফোন করেছিলেন। জানতে চেয়েছেন আমার সেক্রেটারি আমার ব্যাপারে কেন গবেষণা করছে।'

বিমূঢ় হয়ে বসে থাকল ক্যাথেরিন, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

'আমার সম্পর্কে যেসব গসিপ জানা দরকার তা জেনে নিয়েছ?'

বিব্রতকর অনুভূতিটা দ্রুত রূপ নিল ক্রোধে। 'আমি আপনার ব্যাপারে নাক গলাইনি,' বলল ক্যাথেরিন। দাঁড়িয়ে গেছে চেয়ার ছেড়ে। 'আমি আপনার সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছি শুধু এ কারণে যে বুঝতে চেয়েছি কার সঙ্গে আমি কাজ করতে যাচ্ছি।' রাগে কাঁপছে গলা। 'আমি মনে করি একজন ভালো সেক্রেটারির উচিত তার চাকরিদাতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া।'

ফ্রেজার বসে আছে, থমথমে মুখ।

ক্যাথেরিন কটমট করে তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে, লোকটার প্রতি ঘৃণা হচ্ছে তার, অশ্রুতে টলমল করছে চোখ, বলল, 'আপনাকে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, মি. ফ্রেজার। আমি ছেড়ে দিচ্ছি চাকরি।' ঘুরল ও, পা বাড়াল দরজায়।

'বসো,' চাবুকের মতো হিসিয়ে উঠল ফ্রেজারের কণ্ঠ। ফিরল ক্যাথেরিন। 'আমি নাটুকেপনা একদম সহ্য করতে পারি না।'

জ্বলে উঠল ক্যাথেরিনের চোখ। 'আমি নাটক করিনি...'

'ঠিক আছে। আমি দুঃখিত। এখন দয়া করে বসবে?' ডেস্ক থেকে পাইপ তুলে নিলেন তিনি। ধরালেন।

দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাথেরিন, বুঝতে পারছে না কী করবে। নিজেকে খুব অপমানিত লাগছে। 'মনে হয় না এতে কোনো কাজ হবে,' বলতে গেল ও। 'আমি...'

পাইপে টান দিলেন ফ্রেজার, ফুঁ দিয়ে নেভালেন দেশলাই।

'অবশ্যই কাজ হবে, ক্যাথেরিন,' দৃঢ় গলায় বললেন, 'তুমি এখন চাকরি

ছাড়তে পারবে না। নতুন একটা মেয়েকে নিয়ে কীরকম ঝামেলায় পড়েছি দেখতেই পাচ্ছ।'

তাঁর উজ্জ্বল নীল চোখে কৌতুক ঝিকিয়ে উঠতে দেখল ক্যাথেরিন। তিনি হাসলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্যাথেরিনের ঠোঁট বেঁকে গেল হাসির ভঙ্গিতে। চেয়ারে বসল সে।

'তোমাকে কি কেউ বলেছে তুমি বড্ড বেশি আবেগী?'

'বলেছে। আমি দুঃখিত।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিলেন ফ্রেজার। 'কিংবা আমি ওভারসেনসিটিভ। 'বিশ্বের সেরা ব্যাচেলর-এর তকমা পাছায় নিয়ে চলাফেরা খুব যন্ত্রণার।'

এ লোকের মুখে 'পাছা' শব্দটা মোটেই মানায় না। ফ্রেজার বলে চললেন, 'আমি হয়ে উঠেছি প্রতিটি নির্বোধ অবিবাহিত নারীর টার্গেট। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না মেয়েরা কতটা আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে।'

ও নিজেই কি আগ্রাসী নয়? ভাবল ক্যাথেরিন। লাল হয়ে উঠল চেহারা।

'তোমার কথা বলো। তোমার বয়ফ্রেন্ড নেই?'

'না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'বিশেষ কেউ নেই,' যোগ করল দ্রুত। কৌতূহল নিয়ে ক্যাথেরিনকে দেখলেন ফ্রেজার। 'তুমি থাকো কোথায়?'

'আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করি। ও আমার কলেজজীবনের বন্ধু।'

'নর্থওয়েস্টার্ন।'

অবাক হয়ে ফ্রেজারের দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। বুঝতে পারল ভদ্রলোক ওর জীবনবৃত্তান্ত পড়ে এ তথ্য জেনেছেন।

'জি, স্যার।'

'তোমাকে আমি নিজের সম্পর্কে একটা কথা বলি যা খবরের কাগজে পাবে না। আমি প্রচণ্ড কাজ-পাগল একজন মানুষ। আমি পারফেকশনিস্ট। আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুব কঠিন। তুমি পারবে?'

'চেষ্টা করব,' বলল ক্যাথেরিন।

'বেশ। স্যালি তোমার কাজ বুঝিয়ে দেবে। তোমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে আমি ভয়ানক কফিখোর মানুষ। আর আমার গরম, ব্ল্যাক কফি পছন্দ।'

'মনে রাখব,' আসন ছাড়ল ক্যাথেরিন, এগোল দরজার দিকে।

যেমনটি আশা করেছিল সাক্ষাৎটা তেমন হয়নি। উইলিয়াম ফ্রেজারকে আর ভালো লাগছে না ক্যাথেরিনের। এ হল ফিটফাট কর্তৃত্বপরায়ণ, দুর্বিনীত, বর্বর। এজন্যই তো এ লোককে তার স্ত্রী ছেড়ে চলে গেছে। নাহ্, এখানে কাজ করা পোষাবে না ক্যাথেরিনের। নতুন চাকরি খুঁজতে হবে ওকে। উৎপীড়কের বদলে একজন মানুষের কাছে কাজ খুঁজে নেবে ও।

ক্যাথেরিনকে দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে দেখলেন ফ্রেজার। চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। ঠোঁটে এখনো লেগে আছে হাসি। ক্যাথেরিন যখন রাগে ফুঁসছিল, থরথর করে কাঁপছিল অধর, ফ্রেজারের তখন ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে ওকে আশ্বস্ত করেন তাঁর কাছে সে যথেষ্ট নিরাপদ। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি এ মেয়েটির একধরনের প্রাচীন ঔজ্জ্বল্য রয়েছে যা আজকালকার মেয়েদের মাঝে নেই বললেই চলে। মেয়েটি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নিঃসন্দেহে এ মেয়ে সেক্রেটারি হিসেবে দারুণভাবে উতরে যাবে। ফ্রেজারের মনে হচ্ছে এ মেয়ে অনেক বড় হবে।

ফ্রেজারের পাইপ নিভে গিয়েছিল। তিনি ওটা আবার জ্বালালেন। হাসিটা এখনো ধরে রেখেছেন মুখে। একটু পরে ডেকে পাঠালেন ক্যাথেরিনকে। ক্যাথেরিন সৌজন্য দেখাতে ভুল করল না। তবে চেহারায় ভাবলেশহীন একটা ভাব ধরে রাখল। সে ভাবছিল ফ্রেজার তাকে ব্যক্তিগত কিছু বলার চেষ্টা করলেও সে ফুঁসে উঠবে। কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেলেন না ফ্রেজার। তিনি এখন দূরের মানুষ, সফল ব্যবসায়ীদের মতো। ক্যাথেরিন ভাবল ফ্রেজার নিশ্চয় সকালের ঘটনাটা মন থেকে দূর করে দিয়েছেন।

চাকরিটা ভালোই লাগল ক্যাথেরিনের। একের পর এক বাজতে লাগল ফোন। যেসব মানুষ ফোন করলেন তাঁদের পরিচয় জেনে রীতিমতো রোমাঞ্চিত ক্যাথেরিন। প্রথম হপ্তায় দুদিন ফোন করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফোন এল আধডজন সিনেটরের, সেক্রেটারি অভ স্টেট এবং প্রখ্যাত এক অভিনেত্রীর যিনি শহরে এসেছেন তাঁর লেটেস্ট ছবির পাবলিসিটির জন্য। তবে হপ্তার সবচেয়ে উত্তেজক ফোনটি ছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের। ক্যাথেরিন এমন নার্ভাস হয়ে যায়, হাত থেকে ফোনই পড়ে গিয়েছিল।

ওইসব ফোন ছাড়াও ফ্রেজারকে অফিসে প্রচুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে হল। কান্ট্রি ক্লাব কিংবা সুপরিচিত কোনো রেস্টুরেন্টে তাঁকে যেতে হল। কয়েক হপ্তা বাদে ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে তাঁর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার অনুমতি দিলেন। ক্যাথেরিন রেস্টুরেন্টগুলোতে রিজার্ভেশনও করল। সে জানতে শুরু করল কার সঙ্গে ফ্রেজার দেখা করতে চান আর কাকে এড়িয়ে চলতে আগ্রহী। কাজে এমন মগ্ন থাকল ক্যাথেরিন, নতুন চাকরি খোঁজার কথা ভুলেই গেল।

ক্যাথেরিনের সঙ্গে ফ্রেজারের সম্পর্ক এখনো নিতান্তই অ-ব্যক্তিগত পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে ক্যাথেরিন তাঁকে এতটাই চিনে ফেলেছে যে বুঝতে পেরেছে এই লোকের ঔদাসীন্য শত্রুভাবাপন্ন নয়। এ হল উৎকর্ষ, নিজেকে আড়াল করে রাখার একটা দেয়াল। ক্যাথেরিন বুঝতে পারে ফ্রেজার আসলে খুব একা। চাকরির খাতিরে তাঁকে অনেকের সঙ্গে মিশতে হয়, তবে এমনিতে তিনি খুব নিঃসঙ্গ। ক্যাথেরিন এও বুঝতে পেরেছে উইলিয়াম ফ্রেজার তার নাগালের বাইরে। অবশ্য আমেরিকার

বেশিরভাগ পুরুষই তো আমার নাগালের বাইরে, ভাবে ক্যাথেরিন।

সুসির সঙ্গে মাঝে মাঝে পার্টিতে যায় ক্যাথেরিন। কিন্তু তার বেশিরভাগ সঙ্গীই বিবাহিত, সেক্সুয়াল অ্যাথলেট। এদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেয়ে একা একা সিনেমা কিংবা থিয়েটারে যেতে পছন্দ করে ক্যাথেরিন।

এক রাতে হ্যামলেট দেখতে গিয়ে ফ্রেজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। তিনি একটা বক্সে বসে আছেন। সঙ্গে সাদারঙের অত্যন্ত দামি গাউন পরা এক সুন্দরী। এ গাউনের ছবি ভোগ-এর পাতায় দেখেছে ক্যাথেরিন। মেয়েটিকে চিনতে পারল না ক্যাথেরিন। ফ্রেজার তার ব্যক্তিগত ডেট সম্পর্কে কখনো কিছু বলেন না। ফলে ক্যাথেরিনের জানার সুযোগ নেই তিনি কখন, কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন। নাট্যমঞ্চের দিকে তাকাতেই ক্যাথেরিনকে দেখে ফেললেন ফ্রেজার। পরদিন সকালে ডিকটেশন শেষ করার আগ পর্যন্ত এ বিষয় নিয়ে একটা কথাও বললেন না তিনি।

'হ্যামলেট কেমন লাগল?' ডিকটেশন শেষে জানতে চাইলেন ফ্রেজার।

'নাটকটার গল্প ভালো লাগে আমার তবে অভিনেতাদের নয়।'

'আমার কিন্তু ওদের অভিনয় ভালোই লাগে,' বললেন তিনি।

'ওফেলিয়ার ভূমিকায় যে মেয়েটি অভিনয় করছে সে তো অপূর্ব।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন, চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

'ওফেলিয়াকে তোমার ভালো লাগে না?' জানতে চাইলেন ফ্রেজার।

'যদি সত্যিকারের মন্তব্য চান,' সতর্কতার সাথে বলল ক্যাথেরিন, 'বলব খুব উঁচুমানের অভিনেত্রী সে নয়।' চলে গেল ও।

সে রাতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ক্যাথেরিন দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে সুসি। 'তোমার একজন দর্শনার্থী এসেছিল।' জানাল সে।

'কে?'

'এফবিআই। তোমার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিল।'

মাই গড, ভাবল ক্যাথেরিন, *ওরা নিশ্চয় জেনে গেছে আমি কুমারী। এবং সম্ভবত ওয়াশিংটনে কুমারীদের ব্যাপারে আইনী বিধিনিষেধ আছে।* উঁচু গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এফবিআই আমার ব্যাপারে খোঁজ নেবে কেন?'

'কারণ তুমি এখন সরকারি চাকরি করছ তাই।'

'আচ্ছা।'

'তোমার মি. ফ্রেজার কেমন আছে?'

'আমার মি. ফ্রেজার ভালো আছেন,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

'ওনার কি আমাকে পছন্দ হবে?'

ক্যাথেরিন তার লম্বা, সুগঠিত শরীরের কৃষ্ণকেশী রুমমেটকে পরখ করল। 'প্রাতরাশের জন্য।'

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ক্যাথেরিন। কাছেপিঠের অফিসের অন্যান্য সেক্রেটারিদের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। অনেক মেয়েরই তাদের বসদের সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে, মানুষটি একা নাকি বিবাহিত তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গে কাজ করে বলে তারা ঈর্ষা করে ক্যাথেরিনকে।

'গোল্ডেন বয়টি আসলে কীরকম?' একদিন লাঞ্চে এদের একজন জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিনকে। 'তোমাকে কোনো ইঙ্গিত-টিঙ্গিত দেয়নি?'

'উনি ইঙ্গিত-টিঙ্গিতের ধার ধারেন না,' গম্ভীর গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'আমি প্রতিদিন সকাল নটায় অফিসে আসি, বেলা একটা পর্যন্ত দুজনে কাউচে গড়াই, তারপর লাঞ্চের বিরতি দিই।'

'ধ্যাৎ, সত্যি করে বলোতো উনি কীরকম?'

'সহ্য করার মতো,' বলল ক্যাথেরিন। প্রথমদিনের সংঘাতের পরে উইলিয়াম ফ্রেজারের প্রতি ওর আকর্ষণ আরো বেড়েছে। ফ্রেজার বলেছেন তিনি পারফেকশনিস্ট। একবিন্দু মিথ্যা বলেননি। ক্যাথেরিন কোনো ভুল করলেই বকা খায়। তবে মানুষটা সৎ এবং মানুষকে বুঝতে পারে। ক্যাথেরিন লক্ষ করেছে ফ্রেজার নিজের সমস্যা থাকলেও কেউ তাঁর সাহায্য চাইলে সাহায্য করতে দ্বিধা করেন না। এমন সব মানুষকে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন যাদের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছুই পাবার নেই। কিন্তু এজন্য ফ্রেজার কখনো বাহবা নেন না। হ্যাঁ, ক্যাথেরিন ফ্রেজারকে খুব পছন্দ করে। তবে সেটা একান্তই ক্যাথেরিনের ব্যাপার, অন্য কারো নয়।

একবার ভয়ানক কাজের চাপ পড়ে গেল অফিসে। সারাদিন কাজ করেও কুলিয়ে ওঠা গেল না। ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে তার বাড়িতে ডিনার করতে বললেন। ডিনার শেষে শেষ করবেন বাকি কাজ। ফ্রেজারের শোফার টালমাজ ভবনের সামনে লিমুজিন নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বিল্ডিং থেকে অন্যান্য মেয়েরা বেরিয়ে দেখল ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে নিয়ে গাড়ির পেছনের আসনে উঠে বসেছেন। তাদের ঠোঁটে অর্থবোধক হাসি ফুটল। শেষ বিকেলের গাড়ির ভিড় ঠেলে মসৃণগতিতে চলতে লাগল লিমুজিন।

'আপনার সুখ্যাতির আমি বারোটা বাজাতে চলেছি,' বলল ক্যাথেরিন।

হেসে উঠলেন ফ্রেজার। 'তোমাকে কিছু পরামর্শ দিই। কখনো পাবলিক ফিগারের সঙ্গে প্রেম করতে চাইলে, খোলা জায়গায় করবে।'

'ঠাণ্ডা লেগে গেলে?'

মুচকি হাসলেন তিনি। 'পাবলিক প্লেসগুলোতে যাবে—বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট কিংবা থিয়েটারে।'

'শেক্সপিয়রের নাটক দেখব?' নিরীহ মুখ করে জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

বুঝেও না-বোঝার ভান করলেন ফ্রেজার। 'লোকের কাজই হল বাঁকাচোখে সবকিছু দেখা। তারা বলাবলি করে, অমুককে তমুক জায়গায় দেখা গেছে। কে

জানে কার সঙ্গে গোপন অভিসার করছে। এরা সোজা চোখে কিছু দেখতে পারে না।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'এডগার অ্যালান পো এদের নিয়ে একটা গল্পও লিখেছেন।' বললেন ফ্রেজার, 'নামটা মনে পড়ছে না ঠিক।'

'ওটা আর্থার কোনান ডয়েল লিখেছেন। গল্পের নাম পারলয়েনড লেটার।' কথাটা বলেই ক্যাথেরিন বুঝতে পারল ভুল করে ফেলেছে। পুরুষরা খুব বেশি স্মার্ট মেয়েদের পছন্দ করে না। তবে এতে কিছু এসে যায় না। সে তো আর ফ্রেজারের প্রেমিকা নয়, সেক্রেটারি মাত্র।

বাকি পথটা আর কথা হল না দুজনের।

ফ্রেজারের বাড়ি জর্জটাউনে। যেন পটে আঁকা ছবি। চারতলা জর্জিয়ান হাউস, কমপক্ষে দুশো বছরের পুরানো। সাদা জ্যাকেট পরা এক বাটলার খুলে দিল দরজা। ফ্রেজার বললেন, 'ফ্রাঙ্ক, ইনি মিস আলেকজান্ডার।'

'হ্যালো, ফ্রাঙ্ক, আমরা ফোনে কথা বলেছি,' বলল ক্যাথেরিন।

'জি, ম্যাম। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস আলেকজান্ডার।'

রিসেপশন হলে তাকাল ক্যাথেরিন। দারুণ একসার সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ওককাঠের বার্নিশ করা। মেঝেটা মার্বেলপাথরের, মাথার ওপরে দুর্দান্ত একটা ঝাড়বাতি আলো ছড়াচ্ছে।

ফ্রেজার দেখছেন ক্যাথেরিনকে। 'পছন্দ হয়?'

'পছন্দ হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই।'

হাসলেন তিনি। ক্যাথেরিন কি খুব বেশি উল্লাস প্রকাশ করে ফেলেছে সেইসব মেয়ের মতো যাদের টাকাপয়সা খুব পছন্দ, সেইসব আগ্রাসী নারী যারা সবসময় লেগে আছে ফ্রেজারের পেছনে। 'বেশ... সুন্দর,' মৃদুগলায় বলল ক্যাথেরিন।

কৌতুক নিয়ে ক্যাথেরিনকে দেখলেন ফ্রেজার। ক্যাথেরিনের মনে হল ইনি ওর মনের সমস্ত খবর জেনে ফেলেছেন।

'পড়ার ঘরে চলো।'

ক্যাথেরিন ফ্রেজারের পেছন পেছন কালো প্যানেলের বড় একটি ঘরে ঢুকল। ঘর বোঝাই বই।

ফ্রেজার ওকে লক্ষ করছেন। 'তো!' গম্ভীর চেহারা।

আবার ধরা খেতে চায় না ক্যাথেরিন। ' লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের চেয়ে এটা ছোট।' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল ও।

দরাজ গলায় হেসে উঠলেন তিনি। 'ঠিক বলেছ।'

ফ্রাঙ্ক রুপোর বরফের ঝুড়ি নিয়ে ঢুকল ঘরে। কিনারে, বার-এর ওপরে রাখল। 'কখন ডিনার খাবেন, মি. ফ্রেজার?'

'সাড়ে সাতটায়।'

'আমি রাঁধুনিকে বলে দিচ্ছি,' চলে গেল ফ্রাঙ্ক।

'তুমি কী ড্রিঙ্ক নেবে?'

'কিছু না। ধন্যবাদ।'

ফ্রেজার তাকালেন ক্যাথেরিনের দিকে। 'তুমি মদ খাও না, ক্যাথেরিন?'

'কাজের সময় খাই না,' জবাব দিল ও। 'তাহলে 'P' আর 'O' গুলিয়ে ফেলি।'

আসলে 'P' আর 'Q' তাই না?'

''P' এবং 'O'' টাইপরাইটারে পাশাপাশি আছে শব্দদুটো।'

'জানতাম না।'

'আপনার না-জানলেও চলবে। এজন্যই প্রতি হপ্তায় আপনি আমাকে রাজার সমান বেতন দিয়ে চলেছেন।'

'তোমাকে কত বেতন দিই?'

'ত্রিশ ডলার এবং ওয়াশিংটনের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িতে ডিনার করার সুযোগ।'

'তুমি সত্যি ড্রিঙ্ক নেবে না?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল ক্যাথেরিন।

ফ্রেজার নিজের জন্য মার্টিনি নিলেন। ক্যাথেরিন শেলফভর্তি বই ঘুরে ঘুরে দেখল। বেশিরভাগই চিরায়ত সাহিত্যের ওপরে লেখা বই। পুরো দুটো আলমারি জুড়ে আছে ইটালিয়ান এবং আরবি বই।

ফ্রেজার ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'তুমি ইটালিয়ান এবং অ্যারাবিক জানো?'

'জানি। আমি কিছুদিন মধ্যপ্রাচ্যে ছিলাম। তখন আরবি শিখেছি।'

'আর ইটালিয়ান?'

'এক ইটালিয়ান অভিনেত্রীর সঙ্গে ছিলাম কিছুদিন।'

আগ্রহ নিয়ে ক্যাথেরিনকে দেখছেন ফ্রেজার। নিজেকে স্কুলছাত্রীর মতো মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছে না উইলিয়াম ফ্রেজারকে সে ভালোবাসে নাকি ঘৃণা করে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ক্যাথেরিন, এর মতো চমৎকার মানুষ জীবনে দেখেনি।

চমৎকার হল নৈশভোজ। প্রতিটি ডিশ ফরাসি।

'কেমন লাগল?' জানতে চাইল ফ্রেজার।

'কমিসারির মতো নয়।' হাসল ক্যাথেরিন।

হাসলেন ফ্রেজার। 'একদিন কমিসারিতে খেতে যেতে হবে।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে যেতাম না।'

ভুরু কোঁচকালেন ফ্রেজার, 'খাবারটা এতই খারাপ?'

'খাবার নয়। মেয়েগুলো। ওরা আপনাকে ছিঁড়ে খাবে।'

'তোমার এমন ধারণা হওয়ার কারণ?'

'ওরা সারাক্ষণ আপনার কথা বলে।'

'আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করে?'

'হুঁ,' হাসল ক্যাথেরিন।

'ওরা কী ভাবে কল্পনা করতে পারছি আমি। আমার ব্যাপারে তথ্য না-পেয়ে নিশ্চয় হতাশ হয়।'

মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, 'ভুল। আপনাকে নিয়ে নানান গল্প বানাই আমি।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ফ্রেজার, চুমুক দিলেন ব্রান্ডির গ্লাসে। 'কী ধরনের গল্প?'

'আপনি সত্যি জানতে চান?'

'অবশ্যই।'

'বলি আপনি একটা রাক্ষস। সারাদিন আমাকে বকেন, চেঁচামেচি করেন।'

দাঁত বের করে হাসলেন ফ্রেজার, 'সারাদিন নয়।'

'বলি আপনি শিকার-পাগল মানুষ। অফিসে ঢোকেন গুলিভরা বন্দুক নিয়ে এবং আপনি ডিকটেশন দেয়ার সময় সারাক্ষণ ভয়ে কাঁপতে থাকি এই বুঝি আমাকে গুলি করে মেরে ফেললেন।'

'ওরা নিশ্চয় আমার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।'

'ওরা অপেক্ষায় আছে আসল আপনাকে চেনার জন্য।'

'তুমি আসল আমাকে চিনতে পেরেছ?' ফ্রেজারের কণ্ঠ হঠাৎ সিরিয়াস শোনাল।

তাঁর উজ্জ্বল, নীলচোখে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন, তারপর মুখ ঘোরাল। 'মনে হয়।'

'কে আমি?'

আকস্মিক একটা টেনশন অনুভব করল ক্যাথেরিন। আলোচনার হালকা সুরটা কেটে গিয়ে ভাবগম্ভীর হয়ে উঠেছে পরিবেশ। নতুন একটা সুর তৈরি হয়েছে। জবাব দিল না ক্যাথেরিন।

ফ্রেজার ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হাসলেন। 'আমি আসলে একটা নীরস বিষয়। আরেকটু ডেসার্ট নেবে?'

'না, ধন্যবাদ। এত খেয়েছি। এক হপ্তা না-খেলেও চলবে।'

'চলো, কাজ শুরু করা যাক।'

মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করল ওরা। ফ্রেজার ক্যাথেরিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। টালমাজ অপেক্ষা করছিল বাইরে। বাড়ি পৌঁছে দেবে ক্যাথেরিনকে।

বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ ফ্রেজারের কথা ভাবল ক্যাথেরিন। তাঁর শক্তি, রসবোধ, আবেগ। কে যেন বলেছিল পুরুষকে ভদ্র হওয়ার আগে নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণ করতে হয়। উইলিয়াম ফ্রেজার খুব শক্তিশালী। আজকের সন্ধ্যাটা ক্যাথেরিনের জীবনের সেরা একটি সন্ধ্যা। দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। ভয় লাগছে ও-ও হয়তো হিংসুটে সেই সেক্রেটারিদের মতো একজন হবে যারা

সারাদিন অফিসে বসে থাকে আর ঘৃণা করে সেইসব মেয়েকে যারা তাদের বস্‌দের ফোন করে। তবে নিজের জীবনে এমনটা ঘটতে দেবে না ক্যাথেরিন। ওয়াশিংটনের সব মেয়ে ফ্রেজারকে বিয়ে করতে একপায়ে খাড়া। ক্যাথেরিন এ দলে যোগ দেবে না।

ক্যাথেরিন অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখল তার জন্য বসে আছে সুসি। ক্যাথেরিন ঘরে ঢোকামাত্র হামলে পড়ল তার ওপর। 'জলদি বলো কী ঘটেছে?'

'কিছুই ঘটেনি,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'আমরা ডিনার করেছি।'

সুসি অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিনের দিকে। 'তোমাকে উনি কোনো ইঙ্গিতও করেননি?'

'নাহ্।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুসিল। 'জানতাম এমনটাই ঘটবে। লোকটা আসলে ভিতুর ডিম।'

'মানে?'

'মানে খুব সোজা, সুইটি। তুমি ভার্জিন মেরির মতো নিরীহ মুখ করে তাঁর কাছে গিয়েছ। উনি ভয় পেয়েছেন। ভেবেছেন তোমার হাতেও যদি হাত রাখেন তুমি 'রেপ' বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

গাল রাঙা হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। 'আমি তাঁকে নিয়ে এরকম কিছু ভাবিনি।' আড়ষ্ট শোনাল কণ্ঠ, 'আর আমি ভার্জিন মেরির চেহারা নিয়েও যাইনি।' *আমি আসলে গেছি ভার্জিন ক্যাথেরিনের চেহারা নিয়ে। বুড়ি সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিন।* সে এখানে এসেছে ঠিকই। কিন্তু তার জীবনে কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি। সে এখনও পুরোনো চার্চ নিয়েই আছে।

পরের ছয়মাস বাইরে বাইরে থাকতে হল ফ্রেজারকে। গেলেন শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো এবং ইউরোপ। প্রচুর কাজ জমে আছে। সবসময় ব্যস্ত থাকল ক্যাথেরিন। তবু ফ্রেজারের অনুপস্থিতিতে অফিস শূন্য এবং ফাঁকা লাগল।

নানাজন এল ফ্রেজারের সঙ্গে দেখা করতে। বেশিরভাগ পুরুষ। এরা নানানভাবে প্রলুব্ধ করতে চাইল ক্যাথেরিনকে। সে লাঞ্চ, ডিনার, ইউরোপ ভ্রমণ এবং বিছানায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পেল। তবে কোনো আমন্ত্রণই গ্রহণ করল না ক্যাথেরিন। এর কিছুটা কারণ এসব পুরুষের কাউকেই ওর তেমন মনে ধরেনি, তবে বেশিরভাগ কারণ হল ক্যাথেরিন কাজের মধ্যে বিনোদন জড়িয়ে ফেললে ফ্রেজার নিশ্চয় সেটা পছন্দ করবেন না। ফ্রেজার ক্যাথেরিনের এসব প্রস্তাব সম্পর্কে অবগত থাকলেও কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন। ফ্রেজারের সঙ্গে তার বাড়িতে ডিনার করার পরের হপ্তাতেই তিনি ক্যাথেরিনের বেতন দশ ডলার বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শহর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। লোকজনের মুখ আমসি হয়ে আছে দুশ্চিন্তায়। পত্রিকার পাতা জুড়ে শুধু ইউরোপে হামলা এবং দুর্গতির খবর। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যা ঘটছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে আমেরিকানদের ফ্রান্সের পতন। এ যেন তাদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ, এমন একটি দেশের স্বাধীনতাহানি যেদেশটিতে রয়েছে স্বাধীনতার সিঁড়ি।

পতন ঘটেছে নরওয়ের। ইংল্যান্ড প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। একটা চুক্তি হয়েছে জার্মানি, ইটালি এবং জাপানের মধ্যে। আমেরিকাকে যুদ্ধে যেতেই হবে, এরকম একটা অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে সবার মাঝে। একদিন সুযোগ বুঝে ফ্রেজারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন।

'যুদ্ধে আমাদের জড়িয়ে পড়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র,' বললেন ফ্রেজার। 'ইংল্যান্ড হিটলারকে রুখতে না পারলে আমাদেরকেই এগিয়ে যেতে হবে।'

'যুদ্ধ হলে কী করবেন?'

'হিরো হব,' বললেন তিনি।

ক্যাথেরিন কল্পনা করল ইউনিফর্মে দারুণ সুদর্শন লাগছে ফ্রেজারকে।

'দুশ্চিন্তা কোরো না, ক্যাথেরিন,' বললেন ফ্রেজার, 'এখুনি কিছু ঘটছে না। যখন ঘটবে তখন আমরা প্রস্তুত থাকব।

'ইংল্যান্ডের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'হিটলার হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলে দেশটি কি তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে? হিটলারের তো ট্যাংক এবং প্লেনের অভাব নেই। কিন্তু ওদের কিছু নেই।'

'ওদেরও হবে,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন ফ্রেজার। 'শীঘ্রি।'

প্রসঙ্গ পাল্টালেন তিনি। ওরা ফিরে গেল কাজে।

এক হপ্তা বাদে পত্রিকার হেডলাইন হল lend lease (আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য অপর দেশকে যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহের জন্য প্রেসিডেন্টকে বিশেষ ক্ষমতা দান) সম্পর্কে রুজভেল্টের নতুন চিন্তাচেতনার কথা। ফ্রেজার এ ব্যাপারে জানতেন আগেই। ক্যাথেরিনকে বলে দিলেন এ নিয়ে সে যেন কারো সঙ্গে আলোচনা না করে।

দ্রুত কেটে যাচ্ছিল দিন। মাঝে মাঝে ডেটিং-এ যায় ক্যাথেরিন। কিন্তু ফ্রেজারের সঙ্গে প্রত্যেকের তুলনা করে হতাশ হয়। অবাক হয়ে ভাবে সে কেন এমন তুলনা করছে। বুঝতে পারছে ফ্রেজারের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে সে, আবেগী হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ থেকে উদ্ধারের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই অন্য পুরুষদের সঙ্গও তার ভালো লাগে না।

একদিন সন্ধ্যায় অফিসে কাজ করছে ক্যাথেরিন, ফ্রেজার হঠাৎ হাজির। তিনি খেলতে গিয়েছিলেন। ফ্রেজারকে দেখে বিস্মিত হল ক্যাথেরিন।

'এখনো অফিসে কী করছ তুমি?' ঘোঁতঘোঁত করলেন তিনি। 'এটা কি ক্রীতদাসদের জাহাজ যে দিন নেই রাত নেই কাজ করেই যেতে হবে?'

'রিপোর্টটা শেষ করতে চাইছিলাম,' বলল ক্যাথেরিন। 'তাহলে কাল এটা নিয়ে আপনি সানফ্রান্সিসকো যেতে পারবেন।'

'আমাকে মেইল করলেই চলত,' বললেন ফ্রেজার। বসলেন ক্যাথেরিনের বিপরীত দিকে। লক্ষ করছেন ওকে। 'এসব নীরস রিপোর্ট করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তোমার?'

'আজ সন্ধ্যায় আমার অন্য কোনো কাজ নেই।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ফ্রেজার, আঙুল মুঠো করে থুতনিতে ঠেকালেন, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্যাথেরিনের দিকে।

'প্রথম দিন এ অফিসে এসে কী বলেছিলে মনে আছে তোমার?'

'অনেক কথাই বলেছিলাম।'

'বলেছিলে তুমি সেক্রেটারি হতে চাও না। হতে চাও আমার সহকারী।'

হাসল ক্যাথেরিন, 'এর বেশি কিছু হতে চাইবার যোগ্যতা আমার নেই।'

'আছে।'

মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'খুব সহজ ব্যাপার, ক্যাথেরিন,' শান্ত গলায় বললেন ফ্রেজার। 'গত তিনমাস ধরে তুমি আমার সহকারী হিসেবেই কাজ করেছ। আমি এখন এটা অফিশিয়াল করতে যাচ্ছি।'

চোখ গোল গোল হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। 'আপনি কি সত্যি...'

'আমি তোমাকে কোনো পদবি দেব না কিংবা হুট করে বেতনও বাড়াব না। কারণ আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। তবে তুমি জানো তুমি কাজটা করতে পারবে।'

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' তোতলাচ্ছে ক্যাথেরিন। 'আ-আপনি আমাকে নিয়ে হতাশ হবেন না, মি. ফ্রেজার।'

'হতাশ ইতোমধ্যে হয়ে গেছি। আমার সহকারীরা আমাকে বিল বলে ডাকে।'

'বিল।'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে ফ্রেজারের কথা ভাবল ক্যাথেরিন। মনে পড়ল কীভাবে তিনি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখন ওর কেমন লাগছিল। ওই রাতে ঘুম আসতে অনেক দেরি হল ক্যাথেরিনের।

ক্যাথেরিন তার বাবাকে বহুবার চিঠি লিখে বলেছে বাবা যেন তাকে ওয়াশিংটনে দেখতে আসেন। সে বাবাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাবে, পরিচয় করিয়ে দেবে বন্ধুবান্ধব এবং বিল ফ্রেজারের সঙ্গে। গত দুটো চিঠির এখনো জবাব পায়নি ক্যাথেরিন। দুশ্চিন্তা নিয়ে সে ওমাহায়, চাচার বাড়িতে ফোন করল। চাচাই ধরলেন ফোন।

'ক্যাথি! আ-আমি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।' ধক করে উঠল ক্যাথেরিনের বুক।

'বাবা কেমন আছে?'

ওপাশে সংক্ষিপ্ত বিরতি।

'ওর স্ট্রোক হয়েছে। তোমাকে ফোন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বাবা বাধা দিয়েছে। বলেছে একটু সুস্থ হওয়ার পরে ফোন করতে।'

রিসিভার চেপে ধরল ক্যাথেরিন।

'বাবা এখন ভালো তো?'

'না, ক্যাথি,' বললেন চাচা। 'ও প্যারালাইজড হয়ে গেছে।'

'আমি আসছি,' বলল ক্যাথেরিন।

বিল ফ্রেজারের কাছে গেল ও, খবরটা বলল।

'শুনে খুব খারাপ লাগল,' বললেন ফ্রেজার। 'আমি কী করতে পারি?'

'জানি না। আমি এখুনি বাবার কাছে যেতে চাই, বিল।'

'অবশ্যই যাবে,' তিনি রিসিভার তুলে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে লাগলেন। তাঁর শোফার ক্যাথেরিনকে বাড়ি পৌঁছে দিল। ক্যাথেরিন একটা সুটকেসে কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে নিল। শোফার তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এল। এখানে ফ্রেজার ক্যাথেরিনের জন্য একটি বিমান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ওমাহা বিমানবন্দরে অবতরণ করল বিমান। ক্যাথেরিনের চাচা-চাচি এয়ারপোর্টে এসেছেন ভাতিঝিকে নিয়ে যেতে। তাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারল ক্যাথেরিন দেরি করে ফেলেছে সে। তারা নীরবে ওকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জায়গায় নিয়ে গেলেন। ভবনে প্রবেশ করল ক্যাথেরিন অন্তরে অসীম শূন্যতা নিয়ে। তার একটা অংশ মরে গেছে। এ আর কোনোদিন পুনরুজ্জীবিত হবে না। ক্ষুদ্র চ্যাপেলে নিয়ে আসা হল ক্যাথেরিনকে। সবচেয়ে সেরা সুটটি পরিয়ে সাধারণ একটি কফিনে রাখা হয়েছে ওর বাবার লাশ। মানুষটা যেন আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছেন। জীবনসংগ্রাম তাকে ক্ষুদ্র করে ফেলেছে।

বাবার ব্যক্তিগত কিছু জিনিস তুলে দেয়া হলে ক্যাথেরিনের হাতে। এর মধ্যে রয়েছে নগদ পঞ্চাশ ডলার, পুরোনো কিছু ফটোগ্রাফ, একটি হাতঘড়ি, রুপোর পেন নাইফ, বাবাকে লেখা ক্যাথেরিনের কিছু চিঠি, যত্ন করে সুতো দিয়ে বাঁধা। বাবার জন্য মনটা ভেঙে গেল ক্যাথেরিনের। মানুষটার স্বপ্নগুলো ছিল অতিকায় কিন্তু সাফল্য ছিল অতিক্ষুদ্র। ক্যাথেরিনের মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবা ওর জন্য হাতভর্তি উপহার নিয়ে আসতেন। ক্যাথেরিনের কতকিছু বলার ছিল বাবাকে, কতকিছু করতে চেয়েছিল সে মানুষটার জন্য, কিন্তু কিছুই করা হল না।

চার্চের পাশের ছোট্ট গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হল ক্যাথেরিনের বাবার লাশ। ক্যাথেরিন ভেবেছিল রাতটা চাচা-চাচির সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনে ফিরে যাবে। কিন্তু আর সহ্য করতে পারল না। ও এয়ারপোর্টে ফোন করল। ওয়াশিংটনে যাবার পরবর্তী প্লেনে রিজার্ভেশন নিল।

বিল ফ্রেজার স্বয়ং এলেন বিমানবন্দরে। যেন ক্যাথেরিনের প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করার জন্য এয়ারপোর্টে হাজির হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

ক্যাথেরিনকে নিয়ে তিনি ভার্জিনিয়ার এক গাঁয়ের প্রাচীন এক সরাইখানায় চলে এলেন ডিনার করতে। ক্যাথেরিন ওর বাবার কথা বলল। ফ্রেজার মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ক্যাথেরিন বাবার কথা বলতে বলতে শব্দ করে কেঁদে ফেলল। তবে বস্-এর সামনে কাঁদতে ওর একটুও অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল না।

বাবার মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা। অফিসে সন্ধ্যার পরেও ওরা দুজন কাজ করছিল। ক্যাথেরিন গত কয়েকদিন কয়েকবারই ফ্রেজারের সঙ্গে ডিনার করেছে এবং লোকটার প্রতি তার আকর্ষণ বেড়েই চলছিল।

ক্যাথেরিন কিছু কাগজ উল্টেপাল্টে দেখছিল, এমন সময় টের পেল বিল ফ্রেজার ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আঙুল ধীরে ধীরে স্পর্শ করল ক্যাথেরিনের ঘাড়।

'ক্যাথেরিন...'

ঘুরল ক্যাথেরিন, তাকাল। পরমুহূর্তে ফ্রেজারের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে গেল। যেন এরকম আগেও বহুবার ঘটেছে, ওরা পরস্পরকে হাজারবার চুমু খেয়েছে।

এসব এভাবেই ঘটে, ভাবল ক্যাথেরিন। *কিন্তু আমি জানতাম না।*

'কোট পরে নাও, ডার্লিং,' বললেন ফ্রেজার। 'আমরা বাড়ি যাব।'

জর্জটাউনের উদ্দেশে ছুটল গাড়ি। ওরা পরস্পরের গা ঘেঁষে বসল। ফ্রেজার জড়িয়ে ধরে থাকলেন ক্যাথেরিনকে, যেন ওকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। এমন সুখী নিজেকে কখনো মনে হয়নি ক্যাথেরিনের। ও জানে ও ফ্রেজারের প্রেমে পড়ে গেছে, ফ্রেজার ওর প্রেমে পড়ুক বা না পড়ুক তাতে কিছু আসে যায় না। ফ্রেজার ওকে পছন্দ করেন, সে এর মূল্য দেবে। কীভাবে মূল্য দেবে ভাবছে, রন পিটারসনের চেহারাটা ভেসে উঠল। শিউরে উঠল ক্যাথেরিন।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেজার।

ক্যাথেরিনের চোখে ভাসছে মোটেল রুম আর তার নোংরা ভাঙা আয়না। সে পাশে বসা বুদ্ধিমান মানুষটার দিকে তাকাল। 'কিছু হয়নি।' ঢোক গিলল ও। 'আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। আমি কুমারী।'

হেসে উঠলেন ফ্রেজার। 'ওয়াশিংটনে শুধু কুমারীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় কেন?'

'আমি কুমারীত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করেছিলাম,' ব্যগ্র গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'কিন্তু কাজ হয়নি।'

'কাজ হয়নি শুনে খুশি হলাম,' বললেন ফ্রেজার।

'আপনি মাইন্ড করেননি তো?'

হাসিটা মুখে ধরে রাখলেন ফ্রেজার। 'তোমার সমস্যাটা কী জানো?'

'বলুন!'

'তুমি খুব বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগো।'

'আচ্ছা!'

'দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায় হল রিল্যাক্স করা।'

মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন।

'না, ডার্লিং। মুক্তির উপায় হল প্রেমে পড়া।'

আধঘণ্টা বাদে গাড়ি থামল ফ্রেজারের বাড়ির সামনে। ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকলেন।

'ড্রিঙ্ক নেবে?'

তার দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। 'উপরে চলো।'

ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরলেন ফ্রেজার। আগ্রাসী চুমু খেলেন। শক্ত করে ফ্রেজারকে ধরে থাকল ও। নিজের দেহ বিলীন করে দিতে চাইছে ফ্রেজারের মাঝে। *আজ যদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে,* ভাবল ক্যাথেরিন, *স্রেফ আত্মহত্যা করব আমি।*

'চলো,' বললেন ফ্রেজার। ওর হাত ধরলেন।

বিল ফ্রেজারের বেডরুমটি প্রকাণ্ড। ঘরের দূরপ্রান্তে ফায়ারপ্লেস, তার সামনে ব্রেকফাস্ট টেবিল। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে ডাবল বেড। বামে ড্রেসিংরুম, তারপর বাথরুম।

'তুমি সত্যি ড্রিঙ্ক নেবে না?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেজার।

'না।'

ওকে আবার চুমু খেলেন ফ্রেজার। পৌরুষ টের পেল ক্যাথেরিন, আরামদায়ক একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল গোটা শরীরে।

'আসছি,' বললেন তিনি।

ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেলেন বিল ফ্রেজার। এমন চমৎকার মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেনি ক্যাথেরিন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্রেজারের কথা ভাবছে ক্যাথেরিন, হঠাৎ বুঝতে পারল কেন তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। আসলে ওকে জামাকাপড় খোলার সুযোগ করে দিয়ে গেছেন যাতে বিব্রতবোধ না করে ক্যাথেরিন। দ্রুত পোশাক খুলতে শুরু করল ও। এক মিনিট পর নিজের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, বিদায় সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিন। বিছানায় গেল ও, ঢুকে পড়ল চাদরের নিচে।

ঘরে ঢুকলেন ফ্রেজার। পরনে লাল টকটকে মোয়ের সিল্কের ড্রেসিং গাউন। বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। নিষ্পলক নয়নে দেখছেন ক্যাথেরিনকে। ওর রেশম কোমল কালো চুল ছড়িয়ে রয়েছে সাদা বালিশময়। দারুণ লাগছে সুন্দর মুখখানা। গা থেকে রোব খসে পড়তে দিলেন ফ্রেজার। ক্যাথেরিনের পাশে

বসলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল ওর।

'আমি কিছু পরিনি,' বলল ক্যাথেরিন। 'প্রেগন্যান্ট হয়ে যাব না তো?'

'হতেও পারো,' মুচকি হাসলেন ফ্রেজার।

একথার মানে কী জিজ্ঞেস করার জন্য মুখ খুলেছিল ক্যাথেরিন, কিন্তু ফ্রেজার ওর ঠোঁটে আঙুল চাপা দিলেন, তাঁর হাত ওর শরীরে ঘুরতে শুরু করেছে। আবিষ্কার করছে ক্যাথেরিনের অনাঘ্রাতা যৌবন। সবকিছু ভুলে শুধু বর্তমান নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকল ক্যাথেরিন। ওর সমস্ত মনোযোগ নিজের শরীর নিয়ে। টের পেল ফ্রেজার ওর শরীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, কোমর নাড়ছেন, জোরে ধাক্কা দিচ্ছেন, অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণ ব্যথার একটা স্রোত ছড়িয়ে পড়ল ক্যাথেরিনের দেহে, তারপর ওটা জায়গা করে নিল গোপন গুহায়। ফ্রেজারের কোমর চালানোর গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। একটা ছন্দ সৃষ্টি হল। ফ্রেজার প্রবলবেগে মন্থন করে চলেছেন। একপর্যায়ে ঘরঘরে গলায় জানতে চাইলেন, 'তুমি প্রস্তুত?' কিসের জন্য তিনি প্রস্তুত হতে বলেছেন জানে না ক্যাথেরিন, তবু বলল, 'প্রস্তুত।' পরমুহূর্তে গুঙিয়ে উঠলেন ফ্রেজার। 'ওহ্, ক্যাথি!' শেষ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারলেন তিনি, তারপর নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকলেন ওর বুকে।

অবশেষে সাঙ্গ হল মিলনমেলা। ফ্রেজার বলছিলেন, 'দারুণ লেগেছে, না?' ক্যাথেরিন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, দারুণ।' ক্যাথেরিন খুশি, কারণ সে ফ্রেজারকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে। তবে ও নিজে একটুও তৃপ্তি পায়নি।

কিছুক্ষণ পরে ওর বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে গেলেন ফ্রেজার। কনুইতে ভর করে উঁচু হলেন। জানতে চাইলেন, 'কেমন বোধ করছ?'

'চমৎকার,' হাসল ক্যাথেরিন। 'তুমি দুর্দান্ত এক প্রেমিক।'

ফ্রেজারকে চুমু খেল ক্যাথেরিন, জড়িয়ে ধরে থাকল।

'ব্রান্ডি নেবে?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেজার।

'নো, থ্যাঙ্কস।'

'আমি নেব। পুরুষরা তো আর প্রতিদিন কুমারীদের সঙ্গে বিছানায় যেতে পারে না।'

'তুমি মাইন্ড করেছ?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'অবশ্যই না। তুমি জানো, তুমি খুব সুন্দরী?'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

নোয়েল
প্যারিস : ১৯৪১

৬

কারো কাছে ১৯৪১ সালের প্যারিস ছিল ধনীদের জন্য প্রাচুর্যের বছর, অন্যদের কাছে জ্যান্ত নরক। গেস্টাপো হয়ে উঠেছিল মৃত্যুর সমার্থক শব্দ, তাদের ভয়ংকর কর্মকাণ্ড নিয়ে ফিসফাস চলছিল সর্বত্র। ফরাসি ইহুদিরা হয়ে উঠেছিল তাদের প্রধান টার্গেট। শুরুটা হয় ইহুদিদের দোকানের কাচ ভাঙার মাধ্যমে, তারপর দক্ষ গেস্টাপোরা এদের দোকানপাট ভাঙচুরের পাশাপাশি দখলও করতে শুরু করে।

২৯ মে নতুন একটি আইন জারি করা হয়, 'ইহুদিদের ছয়-তারকাঅলা হলুদ রঙের কাপড় পরতে হবে, গায়ে লেখা থাকবে Juden শব্দটা। বুকের বামপাশে, লেখাটি পোশাকের সঙ্গে সেলাই করা থাকবে। এবং ছয়বছর বয়সী বাচ্চা থেকে সমস্ত ইহুদিদের এটা পরতে হবে।'

জার্মানদের বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চ আন্ডারগ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ ম্যাকুইস সুযোগ পেলেই চোরাগোপ্তা হামলা চালাত। তবে ধরা পড়লে সীমাহীন যন্ত্রণার মাঝে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হত।

চাটরেসে এক তরুণী কাউন্টেসের পারিবারিক শ্যাতুর নিচতলা দখল করে নিয়ে ওটাকে স্থানীয় জার্মান কর্মকর্তাদের কোয়ার্টার বানানো হল ছয়মাসের জন্য। ওইসময় কাউন্টেস মাকুইস দলের ছয়-সদস্যদের শ্যাতুর ওপরতলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। এদেরকে জার্মানরা খুঁজছিল।

এদের কারো সঙ্গে কারো কোনো সাক্ষাৎ হয়নি। তবে ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও টেনশনে তিনমাসের মধ্যে কাউন্টেসের সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে যায়।

জার্মানরা বিজেতাদের মতো বাস করছে এ শহরে, তবে গড়পড়তা ফরাসিরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। ঠাণ্ডা আর দুর্দশা ছাড়া সবকিছুরই কমতি চলছে তাদের। রান্নার গ্যাসও দেয়া হয় রেশন করে। প্যারিসবাসী কাঠের গুঁড়ো কিনে, চুলো জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে শরীর।

সিগারেট, কফি থেকে চামড়া সবকিছুরই দারুণ ঘাটতি। ফরাসিরা ঠাট্টা করে

বলে আপনি যাই খান না কেন, সবকিছুর স্বাদ মনে হবে একইরকম। ফরাসি নারী যারা পৃথিবীর সবচেয়ে স্মার্ট-নারী হিসেবে মনে করে নিজেদেরকে—তারা উলের বদলে ভেড়ার চামড়ার জীর্ণ কোট পরে। পায়ে কাঠের প্লাটফর্ম শু। তাই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় খটখট শব্দে মনে হয় ঘোড়া যাচ্ছে।

এমনকি ব্যাপটিজমও প্রভাবিত হল। কারণ ব্যাপটিজমের জন্য অপরিহার্য মিষ্টি বাদামের দুষ্প্রাপ্যতা। রাস্তায় দু-একটা রেনল্ট ট্যাক্সি দেখা যায়, চলাচলের অন্যতম বাহন হয়ে উঠেছে দুই-আসন-বিশিষ্ট ক্যাব।

তবে প্রেক্ষাগৃহগুলো আগের মতোই পূর্ণ থাকছে। প্রতিদিনকার কঠোর বাস্তবতার কবল থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে লোকে নাটক এবং সিনেমা দেখতে যায়।

রাতারাতি তারকা হয়ে গেছে নোয়েল পেজ। থিয়েটারের ঈর্ষাপরায়ণ সহযোগীরা বলে এটা সম্ভব হয়েছে আরমন্দ গটিয়েরের ক্ষমতা এবং ট্যালেন্টের কারণে। এটা সত্যি, গটিয়েরই নোয়েলের ক্যারিয়ারের সূচনা ঘটিয়েছে। দর্শক দারুণ পছন্দ করে ওর অভিনয়।

আরমন্দ গটিয়ের এখন আফসোস করে কেন নোয়েলের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তার ভেতরে ভীতি কাজ করে একদিন নোয়েল তাকে ছেড়ে চলে যাবে। গটিয়ের বহুদিন ধরে থিয়েটারে কাজ করছে। কিন্তু নোয়েলের মতো মেয়ে জীবনেও দেখেনি। ও হল স্পঞ্জের মতো। গটিয়ের ওকে যা যা শিখিয়েছে, স্পঞ্জের মতো শুষে নিয়েছে সব। এবং আরো শিখতে চাইছে। চরিত্রের মধ্যে এমন সাবলীলভাবে ঢুকে যেতে পারে নোয়েল, এত দারুণভাবে জ্যান্ত করে তুলতে পারে চরিত্র, মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয় অভিনয়। একদম প্রথম থেকেই জানত গটিয়ের একদিন তারকা হবে নোয়েল—এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ ছিল না—তবে যে-জিনিসটা তাকে যারপরনাই বিস্মিত করেছে তা হল বিনোদন-ভুবন নোয়েলের লক্ষ্য নয়। সত্য এটাই যে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ নেই ওর।

প্রথমদিকে ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইত না গটিয়েরের। মইয়ের শীর্ষে উঠে গেছে নোয়েল, কিন্তু গটিয়ের এখনো জানে না মেয়েটার মূল লক্ষ্য আসলে কী। নোয়েল একটি রহস্য, প্রহেলিকা, যত ভেতরে প্রবেশ করে গটিয়ের, ততই জট পাকাতে থাকে ধাঁধা চাইনিজ বাক্সের মতো, একটা বাক্স খুললে আরেকটা বাক্স বেরিয়ে আসে। গটিয়ের গর্ব করত সে মানুষ বুঝতে পারে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে, কিন্তু এখন দেখছে যে-মেয়েটির সঙ্গে সে আছে, যার প্রেম তাকে উন্মাদে পরিণত করেছে, এর সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। নোয়েলকে সে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। নোয়েল 'হ্যাঁ' বলেছে। তবে গটিয়ের জানে এটা স্রেফ বলার জন্য বলা। ফিলিপ্পি সোরেলের সঙ্গে এনগেজমেন্ট যেমন তার কাছে কোনো অর্থ বহন করেনি, গটিয়েরের বিয়ের প্রস্তাবও নোয়েলকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। গটিয়ের ভাবে এ মেয়ের জীবনে অতীতে না-জানি কত পুরুষ এসেছে। সে জানে

নোয়েলের সঙ্গে তার কোনোদিন বিয়ে হবে না। প্রস্তুত হবার পরে চলে যাবে নোয়েল।

গটিয়ের নিশ্চিত নোয়েলের সঙ্গে যে-পুরুষের পরিচয় হয়েছে সেই ওকে বিছানায় নিয়ে যেতে চেয়েছে। গটিয়েরের বন্ধুরা ওকে ঈর্ষা করে। কারণ তারা নোয়েলের সঙ্গে ঘুমাবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

'তুমি মহাসৌভাগ্যবান,' এক বন্ধু বলেছিল গটিয়েরকে, 'আমি ওকে একটা ইয়ট, ক্যাপডি অ্যান্টিবসে নিজের একটা শ্যাতু আর চাকরবাকর দিতে চেয়েছিলাম। ও শুধু হেসেছে।'

আরেক ব্যাংকার বন্ধু বলেছে, 'এই প্রথম দেখলাম টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না।'

'নোয়েল?'

মাথা ঝাঁকিয়েছে ব্যাংকার, 'হুঁ। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কত টাকা চায় সে। পাত্তাই দিল না। তোমার মধ্যে কী আছে হে, বন্ধু?'

আরমন্দ গটিয়ের নিজেও জানে না এ-প্রশ্নের জবাব।

গটিয়েরের মনে আছে নোয়েলের প্রথম নাটকের কথা। নাটকের প্রথমে কটা পৃষ্ঠা পড়েই গল্পটা ভালো লেগে যায় তার। নাটকটা ছিল এক নারীকে নিয়ে যার স্বামী যুদ্ধে গেছে। একদিন এক সৈনিক আসে নারীটির বাড়িতে, জানায় সে তার স্বামীর সঙ্গে রুশ-সীমান্তে যুদ্ধ করছে। নারীটি সৈনিকের প্রেমে পড়ে যায়, জানত না লোকটা সাইকোপ্যাথ কিলার এবং নারীর জীবন বিপদাপন্ন। স্ত্রীটির অভিনয়ের প্রচুর সুযোগ ছিল নাটকটিতে। গটিয়ের এ নাটকের নির্দেশনা দিতে রাজি হয়েছিল একটাই শর্তে—নোয়েল পেজকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে দিতে হবে। প্রযোজকরা অচেনা নোয়েলকে এ চরিত্রে নিতে আগ্রহবোধ করেনি। তারাও শর্ত জুড়ে দেয় নোয়েলকে অডিশনে উত্তীর্ণ হতে হবে। গটিয়ের দ্রুত বাড়ি ফিরে গিয়েছিল খবরটা নোয়েলকে দিতে। সে ভেবেছে নোয়েল খবরটা শুনে খুব খুশি হবে, ওর আরো কাছে যাবার সুযোগ হবে তার, ওকে নোয়েল সত্যি ভালোবাসবে। ওরা বিয়ে করবে তারপর নোয়েল তার সম্পত্তি হয়ে যাবে।

খবরটা শুনে নোয়েল শুধু মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছে, 'খুব ভালো খবর, আরমন্দ। ধন্যবাদ,' সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলে যেভাবে ধন্যবাদ দেয় ঠিক তেমন সুর ছিল মেয়েটির কণ্ঠে।

গটিয়ের একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে নোয়েলের দিকে। ভেবেছে মেয়েটা নিশ্চয় মানসিকভাবে অসুস্থ, হয় তার ভেতরে আবেগ বলে কিছু নেই কিংবা আবেগ থাকলেও তা কোনোদিন প্রাণ ফিরে পায়নি। কিন্তু কথাটা নিজেরই বিশ্বাস করতে মন চায়নি গটিয়েরের। কারণ সুন্দরী নোয়েলকে সে দেখেছে স্নেহশীলা এক নারী হিসেবে, যে গটিয়েরের সমস্ত খামখেয়াল পূরণ করেছে,

বিনিময়ে চায়নি কিছুই। নোয়েলকে ভালোবাসে বলেই গটিয়ের জোর করে মন থেকে দূর করে দিয়েছে সন্দেহ। তারপর ওরা অডিশনে গেছে।

অডিশনে দারুণ করেছিল নোয়েল। সাথে সাথে পেয়ে গেছে পার্ট। গটিয়ের জানত ও পারবে। দুইমাস বাদে প্যারিসে প্রদর্শিত হয় এ নাটক, রাতারাতি ফ্রান্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকায় পরিণত হয় নোয়েল। সমালোচকরা কলম শানাচ্ছিল নাটক এবং নোয়েলকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য। কারণ তারা জানত গটিয়ের তার রক্ষিতা, অনভিজ্ঞ এক অভিনেত্রীকে দিয়ে প্রধান চরিত্রটি করাচ্ছিল। কিন্তু সমালোচকদের বোবা করে ফেলে নোয়েল তার অভিনয় দিয়ে। তারা নোয়েলের অবিশ্বাস্য, অপূর্ব অভিনয়ক্ষমতা এবং সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে নতুন বিশেষণ খুঁজতে থাকে। নাটকটি সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

প্রতি রাতে, নাটকশেষে নোয়েলের ড্রেসিংরুম ভরে ওঠে দর্শনার্থীতে। এদের মধ্যে আছে সবশ্রেণীর মানুষ। মুচি, সৈনিক, কোটিপতি, শপগার্ল। সবার সঙ্গে সমান সৌজন্য দেখায় নোয়েল। গটিয়ের মুগ্ধ হয়ে দেখে ওকে। যেন রাজকুমারী দর্শন দিচ্ছে তার প্রজাদের।

একবছরের মধ্যে মার্সেই থেকে তিনটি চিঠি পেয়েছে নোয়েল। প্রতিটি চিঠি কুটি-কুটি করে ছিঁড়েছে সে। শেষে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

বসন্তে আরমন্দ গটিয়েরের পরিচালনায় সিনেমায় অভিনয় করল নোয়েল। ছবি মুক্তি পেল। সুপারহিট হল। নোয়েলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল আরো। সংবাদ মাধ্যম ছেঁকে ধরল ওকে। অবাক বিস্ময়ে গটিয়ের দেখল কী ধৈর্য নিয়ে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছে নোয়েল, ফটোসেশনের জন্য দাঁড়াচ্ছে ক্যামেরার সামনে।

আর এসবই নোয়েল করছিল ল্যারি ডগলাসের জন্য।

ফটোগ্রাফারদের সামনে যখন পোজ দেয় নোয়েল, ভাবে তার সাবেক প্রেমিক পত্রিকার প্রচ্ছদে তার ছবি দেখছে। সিনেমায় অভিনয় করার সময় কল্পনা করে দূরের কোনো দেশের সিনেমাহলে বসে তার ছবি দেখছে ল্যারি। তার কাজ ল্যারির জন্য যেন একটা সতর্কবাণী, অতীতের ম্যাসেজ, একটা সংকেত যা একদিন তাকে নোয়েলের কাছে নিয়ে আসবে। আর নোয়েল এটাই চায়—তার কাছে ফিরে আসবে ল্যারি। তখন ওকে ধ্বংস করবে নোয়েল।

ক্রিশ্চিয়ান বারবেটের দৌলতে ল্যারি ডগলাসের ওপরে একটি স্ক্রাপবুক তৈরি করেছে নোয়েল। বেঁটে গোয়েন্দা তার জীর্ণ অফিস ছেড়ে রু রিচার-এ বড়, অভিজাত এক স্যুইটে উঠেছে। নোয়েল তার সঙ্গে দেখা করতে গেল একদিন। দাঁত বের করে বারবেট বলল, 'সস্তায় পেয়ে গেলাম। এ অফিসটা এক ইহুদির ছিল।'

'আমার জন্য খবর জোগাড় করেছেন বললেন,' বলল নোয়েল।

গপ করে হাসিটা গিলে ফেলে বারবেট, 'জি,' সে যে খবর জোগাড় করেছে তা

জানায় নোয়েলকে।

নাৎসিদের নাকের ডগায়, ইংল্যান্ড থেকে খবর জোগাড় করা খুব কষ্টের। তবে বারবেট সে-ব্যবস্থা করেছে। লন্ডনে চিঠি নিয়ে আসে যেসব জাহাজ, তার একটার নাবিকদের ঘুস দেয় ও। তবে এটা বারবেটের একটি মাত্র সূত্র। ফ্রেঞ্চ আন্ডারগ্রাউন্ডের সঙ্গেও সে ভাব করেছে। তার খাতির আছে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস এবং কালোবাজারিদের সঙ্গেও। এদের একেজনকে একেক গল্প বলে বারবেট। খবরের বন্যা বইতে থাকে তার কাছে।

একটা রিপোর্ট তুলে নিল বারবেট। 'আপনার বন্ধু ইংলিশ চ্যানেলে গুলি খেয়েছে।' কোনো ভূমিকার ধার ধারল না সে। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করছে নোয়েলকে। কিন্তু নোয়েলের চেহারা পাথর হয়ে থাকল। তাকাল বারবেটের দিকে। 'ওকে উদ্ধার করা হয়েছে।' ঢোক গিলল গোয়েন্দা। 'জি। ব্রিটিশ রেসক্যু বোট তাকে তুলে নেয়।' মেয়েটা এ খবর কীভাবে পেল? অবাক বারবেট।

এই নারীর সবকিছুই হতবুদ্ধি করে তোলে বারবেটকে, ক্লায়েন্ট হিসেবে একে পছন্দ নয় তার। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কাজটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু কাজটা নির্বোধের মতো হয়ে যাবে ভেবে ছাড়ে না।

একবার নোয়েলকে ইঙ্গিত দিয়েছিল বারবেট তাকে সস্তায় ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নোয়েল এমন আচরণ করেছে তার সঙ্গে নিজেকে রীতিমতো একটা ভোদাই মনে হয়েছে বারবেটের। আচরণটা যথেষ্ট অপমানজনকই ছিল। বারবেট এজন্য নোয়েলকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। একদিন শোধ নেবে সে।

নোয়েল তার অফিসে দাঁড়িয়ে আছে, সুন্দরমুখে বিতৃষ্ণা, বারবেট দ্রুত রিপোর্টে চোখ ফেরাল। এ যত তাড়াতাড়ি চলে যায় ততই মঙ্গল।

'তার স্কোয়াড্রন লিঙ্কনশায়ারের কিরটনে স্থানান্তরিত হয়েছে। তারা হারিকেন চালাচ্ছে এবং—'

নোয়েল অন্য খবর জানতে চায়। 'অ্যাডমিরালের কন্যার সঙ্গে ওর এনগেজমেন্টের কী হল?' জিজ্ঞেস করল ও। 'ওটা এখন বাতিল, না?'

মুখ তুলে চাইল বারবেট। বিড়বিড় করল, 'জি। উনি অন্য মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।' নোয়েল এমনভাবে বলছে যেন রিপোর্ট তার আগেই দেখা। সে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল। বাড়ি ফিরে ধীরে ধীরে পুরোটা পড়ল, তারপর অন্য রিপোর্টের মধ্যে ওটা ঢোকাল। রেখে দিল গোপন জায়গায় যেখানে কারো চোখে পড়বে না।

শুক্রবারের এক রাত। নোয়েল অভিনয়-শেষে থিয়েটারের ড্রেসিংরুমে বসে মেকআপ তুলছে, নক হল দরজায়। বুড়ো, খোঁড়া দারোয়ান মারিয়াস।

'মাফ করবেন, মিস পেজ, এক ভদ্রলোক এগুলো আপনাকে দিতে বললেন।'

আয়নায় তাকাল নোয়েল। বুড়োর হাতে দামি ফুলদানিতে লাল গোলাপের প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া।

'ওখানটায় রাখো, মারিয়াস,' বলল নোয়েল। টেবিলে ফুলদানিটা রেখে দিল দারোয়ান।

অক্টোবরের শেষার্ধ এখন। গত তিনমাস ধরে প্যারিসে কেউ গোলাপ দেখেনি। কমপক্ষে চার ডজন হবে, লাল টকটকে, লম্বা পাপড়ি, শিশিরে ভেজা। কৌতূহলি নোয়েল হেঁটে গেল টেবিলে, কার্ডটা তুলে পড়ল : 'সুন্দরী ফ্রাউলিন পেজকে। আপনি কি আমার সঙ্গে সাপার করবেন?–জেনারেল হ্যানস স্কাইডার।'

ফুলদানিটা চকচকে, রঙিন, গায়ে চমৎকার নকশা-আঁকা, অত্যন্ত দামি। এ জিনিস জোগাড় করতে নিশ্চয় প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে জেনারেলকে।

'উনি জবাবের অপেক্ষা করছেন,' বলল দারোয়ান।

'ওঁকে বলো আমি সাপার খাই না। আর এটা বাড়ি নিয়ে যেয়ো। তোমার স্ত্রীকে দিও।'

বিস্মিত দেখাল দারোয়ানকে। 'কিন্তু জেনারেল...'

'বললামই তো।'

মাথা ঝাঁকাল মারিয়াস। ফুলদানি নিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত, নোয়েল জানে বুড়ো সবাইকে বলে বেড়াবে ও একজন জার্মান জেনারেলকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ফরাসিরা ওকে বীরাঙ্গনার চোখে দেখবে। ব্যাপারটা হাস্যকর। নোয়েলের নাৎসিদের প্রতি কোনো ক্ষোভ নেই। ওরা তার জীবন বা পরিকল্পনার অংশ নয়, সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে একদিন নাৎসিরা ফিরে যাবে বাড়ি। সে নাৎসিদের দখলদারিত্ব নিয়ে কোনো কথা বলে না, বিষয়টি কেউ উত্থাপন করলে—যা প্রায়ই করা হয়—স্রেফ এড়িয়ে যায় ও।

অক্টোবরে, নোয়েলের নাটকের প্রথম বর্ষপূর্তিতে প্রযোজকরা ট্যুর ডি আর্জেন্টে পার্টি দিলেন। পার্টিতে এলেন অভিনেতা, ব্যাংকার এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা। অতিথিদের বেশিরভাগই ফরাসি, তবে জার্মানরাও এল কয়েকজন। তাদের কারো কারো পরনে ইউনিফর্ম। সবার সঙ্গেই রয়েছে ফরাসি নারীসঙ্গিনী, শুধু একজন বাদে। এই জার্মান অফিসারের বয়স চল্লিশের কোঠায়, লম্বা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, গভীর সবুজ চোখ, সুঠাম শরীর। তার গাল থেকে থুতনি পর্যন্ত সরু, একটা কাটা দাগ। লোকটা সারা সন্ধ্যা নোয়েলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

'কে ওই লোক?' ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে এক হোস্টকে জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

টেবিলে একা বসে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন ভদ্রলোক। হোস্ট তার দিকে একবার তাকিয়ে ফিরল নোয়েলের দিকে। 'আপনি ওঁকে চেনেন না? আমি তো ভাবলাম উনি আপনার বন্ধু। উনি জেনারেল হ্যানস স্কাইডার। জেনারেল স্টাফ-এ আছেন।'

কার্ড এবং গোলাপের কথা মনে পড়ে গেল নোয়েলের। 'উনি আমার বন্ধু একথা কী করে মনে হল আপনার?'

লজ্জা পেল লোকটি। 'না, মানে এমনি ভাবলাম... ফ্রান্সের প্রতিটি নাটক বা ছায়াছবি প্রদর্শনে জার্মানদের অনুমোদন লাগে। আপনার নতুন ছবিটি তৈরিতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল সেন্সর বোর্ড। জেনারেল ব্যক্তিগতভাবে ওদেরকে থামিয়ে অনুমোদন দিয়েছেন।'

এমন সময় আরমন্দ গটিয়ের এক অতিথিকে নিয়ে এল নোয়েলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। আলোচনার সমাপ্তি ঘটল ওখানেই।

নোয়েল আর জেনারেল স্কাইডারের প্রতি আগ্রহ দেখাল না।

পরদিন সন্ধ্যায় ড্রেসিংরুমে ঢুকে নোয়েল দেখে ছোট একটি ফুলদানিতে একটিমাত্র গোলাপ, সঙ্গে একটি কার্ড। তাতে লেখা : সম্ভবত : ছোট ছোট জিনিস দিয়ে আমাদের শুরু করা উচিত। আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে?—হ্যানস স্কাইডার।

নোয়েল কার্ডটি ছিঁড়ে ফেলল, ফুলটির জায়গা হল ময়লা রাখার ঝুড়িতে।

ওই রাতের পরে প্রায় প্রতিটি পার্টিতে জেনারেল হ্যানস স্কাইডারকে দেখতে পেল নোয়েল। সবসময় সবার পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ করছেন। নোয়েল বুঝে পায় না তার প্রতি লোকটির এত আগ্রহ কিসের। অবশ্য জেনারেলের উপস্থিতিতে বিরক্তবোধও করে না সে। মাঝে মাঝে নোয়েল আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও পার্টিতে যায় না। পরদিন হোস্টকে জিজ্ঞেস করে জেনারেল স্কাইডার পার্টিতে হাজির ছিলেন কিনা। জবাব আসে : 'হ্যাঁ।'

নাৎসিদের বিরুদ্ধাচারণ করলে ভয়ংকর শাস্তি জেনেও প্যারিসে জার্মান সৈন্যরা স্যাবোটাজের শিকার হতে লাগল। কমপক্ষে একডজন স্বাধীনতাপ্রেমী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দাঁড়িয়ে গেল যারা হাতে অস্ত্র পাওয়া মাত্র শত্রুর বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে লড়াই করছে। সুযোগ পেলেই তারা অতর্কিত হামলা করে বসে জার্মান সেনাদের, উড়িয়ে দেয় তাদের রসদভর্তি ট্রাক কিংবা মাইন দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় সেতু অথবা ট্রেনে। একজনের নাম পত্রিকার পাতায় খুব ছাপা হচ্ছিল : লো কাফার্ড বা আরশোলা। ছদ্মনাম। তাকে সবজায়গায় দেখা যাচ্ছিল। গেস্টাপো বহু চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারছে না। কেউ জানে না কে সে। কারো ধারণা এ লোক ইংরেজ, থাকে প্যারিসে। কেউ গল্প বানাল এ আসলে জেনারেল দ্য গলের চর, ফ্রি ফ্রেঞ্চ ফোর্সের নেতা। কেউ বা এককাঠি বাড়িয়ে বলল সে বিপথগামী কোনো জার্মান। সে যে-ই হোক, অদৃশ্য এই আরশোলা-মানব এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে আরশোলার ছবিতে ছেয়ে গেল গোটা প্যারিস, বিল্ডিং, ফুটপাত, এমনকি জার্মান হেডকোয়ার্টার্সের ভেতরেও লাগানো হল আরশোলার ছবি। গেস্টাপো এ লোককে ধরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এটা সত্যি যে সে চোখের নিমিষে প্যারিসবাসীর চোখে হিরো হয়ে উঠল।

৬সেম্বরের বৃষ্টিস্নাত এক বিকেলে নোয়েল এক তরুণ চিত্রকরের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে হাজির হল। এর সঙ্গে তার এবং আরমন্দ দুজনেরই পরিচয় আছে। রু দ্যু ফাউবর্গ-সেন্ট-অনর-এর গ্যালারিতে প্রদর্শনী হচ্ছে। ঘরভর্তি লোক। অনেক সেলেব্রিটি এসেছেন। ফটোগ্রাফাররা কিলবিল করছে চারিদিকে। নোয়েল একটার পর একটা ছবি দেখছে, হঠাৎ একজন ওর হাত ধরল। ঘুরল সে। তাকাল। ম্যাডাম রোজ। একমুহূর্ত লাগল তাঁকে চিনতে। কুৎসিত চেহারাটা আগের মতোই আছে, শুধু বয়সটা যেন বেড়ে গেছে কুড়ি বছর। ম্যাডাম রোজকে এখন নিজের মায়ের মতোই লাগছে দেখতে। বড় কালো একটা হাতাহীন কোট পরেছেন তিনি। কোটের গায়ে JUDEN লেখা হলুদ তারকা নেই।

নোয়েল কথা বলার জন্য মুখ খুলেছে, ওর হাতে চাপ দিয়ে বাধা দিলেন ম্যাডাম রোজ। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?' অস্পষ্ট গলায় বললেন তিনি। 'লে দু ম্যাগটস-এ।'

নোয়েল জবাব দেয়ার আগেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন ম্যাডাম রোজ, ওকে ঘিরে ধরল ফটোগ্রাফাররা। ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পোজ দেয়ার সময় নোয়েলের মনে পড়ল ম্যাডাম রোজ এবং তার ভাতিজা ইসরায়েল কাৎজকে। প্রয়োজনের সময় দুজনকেই কাছে পেয়েছে সে। ম্যাডাম রোজ কী চান? সম্ভবত টাকাপয়সার টানাটানি চলছে।

কুড়ি মিনিট বাদে ভিড় থেকে আলগোছে কেটে পড়ল নোয়েল, সেন্ট জার্মেইন দে প্রেস থেকে একটা ট্যাক্সি নিল। আজ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। এখন হি হি ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এনেছে সঙ্গে। ট্যাক্সি এসে লে দ্যু ম্যাগটস-এর সামনে থামল। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যে ট্যাক্সি থেকে নামল নোয়েল। তার পাশে ভোজবাজির মতো উদয় হল রেনকোট আর চওড়া কিনারার হ্যাটপরা এক লোক। লোকটিকে চিনে নিতে একটু সময় লাগল নোয়েলের। ফুপুর মতো সেও বুড়িয়ে গেছে, তবে এই পরিবর্তন চেহারায় বেশ ভারিক্কি একটা ভাব এনে দিয়েছে। ইসরায়েল কাৎজ আগের চেয়ে শুকিয়ে গেছে, চোখজোড়া আরো গর্তে ঢুকে গেছে, যেন অনেকদিন ঘুমায় না। নোয়েল লক্ষ করল ছয়প্রান্তঅলা হলদে ইহুদি তারকাটি পরেনি সে।

'চলো ভেতরে যাই,' বলল ইসরায়েল কাৎজ।

নোয়েলের হাত ধরে ক্যাফেতে ঢুকল সে। এখানকার ডজনখানেক খদ্দেরের সবাই ফরাসি। পেছনে, কিনারার একটা টেবিলে নোয়েলকে নিয়ে গেল কাৎজ।

'কিছু খাবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, ধন্যবাদ।'

বৃষ্টিভেজা হ্যাট মাথা থেকে খুলে নিল ইসরায়েল কাৎজ। নোয়েল ওকে লক্ষ করছে। বুঝতে পারছে টাকাপয়সার জন্য ওকে এখানে ডেকে আনা হয়নি। নোয়েলকে সেও পরখ করছে।

'তুমি এখনো আগের মতোই সুন্দরী আছ, নোয়েল,' মৃদুগলায় বলল কাৎজ।

'তোমার সব নাটক এবং সিনেমা দেখেছি। তুমি দারুণ অভিনয় করো।'

'আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন?'

ইতস্তত করল ইসরায়েল, তারপর লাজুক হাসল, 'আমি তোমাকে বিব্রত করতে চাইনি।'

নোয়েল ওকে দেখছে। হঠাৎ বুঝতে পারল কী বলতে চেয়েছে ইসরায়েল। 'Juden' শব্দটা নোয়েলের কাছে কোনো অর্থ বহন না করলেও ইহুদিদের কাছে বিরাট অর্থ বহন করে। 'Juden' তকমা এঁটে বেড়ানো লোক মানেই ইহুদি যাদেরকে জার্মানরা নির্বংশ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

'আমি নিজেই নিজের বন্ধু নির্বাচন করি,' বলল নোয়েল। 'কারো ধার ধারি না, যাক, বাদ দাও। তোমার কথা বলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইসরায়েল। 'একদম গতানুগতিক, নীরস জীবন কেটে যাচ্ছে আমার। ড. অ্যাঞ্জিলবুর্স্টের সঙ্গে আছি। নাম শুনেছ?'

'না।'

'দুর্দান্ত এক শল্যচিকিৎসক। উনি আমাকে তাঁর উত্তরাধিকার করেছেন। নাৎসিরা আমার প্রাকটিস করার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।' লম্বা হাতজোড়া মেলে ধরল সামনে, 'এখন ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করি।'

অনেকক্ষণ ইসরায়েলের দিকে তাকিয়ে থাকল নোয়েল। 'আর কোনো খবর?'

বিস্মিত দেখাল ডাক্তারকে, 'না। আর কোনো খবর নেই। কিন্তু কেন?'

'না, এমনি। আচ্ছা, আমাকে ডেকেছ কেন?'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল ইসরায়েল। গলা নামাল। 'আমার একটা উপকার করতে হবে। আমার এক বন্ধু—'

ঠিক তখন খুলে গেল দরজা। ধূসর-সবুজ উর্দি-পরা চার জার্মান সৈনিক ঢুকল বার-এ, নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন কর্পোরাল। বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ল সে, 'অখটাং! (অ্যাটেনশন!) আপনাদের যার যার পরিচয়পত্র দেখান।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ইসরায়েল কাৎজের শরীর, মুখ থেকে যেন খসে পড়ল মুখোশ। ডান হাতটা চলে গেল ওভারকোটের পকেটে। চাইল ক্যাফের পেছনে, বাইরে বেরুবার সরু প্যাসেজওয়ের দিকে। কিন্তু এক সৈন্য ওই রাস্তা ইতিমধ্যে আটকে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েল নিচু, জরুরি গলায় বলল, 'এখান থেকে চলে যাও। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এখুনি।'

'কেন?' ফুঁসে উঠল নোয়েল।

জার্মানরা প্রবেশপথের সামনে একটি টেবিলের খদ্দেরদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করছে।

'কোনো প্রশ্ন কোরো না,' হুকুম দিল ইসরায়েল, 'চলে যাও।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল নোয়েল, তারপর সিধে হল। পা বাড়াল দরজার দিকে। সৈনিকরা পরের টেবিলের দিকে এগোচ্ছে। ইসরায়েল তার চেয়ারটা

পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল দুই সৈনিক। হেঁটে এল ওর দিকে।

'পরিচয়পত্র।'

কেন জানি নোয়েলের মনে হল সৈন্যরা আসলে ইসরায়েলেরই খোঁজ করছে। এজন্য ও পালাতে চাইছে। পালাতে গেলেই খুন হয়ে যাবে। ওর বাঁচার কোনো উপায় নেই।

ঘুরল নোয়েল, গলা চড়িয়ে ইসরায়েলকে ডাকল, 'ফ্রাঁসোয়া! থিয়েটারে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে! বিল মিটিয়ে জলদি চলো।'

সৈন্যরা বিস্মিত চোখে নোয়েলকে দেখল। নোয়েল টেবিলের দিকে পা বাড়াল।

কর্পোরাল শুলজ নোয়েলের সামনে এসে দাঁড়াল। তার চুলের রঙ সোনালি, বয়স কুড়ির কোঠায়। 'আপনি এই লোকটির সঙ্গে এসেছেন, ফ্রাউলিন?'

'অবশ্যই! তোমরা সৎ ফরাসি নাগরিকদের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করতে পারো না?' রাগ নোয়েলের গলায়।

'আমি দুঃখিত, মাই গুড ফ্রাউলিন, কিন্তু...'

'আমি তোমার গুড ফ্রাউলিন নই,' খেঁকিয়ে উঠল নোয়েল। 'আমি নোয়েল পেজ। আজ ভ্যারিয়েট থিয়েটারে আমার নাটক আছে। এই লোকটি আমার সহ-অভিনেতা। আজ রাতে, যখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেনারেল হ্যান্স স্কাইডারের সঙ্গে সাপার করব তখন অবশ্যই তাকে তোমাদের বাজে আচরণের কথা জানাব। উনি নিশ্চয় ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবেন না।'

কর্পোরালের চোখে সশ্রদ্ধ একটা ভাব ফুটতে দেখল নোয়েল। তবে সেটা ওকে চিনতে পারার জন্য নাকি জেনারেলের সঙ্গে ওর খাতির আছে শুনে, বুঝতে পারল না।

'আ-আমি দুঃখিত, ফ্রাউলিন।' তোতলাচ্ছে কর্পোরাল। 'আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।' ইসরায়েল কাৎজের দিকে ফিরল সে। কাৎজ চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে, হাত পকেটে। 'কিন্তু এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছি না।'

'চিনতে পারতে যদি তোমরা, বর্বররা কখনো নাটক দেখতে যেতে,' তীব্র ঘৃণা নিয়ে বলল নোয়েল। 'আমাদের কি গ্রেফতার করা হয়েছে নাকি আমরা যেতে পারি?'

যুবক কর্পোরাল টের পেল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিল সে। 'অবশ্যই ফ্রাউলিন এবং তার বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়নি,' বলল। 'যদি খারাপ ব্যবহার করে থাকি তো ক্ষমা চাইছি। আমি—'

ইসরায়েল কাৎজ কর্পোরালের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। তোমার লোকদের কাউকে বলো একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে।'

'অবশ্যই। এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।'

নোয়েলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল ইসরায়েল। জার্মান কর্পোরাল বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেখল। তিন ব্লক পরে, ট্র্যাফিক লাইটে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। দরজা খুলল ইসরায়েল, নোয়েলের হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল কোনো কথা না বলে।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় নোয়েল থিয়েটারের ড্রেসিংরুমে ঢুকে দেখল তার জন্য দুজন লোক অপেক্ষা করছে। একজন ক্যাফের সেই তরুণ জার্মান কর্পোরাল, অপরজন সাদা পোশাকে। লোকটা আলবিনো, গায়ে সামান্যতম লোম নেই, গোলাপি চোখ, যেন অপূর্ণ একটি শিশু। তার বয়স ত্রিশের কোঠায়, চাঁদের মতো গোল মুখ। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, প্রায় মেয়েলি। তবে লোকটার অবয়ব জুড়ে ভয়ংকর কিছু একটা আছে, হিম করে দেয় গা। 'মিস নোয়েল পেজ?'

'জি।'

'আমি কর্নেল কুর্টমুয়েলার, গেস্টাপো। আশা করি কর্পোরাল শুলজের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে।'

নোয়েল ফিরল কর্পোরালের দিকে। নিরাসক্ত গলায় বলল, 'মনে পড়ছে না পরিচয় হয়েছে কিনা।'

'আজ বিকেলে ক্যাফে হাউজে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার,' উৎসাহ নিয়ে বলল কর্পোরাল।

নোয়েল ঘুরল কর্নেলের দিকে। 'আমার সঙ্গে বহু মানুষের সাক্ষাৎ হয়।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'বন্ধুসংখ্যা প্রচুর হলে সবার কথা মনে রাখা কষ্টের বইকি।'

সায় দিল নোয়েল। 'ঠিক।'

'ধরুন, আজ বিকেলে যে-বন্ধুটির সঙ্গে আপনি ছিলেন,' বিরতি দিল কর্নেল, নোয়েলের চোখে চোখ। 'আপনি কর্পোরাল শুলজকে বলেছেন সে আপনার সঙ্গে নাটক করছে।'

নোয়েল চেহারায় বিস্ময় ফোটাল। 'কর্পোরাল নিশ্চয় ভুল করছে।'

'নাইন, ফ্রাউলিন,' প্রতিবাদ করল কর্পোরাল। 'আপনি বলেছেন—' কর্নেল তার দিকে এমন হিমদৃষ্টিতে তাকাল, হাঁ-করা মুখ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল কর্পোরালের।

'সম্ভবত,' বলল কুর্টমুয়েরার, 'এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে যায় যদি বিদেশি ভাষয় কেউ কম্যুনিকেট করতে চায়।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল নোয়েল।

চোখের কোণ দিয়ে ও দেখল রাগে লাল হয়ে গেছে কর্পোরালের চেহারা, তবে মুখ বুজে থাকল।

'খামোকা আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' বলল কর্নেল।

হঠাৎ কাঁধ থেকে দশমণি বোঝা যেন নেমে গেল নোয়েলের।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আপনারা নাটক দেখতে চাইলে দুটো টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারি।'

'আমি দেখেছি,' বলল গেস্টাপোর কর্মকর্তা, 'কর্পোরাল শুলজ আগেই টিকেট কিনেছে। তবু আপনাকে ধন্যবাদ।'

দরজার দিকে এগোল সে, মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। 'আপনি কর্পোরাল শুলজকে বর্বর বলার পরে সে আপনার অভিনয় দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং টিকেট কেনে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের ছবি খুঁটিয়ে দেখেছে। কিন্তু ক্যাফে হাউজ-এ আপনার বন্ধুটির চেহারা দেখতে পায়নি ওইসব ছবিতে। তারপর সে আমাকে খবর দেয়।'

নোয়েলের বুকে ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল।

'জাস্ট ফর দা রেকর্ড, মাদমোয়াজেল। ওই লোক আপনার সহ-অভিনেতা না হলে কী ছিল সে?'

'এ-একজন বন্ধু।'

'নাম?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠটা এখনো নরম তবে বিপজ্জনক।

'নামে কী আসে যায়?' বলল নোয়েল।

'আপনার বন্ধুর চেহারার সঙ্গে এক অপরাধীর মিলে যায় যাকে আমরা খুঁজছি। তাকে আজ বিকেলে সেন্ট জার্মেইন দেস প্রেস-এ দেখা গেছে।'

নোয়েল কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছে, মাথায় চিন্তার ঝড়।

'আপনার বন্ধুর নাম কী?' গোঁ ধরে রইল কর্নেল মুয়েলার।

'আ-আমি জানি না।।'

'অহ্ তার মানে তাকে আপনি চেনেন না?'

'জি।'

স্থিরদৃষ্টিতে নোয়েলকে দেখছে কর্নেল। ঠাণ্ডা, গোলাপি চোখজোড়া যেন ঢুকে যাচ্ছে কোটরের মধ্যে। 'আপনি লোকটার সঙ্গে বসে ছিলেন। সৈন্যদের কাগজপত্র দেখতেও বাধা দিয়েছেন। কেন?'

'লোকটার জন্য আমার মায়া লাগছিল,' বলল নোয়েল। 'সে আমার কাছে আসে...'

'কোন্ জায়গায় দেখা হয়েছে?'

দ্রুত চিন্তা করছে নোয়েল। ওরা একত্রে ক্যাফেতে গিয়েছে কেউ হয়তো দেখে ফেলতে পারে। 'ক্যাফের বাইরে। বলল নিজের পরিবারের জন্য কিছু মুদি সদয় চুরির অপরাধে সৈন্যরা তাকে খুঁজছে। আমার কাছে এটা খুব বিরাট কোনো অপরাধ মনে হয়নি তাই আমি...' মুলারের দিকে তাকাল ও, 'আমি ওকে সাহায্য করি।'

মুয়েলার ওকে একমুহূর্ত পরখ, তারপর প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'বুঝতে পারছি আপনি কেন বড় তারকা।' মুখ থেকে হাসি মুছে গেল তার, যখন

কথা বলল, আরো নরম শোনাল কণ্ঠ। 'আপনাকে কিছু উপদেশ দিই, মাদমোয়াজেল পেজ। ফরাসিদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো আছে তো ঠিক আছে। তবে আমরা চাই আপনি আমাদের বন্ধু এবং মিত্র হবেন। তবে আমাদের শত্রুকে যারা সাহায্য করে তারা আমাদেরও শত্রু হিসেবে পরিগণিত। আমরা আপনার বন্ধুকে ধরব, মাদমোয়েজ্জেল, এবং যখন ধরব তখন ওকে জেরা করব। এবং আপনাকে কথা দিচ্ছি তাকে কথা বলিয়ে ছাড়বই।'

'তাতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই,' বলল নোয়েল।

'ভুল বললেন,' কর্নেলের কথা প্রায় শুনতেই পাচ্ছে না নোয়েল।

'আমাকে আপনার তখন ভয় পেতে হবে,' কর্নেল মুয়েলার কর্পোরালের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। আবার পা বাড়াল দরজায়। ফিরল আরেকবার। 'আপনার বন্ধুটির সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। যদি না জানান...' মুচকি হাসল সে। তারপর চলে গেল ওরা।

ধপাশ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল নোয়েল, যেন শরীর থেকে শুষে নেয়া হয়েছে সমস্ত শক্তি। গেস্টাপো সম্পর্কে নোনা ভয়ংকর সব গল্প মনে পড়তে লাগল ওর। ঠাণ্ডা হয়ে এল গা-হাত-পা। ধরা যাক, ধরা পড়ল ইসরায়েল কাৎজ এবং তার পেট থেকে কথা বের করানো হল। ও হয়তো ওর পুরোনো বন্ধু। গেস্টাপো জানবে কাৎজের ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে নোয়েল। তবে তাতে কিছু আসবে যাবে না। যদি না... রেস্টুরেন্টে বসে যে-নামটা চিন্তা করেছিল, ধাঁ করে তা মনে পড়ে গেল। *লো কাফার্ড*।

আধঘণ্টা পরে মঞ্চে উঠল নোয়েল। নাটকের চরিত্র ছাড়া আর সবকিছু ঝেঁটিয়ে মন থেকে বিদায় করে দিল। নাটক শেষে যথারীতি দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হল প্রেক্ষাগৃহ। তাদের প্রশংসাসূচক বাণী শুনতে শুনতে ড্রেসিংরুমে চলে এল নোয়েল। খুলল দরজা। চেয়ারে বসে আছেন জেনারেল হ্যানস স্কাইডার। নোয়েলকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, 'শুনলাম আজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে আমার সাপার করার কথা।'

সিন নদীর তীরে, প্যারিস থেকে কুড়ি মাইল দূরে, লো ফুট পার্দুতে ওরা সাপার খেল। কালো, চকচকে একটি লিমুজিনে জেনারেলের শোফার নোয়েলকে নিয়ে এসেছে এখানে। বৃষ্টি থেমে গেছে। রাতটা ঠাণ্ডা, আরামদায়ক। ওরা চুপচাপ খেল। খাওয়ার সময় বিকেলের ঘটনা নিয়ে একটা কথাও বললেন না জেনারেল। নোয়েলের ইচ্ছে ছিল না এই লোকের সঙ্গে বেরুবে। কিন্তু জার্মানরা ওর সম্পর্কে আসলেই কতটুকু জানে এবং সে কতটা বিপদে আছে তা জানাটা জরুরি ছিল নোয়েলের জন্য।

'আজ বিকেলে গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্স থেকে একটা ফোন পাই আমি,'

বললেন জেনারেল। 'ওরা আমাকে জানায় আপনি জনৈক কর্পোরাল শুলজকে নাকি বলেছেন আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় সাপার করছেন।' নোয়েল লোকটাকে দেখছে শুধু, বলছে না কিছু। তিনি বলে গেলেন, 'ভাবলাম আমি যদি "না" বলে দিই তাহলে ব্যাপারটা আপনার জন্য খুবই অপমানজনক হবে, আর "হ্যাঁ" বললে আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক হবে।' হাসলেন তিনি। 'তাই এখন আমরা এখানে।'

'পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর,' আপত্তি জানাল নোয়েল। 'পেটের দায়ে খাবার চুরি করা একজন গরিব মানুষকে সাহায্য করা—'

'না!' ধারালো শোনাল জেনারেলের কণ্ঠ। বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল নোয়েল। 'সকল জার্মানকে বোঝা ভাববার মতো ভুল করবেন না। আর গেস্টাপোকে আন্ডারএস্টিমেট করা মোটেই উচিত হবে না।'

নোয়েল বলল, 'আমার সঙ্গে ওদের কোনো কাজ নেই, জেনারেল।'

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন জেনারেল। 'কর্নেল মুয়েলারের সন্দেহ আপনি যে-লোকটিকে সাহায্য করেছেন তাকেই আসলে সে খুঁজছে। যদি তাই হয়, আপনি সাংঘাতিক বিপদে আছেন। কর্নেল মুয়েলার কোনোকিছু ভোলে না, কাউকে ক্ষমাও করে না।' নোয়েলের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওই বন্ধুটির সঙ্গে আপনার আর দেখা না-করাই উচিত হবে। তাহলে সবকিছু বিস্ফোরিত হতে পারে। কনিয়াক নেবেন?'

'প্লিজ,' বলল নোয়েল।

জেনারেল দুটো নেপোলিয়ন ব্রান্ডির অর্ডার দিলেন। 'আরমন্দ গটিয়েরের সঙ্গে কদ্দিন ধরে আছেন?'

'আমার ধারণা জবাবটা আপনার জানা,' বলল নোয়েল।

হাসলেন জেনারেল স্কাইডার। 'তা অবশ্য জানি। আসলে আমি জানতে চাইছি এর আগে আমার সঙ্গে ডিনারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? গটিয়েরের কারণে?'

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'না।'

'আচ্ছা।' আড়ষ্ট গলায় বললেন জেনারেল।

'প্যারিসে মেয়ের তো অভাব নেই,' বলল নোয়েল। 'যে কাউকে ডাকলেই তো পেতে পারতেন।'

'আপনি আসলে আমাকে চেনেন না,' শান্ত গলা জেনারেলের, 'চিনলে একথাটা আর বলতেন না।' বিব্রত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'বার্লিনে আমার স্ত্রী এবং সন্তান আছে। ওদেরকে আমি খুব ভালোবাসি। তবে ওদের কাছ থেকে আমি একবছরেরও বেশি সময় ধরে দূরে। জানি না কবে আবার ওদের দেখতে পাব।'

'আপনাকে প্যারিসে আসতে বলেছে কে?' নিষ্ঠুর গলায় জিজ্ঞেস করল

নোয়েল।

'আমি কারো করুণা চাই না। নিজের অবস্থাটা শুধু খানিকটা তুলে ধরলাম। আমি বাছ-বিচারহীন সম্ভোগে বিশ্বাসী নই। প্রথমদিন যখন আপনাকে মঞ্চে দেখলাম, কী যেন হয়ে গেল আমার ভেতরে। মনে হল আপনাকে আমার জানতে হবে। আমরা ভালো বন্ধু হতে চাই।'

'আমি এ ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না,' বলল নোয়েল।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'তা বুঝতে পারছি।'

জেনারেল বুঝতে পারেননি। কারণ নোয়েলের এ লোকের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করার কোনোই ইচ্ছে নেই। জেনারেল সুকৌশলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। আলাপ করতে লাগলেন অভিনয় এবং থিয়েটার। এদিকে লোকটার জানার পরিধি বিস্মিত করে তুলল নোয়েলকে। খুব বুদ্ধিমান মানুষ স্কাইডার। একের পর এক বিষয় বদলালেন। জানালেন নোয়েলের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে তাঁর প্রচুর খাটা-খাটনি করতে হয়েছে। জলপাই সবুজ ইউনিফর্ম পরা স্কাইডারকে দেখতে পুরোপুরি জার্মান জেনারেলদের মতোই লাগে। তবে তিনি যেরকম নম্র সুরে, ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন, তাতে তাঁকে সৈনিকের চেয়ে পণ্ডিতের ভূমিকায় মানাচ্ছিল বেশি।

'আপনার মুখের দাগটা কীভাবে হল?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

আলতো করে কাটা দাগে আঙুল বোলালেন জেনারেল। 'অনেক বছর আগে ডুয়েল লড়েছিলাম,' কাঁধা ঝাঁকালেন তিনি। 'জার্মান ভাষায় একে বলে ওয়াইল্ড ফ্রিশ। অর্থ 'গর্বিত ত্বক'।'

নাৎসি দর্শন নিয়ে কথা বলল ওরা।

'আমরা দানব নই,' বললেন জেনারেল। 'পৃথিবী শাসন করার ইচ্ছেও আমাদের নেই। কিন্তু আমরা খামোকা বসে থেকে কুড়ি বছর আগের যুদ্ধের জন্য আর শাস্তিভোগ করতে পারছিলাম না। ভার্সাই চুক্তির নাগপাশ ছিঁড়ে অবশেষে বেরিয়ে আসতে পেরেছে জার্মানরা।'

ডিনার শেষে, প্যারিসে ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল, 'আপনি কি আরমন্দ গটিয়েরকে ভালোবাসেন?'

গলার স্বর নিরুত্তাপ, তবে নোয়েল বুঝতে পারছে উত্তরটা জানা জেনারেলের জন্য জরুরি।

'না,' ধীরে ধীরে জবাব দিল ও।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি, সন্তুষ্ট। 'আমি অবশ্য তা ভাবিনি। তবে আমার ধারণা আপনাকে আমি সুখি করতে পারব।'

'আপনার স্ত্রীর মতো সুখি?'

একমুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে থাকলেন স্কাইডার, যেন ঘুসি খেয়েছেন, তারপর ফিরলেন নোয়েলের দিকে।

'আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি,' শান্ত গলা তাঁর। 'অন্তত এটুকু আশা করতে পারি যে আমরা কখনো পরস্পরের শত্রু হব না।'

নোয়েল যখন বাড়ি ফিরল, রাত প্রায় তিনটা বাজে। উত্তেজিত হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরমন্দ গটিয়ের। নোয়েল ঘরে ঢুকতেই খেঁকিয়ে উঠল সে, 'কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে শুনি?'

'আমার একটা কাজ ছিল,' নোয়েল ঘরে তাকাল। যেন সাইক্লোন হয়ে গেছে। ডেস্ক ড্রয়ার খোলা, ভেতরের জিনিসপত্র মেঝেয় ছড়ানো-ছিটানো। ক্লজিটও খোলা হয়েছে, উল্টে আছে একটা ল্যাম্প, ছোট একটা টেবিল চিৎ হয়ে আছে, একটা পায়া ভাঙা।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'গেস্টাপো এসেছিল। মাই গড, নোয়েল, কিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ তুমি?'

'কিছুর সঙ্গে না।'

'তাহলে ওরা এমন করল কেন?'

নোয়েল ঘরে ঢুকল। দ্রুত ভাবছে। ওর কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল গটিয়ের। 'আমি জানতে চাই এসব হচ্ছেটা কী।'

গভীর দম নিল নোয়েল, 'আচ্ছা।'

সে ইসরায়েল কাৎজের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলল নামটা উহ্য রেখে। কর্নেল মুয়েলারের সঙ্গে সাক্ষাৎও বাদ দিল না।

'আমি জানি না আমার বন্ধু লো কাফার্ড কিনা। তবে হতে পারে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল গটিয়ের। 'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি গ্রাহ্য করি না কে সে। তবে আমি চাই না তার সঙ্গে তুমি আবার দেখা কর। এ কারণে আমরা দুজনেই শেষ হয়ে যেতে পারি। আমি তোমার মতোই ঘৃণা করি জার্মানদের...' থেমে গেল সে। কারণ জানে না নোয়েল জার্মানদের ঘৃণা করে কিনা। আবার শুরু করল গটিয়ের, 'চেরি, জার্মানরা যতদিন আইন বানাচ্ছে, ওদের তোষামোদ করে চলতে হবে আমাদের। গেস্টাপোর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িয়ে পড়া যাবে না। এই ইহুদিটা—কী যেন নাম বললে ওর?'

'নাম বলিনি।'

ওকে একমুহূর্ত দেখল গটিয়ের, 'লোকটা কি তোমার প্রেমিক ছিল?'

'না, আরমন্দ।'

'এ কি তোমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে?'

'না।'

'বেশ,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গটিয়ের। 'তাহলে আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। হঠাৎ করে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তোমার। এজন্য নিশ্চয় ওরা তোমাকে দুষতে পারবে না। ওই লোকের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করলে ওরা পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাবে।'

'অবশ্যই ভুলে যাবে,' বলল নোয়েল।

পরদিন সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাবার পথে নোয়েলের পিছু নিল দুই গেস্টাপো।

সেদিন থেকে নোয়েল যেখানে গেল, পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকল ওরা। নোয়েলের প্রথম প্রথম অস্বস্তি হত। মনে হত কেউ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখ ঘুরিয়ে তাকালে দেখত সিভিলিয়ান ড্রেসের জার্মান এক তরুণকে। তরুণ ভিড়ে মিশে থাকে। তবে সে একা নয়, আরো একজন তরুণ পিছু নিয়েছে নোয়েলের। এরা সাদা পোশাকে থাকলেও তাদেরকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কারণ এদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হয় ঘৃণা, অবজ্ঞা, কর্তৃত্ব এবং নিষ্ঠুরতা।

যা ঘটছে গটিয়েরকে তা জানাল না নোয়েল। ওকে আরো দুশ্চিন্তায় ফেলতে চায় না। অ্যাপার্টমেন্টে গেস্টাপোর অনুপ্রবেশে সে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। গটিয়ের মুখে কিছু বলছে না, তবে জানে জার্মানরা ইচ্ছে করলে তার এবং নোয়েলের ক্যারিয়ারের বারোটা বাজাতে পারে। নাৎসিদের মনে কোনো দয়ামায়া নেই। খবরের কাগজে চোখ বুলালেই তাদের নিষ্ঠুরতার প্রমাণ মেলে। জেনারেল স্কাইডার বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন নোয়েলকে। ফোন ধরেনি সে। নাৎসিদের সে শত্রু ভাবে না, বন্ধুও ভাবতে চায় না। সে সুইটজারল্যান্ডের মতো থাকতে চায় : নিরপেক্ষ। ইসরায়েল কাৎজরা তাদের দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। লোকটা তার কাছে কিসের সাহায্য চেয়েছিল জানার আগ্রহ হলেও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছে নেই নোয়েলের।

ইসরায়েল কাৎজ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের দুই হপ্তা পরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হল গেস্টাপো কজন অন্তর্ঘাতককে গ্রেফতার করেছে, এরা সবাই লো কাফার্ড-এর দলের লোক। খবরটা খুঁটিয়ে পড়ল নোয়েল। লো কাফার্ড গ্রেফতার হয়নি পড়ে জানা গেল। জার্মানরা যখন ইসরায়েল কাৎজ-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তার সেই চেহারা মনে পড়ে গেল নোয়েলের। *কাৎজ জ্যান্ত অবস্থায় ধরা দিত না। হয়তো এ স্রেফ আমার কল্পনা,* ভাবল নোয়েল। কিন্তু ও যদি নিরীহই হয়ে থাকে তাহলে গেস্টাপো তার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন? সে কি লো কাফার্ড? ও কি ধরা পড়েছে নাকি পালিয়ে গেছে?

নিজের অ্যাপার্টমেন্টের জানালার সামনে দাঁড়াল নোয়েল। ওর বাড়ির সামনে এভিন্যু মার্টিনি। রাস্তায়, একটা স্ট্রিটল্যাম্পের নিচে কালো বর্ষাতি পরা দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা? গটিয়েরের মতো নোয়েলেরও মনে দুশ্চিন্তা জাগল। তবে দুশ্চিন্তার জায়গা দখল করে নিল রাগ। মনে পড়ল কর্নেল মুয়েলারের কথা : *আমাকে নিয়ে আপনার ভয় পেতে হবে।* ওটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। নোয়েল সিদ্ধান্ত নিল ইজরায়েল কাৎজের সঙ্গে আবার দেখা করবে।

পরদিন সকালে ম্যাসেজটা এল এমন একজনের কাছ থেকে যে এসবের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে বলে ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবেনি নোয়েল—তার দারোয়ান। লোকটা ক্ষুদ্রকায়, ঘোলাটে চোখ, বয়স সত্তরের কোঠায়। নিচের পাটিতে একটা দাঁতও নেই। ফলে সে কী বলছে বুঝতে খুবই অসুবিধে হয়। নোয়েল এলিভেটরে উঠছে, বুড়ো তার জন্য অপেক্ষা করছিল। একসঙ্গে নিচে নেমে এল দুজনে। লবির দিকে এগোচ্ছে, বিড়বিড় করল বুড়ো, 'আপনার অর্ডার দেয়া জন্মদিনের কেকটি রুডি পেসি'র বেকারিতে রেডি আছে।'

নোয়েল বিস্মিত চোখে তাকাল দারোয়ানের দিকে। ভুল শুনেছে কিনা বুঝতে পারছে না। বলল, 'আমি কোনো কেকের অর্ডার দিইনি।'

'রু ডি পেসি,' আবার বলল বুড়ো।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল নোয়েল। রাস্তায় তাকাল ও। সেই দুই গেস্টাপো কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপাশে। ওকে অপরাধীর মতো অনুসরণ করছে ওরা। এই মুহূর্তে দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন। নোয়েলকে দেখতে পায়নি এখনো। রাগের একটা হল্কা উঠে এল ওর শরীর বেয়ে। ঝট করে ঘুরল দারোয়ানের দিকে। 'সার্ভিস এন্ট্রান্সটা কোন্ দিকে?'

'এ দিকে ম্যাম'জেল।'

নোয়েল একটা ব্যাক করিডর ধরে বুড়োর পেছন পেছন এগোল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বেজমেন্টে, সেখান থেকে সরু গলিতে। তিন মিনিট পরে ট্যাক্সিতে উঠল নোয়েল। চলেছে ইসরায়েল কাৎজের সঙ্গে দেখা করতে।

মধ্যবিত্তদের জন্য সাধারণ চেহারার বেকারি ওটা। জানালায় বড় বড় অক্ষরে লেখা BOULANGERIE। অক্ষরগুলোর কোথাও কোথাও চল্টা উঠে গেছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নোয়েল। ধবধবে সাদা অ্যাপ্রন পরা, ছোটখাটো গড়নের, মোটাসোটা এক মহিলা স্বাগত জানাল ওকে।

'জি, মাদমোয়াজেল?'

ইতস্তত করল নোয়েল। এখন সময় আছে চলে যাওয়ার, ফিরে গেলে তাকে আর বিপজ্জনক কোনোকিছুর মধ্যে জড়াতে হবে না।

অপেক্ষা করছে মহিলা।

'আপনাদের কাছে আমার একটা কেকের অর্ডার দেয়া আছে,' বলল নোয়েল। এরকম খেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে বলে নিজেকে মস্ত বোকা লাগছে।

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'ওটা রেডি আছে, মিস পেজ,' দরজায় 'বন্ধ' লেখা একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল সে। তালা মেরে বলল, 'এই পথে আসুন।'

বেকারির পেছনদিকের ছোট ঘরটিতে, একটি খাটিয়ায় শুয়ে আছে সে। তার চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট, ঘামে ভেজা। গায়ের চাদরটা রক্তে জবজবে, বাম

হাঁটুতে ব্যান্ডেজ।

'ইসরায়েল!'

দরজার দিকে ফিরল সে, চাদরটা খসে গেল গা থেকে। পা ফুলে আছে ভয়ানকভাবে, মাংস কেটে হাড় বেরিয়ে আছে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

হাসার চেষ্টা করল ইসরায়েল কিন্তু মুখে হাসি ফুটল না। গলার স্বর ঘরঘরে, কথা বলার সময় ককাল যন্ত্রণায়।

'ওরা লো কাফার্ডকে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের ধরা অত সহজ নয়।'

নোয়েলের অনুমান তাহলে সঠিক। 'কাগজে পড়লাম,' বলল ও। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

বুক ভরে দম নিল ইসরায়েল, ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। কথা বলার সময় হাঁপাতে লাগল।

'গেস্টাপো আমার খোঁজে গোটা প্যারিস ওলটপালট করে ফেলছে। আমাকে এ শহর ছেড়ে পালাতে হবে... লো হার্ভেতে যেতে পারলে ওখানে আমার বন্ধুরা আছে। ওরা নৌকায় আমাকে ফ্রান্স থেকে বের করে নিয়ে যাবে।'

'গাড়িতে প্যারিস থেকে বেরুলো যায় না?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল। 'ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে—'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইসরায়েল। 'রোড ব্লক। একটা ইঁদুরও বেরুতে পারবে না প্যারিস থেকে।'

এমনকি স্বয়ং কাফার্ডও নয়, ভাবল নোয়েল। 'এই পা নিয়ে চলতে পারবে?' দ্রুত চিন্তা করছে ও, একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।

হাসার ভঙ্গিতে বাঁকা হল ঠোঁট। 'আমি এ পা নিয়ে চলতে পারব না।'

নোয়েল তাকাল ওর দিকে, কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। এমন সময় খুলে গেল দরজা। বিশালদেহী, প্রকাণ্ড কাঁধের এক দাড়িঅলা ঢুকল ঘরে। হাতে কুঠার। সে হেঁটে গেল বিছানার ধারে। ইসরায়েল কাৎজের গা থেকে টেনে সরাল চাদর। লোকটা কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল নোয়েলের। জেনারেল স্কাইডার এবং আলবিনো গেস্টাপো কর্নেলের চেহারা ভেসে উঠল। ওরা ওকে ধরতে পারলে কী করবে ভাবল।

'আমি তোমাকে সাহায্য করব,' বলল নোয়েল।

ক্যাথেরিন
ওয়াশিংটন—হলিউড : ১৯৪১

৭

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার যেন জীবনের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। বিল ফ্রেজার যখন শহরে থাকেন, প্রতিরাতে ওরা একত্রে ডিনার করে, তারপর কনসার্ট দেখতে যায় অথবা থিয়েটারে। তিনি আর্লিংটনের কাছে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে দিয়েছেন ক্যাথেরিনকে। ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ক্যাথেরিন আপত্তি করেছে। বাড়িভাড়া সে নিজেই দেবে। তিনি ওকে কাপড়চোপড় এবং গহনা কিনে দিয়েছেন। আপত্তি করেছিল ক্যাথেরিন, বিব্রত বোধ করেছে, তবে শেষে ও তর্ক করা বাদ দেয়ায় যারপরনাই খুশি হয়েছেন ফ্রেজার।

তুমি স্বীকার করো বা না করো, মনে মনে বলে ক্যাথেরিন, তুমি আসলে এখন রক্ষিতা। শব্দটা সবসময় তার কাছে সস্তা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে রক্ষিতা মানে সস্তাদরের নারী যাদের দিন কাটে হতাশার মাঝে। এখন সেটাই ঘটছে ক্যাথেরিনের জীবনে। তবে সস্তা রক্ষিতার মতো জীবন নয় ওর। সে আসলে যে-মানুষটিকে ভালোবাসে তার সঙ্গে ঘুমাচ্ছে। এর মধ্যে নোংরামোর কিছু নেই। এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

ফ্রেজার সঙ্গী হিসেবে অত্যন্ত সমঝদার মানুষ, ক্যাথেরিনের মনে হয় ওরা যেন বহুদিন ধরে একইসঙ্গে আছে। ক্যাথেরিন এখন মানুষটাকে খুব ভালো বুঝতে পারে। জানে ফ্রেজার কোন্ পরিস্থিতিতে কীরকম প্রতিক্রিয়া জানাবেন, তাঁর প্রতিটি মুডের খবর ক্যাথেরিনের নখদর্পণে। সেক্স ওদের সম্পর্কের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।

ফ্রেজারের অনুপস্থিতিতে তার অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি চালাচ্ছেন সিনিয়র অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ ওয়ার্লেস টার্নার। বড় ধরনের কোনো সমস্যা হলেই কেবল ফ্রেজারকে তাদের দরকার হয়। ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিজেরাই সামলে নেন ওয়ালেস। এজেন্সি নিয়ে ক্যাথেরিনের সঙ্গে আলোচনা ফ্রেজারের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, ওকে ব্যবহার করছেন সাইনবোর্ড হিসেবে। তিনি লক্ষ করেছেন

বাণিজ্যে ক্যাথেরিনের মাথা খুব সাফ। মাঝে মাঝে নানান পরামর্শ দেয় ক্যাথেরিন এজেন্সির ক্যাম্পেইনের জন্য। ওগুলো বেশ কাজেও লাগে।

'আমি স্বার্থপর না হলে তোমাকে এজেন্সির অ্যাকাউন্টের কাজে লাগিয়ে দিতাম, ক্যাথেরিন,' এক রাতে ডিনারে বললেন ফ্রেজার। ওর হাতে হাত রাখলেন, 'কিন্তু তোমাকে আমি সাংঘাতিক মিস করব। আমি চাই তুমি এখানে, আমার সঙ্গে থাকো।'

'আমি এখানেই থাকতে চাই, বিল। এখানকার কাজ উপভোগ করছি আমি।' বলল ক্যাথেরিন।

এক বিকেলে ক্যাথেরিন অফিসে বসে কাজ করছে, ঘরে ঢুকলেন ফ্রেজার।

'আজ রাতে বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'খুব ভালো হয়। কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ভার্জিনিয়া। বাবা-মার সঙ্গে ডিনার করব।'

মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন। বিস্মিত। 'ওঁরা আমাদের সম্পর্কের কথা জানেন?'

'সব কথা জানেন না,' মুখ টিপে হাসলেন ফ্রেজার। 'শুধু জানেন আমার দারুণ এক তরুণী সহকারী আছে এবং তাকে আমি ডিনারে নিয়ে আসছি।'

হতাশার খোঁচা খেল ক্যাথেরিন তবে চেহারায় ফুটতে দিল না ভাব। 'বেশ,' বলল ও। 'আমি বাড়ি যাচ্ছি ফ্রেশ হয়ে নিতে।'

'তোমাকে সাতটার সময় তুলে নেব আমি।'

'ঠিক আছে।'

ভার্জিনিয়ার নয়নাভিরাম পাহাড় সারির মাঝখানে ফ্রেজারদের বাড়ি। ছয় একর জমি নিয়ে ঔপনিবেশিক আমলের খামারবাড়ি। চারপাশে ঝলমল করছে তাজা, সবুজ ঘাস। সপ্তদশ শতকে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটি।

'এত সুন্দর বাড়ি জীবনে দেখিনি আমি,' উচ্ছ্বসিত ক্যাথেরিন।

'আমেরিকার অন্যতম সেরা ব্রিডিং ফার্ম এটি,' জানালেন ফ্রেজার।

দারুণ দেখতে কতগুলো ঘোড়া বোঝাই আস্তাবল পাশ কাটাল গাড়ি, ক্ষুদ্র চারণভূমি এবং কেয়ারটেকারের কুটির চোখে পড়ল ক্যাথেরিনের।

'এ যেন অন্য এক ভুবন,' বলল ক্যাথেরিন। 'তুমি এখানে বড় হয়ে উঠেছ ভাবতেই ঈর্ষা হচ্ছে।'

'খামারবাড়িতে থাকতে চাও?'

'এটা খামারবাড়ি নয়,' শুকনো গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'যেন গোটা গ্রাম তুলে এনেছ এখানে।'

ফ্রেজার ফিরলেন ওর দিকে। 'আমার বাবা-মা একটু সেকেলে টাইপের। তবে

তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তুমি নিজের মতো থাকবে। নার্ভাস লাগছে?'

'নাহ্,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'ভয় লাগছে।' আসলে মিথ্যা বলেছে ও। কৌতূহল লাগছে।

ওরা গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছে, ছুটে এল এক বাটলার। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে খুলে ধরল দরজা, স্বাগত জানাল হাসিমুখে।

কর্নেল ফ্রেজার এবং তাঁর স্ত্রী যেন গল্পের বই থেকে উঠে আসা দুজন মানুষ। ভয়ানক বুড়ো আর দুর্বল ওরা। একসময়ে নিশ্চয় দেখতে সুদর্শন ছিলেন কর্নেল ফ্রেজার। এখন তাঁর বিবর্ণ কার্বনকপিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর ছেলে বুড়ো হলে এমনই দেখতে হবেন। কর্নেলের মাথার চুল ধবধবে সাদা, নড়াচড়া করতে রীতিমতো কষ্ট হয় তাঁর। চোখের রঙ ম্লান নীল, হাতের চামড়া কুঁচকে গেছে বাতরোগে। তাঁর স্ত্রীর চেহারায় আভিজাত্য রয়েছে, রয়ে গেছে যৌবনের সৌন্দর্যের ছাপ। তিনি আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন ক্যাথেরিনকে।

ক্যাথেরিনের মনে হল তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে জেরা করার জন্য। সারা সন্ধ্যা ওকে ফ্রেজার-দম্পতি একের-পর-এক প্রশ্ন করে গেলেন। নিজের বাবা-মা এবং শৈশব সম্পর্কে বলল ক্যাথেরিন। একের-পর-এক স্কুল-পাল্টানোর বিষয়টি মজা করে বর্ণনা করল। যেন এতে অ্যাডভেঞ্চার আছে, কষ্ট নেই। কথা বলছে, ফ্রেজার গর্বিত হাসি মুখে এঁটে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

ডিনারটা দারুণ সুস্বাদু ছিল। পুরানো ফ্যাশনের ডাইনিংরুমে মোমের আলোয় ডিনার করল ওরা। ঘরে মার্বেলপাথরের ফায়ারপ্লেস আছে, এবং চাকরবাকরের কোনো অভাব নেই। ক্যাথেরিন ভাবল চাইলে এ জীবন তার হতে পারে। ও জানে ফ্রেজার তাকে ভালোবাসে। কিন্তু তবু যেন কিসের একটা অভাব অনুভব করছিল ও, উত্তেজনা। *হয়তো খুব বেশি প্রত্যাশা করছি আমি,* ভাবল ক্যাথেরিন। *বই পড়ে আর সিনেমা দেখে দেখে শুধু ফ্যান্টাসির রাজ্যে উড়ে বেড়াই আমি। গোল্লায় যাক এসব বই আর সিনেমা।* কর্নেলের দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। কুড়ি বছর পরে বিল ফ্রেজারের চেহারা অবিকল তার বাবার মতো হবে—দুর্বল, পলকা, ভঙ্গুর। বাকি সন্ধ্যাটা চুপ করে থাকল ও।

বাড়ি ফেরার পথে জানতে চাইলেন ফ্রেজার, 'ভালো কেটেছে সন্ধ্যা?'

'চমৎকার। তোমার বাবা-মাকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার।'

'তোমাকেও তাদের খুব ভালো লেগেছে।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল ক্যাথেরিন।

পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাথেরিন আর ফ্রেজার জকি ক্লাবে ডিনার করছেন, ফ্রেজার বললেন এক হপ্তার জন্য তাঁকে লন্ডন যেতে হবে। 'তোমাকে মজার একটা কাজ দিয়ে যাব আমি,' বললেন তিনি। 'সেনাবাহিনী একটা ছবি বানাচ্ছে। হলিউডে। আর্মি এয়ার কর্পস ছবিটি বানাচ্ছে। আশা করি তুমি ব্যাপারটা সামাল দিতে পারবে।'

'আমি!' অবিশ্বাস ক্যাথেরিনের চোখে, 'আমি একটা ব্রাউনিং পর্যন্ত লোড করতে জানি না। ট্রেনিং ফিল্ম সম্পর্কে কী জানব?'

'সবাই যা জানে তা-ই জানবে,' মুচকি হাসলেন ফ্রেজার। 'তবে তোমার চিন্তা করতে হবে না। ওদের প্রডিউসার আছে। আর্মি অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করাবে।'

'কেন?'

'সৈনিকরা হয়তো সৈন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে চাইবে না। আমি বিকেলে জেনারেল ম্যাথিউসের সঙ্গে কথা বলেছি। 'গ্ল্যামার' শব্দটি শতাধিক বার উচ্চারণ করেছেন তিনি। ওরা ওটাই বিক্রি করতে চান। আমেরিকার তরুণদের আকর্ষণ করতে চাইছেন।'

'তো, আমার কাজটা কী?' জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তা দেখা। তোমার অনুমোদনই চূড়ান্ত। কাল সকাল নটায় লস এঞ্জেলসগামী বিমানে তোমার জন্য রিজার্ভেশন থাকছে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন, 'আচ্ছা।'

'আমাকে মিস করবে না?'

'তুমি ভালো করেই জবাবটা জানো,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

'তোমার জন্য একটা উপহার নিয়ে আসব আমি।'

'আমার উপহারের দরকার নেই। শুধু নিরাপদে ফিরে এসো।' ইতস্তত করল ও। 'পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে, না, বিল?'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'হ্যাঁ। খুব শীঘ্রি বোধহয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছি আমরা।'

'কী ভয়ংকর!'

'যুদ্ধে না জড়ালে অবস্থা আরো ভয়ংকর হবে।' শান্ত গলা তাঁর। 'হিটলার যদি চ্যানেল পার হবার সিদ্ধান্ত নেয়, ব্রিটিশরা তাকে বাধা দিতে পারবে বলে মনে হয় না।' নীরবে কফি শেষ করল ওরা। বিল মিটিয়ে দিলেন ফ্রেজার।

'বাসায় আজ রাতটা থাকবে আমার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আজ রাতে নয়,' বলল ক্যাথেরিন। 'কাল তোমাকে সকালে উঠতে হবে। আমাকেও।'

'ঠিক আছে।'

ক্যাথেরিনকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন ফ্রেজার। বিছানায় শোয়ার সময় ক্যাথেরিনের মনে হল সে যে কেন বিলের সঙ্গে তাঁর বাসায় গেল না।

জবাবটা পেল না ও।

হলিউডকে ঘিরে বড় হয়ে উঠেছে ক্যাথেরিন যদিও জীবনেও সে যায়নি ওখানে।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে শত শত ঘণ্টা কেটেছে তার, বিশ্বচলচ্চিত্রের রাজধানীতে তৈরি জাদুর স্বপ্নের মাঝে ডুবে থেকেছে।

বারব্যাঙ্ক বিমানবন্দরে অবতরণ করল ক্যাথেরিনের বিমান। ভেতরে ভেতরে সে খুবই উত্তেজিত। তাকে হোটেলে নিয়ে যেতে অপেক্ষা করছিল একটা লিমুজিন। সূর্যালোকিত, চওড়া রাস্তা ধরে যাবার সময় ক্যাথেরিনের প্রথমেই যে জিনিসটা নজর কাড়ল তা হল পামগাছ। এসব গাছ সম্পর্কে বইতে পড়েছে সে, ছবি দেখেছে, কিন্তু বাস্তবের দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর। পামগাছগুলো যেন ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র, লম্বা শরীর নিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে, নিচের অংশগুলো নমনীয় গুঁড়ি, ওপরের অংশ অপূর্ব সুন্দর।

একটা বিশাল ভবনের দিকে যাচ্ছে ওরা। ভবনটা কারখানার মতো। প্রবেশপথের বিশাল সাইনবোর্ডে লেখা 'ওয়ার্নার ব্রস', তার নিচে 'Combining good pictures with good citizenship'। গাড়ি গেটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ক্যাথেরিনের মনে পড়ল জেমস কাগনি অভিনীত ইয়াঙ্কি ডুডল ডান্ডি এবং বেটি ডেভিসের 'ডার্ক ভিক্টরি' ছবির কথা। সে মনে মনে হাসল।

ওরা পার হয়ে এল হলিউড বোল, বাইরে থেকে প্রকাণ্ড লাগছে। মোড় নিল থাইল্যান্ড এভিন্যুতে এবং পশ্চিমে হলিউড বুলেভার্ডের দিকে চলল। ওরা পার হল ইজিপশিয়ান থিয়েটার এবং পশ্চিমে, দুই ব্লক পরে গ্রাউম্যানস চাইনিজ। ড্রাইভার সানসেট বুলেভার্ড ধরে বেভারলি হিলস হোটেলের দিকে চলল। 'হোটেলটা আপনার ভালো লাগবে মিস। এটা পৃথিবীর সেরা হোটেলের একটি।'

এত সুন্দর হোটেল কোনোদিন দেখেনি ক্যাথেরিন। সানসেট-এর উত্তরে এটা, অর্ধবৃত্তাকারে পামগাছের সারি ঘিরে আছে বড় বড় বাগান। চমৎকার একটি ড্রাইভওয়ে বাঁক নিয়ে চলে গেছে হোটেলের সদরদরজায়। এক উৎসাহী তরুণ অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ক্যাথেরিনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তার ঘরে। এটা হোটেলের মূলভবনের পেছনের একটি অভিজাত বাংলো। টেবিলে ফুলের তোড়া রাখা হয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, আরেকটি আরো বড় এবং সুন্দর তোড়ার সঙ্গে বাঁধা কার্ডে লেখা : 'যদি তোমার ওখানে যেতে পারতাম আমি অথবা তুমি চলে আসতে এখানে। ভালোবাসা। - বিল।' অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ক্যাথেরিনকে তিনটি টেলিফোন ম্যাসেজ দিল। সবগুলোই এসেছে ট্রেনিং ফিল্মের প্রযোজক অ্যালান বেঞ্জামিনের কাছ থেকে। বিলের কার্ড পড়ছে ক্যাথেরিন, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। দৌড়ে গিয়ে ফোন তুলল ও, আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'বিল?' না, বিল নয়। ফোন করেছে অ্যালান বেঞ্জামিন।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বাগতম, মিস আলেকজান্ডার,' রিসিভারে ভেসে এল খনখনে কণ্ঠ। 'কর্পোরাল অ্যালান বেঞ্জামিন বলছি। এ ছবির প্রডিউসার।'

কর্পোরাল। অথচ ক্যাথেরিন ভেবেছে দায়িত্বে থাকবে ক্যাপ্টেন অথবা কর্নেল।

'কাল থেকে আমরা শুটিং শুরু করব। আপনাকে কি জানানো হয়েছে যে

আমরা সৈনিকদের বদলে অভিনেতাদের নিচ্ছি?'

'শুনেছি,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

'কাল সকাল নটায় শুরু হবে শুটিং। সকাল আটটার মধ্যে এখানে চলে আসতে পারলে সবকিছুর ওপর একটু নজর বোলাতে পারতেন। আপনি জানেন আর্মি এয়ার কর্পস কী চায়।'

'ঠিক,' উৎফুল্ল গলায় বলল ক্যাথেরিন। যদিও ওর ধারণা নেই আর্মি এয়ার কর্পস কী চায়।

'আমি সকাল সাড়ে সাতটায় আপনার ওখানে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।' বলল বেঞ্জামিন। 'আপনাকে আধঘন্টার মধ্যে মেট্রো পৌঁছে দেবে। ওটা কালভার সিটিতে। আমি স্টেজ থার্টিনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।'

ঘুমাতে ঘুমাতে সকাল চারটা বাজল। কিন্তু যখন ফোন বাজতে লাগল, ক্যাথেরিনের মনে হল ও মাত্র চোখ বুজেছে। অপারেটর জানাল ওর জন্য একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছে।

ত্রিশ মিনিট বাদে ক্যাথেরিন রওনা হয়ে গেল মেট্রো গোল্ডউইন মেয়রের উদ্দেশে।

এটা পৃথিবীর বৃহত্তম সিনেমা স্টুডিও। এ স্টুডিওতে আছে বত্রিশটি সাউন্ড স্টেজ। প্রকাণ্ড থালবার্গ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এ কাজ করেন লুই বি মেয়র তার পঁচিশজন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং শো-বিজনেসের খ্যাতনামা কজন পরিচালক, প্রযোজক ও লেখকদের নিয়ে। লট দুইতে রয়েছে বিশাল আউটডোর সেট। এখানে তিন মিনিটের মধ্যে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন সুইস আল্পস, একটি ওয়েস্টার্ন শহর, ম্যানহাটানের একটি ব্যস্ত ব্লক এবং হাওয়াইর সমুদ্রসৈকত থেকে। লট তিনে আছে লাখ লাখ ডলার দামের প্রপস, ফ্লাট সেট।

এ সবকিছুই ক্যাথেরিনকে ব্যাখ্যা করে শোনাল তার তরুণী গাইড। ক্যাথেরিনের স্টেজ তেরোতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেয়েটিকে। 'এটা নিজেই একটা শহর,' গর্বের সুরে বলল গাইড। 'আমরা আমাদের নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, প্রতিদিন ছয় হাজার মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি এবং নিজেদের সেট নিজেরাই বানাই। আমরা পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল। আমাদের কারো দরকার পড়ে না।'

'শুধু দর্শক ছাড়া।'

ওরা রাস্তা ধরে হাঁটছে, একটা নকল প্রাসাদ দেখতে পেল ক্যাথেরিন। পেছনে একটা হ্রদ। ব্লকের পরে সানফ্রান্সিসকো থিয়েটারের লবি। প্রেক্ষাগৃহ নয়, শুধুই লবি। জোরে হেসে উঠল ক্যাথেরিন। চমকে তার দিকে তাকাল গাইড।

'কোনো সমস্যা?' জানতে চাইল তরুণী।

'না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'সব ঠিক আছে।'

ডজনখানেক এক্সট্রা অভিনেতা হেঁটে গেল রাস্তা দিয়ে। কাউবয় এবং

ইন্ডিয়ানরা একসঙ্গে গপসপ করতে করতে সাউন্ড স্টেজের দিকে এগোচ্ছে। এককোনা দিয়ে হুট করে বেরিয়ে এল এক লোক। ক্যাথেরিন তাকে এড়ানোর জন্য এক কদম পিছু হটল। তখন চোখে পড়ল এ বর্মপরা এক নাইট। তার পেছন পেছন হেঁটে আসছে বেদিং সুট-পরা মেয়েরা। ক্যাথেরিন মনে মনে বলল, সে অবশ্যই পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করবে। তাঁর বাবা এখানে থাকলে খুব ভালো হত। তিনি খুব মজা পেতেন।

'আমরা পৌঁছে গেছি,' বলল গাইড। ওরা প্রকাণ্ড ধূসর রঙের একটি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশের সাইনবোর্ডে লেখা : *STAGE 13*।

'আমি এখানেই বিদায় নিতে চাই। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

'না,' বলল ক্যাথেরিন, 'ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল গাইড। ক্যাথেরিন সাউন্ড স্টেজের দিকে ফিরল। দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলছে : **লাল আলো জ্বললে প্রবেশ নিষেধ**। আলো নেভানো। ক্যাথেরিন দরজার হাতল ধরে টান দিল। খুলল না। ভয়ানক ভারী দরজা। খুলতে জান বেরিয়ে গেল ওর।

ভেতরে পা রাখল ক্যাথেরিন। এখানে আরেকটি দরজা। প্রথমটির মতোই প্রকাণ্ড এবং ভারী। যেন ডিকমপ্রেশন চেম্বারে ঢুকছে ও।

বিশালকায় সাউন্ডস্টেজে ছোটাছুটি করছে লোকজন, যেন রহস্যময় খবর নিয়ে ব্যস্ত প্রত্যেকে। একদল লোকের পরনে এয়ার কর্পস ইউনিফর্ম। ক্যাথেরিন বুঝতে পারল এই অভিনেতারাই এ ছবিতে কাজ করবে। সাউন্ডস্টেজের দূরপ্রান্তে একটি অফিস। তাতে চেয়ার-টেবিল সবই আছে। দেয়ালে ঝুলছে বড়সড় মিলিটারি ক্যাপ। টেকনিশিয়ানরা সেট-এ আলো জ্বেলেছে।

'মাফ করবেন,' এক লোককে পাশ দিয়ে যেতে দেখে তাকে থামাল ক্যাথেরিন, 'মিস্টার অ্যালান বেঞ্জামিন আছেন এখানে?'

'বাঁটু কর্পোরাল?' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'ওইতো ওখানে।'

ঘুরল ক্যাথেরিন। দুর্বল কাঠামোর এক লোক গায়ে ঝলমলে একটা ইউনিফর্ম পরেছে, তাতে কর্পোরালের স্ট্র্যাইপ। সে জেনারেলের পোশাক পরা এক লোককে বকছে।

'বালের কাস্টিং ডিরেক্টর যা-খুশি বলুক গে,' গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে সে। 'জেনারেলের গুষ্টি মারি। আমি নন-কমন চাই। সবাই সর্দার হতে চায়, ইন্ডিয়ান হওয়ার ইচ্ছে কারো নেই।'

'মাফ করবেন,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।'

'থ্যাংক গড,' বলল বেঁটে মানুষটা। ফিরল অন্যদের দিকে, কণ্ঠে তিক্ততা। 'মজা-মস্তি শেষ, গাধার দল। ওয়াশিংটন চলে এসেছে।'

চোখ পিটপিট করল ক্যাথেরিন। সে কিছু বলার আগেই ক্ষুদ্র লোকটি বলে উঠল, 'আমি জানি না এখানে কী করছি আমি। আমি ডিয়ারবর্নে বাৎসরিক

পঁয়ত্রিশশো ডলারে কাজ করতাম একটি আসবাব বিষয়ক পত্রিকায়। এরপর আমাকে সিগন্যাল কর্পসে ঢোকানো হয় এবং ট্রেনিং ফিল্ম করার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি এমন অগোছালো কাজ জীবনে দেখিনি।' পেটে হাত রেখে গুঙিয়ে উঠল সে। 'আমার আলসার হয়ে যাচ্ছে। এবং আমি এমনকি শো-বিজনেসেও নেই। এক্সকিউজ মি।'

ঘুরে হনহন করে এগোল সে দরজার দিকে, ক্যাথেরিনকে ওখানে রেখে। চারপাশে অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল ও। সবাই স্থিরচোখে দেখছে ওকে, ওর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

রোগা-পাতলা, ধূসর চুলের, সোয়েটার-পরা এক লোক এগিয়ে এল ক্যাথেরিনের দিকে মুখে হাসি ফুটিয়ে।

'সাহায্য লাগবে?'

'আমার অলৌকিক সাহায্য দরকার,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি এখানকার চার্জে আছি। কিন্তু জানি না আমাকে আসলে কী করতে হবে।'

দাঁত বের করল লোকটা। 'হলিউডে স্বাগতম। আমি টম ও ব্রায়েন, এ. ডি.।'

ক্যাথেরিন হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে থাকল।

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। আপনার বন্ধু কর্পোরালের ছবিটি পরিচালনার কথা। কিন্তু আমার ধারণা সে আর ফিরছে না।'

'আপনি কদ্দিন ধরে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়রে কাজ করছেন?'

'পঁচিশ বছর।'

'আপনি ছবিটা বানাতে পারবেন?'

লোকটার ঠোঁটের কিনারা কুঁচকে গেল। 'চেষ্টা করতে পারি।' গম্ভীর গলা তার। 'আমি উইলি ওয়াইলারের সঙ্গে ছটা ছবি করেছি।' তার চাউনি সিরিয়াস। 'তবে যতটা খারাপ মনে হচ্ছে পরিস্থিতি ততটা খারাপ না। শুধু দরকার খানিকটা সমন্বয়। চিত্রনাট্য লেখা হয়ে গেছে, সেটও রেডি।'

'ভালো,' বলল ক্যাথেরিন। সাউন্ড স্টেজে তাকাল ও, ইউনিফর্ম পরা অভিনেতাদের দেখল। অনেকের গায়েই পোশাকটা লাগেনি একদম, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে এ জিনিস গায়ে দিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করছে।

'এরা যেন নেভির রিক্রুটিং অ্যাড করতে এসেছে,' মন্তব্য করল ক্যাথেরিন।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ও. ব্রায়েন।

'এই ইউনিফর্ম কোত্থেকে আনা হয়েছে?'

'ওয়েস্টার্ন কস্টিউম। আমাদের ওয়াড্রোব ডিপার্টমেন্টের কাছে মাল নেই। ফুরিয়ে গেছে। আমরা তিনটে যুদ্ধের ছবি বানাচ্ছি।'

তীক্ষ্ণচোখে লোকগুলোকে দেখল ক্যাথেরিন। 'আধডজনের গায়ে ইউনিফর্ম তো একেবারেই লাগেনি। ওদেরকে বাদ দিয়ে কাজ করা যায় কিনা দেখেন।'

মাথা ঝাঁকাল ও. ব্রায়েন। 'দেখছি।'

ক্যাথেরিনকে সে এক্সট্রাদের দলটার দিকে পা বাড়াল। প্রকাণ্ড স্টেজে যেন মাছের বাজার বসেছে। চিৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

'শোনো ছেলেরা,' হাঁক ছাড়ল ও. ব্রায়েন। 'ইনি মিস আলেকজান্ডার। এখানকার সমস্ত চার্জ এখন থেকে ওনার।'

কয়েকজন শিস দিয়ে উঠল, কেউ 'ম্যাও' ডাকল।

'ধন্যবাদ,' হাসল ক্যাথেরিন। 'আপনাদের বেশিরভাগের পোশাকই ঠিক আছে। তবে কয়েকজনকে ওয়েস্টার্ন কস্টিউমে গিয়ে আলাদা ইউনিফর্ম নিয়ে আসতে হবে। লাইনে দাঁড়ান সবাই, তাহলে ভালো করে আপনাদের দেখতে পারব।

'আপনাকেও ভালো করে দেখতে চাই। আজ রাতে ডিনারে কী করছেন?' চেঁচাল এক অভিনেতা।

'আমার স্বামীর সঙ্গে ডিনার করছি,' বলল ক্যাথেরিন। 'তার খেলা শেষ হবার পরপর।'

ও. ব্রায়েন লোকগুলোকে লাইনে দাঁড় করাল। কিন্তু লাইনটা সোজা হল না, আঁকাবাঁকা হয়ে থাকল। হাসাহাসি, চেঁচামেচি শুনে বিরক্তমুখে ঘুরল ক্যাথেরিন। একজন এক্সট্রা একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটা যা বলছে তাই শুনে হাসিতে ফেটে পড়ছে তারা। কিছুক্ষণ ওদেরকে দেখল ক্যাথেরিন, তারপর হেঁটে গেল লোকটার সামনে। 'এক্সকিউজ মি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?'

ধীরে ধীরে ঘুরল লোকটা। 'আপনি কি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?' অলস ভঙ্গিতে জানতে চাইল সে।

'জি,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'আমরা কাজে লেগে যেতে চাই।' চলে এল ও।

লোকটা ফিসফিস করে কী যেন বলল মেয়েগুলোকে, তারা হি হি করে হাসল। লোকটা তারপর ধীরপায়ে এগোল ক্যাথেরিনের দিকে। সে বেশ লম্বা, রোগা, চেহারায় রয়েছে অদ্ভুত কাঠিন্য। অত্যন্ত সুদর্শন দেখতে। তার চুলের রঙ নীলচে-কালো, চোখ কালো। তার কণ্ঠ ভরাট, কথা বলে খুব মজা করে। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে ক্যাথেরিনকে।

'আপনি কি কাজ করতে চান?' পাল্টা প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন।

'অবশ্যই,' জবাব দিল সে।

ক্যাথেরিন এক্সট্রাদের সম্পর্কে একটা লেখায় পড়েছে এরা অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তাদের জীবন কেটে যায় সাউন্ডস্টেজে, জনতার ভূমিকায় তারা অভিনয় করে, এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না বললেই চলে। তার সামনে দাঁড়ানো এ লোকটি এক্সট্রাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ লোক নিঃসন্দেহে সুদর্শন, হয়তো তার শহরের কেউ বলেছে হলিউডে এলে তারকা হতে পারবে। তাই এসেছে।

'কিছু ইউনিফর্ম পাল্টাতে হবে,' বলল ক্যাথেরিন।

'আমারটাতে কোনো সমস্যা আছে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

তীক্ষ্ণচোখে দেখল ক্যাথেরিন। নাহ্, এর ইউনিফর্ম ঠিকই আছে। তার টিউনিক দেখল ও। কাঁধে ক্যাপ্টেনের ব্যাজ। বুকে রঙিন ফিতে।

'চলবে তো, বস্?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'আপনাকে কে বলল যে আপনি ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় অভিনয় করবেন?'

ক্যাথেরিনকে দেখল লোকটা। সিরিয়াস গলায় জবাব দিল, 'আইডিয়াটা একান্ত আমার নিজের। আমাকে কি ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় মানাবে না?'

মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, 'না, মানাবে না।'

চিন্তা করার ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল সে। 'ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট?'

'তাও না।'

'সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট?'

'আপনাকে অফিসারের ভূমিকায় একদম মানাবে না।'

কৌতুক নিয়ে ক্যাথেরিনকে লক্ষ করছে লোকটা। 'তাই? আর কোনো সমস্যা?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাথেরিন, 'মেডেলগুলো। ওগুলো পরেছেন কেন?'

হেসে উঠল লোকটা, 'ভাবলাম এতে এই ছবিটাতে একটু রঙ চড়ানো যাবে।'

'আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন,' বলল ক্যাথেরিন, 'আমরা এখনো যুদ্ধে জড়াইনি। ওসব কোনো কার্নিভালে পরে যাবেন।'

মুচকি হাসল লোকটা, 'ঠিক বলেছেন, আচ্ছা, কয়েকটা খুলে ফেলছি।'

'সবগুলো খুলে ফেলুন,' বলল ক্যাথেরিন।

সেই দুর্বিনীত, অবাধ্য ভঙ্গিতে হাসল সে আবার। 'রাইট, বস্।'

দাবড়ে উঠল ক্যাথেরিন। 'আমাকে বস্ বলবেন না।' সে ও. ব্রায়েনের দিকে গটগট করে এগোল কথা বলার জন্য।

ক্যাথেরিন আটজনকে ফেরত পাঠাল নতুন ইউনিফর্ম পরে আসার জন্য। পরবর্তী ঘণ্টাটা কাটাল ও. ব্রায়েনের সঙ্গে দৃশ্য নিয়ে আলোচনায়। বেঁটে কর্পোরাল অল্পসময়ের জন্য এসে চেহারা দেখিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ লোক শুধু নালিশ করে সবাইকে ঘাবড়ে দিতে জানে।

লাঞ্চের আগেই প্রথম দৃশ্যের শুটিং করে ফেলল ও. ব্রায়েন। কাজটা খারাপ হয়নি মনে হয়েছে ক্যাথেরিনের। সে ওই দুর্বিনীত এক্সট্রাকে শাস্তি দেয়ার জন্য সেটে বসিয়ে রেখে মস্ত একটা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দিয়েছিল মুখস্থ করতে। সে ওটা মুখস্থ করেছে, অভিনয়ও করেছে ঠিকঠাক। শেষে ক্যাথেরিনের দিকে ফিরে বলেছে, 'ঠিক আছে তো, বস্?'

লাঞ্চব্রেকে ক্যাথেরিন প্রকাণ্ড স্টুডিও কমিসারিতে গেল। কিনারে, ছোট একটি টেবিল দখল করল। তার পাশের বড় টেবিলে ইউনিফর্ম-পরা কজন সৈনিক গুলতানিতে ব্যস্ত। দরজার দিকে মুখ করে বসেছে ক্যাথেরিন, দেখল সেই এক্সট্রা

ঢুকেছে ঘরে, সঙ্গে ঝুলে আছে সেই তিনটে মেয়ে। একজন অপরজনকে ধাক্কা মেরে লোকটার কাছে ঘেঁষার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। কেউ কেউ আছে যাকে দেখলেই রক্ত চড়ে যায় মাথায়। এ লোকটা তেমন একজন। একে গিগোলোর ভূমিকায় মানায়। বাস্তবে হয়তো সে তাই।

মেয়েগুলোকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিল সে। মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল ক্যাথেরিনকে। মেয়েগুলোকে ঝুঁকে কী যেন বলল। সবাই একসঙ্গে তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে, ফেটে পড়ল হাসিতে। গোল্লায় যাক ব্যাটা! আরে, লোকটা দেখছি তার টেবিলেই আসছে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে, সবজান্তার হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আপনার সঙ্গে বসতে পারি?'

'আমি—' কথা শেষ করার আগেই বসে পড়ল লোকটা। ওকে দেখছে। গম্ভীর চাউনি।

'চান কী আপনি?' শক্ত গলা ক্যাথেরিনের।

মুচকি হাসিটা বিস্তৃত হল মুখে। 'সত্যি জানতে চান?'

রাগে ঠোঁট কামড়াল ক্যাথেরিন। 'শুনুন—'

'আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম,' দ্রুত বলল সে, 'সকালে কেমন করেছি আমি।' ঝুঁকে এল সামনে। 'সন্তুষ্ট করার মতো?'

'ওদেরকে হয়তো সন্তুষ্ট করতে পারবেন,' মেয়েগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাথেরিন। 'তবে আপনাকে আমার কাঠপুতুল মনে হয়েছে।'

'আপনি কি কোনো কারণে আমার ওপর রেগে আছেন?'

'আপনি যাই করছেন তাতেই আমার রাগ লাগছে,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি আপনার টাইপের মানুষ পছন্দ করি না।'

'আমি কী টাইপের মানুষ?'

'আপনি ভুয়া। আপনি এই ইউনিফর্ম পরে মেয়েগুলোকে বোকা বানাচ্ছেন। কখনো এ পেশায় ঢোকার কথা ভেবেছেন?'

'গুলি খেয়ে মরার জন্য?' হাসল সে।

'আপনাকে দেখলেই আমার গা রি রি করে ওঠে,' বিস্ফোরিত হল ক্যাথেরিন।

'কেন?'

'কেন না জানলে নাই। আমি ব্যাখ্যা দিতে পারব না।'

'চেষ্টা তো অন্তত করুন। আজ রাতে ডিনার করি চলুন। আপনার বাড়িতে। রাঁধতে জানেন?'

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল ক্যাথেরিন, রাগে লাল হয়ে গেছে গাল। 'আর কক্ষনো সেট-এ যেন আপনার চেহারা না দেখি। আমি মি. ও. ব্রায়েনকে বলে দিচ্ছি আজ সকালের কাজের চেকটা যেন আপনাকে দিয়ে দেয়।'

যাওয়ার জন্য ঘুরল ও, কী মনে পড়তে ফিরল আবার, 'আপনার নাম কী?'

'ডগলাস,' জবাব দিল সে। 'ল্যারি ডগলাস।'

পরদিন রাতে ফ্রেজার ফোন করলেন ক্যাথেরিনকে জানার জন্য কাজকর্ম কেমন চলছে। সারাদিন রিপোর্ট দিল সে, শুধু ল্যারি ডগলাসের ঘটনাটা এড়িয়ে গেল।

ফ্রেজার ওয়াশিংটন ফিরলে এ নিয়ে মজা করা যাবে।

পরদিন সকালে ক্যাথেরিন স্টুডিওতে যাওয়ার জন্য কাপড় পরছে, বাজল ডোরবেল। বাংলোর দরজা খুলল ও। এক ডেলিভারি-বয় দাঁড়িয়ে আছে হাতে গোলাপের প্রকাণ্ড তোড়া নিয়ে।

'ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'এখানে সাইন করুন, প্লিজ।'

ফর্মে সাইন করল ক্যাথেরিন।

'খুব সুন্দর ফুল,' তোড়াটা নিতে নিতে বলল ক্যাথেরিন।

'পনেরো ডলার দিন।'

'মানে?'

'ফুলগুলোর দাম। ওগুলো সি.ও.ডি. করা।'

'আমি বুঝতে পারছি না—' ঠোঁট শক্ত করল ক্যাথেরিন। ফুলের সঙ্গে আটকানো কার্ডটা দেখল। খাম থেকে বের করল। কার্ডে লেখা : 'দামটা দিতে পারতাম কিন্তু আমি তো বেকার। ভালোবাসা। ল্যারি।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে কার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন।

'ফুল রাখবেন নাকি রাখবেন না?' জিজ্ঞেস করল ডেলিভারি-বয়।

'রাখব না।' ছেলেটার হাতে গুঁজে দিল তোড়া।

ছেলেটা ওর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকাল। 'উনি বললেন আপনি নাকি হাসবেন। এটা একধরনের প্রাইভেট জোক।'

'আমার হাসি আসছে না,' ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল ক্যাথেরিন।

সারাদিন ফুলের ঘটনাটা তাড়িয়ে বেড়াল ক্যাথেরিনকে। অংহকারী বহু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ওর, কিন্তু ল্যারি ডগলাসের মতো এমন উদ্ধত, দুর্বিনীত জীবনে দেখেনি। এ আসলে ফাঁকা মাথার স্বর্ণকেশী এবং কৃষ্ণকেশীদের মন জয় করে ভাবছে যাকে-খুশি পটানো যাবে। ক্যাথেরিনকেও লোকটা ওই দলে ফেলেছে ভাবতেই রাগে তালু গরম হয়ে গেল ওর। লোকটার কথা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবে ও।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে স্টুডিও ছাড়ছে ক্যাথেরিন, এক অ্যাসিস্ট্যান্ট এগিয়ে এল হাতে একটি খাম নিয়ে।

'আপনি কি এগুলোর অর্ডার দিয়েছিলেন, মিস আলেকজান্ডার?' জিজ্ঞেস করল সে।

সেন্ট্রাল ফাস্টিং-এর একটা স্লিপ এটা। এতে লেখা :

একটি ইউনিফর্ম (ক্যাপ্টেন)

ছটি সার্ভিস রিবন

ছটি মেডেল

অভিনেতার নাম : লরেন্স ডগলাস... (পার্সোনাল চার্জ টু ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার—এম জি এম।)

মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন, লাল হয়ে গেছে চেহারা।

'না।'

অবাক হল সে। 'তাহলে ওদেরকে কী বলব আমি?'

'বলবে যদি মেডেলগুলো পুরস্কার হিসেবে অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে এর দাম দিয়ে দেব আমি।'

তিনদিন পরে ছবির শুটিং শেষ হয়ে গেল। ক্যাথেরিন পরদিন এর রাশি দেখল। পছন্দও হল। ছবিটি কোনো পুরস্কার পাবে না, তবে নির্মাণশৈলী মন্দ নয়। টম ও. ব্রায়েন ভালোই কাজ করেছে।

শনিবার সকালে ক্যাথেরিন ওয়াশিংটনের প্লেনে চড়ে বসল। হলিউড ছেড়ে আসতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সোমবার সকালে অফিসে ঢুকল ও। ওর অনুপস্থিতিতে প্রচুর কাজ জমা পড়ে আছে।

লাঞ্চের ঠিক আগে, তার সেক্রেটারি অ্যানি ইন্টারকমে বলল, 'হলিউড থেকে জনৈক ল্যারি ডগলাস ফোন করেছেন, কথা বলবেন?'

'না,' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। 'ওকে বলে দাও...ঠিক আছে। আমিই বলছি।' বুক ভরে শ্বাস নিল ও, টিপে দিল ফোন বাটন। 'মি. ডগলাস?'

'সুপ্রভাত,' উৎসাহ ল্যারির কণ্ঠে। 'আপনার ঠিকানা খুঁজে পেতে ঘাম ছুটে গেছে। আপনি গোলাপ পছন্দ করেন না?'

'মি. ডগলাস?' শুরু করল ক্যাথেরিন। রাগে কাঁপছে গলা। আবার বুক ভরে দম নিল। 'মি. ডগলাস, আমি গোলাপ ভালোবাসি। তবে আপনাকে পছন্দ করি না। আপনার কোনোকিছুই আমার পছন্দ নয়, বুঝতে পেরেছেন?'

'আপনি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না।'

'আমার যেটুকু জানা দরকার তারচে' বেশিই জানি। আপনি একটা কাপুরুষ, জঘন্য মানুষ। আর কক্ষনো আমাকে ফোন করবেন না।' ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল ক্যাথেরিন। রাগে চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল। লোকটার সাহস কত!

তিনদিন পরে ক্যাথেরিনকে ১০ বাই ১২ সাইজের নিজের একটি ছবি পাঠিয়ে দিল ল্যারি ডগলাস। লিখে দিয়েছে : 'টু দ্য বস্, উইথ লাভ ফ্রম ল্যারি।

ক্যাথেরিন ছবিটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ময়লা রাখার ঝুড়িতে।

পরবর্তী দুই হপ্তায় কমপক্ষে ডজন বার ক্যাথেরিনকে ফোন করল ল্যারি। ক্যাথেরিন অ্যানিকে বলে রেখেছে সে যেন ল্যারিকে কঠোরভাবে বলে দেয় আর

ফোন না করতে এবং ল্যারির ফোনের কথা যেন ক্যাথেরিনকে না বলে। একদিন সকালে অ্যানি ডিকটেশন নিচ্ছে, সে মুখ তুলে চাইল। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'আপনি আমাকে মি. ডগলাসের ব্যাপারে কিছু বলতে নিষেধ করেছেন। তবে উনি আবার ফোন করেছিলেন। তাকে খুব মরিয়া আর... আর মনে হচ্ছিল উনি যেন সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেন।'

'সে বিয়োগের খাতায় চলে গেছে,' শীতল গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'মাথায় বুদ্ধি থাকলে তুমি তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না।'

'আপনার সম্পর্কে উনি অনেক কথা জানতে চেয়েছেন,' ভয়ে ভয়ে বলল অ্যানি। 'তবে আমি কিছুই বলিনি।'

'ভালো করেছ, অ্যানি,' সে আবার ডিকটেশন দিতে লাগল।

বিল ফ্রেজার রোববার সকালে ফিরলেন। ক্যাথেরিন তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসতে গেল। ওকে দেখে খুবই খুশি হলেন ফ্রেজার।

'ক্যাথি,' বললেন তিনি, 'হোয়াট আ লাভলি সারপ্রাইজ। ভাবিইনি তুমি আসবে।'

'আমার আর তর সইছিল না,' হেসে ফ্রেজারকে জড়িয়ে ধরল ক্যাথেরিন। 'তুমি আমাকে অনেক মিস করেছ, না?'

'জানোই তো।'

'হলিউড কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেজার। 'কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

একটু ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। 'ভালোই। ওরা ছবি দেখে খুশি।'

'শুনেছি আমি।'

'বিল, আবার যখন বাইরে যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে,' বলল ক্যাথেরিন।

ফ্রেজার তাকালেন ক্যাথেরিনের দিকে। আনন্দিত।

'অবশ্যই,' বললেন তিনি। 'তোমার অভাব সাংঘাতিক অনুভব করছিলাম। সারাক্ষণ শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।'

'সত্যি?'

'তুমি আমাকে ভালোবাস?'

'অনেক, মি. ফ্রেজার।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি,' বললেন তিনি। 'চলো, আজ রাতটা মজা করি।'

হাসল ক্যাথেরিন। 'চলো।'

'জেফারসন ক্লাবে ডিনার করব।'

ফ্রেজারকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দিল ক্যাথেরিন।

'আমাকে অনেকগুলো ফোন করতে হবে,' বললেন তিনি।

'ক্লাবে আসতে পারবে? আটটায়।'

'আসব,' বলল ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিন নিজের ঘরে ফিরল। কয়েকটি জামাকাপড় কাচল, ইস্ত্রি করল। চুল ধুলো। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গোসল করল। মনে মনে আশা করছিল ল্যারি ডগলাস ফোন করবে। লোকটা তাকে বিরক্ত করছে। কিন্তু তারপরও কেন জানি ওর নামটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ক্যাথেরিন। গোসল শেষে চুল শুকাচ্ছে, এমনসময় বাজল ফোন। শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, তুলল রিসিভার, 'হ্যালো?' ঠাণ্ডা গলা ওর।

ফ্রেজার। 'হাই,' বললেন তিনি। 'কোনো সমস্যা।'

'ন্-না, বিল,' দ্রুত বলল ক্যাথেরিন। 'আ-আমি গোসল করছিলাম।'

'আমি দুঃখিত,' রসিকতার সুরে বললেন তিনি। 'আমি দুঃখিত কারণ এমন একটা সময়ে আমি তোমার সঙ্গে নেই।'

'আমিও,' বলল ক্যাথেরিন।

'ফোন করেছি বলতে যে আমি তোমাকে মিস করছি। দেরি কোরো না।'

হাসল ক্যাথেরিন, 'করব না।'

আস্তে আস্তে ফোন রেখে দিল ক্যাথেরিন। ভাবছে বিলের কথা। এই প্রথম তার মনে হচ্ছে বিল তাঁকে প্রস্তাব দিতে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করবেন মিসেস উইলিয়াম ফ্রেজার হতে রাজি কিনা ক্যাথেরিন। নামটা জোরে উচ্চারণ করল ও, 'মিসেস উইলিয়াম ফ্রেজার'। শুনতে চমৎকার লাগল। ঘড়ি দেখল ক্যাথেরিন। প্রস্তুত হতে লাগল দ্রুত।

জেফারসন ক্লাব এফ স্ট্রিটে। ইটের তৈরি চমৎকার দেখতে একটি ভবন, চারদিকে লোহার বেড়া। অভিজাত ক্লাবগুলোর সেরাদের সেরা এটা। এখানে বংশ-পরম্পরায় সদস্য হতে হয়। বাবা সদস্য থাকলে ছেলে সদস্য হতে পারবে। যদি বাবা সদস্য না থাকেন সেক্ষেত্রে সদস্য হতে হলে ক্লাবের তিনজন সদস্যের সুপারিশ লাগবে। বছরের একবারই সদস্যপদের জন্য প্রস্তাব করা হয়। একবার কেউ কালো-তালিকাভুক্ত হলে সে আর জীবনেও জেফারসন ক্লাবের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। কারণ কঠোর আইন আছে একজন ক্যান্ডিডেটের নাম দুবার প্রস্তাব করা যাবে না।

উইলিয়াম ফ্রেজারের বাবা এ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ফ্রেজার এবং ক্যাথেরিন এখানে হপ্তায় অন্তত একবার ডিনার করে। এখানকার শেফ রথসচাইল্ডের ফরাসি শাখায় টানা কুড়ি বছর কাজ করেছে। এদের রান্না অসাধারণ। ক্লাবের ওয়াইন সেলার শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে গোটা আমেরিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বিশ্বসেরা ডেকোরেটর এ ক্লাবের ডেকোরেশন করেছে। রঙ এবং আলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। মহিলারা মোমের আলোয়

আরো মোহনীয় হয়ে ওঠে। এখানকার সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কেবিনেট কিংবা সুপ্রিমকোর্ট সদস্য, সিনেটর এবং বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা প্রভাবশালী শিল্পপতিরা।

ক্যাথেরিন ক্লাবে ঢুকে দেখল ফ্রেজার ওর জন্য অপেক্ষা করছেন।

'দেরি করে ফেললাম?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'তোমার জন্য সাতখুন মাফ,' প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে দেখছেন ফ্রেজার। 'তুমি কি জানো তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে?'

'জানি,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'সবাই জানে ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার অপূর্ব সুন্দরী।'

'আমি সিরিয়াসলি বলছি, ক্যাথি।'

'ধন্যবাদ বিল,' বলল ক্যাথেরিন, 'আর অমন ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থেকো না তো। অস্বস্তি লাগে।'

'চোখ সরিয়ে নিতে পারছি না যে!' ফ্রেজার ক্যাথেরিনের হাত ধরলেন।

ওয়েটার লুই ওদেরকে কিনারার বুথে বসাল। 'মিস আলেকজান্ডার এবং মি. ফ্রেজার, আপনাদের ডিনার উপভোগ্য হয়ে উঠুক।'

'ড্রিঙ্ক নেবে?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেজার।

'নো, থ্যাংক ইউ,' বলল ক্যাথেরিন।

মাথা নাড়লেন ফ্রেজার। 'তোমাকে কিছু বদাভ্যাস শিখিয়ে দেব আমি।'

'দিয়েছও,' বিড়বিড় করল ক্যাথেরিন।

দাঁত বের করে হাসলেন ফ্রেজার। স্কচ এবং সোডার অর্ডার দিলেন।

ক্যাথেরিন তাঁকে দেখছে। ভাবছে মানুষটা কত ভালো। ও জানে এই লোক তাকে সুখি করতে পারবে। একে বিয়ে করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে ক্যাথেরিন। 'বিল—' ডাকল ও এবং পাথর হয়ে গেল।

ল্যারি ডগলাস হেঁটে আসছে ওদের দিকে, ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছে ক্যাথেরিনকে দেখামাত্র। সেন্ট্রাল কাস্টিং-এর সেই আর্মি এয়ার কর্পস ইউনিফর্ম পরা। লোকটা সোজা ওদের টেবিলে চলে এল। 'হ্যালো,' হাসিমুখে বলল। তবে ক্যাথেরিনকে উদ্দেশ্য করে নয়, কথা বলছে বিলের সঙ্গে। ফ্রেজার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, ল্যারি।'

'আমিও বিল।'

হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন।

ফ্রেজার বললেন, 'ক্যাথি, ইনি ক্যাপ্টেন লরেন্স ডগলাস। ল্যারি, ও মিস আলেকজান্ডার—ক্যাথেরিন।'

ল্যারি ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল, গভীর কালো চোখে ঝিকমিক করছে কৌতুক। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস আলেকজান্ডার।' গম্ভীর

পারা তার।

কথা বলার জন্য মুখ খুলল ক্যাথেরিন, হঠাৎ বুঝতে পারল বলার মতো কিছু আসলে খুঁজে পাচ্ছে না। ফ্রেজার ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যাথেরিন শুধু নড করতে পারল। গলায় রা ফুটবে না ভেবেই চুপ হয়ে রইল।

'আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, ল্যারি?' বললেন ফ্রেজার।

ক্যাথেরিনকে একনজর দেখে নিয়ে বিনীত গলায় বলল ল্যারি, 'আমি যদি আপনাদেরকে বিরক্ত না করে থাকি—'

'অবশ্যই না। বসো।'

ল্যারি ক্যাথেরিনের পাশে বসল।

'তুমি কী নেবে?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেজার।

'স্কচ এবং সোডা,' জবাব দিল ল্যারি।

'আমিও তাই,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল ক্যাথেরিন, 'ডাবল।'

অবাক চোখে ক্যাথেরিনকে দেখলেন ফ্রেজার। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তুমি আমাকে বদাভ্যাস শেখাতে চেয়েছ না!' বলল ক্যাথেরিন। 'এখন থেকে তা শুরু করলাম।'

ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে ল্যারির দিকে ফিরলেন ফ্রেজার। 'জেনারেল টেরির কাছে শুনলাম তুমি নাকি আকাশ এবং মাটি দুজায়গাতেই দারুণ ফাইট দিয়েছ।'

ক্যাথেরিন স্থিরচোখে দেখছে ল্যারিকে। ঝড়ের গতিতে চলছে মস্তিষ্ক। দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছে। 'ওই মেডেলগুলো...' বলল ও।

নিষ্পাপ চোখে ক্যাথেরিনের দিকে ফিরল ল্যারি, 'জি!'

ঢোক গিলল ক্যাথেরিন, 'ওগুলো আপনি কোত্থেকে পেয়েছেন?'

'কার্নিভাল থেকে,' চেহারা গম্ভীর করল ল্যারি।

'কার্নিভালই বটে,' হেসে উঠলেন ফ্রেজার। 'ল্যারি, RAF-এ যুদ্ধবিমান চালায়। ওখানকার আমেরিকান স্কোয়াড্রনের লিডার সে। ওয়াশিংটনে একটা ফাইটার বেস-এ কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য ওকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

ক্যাথেরিন ল্যারির দিকে ফিরল। সে 'ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না' ভঙ্গিতে হাসছে। নাচছে চোখ। পুরোনো সিনেমার মতো ওদের প্রথম সাক্ষাতের প্রতিটি কথা মনে পড়ে গেল ক্যাথেরিনের। ও ল্যারিকে হুকুম দিয়েছিল ক্যাপ্টেনের ব্যাজ আর মেডেল খুলে ফেলতে। বাধ্যগত ছাত্রের মতো তা মেনেও নিয়েছে ল্যারি। এ লোক দুর্দান্ত সাহসী—আর তাকে কিনা ক্যাথেরিন কাপুরুষ বলেছে। ইচ্ছে করল টেবিলের নিচে ঢুকে যায়।

'তুমি শহরে আসছ জানালেই পারতে,' বললেন ফ্রেজার, 'তোমার জন্য চর্বিদার বাছুর রোস্ট করে রাখতাম। তোমার আগমন উপলক্ষে আমাদের বড় পার্টি দেয়া উচিত।'

'বরং এটাই ভালো লাগছে,' বলল ল্যারি। তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, ল্যারির চোখে চোখ রাখতে লজ্জা পাচ্ছে। 'সত্যি বলতে কি,' বলে গেল ল্যারি, 'হলিউডে থাকার সময় আপনার খোঁজ করছিলাম, বিল। শুনলাম আপনি এয়ার কর্পস ট্রেনিং ফিল্ম প্রযোজনা করছেন।'

সিগারেট ধরাতে বিরতি দিল সে, ফুঁ দিয়ে নেভাল দেশলাই। 'আমি সেটে গিয়েছিলাম। পেলাম না আপনাকে।'

'হঠাৎ করে লন্ডন যেতে হয়েছিল,' বললেন ফ্রেজার। 'ক্যাথেরিন ছিল ওখানে। তোমাদের দেখা হয়নি জেনে বিস্ময়বোধ করছি।'

ক্যাথেরিন তাকাল ল্যারির দিকে, ল্যারি ওকে লক্ষ করছে। চোখে কৌতুক। কী ঘটেছে এবার তা বলার সময় এসেছে। কিন্তু কে যেন গলা চেপে ধরে রাখল ক্যাথেরিনের, রা ফুটল না।

ল্যারি বলল, 'প্রচুর ভিড় ছিল সেট-এ। তাই বোধহয় ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি আমার।'

ওকে সাহায্য করছে ল্যারি কিন্তু খুশি হতে পারল না ক্যাথেরিন। মনে হল ফ্রেজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

ড্রিঙ্ক এল। নিজেরটা দ্রুত গলায় চালান করে দিয়ে আরেকটা চাইল ক্যাথেরিন। জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক সন্ধ্যা হতে চলেছে এটা। তাই সে এখান থেকে দ্রুত কেটে পড়তে চায়, পালিয়ে যেতে চায় ল্যারি ডগলাসের সামনে থেকে।

ফ্রেজার ল্যারির কাছে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলেন। ল্যারি খুব মজা করে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। এ আসলে কোনোকিছুই সিরিয়াসভাবে নেয় না। শুরুর দিকে ল্যারিকে সহ্য না হলেও তিন নম্বর ডাবল স্কচ পেটে যাওয়ার পরে ক্যাথেরিনের মনে হতে লাগল এর মতো প্রাণবন্ত মানুষ জীবনে দেখেনি সে। এ লোক জীবনের কাছ থেকে কিছু পায়নি, সবাইকে শুধু বিলিয়ে গেছে। যারা দান করতে ভয় পায় তাদেরকে সে ঠাট্টা করে।

খাবার প্রায় স্পর্শই করল না ক্যাথেরিন। কী খাচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না। ল্যারির চোখে চোখ পড়ল তার। প্রেমভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ল্যারি। তাকে ওর প্রচণ্ড ঝড়, প্রাকৃতিক একটা শক্তি বলে মনে হল। যে মেয়ে ওই ঝড়ের কবলে পড়বে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ল্যারি ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'আমাদের আলোচনায় বোধহয় মিস আলেকজান্ডার যোগ দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না।' বিনীত গলায় বলল সে। 'আমি নিশ্চিত আমাদের দুজনের একত্রিত অভিজ্ঞতার চেয়েও তার জীবনের গল্প অনেক চিত্তাকর্ষক হবে।'

'ভুল,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি খুবই নীরস জীবন যাপন করি। আমি বিলের সঙ্গে কাজ করি।' কথাটা বোধহয় একটু কর্কশই শোনাল, বুঝতে পেরে লাল হয়ে

গেল ক্যাথেরিনের মুখ। 'আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি কথাটা। আমি বলতে চেয়েছি—'

'আপনি কী বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি,' হাসিহাসি মুখ করে বলল ল্যারি। বিলের দিকে ঘুরল। 'ওকে কীভাবে খুঁজে পেলেন?'

'ভাগ্যগুণে পেয়েছি,' উষ্ণগলায় বললেন ফ্রেজার, 'খুবই ভাগ্যবান আমি। তুমি এখনো বিয়ে করোনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারি। 'আমাকে বিয়ে করবে কে?'

ইউ বাস্টার্ড, মনে মনে বলল ক্যাথেরিন। ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। কমপক্ষে আধডজন নারী তাকিয়ে আছে ল্যারির দিকে। কেউ সরাসরি, কেউ আড়চোখে লক্ষ করছে। ল্যারি যেন এক সেক্সুয়াল ম্যাগনেট। 'ইংরেজ মেয়েগুলো কেমন ছিল?' একটু কর্কশই শোনাল ক্যাথেরিনের গলা।

'ভালো,' মৃদুগলায় জবাব দিল ল্যারি। 'তবে মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর সময় খুব বেশি পাই না। আকাশে ব্যস্ত থাকতে হয়।'

তোমার কথা বিশ্বাস হয় না, ভাবল ক্যাথেরিন। *বাজি ধরে বলতে পারি তোমার আশপাশে শত মাইলের মধ্যে কোনো মেয়ের কুমারী থাকার জো নেই।* মুখে বলল, 'বেচারি মেয়েগুলোর জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার। ওরা যে জিনিস মিস করেছে।' গলার স্বর আগের চেয়েও কর্কশ শোনাল।

ফ্রেজার অবাক হলেন ক্যাথেরিনের কথার ঢঙে। 'ক্যাথি!'

'আরেকটা ড্রিঙ্ক নেয়া যাক,' প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল ল্যারি।

'ক্যাথেরিনের অনেক বেশি খাওয়া হয়ে গেছে,' বললেন ফ্রেজার।

'না, তেমন নয়,' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল ক্যাথেরিন। মাতাল হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভয় লাগল। 'আমি বাড়ি যাব।'

'ঠিক আছে,' ফ্রেজার ফিরলেন ল্যারির দিকে। 'ক্যাথেরিনের মদ্যপানে অভ্যাস নেই,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুর বাজল কণ্ঠে।

'আপনাকে কয়েকদিন পরে কাছে পেয়ে উনি বোধহয় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন,' বলল ল্যারি।

ক্যাথেরিনের ইচ্ছে করল জলের গ্লাসটা ছুড়ে মারে লোকটার গায়ে। লোকটাকে তার আবার অপছন্দ হতে শুরু করেছে। কেন তা জানে না।

পরদিন সকালে তীব্র হ্যাংওভার নিয়ে ঘুম ভাঙল ক্যাথেরিনের। মনে হচ্ছে কাঁধের ওপর তিনটে মাথা। তিনটিতেই দমাদম ঢাক পিটানো হচ্ছে। বিছানায় শুয়ে থাকা যন্ত্রণার নড়াচড়া আরো কষ্টের। বমি ভাবটা প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ক্যাথেরিন, সন্ধ্যার সমস্ত স্মৃতি হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল। ব্যথাটা বেড়ে গেল আরো। হ্যাংওভারের জন্য খামোকা সে ল্যারিকে দুষছে। যেন ও না থাকলে মদ খেতে হত না ক্যাথেরিনকে। দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঘুরিয়ে বিছানার পাশে রাখা ঘড়ি দেখল ও। অতিরিক্ত ঘুমিয়েছে সে।

আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়ল ক্যাথেরিন, টলতে টলতে এগোল বাথরুমে। শাওয়ারের সঙ্গে বাড়ি খেল, ঠাণ্ডা জলের কল ছেড়ে দিল, বরফশীতল জল পড়তে দিল গায়ে। গায়ে হিম ঠাণ্ডা পরশটা যেন ছ্যাঁকা দিল, চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। তবে শাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার পরে ভালো লাগল ওর।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে নিজের ডেস্কে ফিরল ক্যাথেরিন। অ্যানি এল লাফাতে লাফাতে। হাতের কাগজটা ওকে দিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'দেখুন!'

প্রথম পাতায় ইউনিফর্ম-পরা ল্যারি ডগলাসের ছবি। নিষ্পাপ হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। ক্যাপশনে লেখা : নতুন ফাইটার ইউনিট গড়ে তুলতে আমেরিকান RAF হিরোর ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্তন। তারপর দুই কলাম লেখা।

'দারুণ না?' চেঁচিয়ে উঠল অ্যানি।

'ভয়ানক,' ক্যাথেরিন ময়লা রাখার ঝুড়িতে ফেলে দিল কাগজ। 'এসো, কাজ শুরু করি।'

অ্যানি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'আমি দুঃখিত। আ-আমি ভাবলাম যেহেতু উনি আপনার বন্ধু, তাই খবরটা দেখলে আপনি খুশি হবেন।'

'সে আমার বন্ধু নয়,' অ্যানিকে শুধরে দিল ক্যাথেরিন। 'শত্রুর চেয়েও বেশি।' অ্যানির মুখের দিকে তাকাল। 'মি. ডগলাসকে ভুলে থাকা যায় না?'

'অবশ্যই,' বিস্ময় এখনো কাটেনি অ্যানির, 'আমি ওনাকে বলেছি আপনি খুশি হবেন।'

কটমট করে তাকাল ক্যাথেরিন, 'কখন?'

'সকালে উনি যখন ফোন করলেন। তিনবার ফোন করেছেন।'

কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ক্যাথেরিন, 'আমাকে বলোনি কেন?'

'আপনি বলেছেন ওনার ফোন এলে আপনাকে যেন না বলি,' হতবুদ্ধি লাগছে অ্যানিকে।

'কোনো নাম্বার দিয়েছে সে?'

'না।'

'বেশ।' ক্যাথেরিনের চোখে ভাসল ল্যারির মুখ। ডাগর, কালো দুই চোখ। 'বেশ।' আবার বলল সে। এবারে আরো দৃঢ়কণ্ঠে। কয়েকটা চিঠি ডিকটেট করল।

অ্যানি ঘর থেকে চলে যাওয়ার পরে ওয়েস্টবাস্কেট থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিল ক্যাথেরিন। ল্যারিকে নিয়ে লেখাটা খুঁটিয়ে পড়ল। জানল ল্যারি আটটি জার্মান বিমান ধ্বংস করেছে। দুবার গুলি খেয়েছে ইংলিশ চ্যানেলে। ক্যাথেরিন ইন্টারকমে অ্যানিকে বলল, 'মি. ডগলাস আবার ফোন করলে আমাকে দিও।'

ভগ্নাংশ পরিমাণ বিরতির পরে অ্যানি বলল, 'আচ্ছা, মিস আলেকজান্ডার।'

লোকটার সঙ্গে বেহুদাই খারাপ ব্যবহার করছে ক্যাথেরিন। স্টুডিওতে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চাইবে ঠিক করল। বলবে ওকে যেন আর ফোন না করে

ল্যারি। সে উইলিয়াম ফ্রেজারকে বিয়ে করতে চলেছে।

বিকেলতক ডগলাসের ফোনের অপেক্ষায় রইল ক্যাথেরিন, তবে ছ'টার সময়ও ওর ফোন এল না। *ও ফোন করবে কেন?* ভাবল ক্যাথেরিন। *সে তো এখন একসঙ্গে ছটা মেয়ের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।*

বেরুবার সময় অ্যানিকে বলল, 'কাল মি. ডগলাস ফোন করলে বলবে আমি অফিসে আসিনি।'

অ্যানি এমনকি চোখ পিটপিট পর্যন্ত করল না। 'জি, মিস আলেকজান্ডার। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

এলিভেটর নিয়ে নিচে নামতে লাগল ক্যাথেরিন। ডুবে গেছে চিন্তায়। কোনো সন্দেহ নেই বিল ফ্রেজার ওকে বিয়ে করতে চাইছেন। ওর জন্য সবচেয়ে ভালো হবে বলে দেয়া যে সে এখুনি বিয়ে করতে চায়। আজ রাতেই কথাটা বলবে। তারপর ওরা মধুচন্দ্রিমায় চলে যাবে। যখন ফিরে আসবে ততদিনে ল্যারি চলে যাবে শহর ছেড়ে।

লবিতে পৌঁছে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ওখানে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ল্যারি ডগলাস। সে মেডেল এবং রিবন খুলে ফেলেছে, কাঁধে সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের ব্যাজ। হেসে ক্যাথেরিনের দিকে এগোল ল্যারি।

'এটা ঠিক আছে?' উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

ক্যাথেরিন বিস্ফারিত চোখে দেখছে ল্যারিকে, বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি। 'ভুল ইনসিগনিয়া পরা আইনবিরুদ্ধ কাজ নয়?'

'জানি না,' জবাব দিল ল্যারি। 'ভাবলাম আপনি বুঝি জানেন।'

ল্যারি ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, গলা নামাল ক্যাথেরিন। 'আমার সঙ্গে এরকম করবেন না। আমাকে একা থাকতে দিন। আমি বিলের বাগদত্তা।'

'বিয়ের আংটি কই?'

ক্যাথেরিন পাশ কাটাল ল্যারিকে, হনহন করে এগোল স্ট্রিটডোরের দিকে। তার আগেই ওখানে পৌঁছে গেল ল্যারি, ওর জন্য খুলে ধরল দরজা।

রাস্তায় নেমে ক্যাথেরিনের একটা হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিল ল্যারি। ঝিন্‌ন্‌ করে বিদ্যুতের শক খেল ক্যাথেরিন। যেন সারা গা বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েছে। 'ক্যাথি—' শুরু করতে গেল ল্যারি।

'ফর গডস্ শেক,' মরিয়া হয়ে বলল ক্যাথেরিন, 'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

'সবকিছু,' শান্ত গলা ল্যারির, 'আমি তোমাকে চাই।'

'কিন্তু তুমি আমাকে পাবে না।' গুঙিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। 'অন্য কাউকে গিয়ে যন্ত্রণা দাও গে।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, ওকে নিজের দিকে ঘোরাল ল্যারি।

'একথার মানে কী?'

'জানি না,' চোখে জল নিয়ে বলল ক্যাথেরিন, 'আমি জানি না আমি কী বলছি। আ-আমার হ্যাংওভার হয়েছে। আমি মরতে চাই।'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে হাসল ল্যারি, 'হ্যাংওভার সারানোর দারুণ ওষুধ আছে আমার কাছে।' সে ভবনের গ্যারেজের দিকে নিয়ে চলল ক্যাথেরিনকে।

'কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?' আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'আমার গাড়িতে।'

ক্যাথেরিন ওর দিকে তাকাল, বিজয়ের উল্লাস দেখতে চাইল চেহারায়। বদলে দেখল দুর্দান্ত সুদর্শন একটি চেহারা উষ্ণতা এবং আবেগে ভরপুর।

একটি স্পোর্টস কনভার্টিবল নিয়ে এল অ্যাটেনডেন্ট।

ক্যাথেরিনকে গাড়িতে বসতে সাহায্য করল ল্যারি, নিজে চট করে বসে পড়ল হুইলের পেছনে। ক্যাথেরিন সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। জানে ওর গোটা জীবন ভিন্ন এক ধারায় প্রবাহিত হতে চলেছে এবং নিজেকে সে বাধাও দিতে পারছে না। যেন এটা ক্যাথেরিন নয়, অন্য কারো জীবনে ঘটছে।

'তোমার বাসায় নাকি আমার বাড়িতে?' নম্র গলায় জানতে চাইল ল্যারি।

মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, 'তোমার যেখানে খুশি,' তার কণ্ঠ অসহায় শোনাল।

'তাহলে আমার বাড়িতেই চলো।'

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাল ল্যারি। ক্যাথেরিন নিজেকে বলার চেষ্টা করল ল্যারিকে সে এখনো মানা করতে পারে, ও গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারে। কিন্তু পারল না। ল্যারির প্রতি আশ্চর্য এক আকর্ষণ অনুভব করছে সে।

দুধারে গাছের সারি, চওড়া আবাসিক একটি এলাকার রাস্তায় ঢুকে পড়ল ল্যারি। থামল একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে। 'বাড়ি চলে এসেছি,' বলল সে।

ক্যাথেরিন জানে না বলার এটাই শেষ সুযোগ। নীরবে দেখল ল্যারি গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকের দরজা মেলে ধরল। গাড়ি থেকে নামল ক্যাথেরিন, হেঁটে এগোল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দিকে।

ল্যারির অ্যাপার্টমেন্টের সব জায়গা থেকে পুরুষালি গন্ধ ছড়াচ্ছে। ওরা ভেতরে ঢুকল। ল্যারি খুলে ফেলল ক্যাথেরিনের কোট। শিউরে উঠল ক্যাথেরিন।

'শীত লাগছে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'না।'

'ড্রিঙ্ক নেবে?'

'না।'

ল্যারি ওর হাত ধরল। চুমু খেল। ক্যাথেরিনের গায়ে যেন আগুন ধরে গেল। কোনো শব্দ ব্যয় না করে ওকে নিয়ে বেডরুমে চলে এল ল্যারি। নীরবে এবং দ্রুত নগ্ন হল ওরা। বিছানায় শুয়ে পড়ল ক্যাথেরিন, তার পাশে ল্যারি।

'ল্যারি—' কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না ক্যাথেরিন। ওর অধরে চেপে

ধরেছে ল্যারির নিষ্ঠুর ঠোঁট। হাত ঘুরে বেড়াতে লাগল ওর শরীরে, আবিষ্কার করছে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সবকিছু ভুলে গেল ক্যাথেরিন শুধু নিজের শারীরিক আনন্দটুকু ছাড়া। ও-ও আদর করতে লাগল ল্যারিকে। আগুনের মতো গরম, লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে ল্যারির পৌরুষ, আঙুল ঢুকিয়ে দিল ক্যাথেরিনের যোনির ভেতরে, তারপর ফাঁক করে ধরল দু'পা, উঠে এল গায়ের ওপর। অদ্ভুত আনন্দে বিস্ফোরিত হল ক্যাথেরিন যা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। প্রচণ্ড গতিতে, ছন্দায়িত ভঙ্গিতে শরীর নড়তে লাগল ল্যারির, সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে গেল ক্যাথেরিন। গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন ওদের সঙ্গে ছন্দে নাচছে। অবিশ্বাস্য ভ্রমণের শেষে পৌঁছে গেছে। ঘটল বিস্ফোরণ। তীব্র সুখ ও আনন্দে শরীরের সমস্ত রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল।

মিলনের পরেও ক্যাথেরিন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল ল্যারিকে, ওকে কোথাও যেতে দেবে না, এই সুখকর অনুভূতির অবসানও চাইছে না। পুরুষ-শরীর এমন তৃপ্তি দিতে পারে, কল্পনাতেও ছিল না ওর। শান্তি নিয়ে শুয়ে রইল ক্যাথেরিন। নিজেকে এখন পূর্ণাঙ্গ নারী মনে হচ্ছে। ও জানে ল্যারির সঙ্গে জীবনেও যদি আর দেখা না হয়, তার প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে সে।

'ক্যাথি?'

অলস গলায় বলল ক্যাথেরিন, 'বলো।'

'আমার পিঠ খামচে ধরে রেখেছ। একটু রেহাই দেবে, প্লিজ?'

হঠাৎ বুঝতে পারল ক্যাথেরিন ওর নখ বসে গেছে ল্যারির পিঠে। 'ওহ্, আই অ্যাম সরি!' বলল ও। ল্যারির পিঠ দেখতে গেল, ওর হাত ধরে ফেলল ল্যারি। টেনে নিল নিজের কাছে।

'ওতে কিছু আসে যায় না। তুমি সুখ পেয়েছ তো?'

'সুখ?' ক্যাথেরিনের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তারপর ফোঁপাতে শুরু করল ও। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠল শরীর। ওকে বাহুডোরে জড়িয়ে রাখল ল্যারি। কাঁদছে মেয়েটা। কাঁদুক। হালকা হোক মন।

অবশেষে বলল ক্যাথেরিন। 'আমি দুঃখিত। আমি জানি না তুমি আমার কী করেছ।'

'হতাশ হয়েছ?'

আপত্তি করে কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছে ক্যাথেরিন, ল্যারির চেহারা দেখে বুঝতে পারল ঠাট্টা করছে। ওকে বুকে টেনে নিল ল্যারি। আবার প্রেম করতে লাগল ওরা। আগের বারের চেয়েও তৃপ্তিদায়ক হল এবারের মিলন।

মিলন শেষে বিছানায় শুয়ে থাকল ওরা। কথা বলছে ল্যারি তবে একটা কথাও কানে যাচ্ছে না ক্যাথেরিনের। সে ল্যারির কথা শুনছে না, শুধু কণ্ঠ শুনছে। ও জানে ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ল্যারি। ওর মতো আর কেউ আসবে না জীবনে।

'তুমি কিন্তু আমার কথা একদম শুনছ না,' বলল ল্যারি। 'সরি,' বলল

ক্যাথেরিন। 'আমি আসলে দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।' ওকে জড়িয়ে ধরল ল্যারি, 'তুমি জানো তুমি একদম আলাদা একটি মেয়ে, ক্যাথি? তোমাকে প্রথম দিন দেখার পরেই পাগল হয়ে যাই। কোনো মেয়ের প্রতি এমন অনুভূতি কখনো হয়নি আমার।'

ক্যাথেরিন কিছু বলল না। ওকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

'আমার খিদে পেয়েছে,' বলল ল্যারি। 'আমার এখন কেমন লাগছে জানো?'

হাসল ক্যাথেরিন, 'জানি।'

ল্যারি দাঁত বের করে হাসল। 'একটা কথা জানো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি একটা সেক্স ম্যানিয়াক।'

মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন। 'ধন্যবাদ।'

ওকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল ল্যারি। ছেড়ে দিল শাওয়ার। দেয়ালের হুক থেকে একটা শাওয়ার ক্যাপ নিয়ে ক্যাথেরিনের মাথায় পরিয়ে দিল। তারপর সাবান মাখাতে লাগল ওর গায়ে। ঘাড় দিয়ে শুরু করল, হাত হয়ে উঠে এল আশ্চর্য সুন্দর বুকে, সেখান থেকে নেমে এল মসৃণ পেট, তারপর ধবধবে সাদা ঊরুতে। দুই ঊরুর মাঝখানটা গরম ভাপ ছড়াতে লাগল, ক্যাথেরিন ল্যারির হাত থেকে সাবান নিয়ে ওর গায়ে মাখতে লাগল। বুক পেট ছুঁয়ে দুই পায়ের মাঝখানে। ওর নরম হাতের ছোঁয়ায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ল্যারির পুরুষাঙ্গ।

ক্যাথেরিনের দুই পা ফাঁক করল ল্যারি, এক ধাক্কায় নিজের পৌরুষ প্রবেশ করিয়ে দিল ওর শরীরে। আবার সুখের স্বর্গে ভ্রমণ শুরু হয়ে গেল ক্যাথেরিনের, অসহ্য পুলকে গোঙাতে লাগল।

গোসল শেষে জামাকাপড় পরে নিল ওরা। ক্যাথিকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল ল্যারি। চলে এল মেরি ল্যান্ডে। ছোট একটি রেস্টুরেন্ট খোলা পেল। লবস্টার এবং শ্যাম্পেন খেল ওরা।

ভোর পাঁচটায় উইলিয়াম ফ্রেজারের বাড়িতে ফোন করল ক্যাথেরিন। শুনল আশি মাইল দূরে বাজছে ফোন। অনেকক্ষণ পরে ফ্রেজারের ঘুম-ঘুম গলা ভেসে এল, 'হ্যালো...'

'হ্যালো, বিল। আমি ক্যাথেরিন।'

'ক্যাথেরিন! সারা সন্ধ্যায় কতবার তোমাকে ফোন করেছি। কোথায় তুমি? ঠিক আছ তো?'

'আমি ভালোই আছি। আমি ল্যারি ডগলাসের সঙ্গে মেরিল্যান্ডে আছি। আমরা এইমাত্র বিয়ে করলাম।'

নোয়েল
প্যারিস : ১৯৪১

৮

ক্রিস্টিয়ান বারবেটের মন ভালো নেই। বেঁটে, টেকো গোয়েন্দাটি নিজের ডেস্কে বসে আছে। ভাঙা, দাগপড়া দাঁতের ফাঁকে সিগারেট, মুখটা প্যাঁচার মতো করে তাকিয়ে রয়েছে সামনের ফোল্ডারের দিকে। ফোল্ডারের তথ্যগুলো নোয়েল পেজের জন্য। সে নোয়েল পেজের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিচ্ছে। এ ফোল্ডার নোয়েলের হাতে তুলে দেয়ার পরে তাকে হয়তো সে হারাবে। তবে টাকার দুঃখে নয়, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার মক্কেলের সঙ্গে আর দেখা হবে না ভেবে। নোয়েল পেজকে সে ঘৃণা করে, তবে ওর মতো উত্তেজক নারী জীবনে দেখেনি বারবেট। নোয়েলকে নিয়ে নানান অশ্লীল ফ্যান্টাসির রাজ্যে বিচরণ তার। রিসেপশন অফিসে নোয়েল পেজকে বসিয়ে রেখেছে বারবেট। এই ফাঁকে চিন্তা করছে কেসটাকে দীর্ঘায়িত করে কীভাবে আরো কিছু অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নেয়া যায় নোয়েলের কাছ থেকে। কিন্তু কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না বারবেট। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে দরজার দিকে এগোল। খুলল। নোয়েল বসে আছে নকল চামড়ার কালো কাউচে, ওকে দেখতে গিয়ে গলার কাছে কী যেন ডেলার মতো বিঁধল বারবেটের। এত সুন্দরী হওয়ার অধিকার নেই কোনো নারীর। 'গুড আফটারনুন, মাদমোয়াজ্জেল,' বলল সে। 'ভেতরে আসুন।'

মডেলদের হাঁটার ঢঙে ঘরে ঢুকল নোয়েল। নোয়েল পেজ তার ক্লায়েন্ট, এজন্য অন্যান্য মক্কেলরা বারবেটের ব্যাপারে আগ্রহবোধ করে। এবং সুযোগটা সবসময় কাজে লাগাতে ইচ্ছুক সে। 'বসুন, প্লিজ,' বলল বারবেট একটা চেয়ার দেখিয়ে, 'ব্রান্ডি নেবেন কিংবা অন্যকিছু?'

বারবেটের ফ্যান্টাসির একটা অংশ হল সে নোয়েলকে মাতাল করে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে।

'না,' বলল নোয়েল। 'আমি আপনার রিপোর্টের জন্য এসেছি।'

মাগী অন্তত শেষবারের মতো তার সঙ্গে মদ পান করতে পারত!

'জি,' বলল বারবেট। 'বেশকিছু খবর যোগাড় করে ফেলেছি আমি।' ডেস্কে হাত বাড়াল সে, ডোশিয়ার পড়ার ভান করল যা আগেই মুখস্থ করে নিয়েছে।

'আপনার বন্ধু,' শুরু করল বারবেট, 'ক্যাপ্টেন পদে প্রমোশন পেয়েছেন। তাঁকে ১৩৩তম স্কোয়াড্রনের নেতা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। ক্যামব্রিজশায়ারের ডাক্সটফোর্ডের ফোল্টিসালে ফিল্ড। ওরা যেসব বিমান বানায় তার মধ্যে রয়েছে'—ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে বলছে সে, জানে টেকনিক্যাল দিকগুলোর প্রতি কোনো আগ্রহ নেই নোয়েলের—'হারিকেন এবং স্পিটফায়ার টু, এছাড়া মার্ক ফাইভ এবং—'

'এসব শোনাতে হবে না,' অধৈর্য গলায় বাধা দিল নোয়েল। 'ও এখন কোথায় আছে?'

এ প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল বারবেট। 'আমেরিকায়, ওয়াশিংটন ডিসিতে।'

'ছুটিতে?'

মাথা নাড়ল বারবেট, 'না। তাঁকে RAF থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। উনি এখন ইউএস আর্মি এয়ার কর্পস-এর ক্যাপ্টেন।'

নোয়েল খবর শুনল, কিন্তু চেহারায় কোনো ভাব ফুটল না। বারবেটের কাজ শেষ হয়নি এখনো। নোংরা, মোটা আঙুলে ধরে থাকা একটি নিউজপেপার ক্লিপিং নোয়েলের হাতে তুলে দিল সে।

'এটা হয়তো আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে,' বলল বারবেট।

আড়ষ্ট হয়ে গেল নোয়েল কাগজটা দেখে। নিইউয়র্ক ডেইলি নিউজ-এর ক্লিপিং। ক্যাপশনে লেখা 'WAR ACE WEDS' ল্যারি ডগলাস এবং তার বউয়ের ছবি ছাপা হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ছবিটি দেখল নোয়েল, তারপর হাত বাড়াল বাকি ফাইলের জন্য। ক্রিশ্চিয়ান বারবেট সমস্ত কাগজ একটা ম্যানিলা খামে পুরে দিল ওকে। বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে মুখ খুলেছে, নোয়েল বলল, 'ওয়াশিংটনে আপনার কোনো সংবাদদাতা না-থাকলে সে-ব্যবস্থা করুন, আমি প্রতি হপ্তায় রিপোর্ট চাই।' চলে গেল সে। তার গমনপথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বারবেট।

বাসায় ফিরে শোবার ঘরে ঢুকল নোয়েল। বন্ধ করল দরজা। খাম থেকে বের করল নিউজপেপার ক্লিপিং। বিছানায় রাখল। ল্যারির চেহারা আগের মতোই আছে। অবশ্য ল্যারির কথা প্রতিদিনই মনে করে নোয়েল। এমন একটা দিন যায় না ল্যারির কথা ভাবে না সে। ল্যারিকে নিয়ে তার মনে প্রতিটি স্মৃতি অত্যন্ত জীবন্ত।

নোয়েল ল্যারির বউয়ের দিকে মনোযোগ ফেরাল। সুন্দরী, তরুণী, বুদ্ধিমতী। ঠোঁটে হাসি।

এ শত্রুর মুখ। এ মুখখানা নোয়েল ল্যারির সঙ্গে ধ্বংস করে দেবে।

সারাটা বিকেল ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে কেটে গেল ওর।

কয়েক ঘন্টা পরে নোয়েলের বেডরুমের দরজার কড়া নাড়ল আরমন্দ গটিয়ের। নোয়েল খেঁকিয়ে উঠে তাকে চলে যেতে বলল। ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল গটিয়ের। ভাবছে এ মেয়ের আবার কী হল! নোয়েল যখন ঘর থেকে বেরুল তাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল এবং হাসিখুশি লাগছিল, যেন দারুণ একটা খবরে আনন্দে আটখানা। গটিয়েরকে কোনো ব্যাখ্যা দিল না সে, এবং গটিয়েরও তাকে কোনো প্রশ্ন করল না।

সেদিন সন্ধ্যায় নাটকশেষে গটিয়েরকে নিয়ে বিছানায় উন্মাদিনী হয়ে উঠল নোয়েল। এমন কামুকী হয়ে উঠল, আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিল গটিয়েরকে। মিলনশেষে গটিয়ের ভাবতে লাগল তার পাশে শুয়ে থাকা এই অপরূপা নারীর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণ কী। কিন্তু কোনো ক্লু খুঁজে পেল না সে।

রাতে নোয়েল কর্নেল মুয়েলারকে স্বপ্নে দেখল। আলবিনো গেস্টাপো তাকে আগুনের মতো গরম ইস্ত্রি দিয়ে নির্যাতন করছে। গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে, স্বস্তিকার চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে নগ্নশরীরে। জেরা করছে সে, কিন্তু কণ্ঠ এত নিচু যে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না নোয়েল। জেরা করছে আর গরম ধাতবযন্ত্রটা চেপে চেপে ধরছে নোয়েলের গায়ে। হঠাৎ টেবিলে ল্যারিকে হাজির হতে দেখা গেল। যন্ত্রণায় চিল্লাচ্ছে। জেগে গেল নোয়েল, ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেছে গা। ধকধক করছে বুক। বিছানার পাশের বাতি জ্বালাল ও। কাঁপা হাতে ধরাল সিগারেট, শান্ত করার চেষ্টা করল নার্ভ।

ইসরায়েল কাৎজের কথা মনে পড়ছে ওর। কুঠার দিয়ে ওর আহত পা-খানা কেটে ফেলা হয়েছে। বেকারিতে সেদিন বিকেলের পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি নোয়েলের, তবে দারোয়ানের মাধ্যমে জানতে পেরেছে বেঁচে আছে কাৎজ, প্রচণ্ড দুর্বল। ওকে লুকিয়ে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই কাৎজের। ওকে প্যারিস থেকে বের করতে হলে দ্রুত করতে হবে কাজটা। নোয়েল এখনো এমন কোনো অপরাধ ঘটায়নি যাতে গেস্টাপো তাকে গ্রেফতার করতে পারে। স্বপ্নটা কি ইসরায়েল কাৎজকে সাহায্য না-করার ইঙ্গিত?

বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল নোয়েল। গর্ভপাতের সময় ওকে অনেক সাহায্য করেছে কাৎজ। ল্যারির বাচ্চাকে হত্যা করতে সাহায্য করেছে। টাকা দিয়েছে, ওকে একটা চাকরি খুঁজে দিয়েছে। ডজন ডজন মানুষ এরচেয়েও অনেক বেশি করেছে নোয়েলের জন্য। কিন্তু তাদের কারো প্রতি কোনোরকম দায়বদ্ধতা নেই নোয়েলের। ওরা প্রত্যেকে, এমনকি তার বাবা, বিনিময়ে কিছু চেয়েছে তার কাছ থেকে এবং নোয়েল তা দিয়েওছে। শুধু ইসরায়েল কাৎজ কখনো কিছু চায়নি তার কাছে। ওকে নোয়েল সাহায্য করবে।

সমস্যাটা খাটো করে দেখছে না নোয়েল। কর্নেল মুয়েলার ইতোমধ্যে তাকে

সন্দেহ করতে শুরু করেছে। স্বপ্নটার কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল নোয়েল। মুয়েলার কখনো যেন ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না পায় সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। ইসরায়েল কাৎজকে সরিয়ে ফেলতে হবে প্যারিস থেকে। কিন্তু কীভাবে? প্যারিস থেকে বেরুবার সমস্ত রাস্তায় সতর্ক প্রহরা। নদী এবং রাস্তা দু-জায়গাতেই পাহারা বসানো হয়েছে। কাৎজকে প্যারিস থেকে সরিয়ে ফেলা ভয়ংকর একটা চ্যালেঞ্জ। তবে অবশ্যই চেষ্টা করবে নোয়েল। সমস্যা হল এমন কেউ নেই যে ওকে একাজে সাহায্য করবে। আরমন্দ গটিয়ের তো নাৎসিদের ভয়েই অস্থির। না, কাজটা নোয়েলের একাই করতে হবে।

ওইদিন সন্ধ্যায় নোয়েল এবং আরমন্দ গটিয়ের গেল একটা সাপার-পার্টিতে। হোস্ট লেসলি রোকাস, শিল্পকলার এক ধনবান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পার্টিতে ব্যাংকার, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতাসহ বেশকিছু সুন্দরী নারীরও আগমন ঘটেছে। নোয়েলের ধারণা, জার্মান অতিথিদের জন্য এদের আনা হয়েছে।

সাপার ঘোষণার পনেরো মিনিট আগে দরজা দিয়ে নতুন একজন অতিথি ঢুকলেন। তাঁকে দেখামাত্র নোয়েল বুঝে ফেলল তার সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। সে আমন্ত্রণকর্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, 'ডার্লিং, আমাকে লক্ষ্মীমেয়ের মতো আলবার্ট হেলারের পাশে বসার সুযোগ করে দাও।'

আলবার্ট হেলার ফ্রান্সের শীর্ষস্থানীয় চিত্রনাট্যকার। ষাটবছর বয়স্ক মানুষটিকে দেখলে ভালুকের কথা মনে পড়ে যায়। মাথাভর্তি সাদা চুল, বৃষস্কন্ধ। ফরাসিদের তুলনায় অনেক লম্বা তিনি। তবে ভিড়ের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে যান কুৎসিত চেহারাটির জন্য। তার অন্তর্ভেদী সবুজ চোখ কিছুই এড়ায় না। হেলার দুর্দান্ত সব নাটক এবং সিনেমার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তিনি অনেকদিন ধরে নোয়েলের পেছনে লেগে আছেন তাঁর নতুন নাটকের নায়িকা বানানোর জন্য। অনেক আগেই ওকে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডিনারে এ মুহূর্তে তার পাশে বসা নোয়েল বলল, 'তোমার নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়লাম, আলবার্ট। চমৎকার।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল চিত্রনাট্যকারের। 'করবে তুমি?'

আলবার্টের হাতে হাত রাখল নোয়েল। 'করতে পারলে খুব খুশি হতাম, ডার্লিং। কিন্তু আরমন্দ আরেকটা নাটকে ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল আলবার্টের, প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'আহ্, কবে যে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

'সে সুযোগ পেলে আমি দারুণ খুশি হব,' বলল নোয়েল। 'তোমার লেখার স্টাইল আমার খুবই ভালো লাগে। লেখকদের প্লট সৃষ্টির পদ্ধতি মুগ্ধ করে আমাকে। জানি না কীভাবে কাজটা করো তোমরা।'

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, 'যেভাবে তোমরা অভিনয় করো, সেভাবে। এটাই আমাদের ব্যবসা। এটা করেই আমরা খাই।'

'না,' বলল নোয়েল, 'তোমার কল্পনাশক্তির ব্যবহার আমার কাছে মির‍্যাকল মনে হয়।' লাজুক হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কারণ আমিও লেখালেখির চেষ্টা করেছি।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারিনি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নোয়েল, চোখ বুলাল টেবিলের চারপাশে। অতিথিরা নিজেদের মাঝে গল্পে মগ্ন। আলবার্ট হেলারের দিকে ঝুঁকল নোয়েল, ফিসফিস করে বলল, 'আমার নাটকের নায়িকা তার প্রেমিককে প্যারিস থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইছে। নাৎসি বাহিনী প্রেমিককে খুঁজছে।'

'অহ্', বিশালদেহী মানুষটি সালাদ ফর্ক প্লেটে ঠুকতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'কাজটা সহজ। তাকে জার্মান ইউনিফর্ম পরিয়ে সৈন্যদের মাঝখান থেকে বের করে নিয়ে এসো।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোয়েল। 'একটা সমস্যা হয়ে গেছে। সে আহত। হাঁটতে পারে না। একখানা পা হারিয়েছে।'

প্লেটে চামচ ঠোকা বন্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ বিরতির পরে হেলার বললেন, 'সিন নদীতে বজরা দিয়ে পার করা যায় না?'

'ওখানে পাহারা আছে।'

'প্যারিস থেকে যত রকমের বাহন বাইরে যাচ্ছে সব সার্চ করা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নাৎসিদের দিয়ে কাজটা করাতে হবে।'

'কীভাবে?'

'তোমার নায়িকা কি সুন্দরী?' নোয়েলের দিকে না-তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন হেলার।

'হুঁ।'

'ধরো,' বললেন তিনি, 'তোমার নায়িকা কোনো জার্মান কর্মকর্তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলল। উঁচুপদের কেউ। এটা সম্ভব?' নোয়েল তাঁর দিকে ঘুরল তবে চোখে চাইতে সাহস পেল না।

'সম্ভব।'

'বেশ। তাহলে তোমার নায়িকার সঙ্গে কর্মকর্তার কোথাও মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দাও। তারা প্যারিসের কোথাও সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে যাবে। বন্ধুরা তোমার হিরোকে গাড়ির ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখবে। কর্মকর্তাটি হাই অফিশিয়াল বলে তাঁর গাড়ি কেউ সার্চ করবে না।'

'ট্রাঙ্ক বন্ধ থাকলে সে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে না?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন আলবার্ট হেলার, ডুবে গেলেন চিন্তার জগতে। অবশেষে বললেন, 'সেরকম সম্ভাবনা নেই।' তিনি নোয়েলের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ নিচুগলায় কথা বললেন। শেষ করলেন 'গুড লাক' বলে। কথোপকথনের পুরোটা সময় একবারও মুখ তুলে চাইলেন না তিনি।

পরদিন সকালে জেনারেল স্কাইডারকে ফোন করল নোয়েল। সুইচবোর্ডের অপারেটর সাড়া দিল, খানিক বাদে একজন এইড ফোন ধরল, অবশেষে জেনারেলের সেক্রেটারি কথা বলল।

'জেনারেল স্কাইডারকে কে চাইছেন, প্লিজ?'

'নোয়েল পেজ,' এ নিয়ে তৃতীয়বার বলতে হল নাম।

'আমি দুঃখিত, জেনারেল এখন কনফারেন্সে আছেন। তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না।'

ইতস্তত করল নোয়েল। 'পরে ফোন করব কি?'

'সারাদিনই কনফারেন্সে ব্যস্ত থাকবেন তিনি। আপনি বরং জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য লিখে জানান।'

পরামর্শটা মোটেই পছন্দ হল না নোয়েলের। বলল, 'ঠিক আছে। আপনি শুধু বলবেন আমি ফোন করেছিলাম।'

একঘণ্টা বাদে বেজে উঠল ফোন। জেনারেল স্কাইডার।

'মাফ করবেন,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'ওই গর্দভটা এইমাত্র জানিয়েছে আপনি ফোন করেছিলেন। ওদেরকে আপনার কথা বলা উচিত ছিল আমার। তবে কল্পনাই করিনি আমাকে আপনি ফোন করবেন।'

'আসলে ক্ষমা চাওয়া উচিত আমারই,' বলল নোয়েল। 'আমি তো জানি আপনি কত ব্যস্ত মানুষ।'

'প্লিজ। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ইতস্তত করল নোয়েল। নির্বাচন করছে শব্দ। 'ডিনারে আপনি কী বলেছিলেন মনে আছে?'

সংক্ষিপ্ত বিরতি নিলেন জেনারেল। তারপর বললেন, 'জি।'

'আপনার কথা অনেক ভেবেছি আমি, হ্যান্স। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আজ রাতে আমার সঙ্গে সাপার করবেন?' আগ্রহ প্রকাশ পেল জেনারেলের কণ্ঠে।

'প্যারিসে নয়,' বলল নোয়েল। 'অন্য কোথাও যাই চলুন।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন স্কাইডার।

'বিশেষ কোনো জায়গায়। ইত্রাত চেনেন?'

'না।'

'প্যারিস থেকে দেড়শো মাইল দূরের চমৎকার একটি জায়গা, লো হার্ভের কাছে। ওখানে নির্জন একটি সরাইখানা আছে।'

'শুনে উত্তেজিত বোধ করছি, নোয়েল। তবে ঠিক এ মুহূর্তে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আবার ক্ষমাপ্রার্থনার সুর জেনারেলের কণ্ঠে। 'আমি একটি কনফারেন্স নিয়ে খুবই ব্যস্ত—'

'বুঝতে পারছি,' বরফ শীতল শোনাল নোয়েলের কণ্ঠ। 'ঠিক আছে, পরে কোনো এক সময় হবে।'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' লম্বা একটা বিরতি, 'আপনি ফ্রি হবেন কবে?'

'শনিবার রাতের শো'র পরে।'

'আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব,' বললেন তিনি। 'আমরা প্লেনে—'

'গাড়িতে যাই না কেন?' প্রস্তাব দিল নোয়েল। 'আরও উপভোগ্য হয়ে উঠবে ভ্রমণ।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলেন। আমি থিয়েটার থেকে তুলে নেব আপনাকে।'

দ্রুত ভেবে নিল নোয়েল। 'আমি বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাব। আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিতে পারবেন না?'

'অবশ্যই পারব, মাই লিবচেন (প্রিয়)। শনিবার রাতে দেখা হবে।'

পনেরো মিনিট পরে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলল নোয়েল। সে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগল।

'না, না, না! আমি আমাদের বন্ধুকে বলব, মাদমোয়াজেল, তবে ওনার পক্ষে এটা করা সম্ভব হবে না। আপনি বরং তাকে গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সে চাকরির আবেদন করতে বলুন। এরচে' ওটা সহজ হবে তার জন্য।'

'প্ল্যান ব্যর্থ হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করল নোয়েল। 'ফ্রান্সের সবচে' উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এটা বেরিয়েছে।'

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে সেদিন বিকেলে বেরুনোর সময় নোয়েল লক্ষ করল এক লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে। নোয়েল রাস্তায় নেমে এলে সিধে হল সে, দূর থেকে ওকে অনুসরণ করতে লাগল। অলস ভঙ্গিতে রাস্তায় হাঁটছে নোয়েল, প্রতিটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডিসপ্লে দেখছে।

নোয়েল ভবন থেকে বেরুবার পাঁচ মিনিট পরে দারোয়ান চলে এল রাস্তায়। ডানে-বামে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা। কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই বুঝতে পেরে সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল, মন্তমার্ত্র'র একটি খেলাধুলার দোকানের ঠিকানা দিল ড্রাইভারকে।

দুইঘণ্টা পরে দারোয়ান নোয়েলের কাছে হাজির হল। বলল, 'শনিবার রাতে আপনার কাছে তাঁকে পৌছে দেয়া হবে।'

শনিবার রাতে নোয়েল নাটক শেষ করেছে, গেস্টাপোর কর্নেল মুয়েলার তার জন্য ব্যাকস্টেজে অপেক্ষা করছিল। পলায়নের পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে, বিন্দুমাত্র দেরি করার উপায় নেই।

'আপনার নাটক দেখলাম, ফ্রাউলিন পেজ,' বলল কর্নেল মুয়েলার। 'উত্তরোত্তর আপনার উন্নতি হচ্ছে।'

খনখনে কণ্ঠটা নোয়েলের দুঃস্বপ্ন ফিরিয়ে আনল।

'ধন্যবাদ, কর্নেল। একটু মাফ করবেন। আমার পোশাক বদলাতে হবে।'

নোয়েল পা বাড়াল ড্রেসিংরুমের দিকে, চট করে তার পাশে চলে এল মুয়েলার।

'আমি আপনার সঙ্গে যাব,' বলল সে।

ড্রেসিংরুম অভিমুখে হাঁটতে লাগল নোয়েল, পেছনে সেঁটে রইল আলবিনো কর্নেল। একটা আরামকেদারা দখল করল সে। একমুহূর্ত ইতস্তত করল নোয়েল, তারপর কর্নেলের সামনেই পোশাক বদলাতে লাগল। মুয়েলার উদাসচোখে তাকে দেখছে। নোয়েল শুনেছে কর্নেল সমকামী, ফলে ওর মূল্যবান একটা অস্ত্র ব্যবহার করা গেল না—যৌনতা।

'ছোট্ট একটি চড়ুইপাখি আমার কানে কানে বলে গেছে আজ রাতে সে পালাবার চেষ্টা করতে পারে,' বলল কর্নেল।

নোয়েলের বুক ধক করে উঠল, তবে চেহারায় কোনো ভাব ফুটল না। মেকআপ তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কে আজ রাতে পালানোর চেষ্টা করবে?'

'আপনার বন্ধু, ইসরায়েল কাৎজ।'

পাঁই করে ঘুরল নোয়েল, পরমুহূর্তে মনে পড়ল ওর বুক খোলা। 'আমি কাউকে—' কর্নেলের গোলাপি চোখে সেকেন্ডের জন্য বিজয়-উল্লাস ঝিলিক দিতে দেখল ও। ফাঁদটাও চোখে পড়ল যথাসময়ে, 'দাঁড়ান। আপনি কি তরুণ ইন্টার্নের কথা বলছেন?'

'অহ্ নামটা মনে আছে দেখছি।'

'অল্প। ওই ডাক্তার একবার আমার নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করেছিল।'

'এবং গর্ভপাতও করিয়েছিল,' নরম, খনখনে কণ্ঠে বলল কর্নেল। ভয়টা আবার ফিরে এল নোয়েলের মধ্যে। গেস্টাপো যদি নিশ্চিত না হত এর মধ্যে ও জড়িত নেই তাহলে এতদূর এগোত না। এর মধ্যে জড়িয়ে মস্ত বোকামি করে ফেলেছে নোয়েল। কিন্তু এ পরিস্থিতি থেকে এখন আর বেরিয়ে আসা যাবে না। দেরি হয়ে গেছে। গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েল কাৎজ হয় মুক্ত হবে... নয়তো মারা যাবে। আর তার দশা কী হবে?

কর্নেল মুলার বলল, 'আপনি বলেছিলেন সর্বশেষ কাৎজের সঙ্গে কয়েক হপ্তা আগে একটা ক্যাফেতে নাকি দেখা হয়েছিল?'

মাথা নাড়ল নোয়েল, 'আমি এরকম কিছু বলিনি, কর্নেল।'

কর্নেল মুয়েলার সরাসরি নোয়েলের চোখের দিকে তাকাল, সেখান থেকে দৃষ্টি নেমে এল নগ্ন বুকে, পেটে এবং সবশেষে প্যান্টিতে। আবার নোয়েলের চোখে উঠে এল চোখ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আমি সুন্দর জিনিস ভালোবাসি।' নরম গলা তার। 'আপনার মতো সুন্দরীর ধ্বংস দেখতে মোটেই ভালো লাগবে না। তাও এমন একজনের জন্য যে কিনা আপনার জন্য মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। আপনার বন্ধু কীভাবে কেটে পড়ার তাল করেছে, ফ্রাউলিন?'

এমন শান্ত গলা তার, নোয়েলের শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল নামল। নিজেকে মনে হল নাটকের অসহায়, নিষ্পাপ চরিত্র অ্যানেটের মতো।

'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, কর্নেল। আপনাকে সাহায্য করতে চাই কিন্তু কীভাবে করব বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল মুয়েলার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নোয়েলের দিকে, তারপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। 'কীভাবে সাহায্য করবেন তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেব, ফ্রাউলিন,' নরম গলায় বলল সে, 'এবং কাজটা আমি উপভোগই করব।'

দরজার দিকে পা বাড়াল গেস্টাপো অফিসার, ঘুরল আবার। 'ভালো কথা, আমি জেনারেল স্কাইডারকে পরামর্শ দিয়েছি আপনার সঙ্গে যেন তিনি সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে না যান।'

দমে গেল নোয়েল। এখন ইসরায়েল কাৎজকে খবর দেয়ার সময় নেই। 'কর্নেলরা কি সবসময় জেনারেলদের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলান?'

'এক্ষেত্রে জবাব হল : না,' আফসোসের ভঙ্গিতে বলল মুয়েলার। 'জেনারেল স্কাইডার আমার পরামর্শ কানে তোলেননি।' ঘুরে চলে গেল সে।

নোয়েল স্থিরদৃষ্টিতে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ড্রেসিং টেবিলের সোনার ঘড়িটির দিকে ফিরে চাইল। দ্রুত পরতে লাগল পোশাক।

পোনে বারোটার সময় বুড়ো দারোয়ান ফোন করে নোয়েলকে জানিয়ে দিল জেনারেল স্কাইডার তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আসছেন। তার গলা কাঁপছিল।

'শোফার আছে গাড়িতে?' জানতে চাইল নোয়েল।

'না, মাদমোয়াজেল,' জবাব দিল দারোয়ান। 'সে জেনারেলের সঙ্গে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দ্রুত বেডরুমে ঢুকে পড়ল নোয়েল। আরেকবার চেক করল লাগেজ। কোথাও কোনো ভুলত্রুটি নেই। বেজে উঠল ডোরবেল। লিভিংরুমে চলে এল নোয়েল, খুলল দরজা।

করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল স্কাইডার, সঙ্গে শোফার, পেছনে এক তরুণ ক্যাপ্টেন। জেনারেল ইউনিফর্ম ছাড়াই এসেছেন। নিখুঁত ছাঁটাইয়ের চারকোল গ্রে রঙা সুট, নরম নীল শার্ট এবং কালো টাইতে দারুণ দেখাচ্ছে তাঁকে। 'শুভ সন্ধ্যা,' বললেন তিনি। ঢুকলেন ভেতরে, ইশারা করলেন শোফারকে।

'আমার ব্যাগগুলো বেডরুমে,' দরজা দেখিয়ে বলল নোয়েল।

'ধন্যবাদ, ফ্রাউলিন,' বেডরুমে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন। জেনারেল স্কাইডার নোয়েলের পাশে চলে এলেন, তার হাত মুঠোয় চেপে বললেন, 'তুমি জানো আজ সারাদিন কী ভেবেছি আমি? ভেবেছি তোমাকে হয়তো এখানে এসে পাব না। হয়তো তুমি বদলে ফেলেছ মত। যতবার ফোন বেজেছে, আঁতকে উঠেছে আত্মা।'

'আমি কথা দিলে কথা রাখি,' বলল নোয়েল। দেখল ক্যাপ্টেন বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসছে ওর মেকআপ কেস এবং ব্যাগ নিয়ে। 'আর কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নাহ্,' জবাব দিল নোয়েল। 'এই-ই সব।'

ক্যাপ্টেন সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

'রওনা হবার আগে একটু ড্রিঙ্ক করে নিন,' বলল নোয়েল। বার-এর দিকে হেঁটে গেল ও। ওখানে বরফের ঝুড়িতে চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছে শ্যাম্পেনের বোতল।

'আমি দেখছি,' জেনারেল বরফের ঝুড়ি থেকে বোতল বের করে নিলেন। খুলে মদ ঢাললেন দুটো গ্লাসে। ওরা গ্লাসে গ্লাস ঠুকে টোস্ট করল, তারপর পান করল। নোয়েল গ্লাস নামিয়ে রেখে আড়চোখে ঘড়ি দেখল। জেনারেল বকবক করছেন কিন্তু তাঁর কথা কানে যাচ্ছে না নোয়েলের। সে ভাবছে নিচতলায় কী ঘটছে। ওকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। তাড়াহুড়ো বা ঢিলেমি দুটোই সবার জন্য মারাত্মক সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

'তুমি কী ভাবছ?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল।

চট করে ফিরে তাকাল নোয়েল, 'কিছু না তো।'

'কিন্তু আমার কথা তুমি শুনছ না তো!'

'দুঃখিত, আসলে আমি নিজেদেরকে নিয়েই ভাবছিলাম,' হাসি ফোটাল মুখে!

'তুমি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছ,' বললেন তিনি।

'সব মেয়েই কি ধাঁধা নয়?'

'তোমার মতো নয়। তুমি এমন খেয়ালি মেয়ে—' একটা ভঙ্গি করলেন জেনারেল—'প্রথমে তো আমাকে পাত্তাই দিতে চাওনি। আর এখন কিনা আমরা ছুটি কাটাতে যাচ্ছি গ্রামে। আচ্ছা, গ্রাম কেন?'

'আপনাকে আগেই ব্যাখ্যা করেছি।'

'ও, হ্যাঁ,' বললেন জেনারেল। 'গ্রাম খুব রোমান্টিক। আর এ ব্যাপারটাই আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। তোমাকে আমার বাস্তববাদী মনে হয়েছে, রোমান্টিক না।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'কিছু না,' জবাব দিলেন জেনারেল, 'আমি শুধু আমার ভাবনাচিন্তাগুলো ব্যক্ত করছি। সমস্যার সমাধান করতে আমি পছন্দ করি। নোয়েল, তোমার ধাঁধার সমাধানও আমি করে ফেলব।'

কাঁধ ঝাঁকাল নোয়েল। 'একবার সমাধান হয়ে গেলে সমস্যাটা আর চিত্তাকর্ষক মনে হবে না।'

'তা দেখা যাবে,' গ্লাস নামিয়ে রাখলেন স্কাইডার। 'এখন রওনা হব?'

শ্যাম্পেনের খালি গ্লাসজোড়া তুলে নিল নোয়েল।

'আমি এ দুটো সিঙ্কে রেখে আসছি।'

জেনারেল দেখলেন ও কিচেনে ঢুকে গেছে। নোয়েলের মতো সুন্দরী এবং কামনামদির নারী দ্বিতীয়টি দেখেননি জেনারেল। ও যেন তাঁকে জাদু করেছে। তবে এর মানে এ নয় যে তিনি বোকা বা অন্ধ হয়ে গেছেন। মেয়েটা তাঁর কাছে কিছু চাইছে। কী সেটা তিনি খুঁজে বের করতে চান। কর্নেল মুয়েলার তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে—নোয়েল সম্ভবত রাইখের এক বিপজ্জনক শত্রুকে সাহায্য করছে। আর কর্নেল মুয়েলারের ভুল খুব কমই হয়। কর্নেলের কথা ঠিক হলে নোয়েল বোধহয় জেনারেলকে দিয়ে কিছু একটা ফায়দা লোটার চেষ্টা করবে। কিন্তু ও তো জার্মান সামরিক বাহিনী কী জিনিস জানে না, জেনারেল সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেবেন নোয়েলকে। তবে তার আগে নিজের মজাটুকু লুটে নেবেন। তিনি সাপ্তাহিক ছুটির দিনদুটির দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন।

নোয়েল বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। তার চেহারায় উৎকণ্ঠা।

'আপনার শোফার কটা ব্যাগ নিয়ে গেছে?'

'দুটো,' জবাব দিলেন জেনারেল। 'একটা ওভারনাইট ব্যাগ, বাকিটি মেকআপ কেস।'

মুখ বাঁকাল নোয়েল, 'ইশ্, আরেকটা ব্যাগ নিতে ভুলে গেছে ও।'

নোয়েল টেলিফোন তুলে নিল, 'জেনারেলের ড্রাইভারকে আবার একবার ওপরে আসতে বলবে? আরেকটা ব্যাগ রয়ে গেছে।' রিসিভার রেখে দিল, 'যদিও শুধু সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে যাচ্ছি ওখানে,' হাসল ও, 'তবে আমি আপনাকে খুশি করে দেব।'

'আমাকে খুশি করতে চাইলে,' বললেন জেনারেল, 'খুব বেশি জামাকাপড় নেয়ার দরকার নেই।' পিয়ানোর ওপর রাখা আরমন্দ গটিয়েরের ছবির দিকে চোখ চলে গেল তাঁর। 'হের গটিয়ের কি জানেন তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ?'

'জানে,' মিথ্যা বলল নোয়েল। আরমন্দ এখন নিসে, এক প্রযোজকের সঙ্গে চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলতে গেছে। ওকে নিজের পরিকল্পনার কথা বলে দুশ্চিন্তায় ফেলার কোনো মানে হয় না। বেজে উঠল ডোরবেল। নোয়েল খুলে দিল দরজা। দোরগোড়ায় ক্যাপ্টেন। 'আরেকটা ব্যাগ নাকি রয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল নোয়েল, 'বেডরুমে আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেডরুমে পা বাড়াল ক্যাপ্টেন।

'প্যারিসে ফিরতে চাইছ কবে?' নোয়েলকে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল। নোয়েল ঘুরল তার দিকে, 'যতক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকা যায় থাকতে চাই আমি। সোমবার বিকেল নাগাদ ফিরব। তার মানে দুদিন থাকতে পারছি।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। 'মাফ করবেন, ফ্রাউলিন, সুটকেসটা কীরকম দেখতে?'

'বড়, গোল নীল সুটকেস,' বলল নোয়েল। ফিরল জেনারেলের দিকে। 'ওটাতে নতুন একটা গাউন আছে। পরিনি এখনো। আপনার জন্য রেখে দিয়েছি।'

অতিরিক্ত কথা বলছে নোয়েল নিজের নার্ভাসনেস আড়াল করার জন্য।

ক্যাপ্টেন ফিরে গেল বেডরুমে। কিছুক্ষণ পরে আবার তার চেহারা দেখা গেল। 'দুঃখিত,' বলল সে। 'আমি ওটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, আমি দেখছি,' নোয়েল গেল বেডরুমে, খুঁজতে লাগল ক্লজিট। 'গর্দভ চাকরানিটা নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।' তিনজনে মিলে অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ক্লজিট ঘেঁটে দেখল। সুটকেসটা জেনারেল খুঁজে পেলেন হল ক্লজিটে। ওটা হাতে নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে খালি।'

নোয়েল দ্রুত ব্যাগ খুলল। ভেতরে কিছু নেই। 'ইশ্, হারামজাদীটা আমার নতুন ড্রেসটা নিয়ে ভেগেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'জার্মানিতে চাকরবাকর নিয়ে এরকম ঝামেলা হয় আপনাদের?'

'এরকম ঝামেলা সবজায়গাতেই আছে,' বললেন জেনারেল স্কাইডার। নোয়েলকে তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করছেন তিনি। অদ্ভুত আচরণ করছে মেয়েটা, কথাও বলছে বেশি বেশি। নোয়েল বুঝতে পারল জেনারেল ওকে লক্ষ করছেন।

'আপনি আসলে আমাকে নার্ভাস করে ফেলেছেন,' বলল নোয়েল। 'একটু প্রগল্ভ আচরণ করছি তাই না?'

হাসলেন জেনারেল স্কাইডার। মেয়েটা হয়তো সত্যি নার্ভাস। নাকি তাঁর সঙ্গে খেলছে? খেললে ঠিকই ধরে ফেলবেন তিনি। ঘড়ি দেখলেন জেনারেল। 'এখনই রওনা না হলে ওখানে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক।'

'আমি রেডি,' বলল নোয়েল।

প্রার্থনা করল অন্যরাও যেন তাই থাকে।

লবিতে এসে দেখল দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান। মুখ চকের মতো সাদা। কোনো সমস্যা হল না তো! ভাবল নোয়েল। দারোয়ানের দিকে তাকাল ও কোনো সংকেত পাবার আশায়। কিন্তু বুড়ো সাড়া দেয়ার আগেই জেনারেল নোয়েলের হাত ধরে ওকে দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে এলেন।

জেনারেল স্কাইডারের লিমুজিন দরজার ঠিক সামনে পার্ক করা। গাড়ির ট্রাঙ্ক

গল। রাস্তা জনশূন্য। শোফার গাড়ির পেছনের দরজা মেলে ধরল। নোয়েল ঘাড় ঘুরিয়ে লবিতে তাকাল দারোয়ানকে দেখার জন্য। কিন্তু জেনারেল ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না নোয়েল। ইচ্ছে করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছেন তিনি! নোয়েল আড়চোখে গাড়ির ট্রাঙ্ক দেখল। কিন্তু বন্ধ ট্রাঙ্ক দেখে কিছুই বোঝা গেল না। নোয়েল জানে না তার পরিকল্পনা সফল হল কী হল না। রহস্য অসহ্য ঠেকছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' স্থিরচোখে জেনারেল তাকিয়ে আছেন নোয়েলের দিকে। নোয়েলের মনে হচ্ছে কোথাও মস্ত কোনো ভজকট হয়ে গেছে। লবিতে ফিরে যেতে হবে ওকে, দারোয়ানের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও কথা বলা দরকার। সে জোর করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে।

'হঠাৎ মনে পড়ল,' বলল নোয়েল, 'আমার বন্ধুর একটা ফোন আসবে। আমি একটা ম্যাসেজ রেখে—'

জেনারেল ওর হাত চেপে ধরলেন।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' হাসলেন তিনি। 'এখন থেকে তুমি শুধু আমার কথা ভাববে।' গাড়িতে চড়ে বসলেন নোয়েলকে নিয়ে। একটু পরেই ছেড়ে দিল গাড়ি।

জেনারেল স্কাইডারের লিমুজিন নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরুবার পাঁচ মিনিট বাদে একটি কালো মার্সিডিজ ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল বিল্ডিঙের সামনে। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল কর্নেল মুয়েলার এবং গেস্টাপোর দুজন লোক। কর্নেল দ্রুত চোখ বুলাল রাস্তায়, 'চলে গেছে ওরা।' বলল সে। লোক দুজন ঝড়ের বেগে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের লবিতে ঢুকে পড়ল, দারোয়ানের ডোরবেল বাজাল। খুলে গেল দরজা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো, হতভম্ব চেহারা। 'কী—' কর্নেল মুয়েলার ধাক্কা মেরে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

'ফ্রাউলিন পেজ!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'কোথায় তিনি?'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকে দেখল বৃদ্ধ। 'উনি—চলে গেছেন।'

'আমি তা জানি গর্দভ! কিন্তু গেছে কই?'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দারোয়ান। 'তা জানি না, মশিউ। শুধু দেখলাম উনি এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে চলে গেলেন।'

'কোথায় যাবেন বলে যাননি কিছু?'

'ন্-না, মশিউ। মাদমোয়াজেল পেজ কোথায় যান আমাকে বলে যান না।'

লোকটার দিকে একমুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঘুরল মুয়েলার।

'ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি,' সে তার লোকদের বলল, 'সবগুলো রোডব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলো জেনারেল স্কাইডারের গাড়ি যেন থামিয়ে রেখে আমাকে খবর দেয়।'

এ সময়ে মিলিটারি ট্রাফিক থাকে হালকা, এ মুহূর্তে রাস্তা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। জেনারেল স্কাইডারের গাড়ি ওয়েস্ট রোডে ঢুকল। এ রাস্তা প্যারিসের বাইরে চলে গেছে। ওরা ভার্সাই, মান্তেস, ভার্নন এবং গেইলন পার হয়ে গেল, পঁচিশ মিনিটের মাথায় ভিচি, লো হাভার এবং ফোটে ডি আজুর-এর সংযোগস্থলে চলে এল।

নোয়েলের কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটা মির‍্যাকল মনে হচ্ছে। কোনোরকম বাধা ছাড়াই ওরা প্যারিস ছাড়তে পারছে। জার্মানরা যতই দক্ষ হোক, শহরের প্রতিটি রাস্তায় রোড ব্লক করে রাখা নিশ্চয়ই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একথা ভাবতেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা রোডব্লক। রাস্তার মাঝখানে জ্বলছে লাল আলো। একটি জার্মান আর্মি লরি দখল করে রেখেছে হাইওয়ে। রাস্তার পাশে আধডজন জার্মান সৈনিক এবং ফরাসি পুলিশের দুটি গাড়ি। লিমুজিনকে উদ্দেশ করে এক আর্মি লেফটেন্যান্ট হাত নাড়ল। গাড়ি থামতে সে এগিয়ে এল ড্রাইভারের দিকে।

'গাড়ি থেকে নামুন। পরিচয়পত্র দেখান!'

পেছনের জানালা খুলে মাথা বের করলেন জেনারেল স্কাইড়ার। রাগী গলায় বললেন, 'আমি জেনারেল স্কাইডার। এখানে হচ্ছেটা কি শুনি?'

অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

'মাফ করবেন, জেনারেল। আমি জানতাম না এটা আপনার গাড়ি।'

রোডব্লকে চোখ বুলালেন জেনারেল, 'এসব কী?'

'প্যারিস ছেড়ে আসা প্রতিটি গাড়ি চেক করার নির্দেশ পেয়েছি আমরা, হের জেনারেল। শহরের প্রতিটি রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

নোয়েলের দিকে ফিরলেন জেনারেল। 'হারামজাদা গেস্টাপো। আমি দুঃখিত, লিবচেন।'

নোয়েলের মুখ থেকে সমস্ত রঙ মুছে গেল, গাড়ির ভেতরে অন্ধকার না থাকলে দেখতে পেত সবাই। কথা বলার সময় স্বাভাবিক রাখল কণ্ঠ। 'ঠিক আছে।'

ট্রাঙ্কের কার্গোর কথা ভাবছে নোয়েল। তার প্ল্যানমাফিক কাজ হয়ে থাকলে ইসরায়েল কাৎজ ওটার মধ্যে রয়েছে। সে ধরা পড়া মানে নোয়েলেরও বারোটা বেজে যাবে।

জার্মান লেফটেন্যান্ট শোফারের দিকে ফিরল।

'লাগেজ কমপার্টমেন্ট খুলুন, প্লিজ।'

'লাগেজ ছাড়া ওখানে কিছু নেই,' আপত্তি জানাল তরুণ ক্যাপ্টেন। 'আমি নিজে রেখেছি।'

'আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। কিন্তু আমাকে আদেশ মানতেই হবে। খুলুন।'

বিড়বিড় করে শাপশাপান্ত করতে করতে দরজা খুলে নেমে এল শোফার। নোয়েলের মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে থামানোর কোনো উপায় বের

করতেই হবে। এবং সেটা করতে হবে ওদের মনে কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে। ড্রাইভার নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। নোয়েল আড়চোখে জেনারেলকে দেখল। তার চোখ সরু, রাগে কাঁপছে ঠোঁট। নোয়েল ফিরল তাঁর দিকে। নিরীহ চেহারা করে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকে নামতে হবে, হ্যানস? ওরা কি আমাদেরকেও সার্চ করবে?' টের পেল রাগে শক্ত হয়ে গেছে জেনারেলের শরীর।

'দাঁড়াও!' চাবুকের মতো সপাং আওয়াজ তুলল জেনারেলের গলা।

'গাড়িতে ফিরে যাও,' হুকুম করলেন তিনি ড্রাইভারকে। লেফটেন্যান্টের দিকে তাকালেন, ক্রোধে কাঁপছে কণ্ঠ, 'তোমাকে যেই অর্ডার দিয়ে থাকুক না কেন তাদেরকে বলে দিও এসব হুকুম জার্মান সেনাবাহিনীর জেনারেলদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আমি লেফটেন্যান্টদের হুকুমের দাসত্ব করি না। আমার সামনে থেকে রোডব্লক সরাও।'

অসহায় লেফটেন্যান্ট বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল জেনারেলের গনগনে চেহারার দিকে। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'জি, জেনারেল স্কাইডার।' রাস্তা আটকে দাঁড়ানো ট্রাক-ড্রাইভারকে ইশারা করল রাস্তা ছেড়ে দেয়ার জন্য। সে রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে নিল ট্রাক।

'গাড়ি চালাও,' হুকুম দিলেন জেনারেল।

লিমুজিন দ্রুত ছুটে চলল রাতের আঁধারে।

ধীরে ধীরে সিটে গা এলিয়ে দিল নোয়েল। টেনশন মুক্ত এখন। কেটে গেছে সমস্যা। ইসরায়েল কাৎজ গাড়ির ট্রাঙ্কে আছে কিনা জানতে পারলে ভালো হত। বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে!

জেনারেল স্কাইডার নোয়েলের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি, এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ। মাঝে মাঝে গেস্টাপোদের স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যুদ্ধ পরিচালনা করে সেনাবাহিনী।'

নোয়েল হেসে জেনারেলের বাহুতে হাত রাখল। 'আর সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন জেনারেলরা।'

'ঠিক তাই,' সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'সেনাবাহিনী জেনারেলরাই চালাচ্ছেন। কর্নেল মুয়েলারকে একটা শিক্ষা দেব আমি।'

জেনারেল স্কাইডারের গাড়ি রোডব্লক থেকে বেরিয়ে যাবার দশমিনিট পরে গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্স থেকে ফোন এল, গাড়িটাকে সার্চ করার নির্দেশ।

'ওটা কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে,' জানাল লেফটেন্যান্ট। উপলব্ধি করল ওর কপালে খারাবি আছে। কর্নেল মুয়েলার ফোন ধরল।

'কতক্ষণ আগে গেছে?' মৃদু গলায় জানতে চাইল গেস্টাপো কর্মকর্তা।

'দশ মিনিট।'

'ওঁর গাড়ি সার্চ করেছিলে?'

লেফটেন্যান্টের নাড়িভুঁড়ি সব যেন গলে জল হয়ে গেল। 'না, স্যার। জেনারেল অনুমতি দেননি—'

'গর্দভ! কোন্‌দিকে গেছেন উনি?'

ঢোক গিলল লেফটেন্যান্ট। কথা বলার সময় ভাঙা শোনাল কণ্ঠ, যেন জেনে গেছে তার আর কোনো আশা নেই।

'ঠিক বলতে পারব না,' জবাব দিল সে। 'এটা একটা ক্রসরোড। উনি রুয়েন, সাগর অথবা লো হার্ভের যে-কোনো একদিকে যেতে পারেন।'

'তুমি কাল সকাল নটায় গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সে হাজির থাকবে। আমার অফিসে।'

'জি, স্যার,' বলল লেফটেন্যান্ট।

ঠাশ করে ফোন রেখে দিল কর্নেল মুয়েলার। পাশে দাঁড়ানো দুই সঙ্গীকে বলল, 'লো হার্ভে। আমার গাড়িতে উঠে পড়ো। আমরা আরশোলা-শিকারে বেরুব।'

লো হার্ভের রাস্তা চলে গেছে সীন নদীর তীর ধরে। পাহাড় আর খামার নিয়ে গড়ে ওঠা অপূর্ব সিন উপত্যকার মাঝ দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। পরিষ্কার, তারা-জ্বলা রাত। দূরের খামারবাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে যেন অন্ধকারের মরূদ্যান।

লিমুজিনের আরামদায়ক আসনে বসে কথা বলছে নোয়েল এবং জেনারেল স্কাইডার। জেনারেল বলছেন তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানের কথা, ব্যাখ্যা করছেন একজন সামরিক কর্মকর্তার জন্য সংসারধর্ম পালন করা কত কঠিন। নোয়েল তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মন্তব্য করল অভিনেত্রীর জন্যও রোমান্টিক জীবন বড্ড কঠিন। দুজনেই জানে এ আলোচনা আসলে একটা খেলা, তারা স্রেফ সময় কাটানোর জন্যই কথা বলছে। পাশে বসা মানুষটির বুদ্ধিমত্তা বিন্দুমাত্র খাটো করে দেখছে না নোয়েল, কী ভয়ানক অভিযানে বেরিয়েছে সে-ব্যাপারেও ও পূর্ণ সচেতন। জেনারেল স্কাইডারের এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই হঠাৎ করেই নোয়েল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। নোয়েল কিছু একটা স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে, জেনারেলের মনে এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। এ খেলায় জেনারেলকে হারিয়ে দেয়াই নোয়েলের টার্গেট। জেনারেল যুদ্ধের বিষয় হালকা স্পর্শ করলেন। তবে তাঁর কথাগুলো দীর্ঘদিন মনে থাকবে নোয়েলের। 'ব্রিটিশরা অদ্ভুত জাতি,' বললেন তিনি। 'শান্তির সময় তাদের সামলানো খুবই কঠিন, কিন্তু সমস্যার সময় তারা দুর্দান্ত। ব্রিটিশ নাবিক সবচেয়ে সুখি হয়ে ওঠে যখন দেখতে পায় তার জাহাজ ডুবে যাচ্ছে।'

ভোর রাতে লো হার্ভে পৌঁছে গেল ওরা, এখান থেকে ইত্রাতাতে যাবে।

'একটু বিরতি দিয়ে কিছু খেয়ে নেয়া যায় না?' বলল নোয়েল, 'আমার খিদে

পেয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল স্নাইডার। 'অবশ্যই।' গলা চড়ালেন তিনি, 'দ্যাখো তো সারারাত খোলা আছে এমন কোনো রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ে কিনা।'

'জেটির ধারে এরকম রেস্টুরেন্ট নিশ্চয় আছে,' পরামর্শ দিল নোয়েল। ওয়াটার ফ্রন্টের দিকে গাড়ি ঘোরাল ক্যাপ্টেন। পানির ধার ঘেঁষে দাঁড়া করাল। জেটিতে নোঙর করে আছে অনেক জাহাজ। এক ব্লক দূরে একটা রেস্টুরেন্ট দেখা গেল। সাইনবোর্ড ঝুলছে : 'বিস্ত্রো।'

গাড়ির দরজা খুলে ধরল ক্যাপ্টেন। নোয়েল নামল জেনারেলের পিছু পিছু।

'ডক-শ্রমিকদের জন্য বোধহয় সারারাত রেস্টুরেন্টটা খোলা থাকে,' বলল নোয়েল। মোটরের আওয়াজ শুনে ঘুরল। কার্গো লোড করা একটা ফর্কলিফট লিমুজিনের কাছে এসে থেমেছে। কভারঅল পরা দুজন লোক, মাথায় লম্বা টুপি চেহারার অনেকটাই ঢেকে রেখেছে, লাফিয়ে নেমে এল তাদের বাহন থেকে। একজন কটমট করে তাকাল নোয়েলের দিকে, তারপর একটা টুলকিট বের করে ফর্কলিফট টাইট করতে লাগল। নোয়েলের পেটের পেশি শক্ত হয়ে গেল। জেনারেল স্নাইডারের হাত ধরল ও, কদম বাড়াল রেস্টুরেন্টের দিকে। নোয়েল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল হুইলের পেছনে বসে আছে শোফার।

'ও কফি খাবে না?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'ও গাড়িতে থাকবে,' জবাব দিলেন জেনারেল।

নোয়েল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। শোফারের গাড়িতে থাকা চলবে না, তাহলে সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু নোয়েল আর কিছু বলার সাহস পেল না।

খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় জুতোর শব্দ তুলে ক্যাফের দিকে এগোল দলটা। হঠাৎ, একটা কদম তুলেছে নোয়েল, খোয়ায় পিছলে গেল পা, 'মাগো!' বলে কাতরে উঠল। জেনারেল হাত বাড়িয়ে ওকে ধরার আগেই দড়াম করে রাস্তায় পড়ে গেল নোয়েল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কী ঘটেছে দেখতে পেয়েছে শোফার, নেমে এল গাড়ি থেকে। দ্রুত এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'আমি দুঃখিত,' বলল নোয়েল। 'আ-আমার গোড়ালি বোধহয় ভেঙে গেছে।'

দক্ষহাতে ওর গোড়ালি পরীক্ষা করলেন জেনারেল। 'কোথাও ফোলা নেই। বোধহয় মচকে গেছে। উঠে দাঁড়াতে পারবে?'

'আ-আমি জানি না,' বলল নোয়েল।

শোফার চলে এসেছে নোয়েলের কাছে, দুজনে মিলে ওকে খাড়া করল। একটা কদম ফেলেই গুঙিয়ে উঠল নোয়েল। 'আমি হাঁটতে পারছি না। বসা দরকার।

'ওকে ওখানে নিয়ে চলো,' ক্যাফে দেখিয়ে বললেন জেনারেল।

দুপাশে দুই পুরুষের কাঁধে ভর করে রেস্টুরেন্টের দিকে এগোল নোয়েল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ঝুঁকি নিয়ে চট করে একবার গাড়ির দিকে

তাকাল ও। দুই ডক-শ্রমিক লিমুজিনের ট্রাঙ্কের সামনে।
'তুমি ইত্রাতাত যেতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।
'আরে, দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক হয়ে যাব,' বলল নোয়েল।
ক্যাফের মালিক ওদেরকে কিনারার একটি টেবিলে নিয়ে এল। ড্রাইভার এবং ক্যাপ্টেন নোয়েলকে সাবধানে বসিয়ে দিল চেয়ারে।
'অনেক ব্যথা করছে?' জানতে চাইলেন জেনারেল।
'কিছুটা,' জবাব দিল নোয়েল। জেনারেলের হাতে হাত রাখল। 'ভাববেন না। পায়ের ব্যথার জন্য আপনার আনন্দ আমি মাটি হতে দেব না, হ্যানস্।'

নোয়েল এবং জেনারেল হ্যানস্ স্কাইডার যখন ক্যাফেতে বসা, ওইসময় কর্নেল মুয়েলার তার দুই সহচরকে নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে লো হার্ভের দিকে। পুলিশের লোকাল ক্যাপ্টেন কাঁচাঘুম থেকে উঠে থানায় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। কর্নেল থানায় পৌঁছুলে জানাল, 'এক ফরাসি রক্ষী জেনারেলের গাড়ি দেখেছে। ওটা জেটিতে আছে।'
কর্নেল মুয়েলারের চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটল। 'আমাকে ওখানে নিয়ে চলো,' হুকুম দিল সে।
পাঁচমিনিট পর কর্নেল মুয়েলার, তার দুই সঙ্গী এবং পুলিশ ক্যাপ্টেনসহ গেস্টাপোর গাড়ি এসে থামল জেটিতে, জেনারেল স্কাইডারের গাড়ির পাশে। লোকগুলো নেমেই ঘিরে ধরল জেনারেলের গাড়ি। ওই মুহূর্তে জেনারেল সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ক্যাফে থেকে বের হচ্ছিলেন। শোফারই প্রথম দেখতে পেল তাদের গাড়ি ঘিরে ফেলেছে সশস্ত্র গেস্টাপো। সে দ্রুত পা চালাল ওদিকে।
'কী হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল। দূর থেকেও চিনতে পারল কর্নেল মুয়েলারকে। হিম হয়ে গেল গা।
'বুঝতে পারছি না,' বললেন জেনারেল স্কাইডার। লম্বা কদম ফেলে তিনি গাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। তাঁকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনুসরণ করল নোয়েল।
গাড়িতে পৌঁছে খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল কর্নেল মুয়েলারের উদ্দেশে, 'তুমি এখানে কী করছ?'
'আপনার ছুটির আনন্দে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত', ধারালো গলায় বলল কর্নেল, 'আপনার গাড়ির ট্রাঙ্ক একবার খুলে দেখতে চাই, জেনারেল।'
'ওখানে লাগেজ ছাড়া কিছু নেই।'
দলে যোগ দিল নোয়েল। লক্ষ করল ফর্কলিফট নেই। চলে গেছে। জেনারেল এবং গেস্টাপো কর্মকর্তা পরস্পরের দিকে জ্বলন্তচোখে তাকিয়ে আছে।
'আমাকে সার্চ করতেই হবে, জেনারেল। আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে থার্ড রাইখের এক পলাতক শত্রু ওখানে লুকিয়ে আছে এবং আপনার সঙ্গিনী তার সহযোগী।'

দীর্ঘক্ষণ কটমট করে মুয়েলারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল। তারপর ফিরলেন নোয়েলের দিকে।

'এর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল নোয়েল।

জেনারেলের দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল নোয়েলের পায়ের গোড়ালি। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরলেন তিনি শোফারের দিকে। 'খোলো।'

'জি, জেনারেল।'

সবার চোখ শোফারের দিকে। সে গাড়ির ট্রাঙ্কের হাতলের দিকে হাত বাড়াল। নোয়েলের মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে খুলে গেল ডানা।

ট্রাঙ্ক খালি।

'আমাদের লাগেজ কেউ চুরি করেছে!' চেঁচাল শোফার।

রাগে বিকৃত হয়ে গেল কর্নেল মুয়েলারের চেহারা। 'ও পালিয়েছে!'

'কে পালিয়েছে?' ধমকে উঠলেন জেনারেল।

'লো কাফার্ড,' ঘোঁতঘোঁত করছে কর্নেল। 'ইসরায়েল কাৎজ আসল নাম। ইহুদি। এই গাড়ির ট্রাঙ্কে করে তাকে প্যারিসের বাইরে পাচার করা হয়েছে।'

'অসম্ভব,' গর্জে উঠলেন জেনারেল। 'ওই ট্রাঙ্ক বন্ধ ছিল। ওখানে থাকলে সে দম বন্ধ হয়ে মারা যেত।'

কর্নেল মুয়েলার ট্রাঙ্ক দেখল একমুহূর্ত। তারপর ঘুরল তার এক সহচরের দিকে। 'ভেতরে ঢোকো।'

'জি, কর্নেল।'

লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ট্রাঙ্কের মধ্যে। কর্নেল মুয়েলার ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করে দিল। ঘড়ি দেখছে। চার মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সবাই, যে-যার চিন্তায় মগ্ন। সময়টা অনন্তকাল মনে হল নোয়েলের কাছে। অবশেষে ট্রাঙ্কের ডালা খুলল কর্নেল। ভেতরের লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। জেনারেল স্কাইডার ফিরলেন মুয়েলারের দিকে, চেহারায় তীব্র বিতৃষ্ণা।

'কেউ যদি এ ট্রাঙ্কে ঢুকে পালাতে চাইত,' ঘোষণার সুরে বললেন তিনি, 'ওরা তার লাশ খুঁজে পেত। তোমার জন্য আর কী করতে পারি, কর্নেল?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল গেস্টাপো কর্মকর্তা, রাগে ও হতাশায় জ্বলছে। জেনারেল তার শোফারকে নির্দেশ দিলেন, 'গাড়ি ছাড়ো।' তিনি নোয়েলকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলেন। ওরা রওনা হয়ে গেল ইত্রাতাতের পথে।

কর্নেল কুর্ট মুয়েলার জেটির চারপাশে সার্চ চালাল। পরদিন সন্ধ্যার দিকে একটা অব্যবহৃত গুদামঘরের ব্যারেলে পাওয়া গেল খালি একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। একটি আফ্রিকান ফ্রেইটার লো হাভরে থেকে আগের রাতে কেপটাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। ওটা এখন মাঝদরিয়ায়। হারানো লাগেজ কয়েকদিন পরে প্যারিসের গারে দু নর্দ-এর লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডিপার্টমেন্টে পাওয়া গেল।

নোয়েল এবং জেনারেল স্কাইডার ইত্রাতাত-এ ছুটি কাটিয়ে সোমবার শেষ বিকেলে ফিরে এল প্যারিসে। রাতের শোতে অংশ নিল নোয়েল।

ক্যাথেরিন
ওয়াশিংটন : ১৯৪১-১৯৪৪

৯

ল্যারিকে বিয়ে করার পরদিনই উইলিয়াম ফ্রেজারের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিল ক্যাথেরিন। ওয়াশিংটন ফেরার দিন ক্যাথেরিনকে লাঞ্চের দাওয়াত দিলেন ফ্রেজার। তাঁকে প্রচণ্ড মনমরা এবং বিধ্বস্ত লাগছিল। তার জন্য মায়া লাগল ক্যাথেরিনের। তবে এর বেশি কিছু নয়। ফ্রেজার ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন, 'তাহলে তুমি এখন বিবাহিতা রমণী,' বললেন তিনি।

'পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি বিবাহিতা রমণী।'

'নিশ্চয় সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করে নেয়া হয়েছে। নইলে আ-আমি হয়তো প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পেতাম।'

'হঠাৎ করেই ঘটে গেছে ঘটনা,' স্বীকার করল ক্যাথেরিন।

'ল্যারি ভাগ্যবান।'

'হুঁ।'

'ক্যাথেরিন—' ইতস্তত করলেন ফ্রেজার—'তুমি বোধহয় ল্যারিকে তেমন চেনো না, চেনো কি?'

আড়ষ্ট বোধ করল ক্যাথেরিন।

'আমি শুধু জানি আমি তাকে ভালোবাসি, বিল,' অচঞ্চল গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'আর জানি ও আমাকে ভালোবাসে। শুরুর জন্য এরচে' ভালো আর কী হতে পারে?'

ভুরু কুঁচকে চুপচাপ বসে রইলেন ফ্রেজার। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকলেন, 'ক্যাথেরিন—'

'বলো!'

'সাবধানে থেকো।'

'কিসের জন্য?'

ধীরে ধীরে বললেন ফ্রেজার, 'ল্যারি কিন্তু অন্যরকম।'

'কীরকম?' জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

'ও অন্যসব পুরুষের মতো নয়,' ক্যাথেরিনের চেহারা বদলে যাচ্ছে দেখে জোর করে ফ্যাকাশে একটা হাসি ফোটালেন মুখে।

'আরি, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমি হলাম সেই 'আঙুরফল টক' গল্পের শেয়াল।'

ক্যাথেরিন ফ্রেজারের হাত ধরল, 'আমি তোমাকে কোনোদিন ভুলব না, বিল। আশা করি আমরা বন্ধু হয়ে থাকতে পারব।'

'আমিও আশা করি,' বললেন ফ্রেজার। 'তুমি কি চাকরিটা করবে না ঠিক করেছ?'

'ল্যারি চায় না চাকরি করি। তার ধ্যানধারণা সেকেলে। তার মতে, স্বামীরাই স্ত্রীদের ভরণপোষণে বাধ্য।'

'যদি কখনো মত বদলাও,' বললেন ফ্রেজার, 'জানিয়ো আমাকে।' লাঞ্চের বাকি সময়টা কেটে গেল অফিসের খুঁটিনাটি বিষয় এবং কে ক্যাথেরিনের জায়গায় বসবে তা নিয়ে। ক্যাথেরিন জানে বিল ফ্রেজারকে সে খুব মিস করবে। মেয়েরা যে-লোককে জীবনে প্রথম সিডিউস করে তার কথা কখনো ভোলে না। ফ্রেজার মানুষটা ভালো, বন্ধুবৎসল। ল্যারি সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন তা পছন্দ হয়নি ক্যাথেরিনের। ল্যারি সম্পর্কে কোনো ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়েও বিল থেমে গেছেন ওর দাম্পত্য সুখের কথা ভেবে। নাকি স্রেফ 'আঙুরফল টক' গল্পের মতোই ব্যাপারটা ছিল? কিন্তু বিল ফ্রেজার ক্ষুদ্র কোনো মানুষ নন, হিংসুকও নন। উনি অবশ্যই ক্যাথেরিনকে সুখি দেখতে চান। ক্যাথেরিনের মনের কোথাও সন্দেহের মেঘ ঘনাল। তবে ঘণ্টাখানেক পরে যখন ল্যারির সঙ্গে তার দেখা হল এবং সে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, মস্তিষ্ক থেকে সবকিছু দূর হয়ে গেল ক্যাথেরিনের। চমৎকার, হাসিখুশি একজন মানুষ তার স্বামী, এ আনন্দে উদ্ভাসিত হল ক্যাথেরিন।

ল্যারির মতো মজার মানুষ দেখেনি ক্যাথেরিন। প্রতিটি দিনই যেন একটা অ্যাডভেঞ্চার, ছুটির দিন। প্রতি সাপ্তাহিক ছুটিতে ওরা শহরের বাইরে যায়, কাটায় ছোট ছোট সরাইতে, ঘুরে বেড়ায় গ্রাম্যমেলায়। লেক প্লসিড-এ ঘুরতে গেল ওরা, প্রকাণ্ড টবোগান স্লাইড-এ চড়ল, মাছ ধরে বেড়াল মন্টাক-এ, নৌকা বাইল। পানি খুব ভয় পায় ক্যাথেরিন সাঁতার জানে না বলে। ল্যারি ওকে ভরসা দিল কোনো ভয় নেই বলে। ওর সঙ্গে নিজেকে নিরাপদ মনে হয় ক্যাথেরিনের।

ক্যাথেরিনের মনে হয় সে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। হানিমুন করতে গিয়ে ল্যারি এক অ্যান্টিকের দোকানে রুপোর ছোট একটি পাখি দেখেছিল। ক্যাথেরিনের ওটা এমন পছন্দ হয়ে যায়, ল্যারি ওকে পরে ক্রিস্টালের একটা পাখি কিনে দিয়েছে। এরপর থেকে ওদের অ্যান্টিক সংগ্রহের পালা শুরু হয়ে যায়।

এক শনিবার রাতে ওরা মেরিল্যান্ডে চলে এল বিয়ের তিন মাস পূর্তি করতে। এবং সেই একই ছোট রেস্টুরেন্টে ডিনার করল।

পরদিন, রোববার, ৭ ডিসেম্বর, পার্ল হারবারে হামলা চালাল জাপানিরা।

আমেরিকা পরদিন বেলা ১টা ৩২ মিনিটে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সোমবার ল্যারি চলে গেল অ্যান্ড্রুজ এয়ারবেস-এ। অ্যাপার্টমেন্টে ল্যারিবিহীন অসহ্য লাগছিল বলে ক্যাথেরিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে ক্যাপিটল বিল্ডিঙে চলে এল কী ঘটছে দেখতে। ক্যাপিটল প্লাজার ফুটপাতে অন্তত ডজনখানেক মানুষ পোর্টেবল রেডিও কানে পেতে খবর শুনছে। ক্যাথেরিন দেখল প্রেসিডেন্টের গাড়ির বহর ক্যাপিটল-এর দক্ষিণ প্রবেশপথের সামনে এসে থামল। লিমুজিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। তাঁকে হুইলচেয়ারে নামিয়ে দিল দুজন এইড। প্রতিটি কিনারে ডজন ডজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে সতর্ক প্রহরায়।

পাঁচ মিনিট পরে ক্যাপিটল-এ ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে। তাঁর গলা শক্তিশালী, দৃঢ়, রাগী আত্মপ্রত্যয়।

'এই হামলার কথা স্মরণে রাখবে আমেরিকা... ন্যায়ের পক্ষের শক্তিরই জয় হবে... আমাদের জয় অনিবার্য। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন।'

রুজভেল্ট ক্যাপিটলে প্রবেশ করার পনেরো মিনিটের মাথায় পাশ হয়ে গেল হাউস জয়েন্ট রেজুলেশন, যুদ্ধ ঘোষণা করা হল জাপানের বিরুদ্ধে। মন্টানার প্রতিনিধি জ্যানেট র‍্যানফিন শুধু যুদ্ধঘোষণার বিরোধিতা করলেন। চূড়ান্ত ভোট হল ৩৮৮ বনাম ১। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঠিক দশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন—আমেরিকান কংগ্রেসে এটাই ছিল সংক্ষিপ্ততম সময়ের যুদ্ধ-বক্তৃতা।

বাইরের জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল, তারা গর্জন করে যুদ্ধঘোষণার প্রতি তাদের ইতিবাচক সাড়ার কথা জানিয়ে দিল। তারা ক্রুদ্ধ এবং প্রতিশোধের নেশায় ব্যাকুল। নারী এবং পুরুষ উভয়ের চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। ক্যাথেরিন ধীরপায়ে ফিরে চলল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। রাস্তার এককোনায় বেয়োনেট হাতে সৈনিকদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হল শীঘ্রি গোটা দেশ ঢেকে যাবে ইউনিফর্মে।

ক্যাথেরিন যেমনটি অনুমান করেছিল, তারচে' অনেক দ্রুত ঘটতে লাগল ঘটনা। ওয়াশিংটন যেন রাতারাতি খাকি-পোশাকধারী নাগরিকের শহরে পরিণত হল।

বাতাসে তীব্র উত্তেজনা, শান্তির কথা কেউ মনেই আনছে না। যেন যুদ্ধই জীবনের মূলমন্ত্র।

ল্যারিকে এখন ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাটাতে হয় এয়ারবেস-এ। প্রায়ই রাতও কেটে যায় এখানে। পার্ল হারবারের হামলা ভয়ানক ক্ষতি করেছে আমেরিকার, ল্যারি বলেছে ক্যাথেরিনকে। আমেরিকার নেভি প্রায় ধ্বংস হয়ে

গেছে এ আক্রমণে, এয়ার কর্পসেরও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

'আমরা কি এ যুদ্ধে হেরে যাব?' আশঙ্কিত হয়ে জানতে চেয়েছে ক্যাথেরিন।

ওর দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছে ল্যারি, 'এটা নির্ভর করবে কত দ্রুত আমরা প্রস্তুত হতে পারব তার ওপর। সবাই ভাবে কুঁৎকুঁতে চোখের বেঁটে জাপানিরা দুর্বল। বোকার রাজ্যে বাস করছে তারা। ওরা কঠিন প্রকৃতির মানুষ, মরতে ভয় পায় না। কিন্তু আমরা পাই।

জাপানিরা ক্রমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। তাদের প্রতিদিনকার সফল হামলা নিয়ে হেডলাইন হল পত্রিকায় : ওরা ওয়েক আক্রমণ করছে... ফিলিপিন দীপপুঞ্জে হামলার পাঁয়তারা কসছে... গুয়ামে অবতরণ করেছে... বোর্নিওতে... হংকং-এ...' জেনারেল ম্যাকআর্থার ম্যানিলাকে মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করলেন, এবং ফিলিপাইনে ফাঁদে পড়া আমেরিকান সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করল।

এপ্রিলের একদিন এয়ার বেস থেকে ক্যাথেরিনকে ফোন করল ল্যারি। ডাউন টাউনে চলে আসতে বলল ডিনার করতে। উইলার্ড হোটেলে সেলিব্রেট করবে।

'কিসের জন্য সেলিব্রেট?' জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

'রাতে তোমাকে বলব,' জবাব দিল ল্যারি। তার কণ্ঠে প্রবল উত্তেজনা।

বিকেল পাঁচটায় রেডি হয়ে গেল ক্যাথেরিন। বিছানায় বসে ড্রেসিংরুমের আয়নায় তাকাল। ল্যারির ফোন পাবার পর থেকে বুকটা ধুকপুক করছে অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। *আমি নিশ্চয় খামোকা দুশ্চিন্তা করছি,* ভাবল ও। *হয়তো প্রমোশন হয়েছে ল্যারির, তাই সেলিব্রেট করছে। কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো সুখবর পেয়েছে। কিন্তু মন যে মানে না।* নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে ও। *তোমার ফিগার ভালো, শরীরে উত্তেজক বাঁকের কমতি নেই। তুমি বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি, সৌজন্যপরায়ণ, দয়ালু এবং সেক্সি। সাধারণ কোনো পুরুষ কেন তোমাকে ছেড়ে যুদ্ধে গিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইবে?*

সাতটার সময় উইলার্ড হোটেলের ডাইনিংরুমে ঢুকল ক্যাথেরিন। ল্যারি এসে পৌঁছায়নি এখনো, বেয়ারা তাকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল। ড্রিঙ্ক নেবে না বললেও মত বদলাল ক্যাথেরিন। মার্টিনির অর্ডার দিল।

ওয়েটার ড্রিঙ্ক নিয়ে এল। ক্যাথেরিন গ্লাস তুলতে গিয়ে লক্ষ করল ওর হাত কাঁপছে। মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল ল্যারিকে। আসছে ওর দিকে। টেবিলের মাঝ দিয়ে পথ করে এল, মুখে ধরে রেখেছে হাসি। ওর গোটা অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তি। সবাই ফিরে দেখছে ল্যারিকে। ক্যাথেরিনও দেখছে ওকে। মনে পড়ল হলিউডে এমজিএম কমিসারিতে যেদিন ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ল্যারি, তখন ওর সম্পর্কে কিছুই জানত না ক্যাথেরিন। এখনই বা কতটুকু জানে? ক্যাথেরিনের টেবিলে পৌঁছে গেল ল্যারি, চট করে ওর গালে চুমু খেল।

'দুঃখিত, দেরি করে ফেললাম, ক্যাথি,' ক্ষমাপ্রার্থনা করল ও। 'বেসটা তো একটা পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে।'

বসল ও। মার্টিনির অর্ডার দিল।

ক্যাথেরিনের মন চিৎকার করে বলছে : *তোমার সারপ্রাইজের কথা বলো। বলো আমরা কী নিয়ে সেলিব্রেট করছি।* কিন্তু মুখে বলল না কিছুই। মার্টিনির গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিল। ল্যারির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভালো কোনো খবর নিয়ে এসেছে।

ল্যারি ক্যাথেরিনের দিকে ঝুঁকে এল। মুখে ছেলেমানুষি হাসি, ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

'তুমি চিন্তাও করতে পারবে না, ক্যাথি কী ঘটেছে। আমি সাগরপাড়ে যাচ্ছি।'

যেন একটা পিচ্ছিল পর্দা নেমে এল, সবকিছু ঝাপসা এবং অস্পষ্ট ঠেকল। ল্যারি ক্যাথেরিনের পাশে বসেছে, ওর ঠোঁট নড়ছে কিন্তু মুখখানা যেন আউট অভ ফোকাস হয়ে যাচ্ছে। ওর একটি কথাও শুনতে পাচ্ছে না ক্যাথেরিন। ল্যারির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। রেস্টুরেন্টের দেয়াল কেমন ঢেউয়ের মতো দুলছে। ক্যাথেরিন দেখছে, চোখ বিস্ফারিত।

'ক্যাথেরিন,' ল্যারি ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে। ধীরে ধীরে ল্যারির মুখে ফিরে এল ক্যাথেরিনের দৃষ্টি। সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন। ঢোক গিলল। কথা বলার সময় কেঁপে গেল গলা। 'ভালো খবর শুনলে এরকম হয় আমার।'

'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমার না গিয়ে উপায় নেই?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

ল্যারির কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। 'তুমি কাঁদছ!'

'কাঁদছি না,' ধরাগলায় বলল ক্যাথেরিন, 'আ-আসলে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগবে।'

'ওরা আমাকে নিজের স্কোয়াড্রন দিচ্ছে,' জানাল ল্যারি।

'তাই নাকি?' কণ্ঠে গর্ব ফোটানোর চেষ্টা করল ক্যাথেরিন। ওর নিজের স্কোয়াড্রন। ও যখন ছোট ছিল তখন হয়তো নিজের ট্রেন নিয়ে খেলা করেছে। এখন বড় হয়েছে। ওরা এখন ওকে খেলার জন্য নিজের স্কোয়াড্রন দেয়। এগুলো আসল খেলনা, গুলি খেয়ে মরার গ্যারান্টি আছে এতে। 'আমি আরেকটা ড্রিঙ্ক নেব।' বলল ক্যাথেরিন।

'অবশ্যই।'

'কবে—কবে তুমি যাবে?'

'আগামী মাসের আগে নয়।'

এমনভাবে কথাটা বলল ল্যারি যেন পালাতে চাইছে। অনুভূতিটা ভয়ংকর।

মনে হচ্ছে বিয়ের সুতোটা ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে।

'যাওয়ার আগে হাতে অনেক সময় পাচ্ছি,' বলল ল্যারি।

প্রচুর সময় কিসের জন্য? তিক্ত মন নিয়ে ভাবল ক্যাথেরিন। *ওদের পরিবার গড়ে তোলা, সন্তান নিয়ে ভারমন্টে স্কি করা, একসঙ্গে বুড়ো হওয়ার মতো প্রচুর সময় পাওয়া যাবে?*

'আজ রাতে কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

কান্ট্রি হাসপাতালে গিয়ে তোমার একটা আঙুল কেটে ফেলতে চাই অথবা তোমার কানের পর্দা ফুটো করতে চাই। মুখে বলল, 'বাড়ি গিয়ে প্রেম করি চলো।'

পরের চারটা হপ্তা খুব দ্রুত ফুরিয়ে গেল। দেখতে-না-দেখতে ঘনিয়ে এল ল্যারির বিদায়ের দিন। ক্যাথেরিন ওকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল নিজে গাড়ি চালিয়ে। খুশিতে বকবক করেই চলেছে ল্যারি। পুরো সময়টা গম্ভীর হয়ে থাকল ক্যাথেরিন। কষ্টে ফেটে যাচ্ছে বুক।

প্লেনে ওঠার আগে ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে বিদায়-চুম্বন করল ল্যারি। তারপর ঢুকে পড়ল বিমানে। শেষবারের মতো হাত নাড়ল। ক্যাথেরিন মাঠে দাঁড়িয়ে দেখল আকাশে বিন্দুর মতো লাগছে ল্যারির বিমান, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। একঘণ্টা ওখানে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাথেরিন। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার পরে রওনা হল বাড়ির পথে।

পার্ল হারবারে হামলা হবার পরে প্রথম বছরে জাপানিদের বিরুদ্ধে সাগরে এবং আকাশে দশটি বড় ধরনের লড়াই হল। তিনটিতে জিতল মিত্রপক্ষ।

প্রতিদিনের যুদ্ধের খবর কাগজের পাতায় খুঁটিয়ে পড়ে ক্যাথেরিন। উইলিয়াম ফ্রেজারের কাছে এ নিয়ে নানান প্রশ্ন করে। ল্যারিকে প্রতিদিন চিঠি লেখে সে। তবে আট হপ্তা পরে সে ল্যারির কাছ থেকে জবাব পেল। উত্তেজনায় ভরপুর তার চিঠি। চিঠিটি সেন্সর করা। তাই ক্যাথেরিন বুঝতে পারে না ল্যারি কোথায় আছে কিংবা কী করছে। তবে চিঠির ভাষা পড়ে বোঝা যায় নিজের কাজটা খুব উপভোগ করছে ল্যারি।

ক্যাথেরিন মাঝেমধ্যে উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গে লাঞ্চ করে। ও জানে ফ্রেজার যুদ্ধে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হোয়াইট হাউজ তাঁকে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে। এতে খুবই হতাশ ফ্রেজার। সেদিন লাঞ্চ করার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'ল্যারির কোনো খবর পেয়েছ?'

'গত হপ্তায় একট চিঠি পেয়েছি।'

'কী লিখেছে?'

'লিখেছে, যুদ্ধ ফুটবলখেলার মতো। আমরা প্রথম রাউন্ডে হেরে গেছি, কিন্তু

ওরা ফার্স্ট টিম পাঠিয়েছে। আমরা এখন জিতছি।'

মাথা ঝাঁকালেন ফ্রেজার। 'ল্যারির ভাষাই এরকম।'

'কিন্তু যুদ্ধ তো ফুটবলখেলা নয়,' শান্ত গলায় বলল ক্যাথেরিন, 'এ যুদ্ধ শেষ হবার আগে লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে।'

'এটাকে ফুটবলখেলা হিসেবেই ভাবো, অতটা খারাপ লাগবে না,' বললেন ফ্রেজার।

আবার কাজে লেগে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ক্যাথেরিন। সেনাবাহিনী মহিলাদের জন্য একটা শাখা খুলেছে WAC নামে। তবে এ সংগঠন নিয়ে নানা মুখরোচক খবর কানে এসেছে ক্যাথেরিনের। এ সংগঠনের মেয়েদের বেশিরভাগ সুন্দরী। এখানে গর্ভধারণের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। গুজব আছে, ভলান্টিয়াররা শারীরিক পরীক্ষায় সরাসরি অবতীর্ণ হয়। এসব শুনে এখানে কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল ক্যাথেরিন।

বিল ফ্রেজারের সঙ্গে লাঞ্চ করার সময় ও বলল, 'আমি কাজ করতে চাই। যুদ্ধের কাজে লাগতে চাই।'

ওকে একমুহূর্ত দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ফ্রেজার। 'সরকার ওয়ারবন্ড বিক্রির চেষ্টা করছে। তুমি এতে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারো।'

দুই হপ্তা পরে কাজে লেগে গেল ক্যাথেরিন। তারকারা ওয়ারবন্ড বিক্রির কাজে সাহায্য করছেন। ক্যাথেরিনের কাজ এদেরকে অর্গানাইজ করা। সহজ শোনালেও কাজটা মোটেই তা নয়। তারকারা শিশুর মতো, উৎসাহী, উত্তেজিত; তাঁরা যুদ্ধের জন্য সাহায্য করছেন এ আনন্দে মশগুল। কিন্তু এদের শিডিউল পাওয়া খুব কঠিন। ক্যাথেরিনকে প্রায়ই ওয়াশিংটন, হলিউড এবং নিউইয়র্কে ছুটতে হচ্ছে। একঘণ্টার নোটিশে বাইরে যাওয়ার প্রোগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে গেল সে। ডজনখানেক সেলিব্রিটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল।

'ক্যারি গ্রান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?' হলিউড থেকে ফিরে আসার পরে ক্যাথেরিনের সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করল তাকে।

'আমরা একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছি।' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

এটা ঘনঘন ঘটছিল। বিষয়টি নিয়ে সচেতনও ছিল না ক্যাথেরিন। মাস ছয় আগে বিল ফ্রেজার ওকে বলেন ওয়ালেস টার্নার তার অ্যাডভার্টাইজিং একটি অ্যাকাউন্ট নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন। তিনি ক্যাথেরিনকে পরিস্থিতি সামাল দিতে বলেন। ক্যাথেরিন মজা করে নতুন প্রচারণা চালায়। ক্লায়েন্ট তার ওপর খুব খুশি হয়। কয়েক হপ্তা বাদে ফ্রেজার আরেকটা বিষয়ে ক্যাথেরিনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ক্যাথেরিনের অর্ধেক সময় খেয়ে নিচ্ছিল অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি। তাকে আধডজন অ্যাকাউন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সবগুলোই খুব ভালোভাবে চালাচ্ছিল ও। ফ্রেজার ওকে বিরাট অঙ্কের বেতন দিচ্ছিলেন, সেইসঙ্গে

পার্সেন্টেজও।

ক্রিসমাসের আগে, একদিন দুপুরে ফ্রেজার ক্যাথেরিনের অফিসে ঢুকলেন। কর্মচারীদের সবাই বাড়ি চলে গেছে। শেষ মিনিটের কাজ সেরে নিচ্ছিল ক্যাথেরিন।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেজার।

'ভালোই,' হাসল ক্যাথেরিন, কলকলিয়ে যোগ করল, 'তুমি বেশ ভালো বেতনও দিচ্ছ। ধন্যবাদ, বিল।'

'আমাকে ধন্যবাদ দিয়ো না। প্রতিটি পয়সা অর্জন করছ নিজের যোগ্যতায়। তোমার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি। তোমাকে পার্টনারশিপের অফার দিচ্ছি।'

বিস্মিত ক্যাথেরিন, 'পার্টনারশিপ!'

'গত ছয়মাসে যে নতুন অ্যাকাউন্টগুলো পেয়েছি তার অর্ধেক তোমার কারণেই পাওয়া সম্ভব হয়েছে।' তিনি বসে পড়লেন। তাকিয়ে থাকলেন ক্যাথেরিনের দিকে। কিছু বলছেন না। তবে ক্যাথেরিন বুঝতে পারল ওর পার্টনারশিপ সাংঘাতিক কামনা করছেন ফ্রেজার।

'ঠিক আছে। আমি তোমার পার্টনার হব।'

উজ্জ্বল দেখাল ফ্রেজারের চেহারা। 'তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না কত খুশি হয়েছি আমি।' তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন। সরিয়ে দিল হাত। আলিঙ্গন করল তাঁকে। চুমু খেল গালে।

'যেহেতু এখন আমরা পার্টনার,' মশকরা করল ও, 'কাজেই তোমাকে চুমু খেতে পারি,' টের পেল ওকে জোরে আঁকড়ে ধরেছেন ফ্রেজার।

'ক্যাথি,' বললেন তিনি, 'আমি...'

তাঁর ঠোঁটে আঙুল রাখল ক্যাথেরিন, 'কিছু বলতে হবে না, বিল। জীবন যেভাবে চলছে চলুক।'

'তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।' আন্তরিক গলায় বলল ক্যাথেরিন।

হাসলেন ফ্রেজার, 'আমি তোমাকে বিরক্ত করব না, কথা দিচ্ছি। ল্যারির প্রতি তোমার ভালোবাসাকে আমি সম্মান করি।'

'ধন্যবাদ, বিল,' ইতস্তত করল ক্যাথেরিন। 'জানি না একথা জানলে তোমার কিছু এসে যাবে কিনা, তবে আমার প্রয়োজনের সময় সবসময় একজনকে পেয়েছি, সে তুমি।'

'অনেক কিছুই এসে যাবে,' মুচকি হাসলেন ফ্রেজার। 'তোমার একথাগুলো সারারাত জাগিয়ে রাখবে আমাকে।'

নোয়েল
প্যারিস : ১৯৪৪

১০

আরমন্দ গটিয়ের বিয়ের জন্য নোয়েলের ওপর এখন আর চাপ সৃষ্টি করছে না। আগে সে নোয়েলের ওপর অধিকার ফলাতে চাইত। ভাবত নোয়েলের চেয়ে অনেক উঁচু অবস্থানে আছে। কিন্তু পরিস্থিতি পুরো উল্টো হয়ে গেছে। ওরা যখন খবরের কাগজে একত্রে সাক্ষাৎকার দেয়, সাংবাদিকরা নোয়েলকেই সরাসরি প্রশ্ন করে। ওরা যেখানেই যায়, অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে ওঠে নোয়েল, গটিয়েরের প্রতি খুব কম লোকেরই আগ্রহ থাকে।

নোয়েল রক্ষিতা হিসেবে যথার্থ। সে গটিয়েরের হোস্টেজের ভূমিকা পালন করে। ফ্রান্সের সবাই তাকে ঈর্ষা করে। কিন্তু বাস্তবতা হল এই—একমুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে নেই গটিয়ের। কারণ সে জানে নোয়েল তার নয়, কোনোদিন হবেও না, একদিন হঠাৎ করেই নোয়েল তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে যেভাবে একবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। সেকথা মনে পড়লে অসুস্থবোধ করে গটিয়ের। নারীদের নিয়ে তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা, তার জ্ঞান, তার বুদ্ধিমত্তা সবকিছুই হার মেনে যায় নোয়েলের কাছে এলে। নোয়েলকে সে পাগলের মতো ভালোবাসে। এই নারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তার জীবনে আসেনি। নোয়েল অন্য কোনো পুরুষের দিকে তাকালেও ঈর্ষার কাঁটা খচ করে গটিয়েরের বুকে বেঁধে। একবার নোয়েল এক পার্টিতে সারাটা সন্ধ্যা এক বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছিল। গটিয়ের রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল। তার চিৎকার চেঁচামেচি শোনার পরে শান্তগলায় নোয়েল বলেছে, 'অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বললে যদি তুমি বিরক্ত হও, আরমন্দ, আমি আজই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

এরপর বিষয়টি আর উত্থাপন করার সাহস হয়নি গটিয়েরের।

ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে নিজের সেলুন চালু করল নোয়েল। থিয়েটার থেকে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে রোববারের একটা সাধারণ শাখা খুলল। তবে সেলুনের কথা

লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লে এখানে সমাজের রাঘববোয়ালরা এসে ভিড় করতে লাগলেন। এদের মধ্যে আছেন রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, লেখক। নোয়েল তার সেলুনের প্রধান আকর্ষণ। সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। নোয়েল বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করে, জবাবগুলো মনেও রাখে। সে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে শিখে নেয় রাজনীতির কলাকৌশল, ব্যাংকারদের কাছ থেকে জানে অর্থলগ্নি সম্পর্কে। একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পকলা-বিশেষজ্ঞ নোয়েলকে চিত্রকলা শেখান, শীঘ্রি সে জেনে যায় ফ্রান্সের বিখ্যাত চিত্রকরদের সম্পর্কে। ব্যারন রথসচাইল্ডের প্রধান মদ-বিক্রেতার কাছ থেকে মদ বিষয়ে খোঁজখবর নেয় সে, করবুসিয়ার থেকে জানে স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে। বিশ্বের সেরা সব শিক্ষককে পেয়ে গেছে নোয়েল। আর তাঁরা পেয়েছেন অপূর্ব সুন্দরী, মাথা-খারাপ-করা এক ছাত্রী। সে শ্রোতা হিসেবে অত্যন্ত মনোযোগী, যে-কোনো-কিছু বুঝেও নিতে পারে সহজে।

আরমন্দ গটিয়েরের নোয়েলকে দেখে মনে হয় একজন রাজকুমারী তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। গটিয়ের জানে রহস্যময়ী নোয়েলের খুব কাছাকাছি একমাত্র সেই আসতে পেরেছে। অন্য কেউ নয়।

আরমন্দ গটিয়ের নোয়েলের ব্যাপারে ধীরে ধীরে আরেকটু নিরাপত্তার আশ্বাস পেতে থাকে। তার মনে হতে থাকে নোয়েল প্রয়োজনে অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা করে বটে তবে কারো প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না।

কিন্তু নোয়েলের সঙ্গে তখনও কনস্টানটিন ডেমিরিসের পরিচয় হয়নি।

কনস্টানটিন ডেমিরিস এমন বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যা অনেক দেশের চেয়েও শক্তিশালী। তাঁর নিজের কোনো পদবি কিংবা অফিশিয়াল কোনো অবস্থান নেই তবে তিনি নিয়মিত প্রধানমন্ত্রী, কার্ডিনাল, রাষ্ট্রদূত এবং রাজাদের কেনাবেচা করেন। ডেমিরিস বিশ্বের সেরা তিন ধনবান ব্যক্তির একজন। তাঁর ক্ষমতা কিংবদন্তি সমান। তিনি বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ ব্যবসায়ী, তাঁর রয়েছে এয়ারলাইন, সংবাদপত্র, ব্যাংক, ইস্পাত কারখানা, স্বর্ণখনি—তাঁর শুঁড় ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। তিনি কয়েক ডজন দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক।

ডেমিরিস বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা সংগ্রাহকও বটে, তিনি বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত বিমানের মালিক। সারাবিশ্ব জুড়ে তাঁর ছড়িয়ে রয়েছে কয়েক ডজন অ্যাপার্টমেন্ট এবং ভিলা।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের উচ্চতা মাঝারির চেয়ে সামান্য বেশি, পিপের মতো চিতানো বুক, চওড়া কাঁধ। গায়ের রঙ ফর্সা, খাড়া, গ্রিক নাক, কালো চোখে ঠিকরে পড়ে বুদ্ধিমত্তা। জামাকাপড়ের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই, তবু 'ব্রেস্ট ড্রেসড ম্যান'-এর তালিকায় তিনি আছেন, গুজব রয়েছে তাঁর পাঁচশতাধিক সুট আছে। তিনি যেখানে যান, সুট বানান। তাঁর সুট তৈরি করে লন্ডনের হস অ্যান্ড কার্টিস, শার্ট আসে রোমের ব্রাইওনি থেকে, প্যারিসের ভ্যালিয়েন্ট গ্রান্ড তাঁর জুতো

বানায়, টাই আসে কয়েক ডজন দেশ থেকে।

ডেমিরিসের উপস্থিতির মধ্যেই রয়েছে জাদু। তিনি ঘরে ঢুকলে, যারা তাঁকে চেনে না, তারাও তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর হেন পত্রিকা নেই যাতে কনস্টানটিন ডেমিরিসের বাণিজ্যিক এবং সামাজিক জীবন নিয়ে গল্প ছাপা হয়নি।

মিডিয়ার অন্যতম আকর্ষণ ডেমিরিস 'সাংবাদিকরা একবার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল বন্ধুরা তাঁর সাফল্যে সহযোগিতা করেছে কিনা। তিনি জবাব দিয়েছেন, 'সফল হতে বন্ধুদের দরকার, তবে খুব বেশি সফল হতে দরকার শত্রুদের।'

তিনি ব্যবসাকে মনে করেন ধর্ম, অফিস তাঁর কাছে মন্দির। গ্রিক অর্থডক্স চার্চে যান তিনি। তবে বলেন, 'ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসার নামে অনেক বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।'

বিশ্ব জানে ডেমিরিসের স্ত্রী এক পুরোনো গ্রিক ব্যাংকিং পরিবারের কন্যা। তাঁর সহধর্মিণী আকর্ষণীয়া এবং অভিজাত। ডেমিরিস ইয়ট ভ্রমণ কিংবা ব্যক্তিগত দ্বীপে ছুটি কাটাতে গেলে তাঁর স্ত্রী খুব একটা সঙ্গিনী হওয়ার সুযোগ পান না। ডেমিরিসের সঙ্গ দেন সুন্দরী অভিনেত্রী কিংবা সাম্প্রতিক সময়ের আলোড়ন তোলা কোনো ব্যালেরিনা। ডেমিরিসের রোমান্টিক গল্প তাঁর বাণিজ্যিক অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে কোনো অংশে কম রোমাঞ্চকর নয়। তিনি ফিল্মের কয়েক ডজন তারকাকে নিয়ে বিছানায় গেছেন, তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর তালিকায় রয়েছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের স্ত্রী, পনেরো বছরের ঔপন্যাসিকা, সদ্য বিধবা, এমনকি একদল নানও যাদের নতুন একটি কনভেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

ডেমিরিসকে নিয়ে আধডজন বই লেখা হয়েছে, তবে কেউ তাঁর সাফল্যের রহস্য জানে না। বিশ্বের অন্যতম পাবলিক ফিগার কনস্টানটিন ডেমিরিস একজন রহস্যময় মানুষ, পাবলিক ইমেজটা মুখোশ মাত্র, যা তাঁর ভেতরটাকে ঢেকে রাখে। তাঁর মতো চেহারার কয়েকজন মানুষ ভাড়া করেছেন তিনি। আসল ডেমিরিসকে কেউ চেনে না। পিরাউসে জন্ম তাঁর, বাবা জাহাজ থেকে মাল খালাস করতেন। চোদ্দ ভাই-বোনের সংসারে টেবিলে পর্যাপ্ত খাবার কোনোদিনই থাকত না। কেউ অতিরিক্ত খাবার চাইলে মারামারি বেধে যেত।

ছেলেবেলা থেকে অঙ্কের প্রতি প্রবল মোহ ডেমিরিসের। কৈশোরকাল থেকেই তিনি একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি শীঘ্রি বুঝতে পারেন আশপাশের মানুষজনের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখেন ঘটে। তিনি জানেন পৃথিবীটা বাজার ছাড়া কিছু নয়। এখানে মানুষ হয় ক্রেতা নয়তো বিক্রেতা। কিছু নারী, তিনি জানেন, তাঁর অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিছু আকৃষ্ট হয় শক্তির প্রতি আর খুবই অল্পসংখ্যক তাঁর মন এবং কল্পনাশক্তির প্রতি আকর্ষণবোধ করে।

যত মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, প্রায় সবাই কিছু-না-কিছু তাঁর কাছে চেয়েছে : চ্যারিটির জন্য চাঁদা কিংবা ব্যবসা শুরুর জন্য অর্থ। যারা ডেমিরিসকে

িয়ে বই বা প্রবন্ধ লেখে তারা শুধু তাঁর অমায়িক আচরণ এবং বিনয় সম্পর্কে জানে। তাদের কল্পনাতেও নেই বিনয় ভূষণের সারফেসের নিচে বাস করে একজন খুনি, সুপ্ত এক অগ্নিগিরি, যে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায়।

প্রাচীন গ্রিক-এ দুটি শব্দ আছে—thekaeossini—ন্যায়বিচার এবং ekthekessis—প্রতিশোধ। দুটি শব্দই যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে ডেমিরিসকে। তাঁকে যারা কষ্ট বা যন্ত্রণা দিয়েছে তাদের কথা প্রতিরাতে স্মরণ করেন তিনি। তারা জানে না তাদের ধ্বংস করার জন্য কী ভয়ংকর পরিকল্পনা এঁটে চলেছেন ডেমিরিস।

ষোলোবছর বয়সে স্পাইরোস নিকোলাস নামে এক লোকের সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছিলেন ডেমিরিস। জাহাজঘাটায় ছোট একটি দোকান খোলার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল তাঁকে। দোকানে রাতের ডকশ্রমিকদের গরম খাবার বিক্রি করা হবে। ব্যবসার অর্ধেক টাকা যোগান দেন ডেমিরিস। কিন্তু দোকান জমে ওঠার পরে নিকোলাস তাকে ব্যবসা থেকে বাদ দিয়ে দেয়, নিজেই পুরোটার দখল নিয়ে নেয়। ডেমিরিস নিজের নিয়তি মেনে নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করেননি। আরেকটি ব্যবসা শুরু করেন।

পরবর্তী কুড়ি বছরে মাংস-প্যাকিঙের ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করে স্পাইরোস নিকোলাস। ধনী হয়ে ওঠে সে। বিয়ে করে সে, তিন সন্তানের বাবা হয়, গ্রিসের অন্যতম খ্যাতিমান মানুষে পরিণত হয়। এই সময়ে ডেমিরিস চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসেছিলেন, নিকোলাসকে তার ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য গড়তে দিয়েছেন। যখন দেখলেন খুব সুখে আছে নিকোলাস এবং ভাবছে এ সুখ অনন্তকাল, আঘাত হানলেন ডেমিরিস।

ব্যবসা বেড়ে চলছিল, তাই নিকোলাস নিজেই মাংস বিক্রির জন্য গবাদি খামার এবং কয়েকটি স্টোর খুলে বসার চিন্তা করতে লাগল। এজন্য বিপুল পরিমাণ টাকার দরকার। কনস্টানটিন ডেমিরিসের ব্যাংকের সঙ্গে ব্যবসা ছিল নিকোলাসের। ব্যাংক নিকোলাসকে সুদে টাকা ধার নিতে বলল। নিকোলাস প্রচুর টাকা ধার করল। হঠাৎ করেই ব্যাংক টাকা ফেরত চেয়ে বসল। আপত্তি জানাল নিকোলাস, বলল সে পেমেন্ট করতে পারবে না। ব্যাংক নিকোলাসের বন্ধকি সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ করতে লাগল। ডেমিরিসের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো নিকোলাসের গল্প ছাপতে লাগল, যারা তাকে টাকা ধার দিয়েছিল তারা নিকোলাসের বন্ধকি সম্পত্তি দখল করতে লাগল। সে অন্য ব্যাংকে গেল টাকা ধার চাইতে, কিন্তু তারা কোনোরকম সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করল। যেদিন দেউলিয়া বলে ঘোষিত হল নিকোলাস, তার পরদিন সে আত্মহত্যা করল।

ডেমিরিস-এর thekaeossini-র নীতি দ্বি-ধার তরবারির মতো। তিনি কখনো অপমানের কথা ভোলেন না, কারো উপকারও কখনো বিস্মৃত হন না। এক বাড়িউলি তরুণ ডেমিরিসকে অভাবের সময় খাবার এবং কাপড় দিয়ে সাহায্য

করেছিল। হঠাৎ সেই তরুণ আবিষ্কার করে একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের মালিক হয়ে গেছে। বাড়িউলি কোনোদিন জানতে পারেনি দাতার পরিচয়। এক তরুণী কপর্দকশূন্য ডেমিরিসকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাকে একটি ভিলা দান করা হয় এবং সারাজীবনের জন্য তার খাওয়াপরার চিন্তা ঘুচে যায়। যেসব মানুষ চল্লিশ বছর আগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ এ গ্রিকের সঙ্গে কাজ করেছে, তাদের কল্পনাতেও ছিল না এই সাধারণ সম্পর্ক তাদের জীবনে কীরকম প্রভাব ফেলবে। কর্মচঞ্চল ডেমিরিসের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে ব্যাংকার, আইনজীবী, জাহাজের ক্যাপ্টেন, রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। কেউ তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছে, সাহায্য করেছে; অন্যরা তাকে ডুবিয়েছে, ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে। এই গ্রিক তাঁর মনে এবং মস্তিষ্কে সবার কথা গেঁথে রেখেছেন। তিনি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন তাঁর প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনায়। শিকারকে সতর্কভাবে লক্ষ করেন ডেমিরিস, তাদের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করেন, মেপে দেখেন তাদের শক্তি এবং খুঁজে বের করেন দুর্বলতা।

ডেমিরিসের তখন তিনটে ছোট ফ্রেইটার ছিল। জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লোনের প্রয়োজনে তিনি ব্যাসেল-এ এক সুইস ব্যাংকার-এর কাছে গিয়েছিলেন। ব্যাংকার তাঁকে শুধু প্রত্যাখানই করেননি, অন্য ব্যাংকার বন্ধুদের ফোন করে মানা করেছিলেন এই তরুণ গ্রিককে যেন টাকা দেয়া না হয়। ডেমিরিস শেষে টাকাটা তুরস্ক থেকে ধার করেন।

ডেমিরিস সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। সিদ্ধান্ত নেন ওই ব্যাংকারকে লোভের ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করবেন। সৌদি আরবের ইবনে সউদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন ওখানে নতুন আবিষ্কৃত অয়েল ডেভেলপমেন্টের লিজ নেয়ার ব্যাপারে। কয়েকশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে লিজ নেবে ডেমিরিসের কোম্পানি।

ডেমিরিস তাঁর এক এজেন্টকে নির্দেশ দেন খবরটি সুইস ব্যাংকারের কানে তোলার জন্য। ব্যাংকারকে ২৫ শতাংশ অংশীদার করার প্রস্তাব দেয়া হয় নতুন কোম্পানিতে। শর্ত—স্টকের শেয়ার কিনতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে নগদ। যখন চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটবে, ওই পাঁচ মিলিয়নের দাম গিয়ে দাঁড়াবে পনেরো মিলিয়নে। ব্যাংকার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিমাফিক টাকা দিতে রাজি হয়ে যান। নিজের কাছে অত টাকা না-থাকায় তিনি কাউকে কিছু না-জানিয়ে চুপিচুপি টাকাটা ধার করেন ব্যাংক থেকে। কারণ শেয়ার হারাতে চাননি তিনি। পরের হপ্তায় হস্তান্তর হয়ে যাবে টাকা, ইতোমধ্যে তিনি ব্যাংক থেকে নেয়া টাকা রেখে দিতে পারবেন যথাস্থানে।

ব্যাংকারের চেক হাতে পেয়ে ডেমিরিস সংবাদপত্রে ঘোষণা করে দেন আরবের সঙ্গে তাঁর চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। দুড়ুম করে নেমে যায় শেয়ার। লস তোলার কোনো উপায় ছিল না ব্যাংকারের। এবং তার অর্থ তছরুপের ঘটনা প্রকাশ হয়ে যায়। ডেমিরিস ব্যাংকারের শেয়ারের স্টক অতি সামান্য টাকায় কিনে নিয়ে

তেলের চুক্তিতে এগিয়ে যান। স্টক আবার চাঙা হয়ে ওঠে। অর্থ তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত ব্যাংকারের কুড়ি বছরের জেল হয়ে যায়।

তবে ডেমিরিসের খেলায় কয়েকজন খেলোয়াড় এখনো রয়ে গেছে যাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়নি। তবে কোনো তাড়া নেই ডেমিরিসের। তিনি প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন খুব উপভোগ করেন। এ যেন দাবাখেলা আর ডেমিরিস দাবার মাস্টার। এখন তাঁর কোনো শত্রু নেই, কারণ তাঁর শত্রুতা করার ক্ষমতা কারো নেই। তবে অতীতে যারা ডেমিরিসের ক্ষতি করেছে তাদের কথা তিনি ভোলেননি।

এক রোববার নোয়েল পেজের সেলুনে ঢুকলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। কায়রো যাচ্ছেন তিনি, কয়েক ঘণ্টার যাত্রাবিরতি করেছেন প্যারিসে। তাঁর এক তরুণী স্থপতি প্রেমিকা ডেমিরিসকে নোয়েলের সেলুনে একবার ঢুঁ মেরে আসতে বলেছিল। ডেমিরিস যে-মুহূর্তে দেখলেন নোয়েলকে, বুঝলেন এ নারীকে তাঁর যেভাবেই হোক পেতেই হবে।

কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে সাক্ষাতের তিনদিন বাদে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গ্রিসে চলে এল নোয়েল।

দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত বলে নোয়েল পেজ এবং কনস্টানটিন ডেমিরিসের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। ফটোগ্রাফার এবং সাংবাদিকরা ডেমিরিসের স্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করল। এ ঘটনা ঘরের শান্তি নষ্ট করে থাকলেও এ সম্পর্কে একটা কথাও বললেন না তিনি। মেলিনা ডেমিরিস প্রেসের কাছে শুধু এ মন্তব্যই করলেন তাঁর স্বামীর বিশ্বজুড়ে প্রচুর বান্ধবী আছে। এবং এতে তিনি দোষের কিছু দেখছেন না। তবে ক্রুদ্ধ বড়ভাইকে ব্যক্তিগতভাবে বললেন কোস্টা (স্বামীকে এ নামে ডাকেন মেলিনা এর আগেও বেশ কয়েকবার প্রেমে জড়িয়েছে। এটা সেই প্রেমগুলোর মতোই ক্ষণস্থায়ী। মেলিনা মানসিক এই যন্ত্রণাটুকু সহ্য করেন, কারণ স্বামীকে তিনি সত্যি ভালোবাসেন। স্বামীর পরনারী-আসক্তি তিনি মেনে নিয়েছেন, তবে নিজে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। মেলিনা কনস্টানটিনকে কিছু বলেন না, কারণ জানেন এতে দুজনের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হবে। তাদের বিবাহিত জীবন একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। তিনি জানেন তিনি খুববেশি যৌনাবেদনময়ী নন, তবে স্বামী যখন ইচ্ছা করেন স্ত্রীকে বিছানায় পেতে পারেন। মেলিনা স্বামীকে যতটা সম্ভব তৃপ্তি দেয়ার চেষ্টাও করেন। তবে তিনি যদি জানতেন নোয়েলের প্রেম করার ধরন, শক্‌ড্ হতেন এবং যদি জানতেন তার স্বামী ওটা উপভোগ করেন, কষ্টে ছেয়ে যেত মেলিনার মন।

কনস্টানটিনের কাছে নারী কোনো বিস্ময় নয়। কিন্তু নোয়েলকে তার

সার্বক্ষণিক বিস্ময় মনে হয়। নোয়েল তার কাছে ধাঁধার জন্য প্যাশন, এক প্রহেলিকা। এমন নারী জীবনে আসেনি তাঁর। তিনি যেসব সুন্দর সুন্দর জিনিস নোয়েলকে দিয়েছেন, সে খুশি হয়ে গেছে। তবে না দিলেও অখুশি থাকেনি। তিনি পোর্টফোলিওতে নীল উপসাগরের দিকে মুখ ফেরানো একটি চমৎকার ভিলা কিনে দিয়েছেন নোয়েলকে। তবে তিনি জানেন এথেন্সের পুরোনো প্লাকা অঞ্চলে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিলেও একই গুরুত্ব বহন করত নোয়েলের কাছে।

ডেমিরিসের জীবনে আসা নারীদের অনেকেই তাদের সেক্স ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চেয়েছে তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু নোয়েল কোনোদিন কিছু চায়নি তাঁর কাছে। কিছু নারী তাঁর কাছে আসে তাঁর আলোয় আলোকিত হতে। কিন্তু নোয়েলের আলোয় আকর্ষিত হয়ে ছুটে আসে আলোকচিত্রী আর সাংবাদিকরা। কারণ নোয়েল নিজেই তারকা। মাঝে মাঝে ডেমিরিসের মনে হয় নোয়েল বোধহয় তাঁর প্রেমে পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা জোর করে ঝেঁটিয়ে দেন মাথা থেকে।

শুরুতে নোয়েলের গভীরে পৌঁছে তাকে বুঝে ওঠা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল ডেমিরিসের জন্য। প্রথমে যৌনতা দিয়ে চেষ্টাটা করেছিলেন তিনি। কিন্তু জীবনে প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেন এই মেয়ে বিছানায় তাঁর চেয়েও পাকা খেলুড়ে। তার যৌনক্ষুধার সীমা নেই। ডেমিরিস যাই করেন, তারচে' অনেক বেশি পারঙ্গমতার সাথে ওটা করে দেখায় নোয়েল। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন নোয়েলের মতো তৃপ্তি কেউ তাঁকে দিতে পারেনি। ও যেন এক ফেনোমেনা, উপভোগ করার নতুন নতুন দ্বার নিয়মিত উন্মোচন করে চলেছে। ডেমিরিস বিরাট অঙ্কের বেতন দিয়ে যেসব রাঁধুনি রেখেছেন, রান্নায় তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় নোয়েল। শিল্পকলা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিটি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী সে।

ডেমিরিস সম্প্রতি রেমব্রান্ডটের একটি চিত্রকলা কিনেছেন আড়াই লক্ষ পাউন্ড দিয়ে। এক তরুণ কিউরেটর ছবিটি নিয়ে এসেছিল। নোয়েল গভীর মনোযোগে ছবিটি দেখে ঘোষণা করল ওটা নকল। কিউরেটর জানিয়েছে সে ব্রাসেলসের একটি ডিলারের কাছ থেকে ছবিটি কিনেছে। নোয়েল ব্যাখ্যা করল, মূল ছবিটি রয়েছে স্পেনের ডিউক অভ টোলেডোর কাছে। এবং এটার আসল দাম এক লাখ পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল নোয়েলের ধারণাই সঠিক। র‍্যামব্রান্ডটের ছবিটি নকল। ভয়ানক ঠকেছেন ডেমিরিস। প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় কিউরেটর এবং আর্ট ডিলারের জেল হয়ে গেল। ডেমিরিস নোয়েলের চিত্রকলার জ্ঞানের চেয়ে তার সততায় বেশি মুগ্ধ। নোয়েল ইচ্ছে করলে কিউরেটরকে একপাশে ডেকে নিয়ে ব্ল্যাকমেইলের হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারত। তাতো সে করেইনি বরং ডেমিরিসের সামনে সরাসরি চ্যালেঞ্জ

করে নাস্তানাবুদ করেছে ব্যাটাকে। ছবিটি ডেমিরিস ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি নোয়েলকে অত্যন্ত দামি এমারেল্ড নেকলেস কিনে দিয়েছেন। খুব বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে উপহারটি গ্রহণ করেছে নোয়েল। কেউ তাকে সিগারেট লাইটার উপহার দিলে একইরকম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করত সে।

ডেমিরিস যেখানেই যান, সঙ্গে থাকে নোয়েল। তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না বলে সকল সিদ্ধান্ত একাই নেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে নোয়েলের দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং প্রখর। তার সঙ্গে কথা বলে এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরো সহজ হয়ে উঠছে ডেমিরিসের জন্য। দেখা গেছে কিছু ব্যবসার ব্যাপারে নোয়েল ডেমিরিসের আইনজীবী এবং অ্যাকাউনটেন্টদের চেয়েও ভালো বোঝে। আগে একসঙ্গে একাধিক রক্ষিতার প্রয়োজন হত ডেমিরিসের। কিন্তু এখন নোয়েল তাঁর যা যা দরকার সমস্ত প্রয়োজনই মেটাচ্ছে। তিনি একে একে সবগুলো রক্ষিতাকে ত্যাগ করলেন।

ডেমিরিসের একটি ইয়ট আছে, ১৩৫ ফুট লম্বা। ইয়টটি একটি সি-প্লেন বহন করে, ক্রুর সংখ্যা ২৪, এতে রয়েছে দুটি স্পিডবোট এবং মিষ্টি পানির সুইমিংপুল। এ ছাড়াও ইয়টটিতে রয়েছে চমৎকার সাজানো একডজন গেস্টসুইট, ডেমিরিসের নিজের জন্য বৃহৎ একটি অ্যাপার্টমেন্ট, পেইন্টিং এবং অ্যান্টিক দ্বারা সুসজ্জিত।

ডেমিরিসের ইয়ট-ভ্রমণে হোস্টেস থাকে নোয়েল। ডেমিরিস যখন তার ব্যক্তিগত দ্বীপে বেড়াতে যান, নোয়েল তার সঙ্গী হয়। মেলিনা থাকেন বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী এবং নোয়েল যেন কখনো মুখোমুখি হয়ে না পড়ে সে-ব্যাপারে সতর্ক নজর রয়েছে ডেমিরিসের। যদিও তিনি জানেন নোয়েলের কথা তাঁর স্ত্রীর অজানা নেই।

নোয়েল যেখানে যায়, রানির মতো সমাদর পায়। নোয়েল ডেমিরিসের সম্পদ বা খ্যাতি দেখে বিমোহিত হয়নি, মুগ্ধ হয়েছে লোকটার বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তি দেখে। তার রয়েছে দানবীয় ইচ্ছাশক্তি, তার সঙ্গে তুলনায় অন্য পুরুষরা রীতিমতো নস্যি। নোয়েল টের পায় এই মানুষটি সীমাহীন নিষ্ঠুর, তবে এটা তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কারণ নোয়েলের নিজের মাঝেও নিষ্ঠুরতার কমতি নেই।

সিনেমা এবং নাটকে অভিনয়ের প্রস্তাব ক্রমাগত আসছে নোয়েলের কাছে। কিন্তু সে এ-ব্যাপারে উদাসীন ভূমিকা পালন করছে। এ জীবন তার কাছে দারুণ উত্তেজক মনে হচ্ছে, যে-কোনো চিত্রনাট্যকারের কাহিনীর চেয়ে রোমাঞ্চকর। সে রাজা, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ডিনার করে। তাঁরা জানেন নোয়েল ডেমিরিসের কান। তাই তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনের কথা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন, বলেন নোয়েল তাঁদেরকে সাহায্য করলে তাঁরাও নোয়েলের প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াবেন।

তবে নোয়েলের কিছু প্রয়োজন নেই। সে ডেমিরিসের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে

জানিয়ে দেয় কে কী চেয়েছেন। ডেমিরিস তখন তাঁদের প্রয়োজনীয়তা, শক্তি এবং দুর্বলতা পরিমাপ করেন। এবং সেভাবে প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর বিপুল ভাণ্ডারে আরো অর্থ সঞ্চিত হয়।

ডেমিরিসের প্রাইভেট দ্বীপ তাঁর আনন্দের অন্যতম উৎস। তিনি পাথুরে দ্বীপটাকে স্বর্গে পরিণত করেছেন। পাহাড়ের ওপরে রয়েছে তাঁর দৃষ্টিনন্দন ভিলা। ওখানে তিনি বাস করেন। এছাড়া রয়েছে ডজনখানেক সুদৃশ্য কটেজ, একটি হান্টিং প্রিজার্ভ, একটি কৃত্রিম হ্রদ, একটি চিড়িয়াখানা, ইয়ট নোঙর করার জন্য জেটি এবং বিমান অবতরণের জন্য ল্যান্ডিং ফিল্ড। দ্বীপে ভৃত্যের সংখ্যা আশি, সশস্ত্র প্রহরী কাউকে দ্বীপে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয় না। দ্বীপের নির্জনতা ভালো লাগে নোয়েলের, সবচেয়ে উপভোগ্য হয়ে ওঠে সে-সময় যখন কোনো অতিথি থাকে না। তাঁর সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে চায় নোয়েল, ভাবলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন ডেমিরিস। তিনি জানলে যারপরনাই বিস্মিত হতেন—নোয়েল সারাক্ষণ এমন এক লোককে নিয়ে ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকে যার নামই তিনি শোনেননি।

নোয়েলের কাছ থেকে ল্যারি ডগলাস আধা-পৃথিবী দূরে। গোপন দ্বীপে গোপন যুদ্ধে ব্যস্ত। তবু নোয়েল ল্যারি সম্পর্কে তার স্ত্রীর চেয়ে বেশি খবর রাখে। নোয়েল মাসে একবার প্যারিসে যায় ক্রিশ্চিয়ান বারবেটের সঙ্গে দেখা করতে। টাকমাথা, বেঁটে গোয়েন্দা নোয়েলের জন্য লেটেস্ট খবর রেডি রাখে।

নোয়েল যখন প্রথম বারবেটের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফ্রান্স আসছিল, এক্সিট ভিসা পেতে ঝামেলা হচ্ছিল। কাস্টমস অফিসে পাঁচঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে তাকে। শেষে সে কনস্টানটিন ডেমিরিসকে ফোন করে। ডেমিরিসের সঙ্গে কথা বলার দশ মিনিট পরে এক জার্মান অফিসার হন্তদন্ত হয়ে নোয়েলের কাছে এসে তার সরকারের তরফ থেকে প্রচুর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাকে বিশেষ ভিসা দিয়ে দেয়। এরপর থেকে নোয়েলকে আর কাস্টমস আটকায়নি।

বেঁটে গোয়েন্দা নোয়েলের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। সে নোয়েলের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিচ্ছে, কিন্তু তার ট্রেনিংপ্রাপ্ত নাক আরো টাকার গন্ধ খোঁজে। কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে নোয়েলের নয়া সম্পর্কের কথা জেনে সে বেজায় খুশি। তার মনে হচ্ছে এটা তার জন্য বিরাট আর্থিক সুবিধা এনে দেবে। প্রথমত তাকে জানতে হবে ডেমিরিস তার রক্ষিতার প্রেমিক ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে খবর রাখেন কিনা। এরপর সে জানবে এই তথ্য ডেমিরিসের কাছে কতটা মূল্যবান। নাকি নোয়েল পেজ তাঁকে চুপ থাকতে বলেছে। ভয়ানক একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে বারবেট তবে হাতের তাস খেলতে হবে সাবধানে। ল্যারি সম্পর্কে দারুণ দারুণ খবর জোগাড় করেছে বারবেট। কারণ সে তার সূত্রকে ভালো টাকা দেয়।

ল্যারির স্ত্রী যখন APO-তে আসা নাম-ঠিকানাবিহীন একটি চিঠি পড়ছে, ওই

সময় ক্রিশ্চিয়ান বারবেট রিপোর্ট করছে নোয়েলকে।

'উনি ফোরটি এইটথ ফাইটার স্কোয়াড্রনে, ফোরটিনথ ফাইটার গ্রুপ-এর সঙ্গে আছেন।'

ক্যাথেরিন চিঠিতে পড়ছে, '... আমি প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও আছি, বেবি...'

ক্রিশ্চিয়ান বারবেট নোয়েলকে বলছে, 'ওরা টারাবায় আছে, গুয়াম-এর পরে।'

'... আমি তোমাকে সাংঘাতিক মিস করছি, ক্যাথি। তোমাকে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমরা অবশেষে জ্যাপ জিরোর চেয়ে ভালো প্লেন পেয়েছি...'

'আপনার বন্ধু পি-থার্টি-এইট, পি-ফর্টি এবং পি-ফিফটি ওয়ান চালাচ্ছেন।'

'... তুমি ওয়াশিংটনে কাজে ব্যস্ত আছ শুনে খুশি হয়েছি। এখানে সবকিছু ঠিক আছে। দেখা হলে তোমাকে একটা খবর বলব...'

'আপনার বন্ধু D. F.C. পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি এখন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল।'

ক্যাথেরিন যখন তার স্বামীর কথা ভাবছে এবং প্রার্থনা করছে তাঁর স্বামী যেন নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে, নোয়েলও তখন ল্যারির নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে শীঘ্রি। ল্যারি ডগলাস বাড়ি ফিরবে। ওদের দুজনের জন্যই।

ক্যাথেরিন
ওয়াশিংটন : ১৯৪৫-১৯৪৬

১১

১৯৪৫ সালের ৭ মে সকালে, ফ্রান্সের রেইমসে মিত্রপক্ষের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল জার্মানি। থার্ড রাইখের হাজার বছরের রাজত্বের ঘটল অবসান। মুক্ত পৃথিবীর সকল মনোযোগ পড়ল দূরপ্রাচ্যে। ছোটখাটো গড়নের, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির জাপানিরা তাদের অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রতিটি ইঞ্চি ধরে রাখার জন্য রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ করে চলছিল। মনে হচ্ছিল এটা ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি যুদ্ধ হতে চলেছে।

৬ আগস্ট পারমাণবিক বোমা ফেলা হল হিরোশিমায়। ধ্বংসযজ্ঞ ছিল কল্পনাতীত। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের অধিকাংশ মানুষ প্রাণ হারাল।

তিনদিন পরে, ৯ আগস্ট দ্বিতীয় আণবিক বোমা পড়ল, এবারে নাগাসাকিতে। ফলাফল আগের চেয়েও ভয়ংকর। পরপর দুটি পারমাণবিক বোমার ধাক্কা সামলাতে পারল না জাপানিরা। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধজাহাজ মিসৌরিতে জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল জাপান সরকার। সমাপ্তি ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

খবরটা জানার পরে লম্বা একটা মুহূর্ত দমবন্ধ করে রইল বিশ্ব, তারপর ফেটে পড়ল উল্লাসে। সারা পৃথিবীর মানুষের যুদ্ধের অবসানের আনন্দে নাচানাচি করতে লাগল।

পরদিন বিল ফ্রেজার দক্ষিণ প্রশান্তের একটি দ্বীপ থেকে ল্যারি ডগলাসের ফোন পেলেন। ক্যাথেরিনকে একটা সারপ্রাইজ দেবে সে। তবে ফ্রেজারকে নিষেধ করল এ ব্যাপারে কিছু না বলতে। ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে তার অফিসে অপেক্ষা করতে বললেন, একসঙ্গে লাঞ্চ করবেন। বেলা আড়াইটায় ক্যাথেরিন বিলের ইন্টারকম বাজার টিপল।

'তুমি আমাকে কখন লাঞ্চ খাওয়াবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ডিনারের সময় তো হয়ে এল।'

'বসে থাকো,' বললেন ফ্রেজার, 'আমি একটু পরেই আসছি।'

পাঁচমিনিট পরে ক্যাথেরিনের ইন্টারকমে বললেন ফ্রেজার, 'এক নাম্বার লাইনে তোমার ফোন এসেছে।'

ফোন তুলল ক্যাথেরিন, 'হ্যালো!' খ্যাচম্যাচ শব্দ হল, তারপর মনে হল ঢেউয়ের শব্দ আসছে। 'হ্যালো,' আবার বলল ও। একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, 'মিসেস ল্যারি ডগলাস?'

'জি,' বলল ক্যাথেরিন। 'কে বলছেন?'

'এক মিনিট, প্লিজ।'

রিসিভারে তীক্ষ্ণ নিনাদ শোনা গেল। আবার খ্যাচম্যাচ শব্দ। তারপর বলল একটি কণ্ঠ, 'ক্যাথি?'

জায়গায় বসে রইল ক্যাথেরিন, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না, 'ল্যারি? ল্যারি?'

'ইয়েস, বেবি।'

'ওহ্, ল্যারি!' কাঁদতে শুরু করল ক্যাথেরিন, সারাশরীর কাঁপছে।

'কেমন আছ, হানি?'

বাহুতে নখ বসিয়ে দিল ক্যাথেরিন, নিজেকে ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করল যাতে হিস্টিরিয়া থামানো যায়। 'আ-আমি ভালো আছি,' বলল ও, 'কো-কোথায় তুমি?'

'বললেই লাইন কেটে দেবে,' জানাল ল্যারি, 'প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও।'

'তাহলে তো কাছেই আছ!' কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে ক্যাথেরিন। 'তুমি ঠিক আছ তো, ডার্লিং?'

'ভালো আছি।'

'বাড়ি ফিরছ কবে?'

'যে-কোনো মুহূর্তে,' একটু বিরতি, 'তুমি কাঁদছ নাকি?'

'অবশ্যই কাঁদছি। ভাগ্যিস তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমার মাসকারা গলে গলে পড়ছে। ওহ্, ল্যারি... ল্যারি...

'আমি তোমাকে খুব মিস করেছি, বেবি,' বলল ল্যারি।

ক্যাথেরিন লম্বা, একাকী রাতগুলো নিয়ে ভাবল যা দীর্ঘায়িত হয়েছে হপ্তা, মাস এবং বছরে, ল্যারিকে ছাড়া। ও পাশে নেই, ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে নেই, ওর উষ্ণতা এবং নিরাপত্তা ছাড়া দিন কাটাতে হয়েছে ক্যাথেরিনকে। ক্যাথেরিন বলল, 'আমিও তোমাকে মিস করেছি।'

এক লোকের কণ্ঠ ভেসে এল লাইনে, 'আমি দুঃখিত, কর্নেল, তবে এখুনি লাইন কেটে দিতে হবে।'

'কর্নেল!'

'তুমি বলোনি তোমার প্রমোশন হয়েছে।'

'বললে এ নিয়েই সারাক্ষণ মাতামাতি করতে।'

'ওহ্, ডার্লিং, আমি—'

সাগরের গর্জন উচ্চকিত হয়ে উঠল, আকস্মিক নীরবতা, কেটে গেল লাইন। ক্যাথেরিন ডেস্কে বসে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল ফোনের দিকে। তারপর বাহুতে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল।

দশ মিনিট পরে ফ্রেজারের কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে। 'তুমি রেডি হলেই আমরা লাঞ্চে বেরিয়ে পড়তে পারি, ক্যাথেরিন।'

'পাঁচটা মিনিট সময় দিন, রেডি হয়ে নিচ্ছি,' খুশি-খুশি গলা ক্যাথেরিনের। ল্যারির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে ফ্রেজারকে নিশ্চয় অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। ওর মতো চমৎকার মানুষ হয় না। তবে ল্যারির পরে, অবশ্যই।

ল্যারি আসছে, কল্পনায় প্রতিদিনই দেখছে ক্যাথেরিন। উত্তেজনায় আর তর সইছে না। বিল ফ্রেজার বলেছেন ল্যারি সম্ভবত এয়ার ট্রান্সপোর্ট কমান্ড প্লেন অথবা MATS বিমানে আসবে। তবে এগুলো কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারের মতো সময় মেপে চলে না। কখন আসবে-যাবে, টাইম-টেবিল নেই।

ক্যাথেরিন সারাদিন ল্যারির অপেক্ষায় বাসায় বসে থাকে। বই পড়ার চেষ্টা করে, মন বসাতে পারে না। রেডিওতে খবর শোনে আর ভাবে এবারে ল্যারি বাড়ি ফিরলে আর ওকে ছেড়ে চলে যাবে না। মধ্যরাতেও ল্যারি বাড়ি না ফিরলে আরেকটা দিনের আশায় বুক বাঁধে ক্যাথেরিন। পরদিন রাত দুটো পর্যন্ত বসে থাকতে থাকতে ঘুম এসে যায় চোখে। ঘুমিয়ে পড়ে ক্যাথেরিন।

বাহুতে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে যায় ক্যাথেরিন, চোখ মেলে তাকায়। দাঁড়িয়ে আছে ল্যারি, ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। রোদে পোড়া মুখে হাসি। পরমুহূর্তে ওর বাহুডোরে বাঁধা পড়ল ক্যাথেরিন। গত চার বছরের সমস্ত দুশ্চিন্তা, একাকিত্ব, যন্ত্রণা একনিমিষে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। আনন্দের বন্যায় ভেসে যেতে লাগল ক্যাথেরিন। ওকে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরে থাকল ক্যাথেরিন। যেন যেতে দেবে না কোথাও।

'আস্তে, হানি,' অবশেষে বলল ল্যারি, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্ত্রীর আলিঙ্গন থেকে। 'কাগজে খবর বেরুবে যুদ্ধফেরত বৈমানিকের স্ত্রীর আলিঙ্গনে দমবন্ধ হয়ে পটল তুলেছে।' বলে হাসল সে।

ঘরের আলো জ্বেলে দিল ক্যাথেরিন যাতে ওকে ভালোভাবে দেখতে পারে। ল্যারিকে আগের চেয়ে সুদর্শন লাগছে।

'তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি', বিড়বিড় করল ক্যাথেরিন, 'তবে কোথায়, কীভাবে দেখা করব জানতাম না। এবার কর্পস-এ ফোন করেছিলাম। ওরা কোনো তথ্য দিতে পারল না। আমি তখন থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি...আর...'

ল্যারি চুমু দিয়ে ওর কথা বলা বন্ধ করে দিল। কঠিন চুম্বন। ক্যাথেরিন ভেবেছে ল্যারির প্রতি আগের মতো শারীরিক আকর্ষণ বোধ করবে। কিন্তু করছে না দেখে অবাক হল। বহুদিন ধরে যৌনসংসর্গ থেকে দূরে ক্যাথেরিন। হয়তো এজন্য কামনা-বাসনাগুলো গভীরে ডুব মেরে আছে। ওগুলোকে উজ্জীবিত করে তুলতে সময় লাগবে।

কিন্তু ক্যাথেরিনকে সময় দিতে রাজি নয় ল্যারি। সে ক্ষিপ্রগতিতে জামাকাপড় খুলছে, বলছে, 'গড, ক্যাথি, তুমি জানো না এ মুহূর্তটির জন্য কী ব্যাকুল হয়েছিলাম আমি। তুমি আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছ।'

টান মেরে শর্টস খুলে ফেলল ল্যারি। এখন পুরোপুরি নগ্ন। ক্যাথেরিনকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বিছানায়। ল্যারি মাত্র বাড়ি ফিরেছে, এই আনন্দ বুঝে উঠতে সময়ের দরকার, ওর নগ্নতার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ল্যারি ওসবের ধার ধারল না। সে ক্যাথেরিনের ওপর চড়ে বসেছে, ওর ভেতরে ঢুকছে। ক্যাথেরিন ল্যারির জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। কিন্তু ল্যারি ওকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, ব্যথা দিচ্ছে। বুনো জন্তুর মতো মিলিত হচ্ছে। কান্না থামাতে নিজের হাত কামড়ে ধরে থাকল ক্যাথেরিন।

ওর স্বামী বাড়ি ফিরেছে।

পরের মাসটা ফ্রেজারের বদান্যতায় অফিসে যেতে হল না ক্যাথেরিনের। ল্যারির সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাল ও। ল্যারির প্রিয় খাবারগুলো রান্না করল, একসঙ্গে গান শুনল, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আড্ডা দিল, এতদিনের হারানো বছরগুলোর শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করল। রাতে ওরা পার্টি কিংবা থিয়েটারে গেল। বাড়ি ফিরে প্রেম করল। ক্যাথেরিনের শরীর এখন ল্যারির জন্য প্রস্তুত, আগের মতো উত্তেজক লাভার সে।

ল্যারি অনেকটা বদলে গেছে। সে এখন নিতে চায় বেশি, দিতে চায় কম। তার মিলন অনেক সময় যৌন-হামলার মতো মনে হয় ক্যাথেরিনের কাছে। প্রতিবার মিলনশেষে শরীরে ক্ষত নিয়ে বিধ্বস্ত শরীরে বিছানায় পড়ে থাকে ক্যাথেরিন। যেন ওকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। হতে পারে দীর্ঘদিন নারীসঙ্গের অভাব এমন বুনো করে তুলেছে ল্যারিকে।

কিন্তু ল্যারির মিলনকৌশল অপরিবর্তিতই থেকে গেল। ল্যারির ভেতরে আরো অনেক পরিবর্তন দেখছে ক্যাথেরিন। ওকে পরখ করার চেষ্টা করে, ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে এ তার স্বামী, যাকে সে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করত। লম্বা, সুগঠিত শরীরের, গভীর কালো চোখের অত্যন্ত সুদর্শন একজন মানুষ। ও সুদর্শন ঠিক আছে তবে চেহারায় কেমন একটা কাঠিন্য চলে এসেছে। ওকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হয় ক্যাথেরিনের। মনে হয় এ মানুষটি স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। পরক্ষণে ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ক্যাথেরিন। এ তার ল্যারি, প্রেমিক

পুরুষ, দয়ালু, বুদ্ধিমান।

ক্যাথেরিন গর্বের সাথে তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ল্যারির পরিচয় করিয়ে দেয়। তবে তাদের কাছে ল্যারিকে বিরক্তিকর মনে হয়। পার্টিতে ঘরের এককোনায় বসে মদ পান করে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দেয় ল্যারি। ক্যাথেরিনের সন্দেহ, ল্যারি কারো সঙ্গে মিশতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। 'কেন ওদের সঙ্গে মিশতে যাব?' প্রশ্ন করলে খেঁকিয়ে ওঠে ল্যারি। 'আমি যখন বিপদ আর ঝুঁকির মধ্যে তখন এই মোটা বেড়ালগুলো কোথায় ছিল?'

ক্যাথেরিন জানতে চেয়েছে ল্যারি ভবিষ্যতে কী করবে। ভেবেছে ল্যারি এয়ার কর্পসেই থাকবে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে সে।

সমস্যাটা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলা দরকার। ক্যাথেরিন গেল বিল ফ্রেজারের কাছে। সব শুনে সহানুভূতির সুরে ফ্রেজার বললেন, 'তোমার মতো সমস্যা এ মুহূর্তে সারা পৃথিবীর লাখ লাখ মেয়ে ভোগ করছে। তুমি আসলে এক অচেনা মানুষকে বিয়ে করেছ, ক্যাথেরিন।'

ক্যাথেরিন তাকিয়ে থাকে ফ্রেজারের দিকে, কিছু বলে না।

ক্যাথেরিন আবার যোগ দিল কাজে। অফিসের লোকেরা তাকে দেখে খুবই খুশি। প্রথম তিনদিন ক্যাম্পেইন আর নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য লে আউট এবং পুরোনো অ্যাকাউন্টের ফাইলে হালকাভাবে চোখ বুলানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ করল না ও। সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করে গেল হারানো সময়গুলো পূরণ করতে।

ল্যারি ক্যাথেরিনের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকে বাসায়। শুরুতে জানতে চাইত ল্যারি ওর অবর্তমানে কী করেছে। কিন্তু সবসময় অস্পষ্ট জবাব দিত ল্যারি। তাই ওকে প্রশ্ন করা বাদ দিয়েছে ক্যাথেরিন। একটা দেয়াল তৈরি করে রেখেছে ল্যারি, ক্যাথেরিন জানে না এ দেয়াল ভাঙবে কী করে। ক্যাথেরিন যাই বলুক, তার বিপক্ষে কথা বলা চাই-ই, বেহুদা ওদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে ফ্রেজারের সঙ্গে ডিনার করে ওরা। তবে ক্যাথেরিন হাসি-ঠাট্টায় এমনভাবে মাতিয়ে রাখে সবাইকে, বোঝার জো নেই সংসারে কী অশান্তি চলছে।

তবে ক্যাথেরিন বুঝতে পারছিল বিরাট কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতে চলেছে। সে ল্যারিকে এখনো ভালোবাসে। কিন্তু ল্যারি এভাবে চলতে থাকলে দুজনেই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গে লাঞ্চ করছে ক্যাথেরিন।

'ল্যারি কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ঠোঁটের ডগায় 'ভালো' শব্দটা এসে গিয়েছিল, থেমে গেল। 'ওর একটা চাকরি দরকার,' ভোঁতা গলায় বলল ক্যাথেরিন।

চেয়ারে হেলান দিলেন ফ্রেজার। 'চাকরি পাচ্ছে না বলে মেজাজ খারাপ?'

ইতস্তত করল ও, মিথ্যা বলতে চাইছে না। 'ও আসলে কিছুই করতে চাইছে না,' সাবধানে বলল। 'ওর উপযোগী একটা কাজ দরকার।'

'পাইলটের চাকরি করবে?'

'সার্ভিসে আবার ঢুকতে চাইছে না ল্যারি।'

'আমি এয়ারলাইন্সের কথা ভাবছি। আমার এক বন্ধু আছে, প্যান-অ্যাম চালায়। ল্যারির মতো অভিজ্ঞ পাইলট ওদের দরকার।'

ক্যাথেরিন প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবল। ল্যারির জায়গায় নিজেকে চিন্তা করার চেষ্টা করছে। সে পৃথিবীর যে-কোনোকিছুর চেয়ে ভালোবাসে প্লেন চালাতে। ও যে কাজ ভালোবাসে সেরকম চাকরি পেলে ল্যারির নিশ্চয় আপত্তি থাকবে না। 'কাজটা ভালোই,' বলল ক্যাথেরিন। 'চাকরিটা সত্যি কি ও পাবে, বিল?'

'চেষ্টা করব আমি,' বললেন ফ্রেজার। 'ল্যারিকে একবার জিজ্ঞেস করে দ্যাখো সে এটা করবে কিনা।'

'করব,' কৃতজ্ঞচিত্তে ফ্রেজারের হাত চেপে ধরল ক্যাথেরিন। 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ কিসের জন্য?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন ফ্রেজার।

'যখনই তোমাকে প্রয়োজন, কাছে পেয়েছি সেজন্য।'

ক্যাথেরিন সে রাতে ল্যারিকে বিলের প্রস্তাবের কথা বলল। ল্যারি বলল, 'এরচেয়ে ভালো কাজ হতে পারে না।'

দিনদুই পরে ম্যানহাটানে প্যান-অ্যাম-এর হেডকোয়ার্টার্সে কার্ল ইস্টম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল ল্যারি। ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল ক্যাথেরিন। 'আমি তোমাকে ফোন করে সব খবর জানাব,' ল্যারি চুমু খেল ওকে। মুখে বাচ্চা ছেলেদের হাসি।

ল্যারিকে অনেক সময় বাচ্চাদের মতো লাগে ক্যাথেরিনের। হুটহাট করে রেগে যায় বটে তবে ও খুব উদার মনের এবং ভদ্র।

ক্যাথেরিনের অনেক কাজ। কিন্তু ল্যারি ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছে না সে। ওর কাছে এটা চাকরির চেয়েও বড় কিছু মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওদের বিয়ে টিকে থাকা না-থাকা যেন নির্ভর করছে ওর ওপর।

ফিফথ এভিন্যু এবং ফিফটি-থার্ড স্ট্রিট-এ একটি আধুনিক ভবনে প্যান আমেরিকান হেডকোয়ার্টার্স। কার্ল ইস্টম্যান-এর অফিস বেশ বড়সড়। দামি, আরামদায়ক আসবাবে সাজানো। সন্দেহ নেই, এ লোক গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদ অধিকার করে আছে।

'আসুন, বসুন,' ল্যারিকে স্বাগত জানাল সে।

ইস্টম্যানের বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়, হালকা-পাতলা গড়ন, অন্তর্ভেদী একজোড়া চোখ। ল্যারিকে কাউচে বসতে বলে তার মুখোমুখি একটি চেয়ার দখল

করল নিজে।

'কফি?'

'না, ধন্যবাদ।' বলল ল্যারি।

'শুনলাম আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাইছেন।'

'যদি সুযোগ থাকে।'

'সুযোগ আছে,' বলল ইস্টম্যান। 'যদিও একটি মাত্র পদের জন্য হাজার হাজার আবেদন পড়েছে। বললে বিশ্বাস করবেন না আপনার মতো অভিজ্ঞ পাইলটরা সারাদিন এখানে বসে থাকে।'

হতাশ বোধ করল ল্যারি। 'তাহলে আমাকে ডেকেছেন কেন?' আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল।

'দুটো কারণে। প্রথম কারণ, ওপরমহল থেকে একজন লোক আমাকে বলেছেন।'

রাগ হল ল্যারির।

'আমার দরকার নেই—'

সামনে ঝুঁকে এল ইস্টম্যান। 'দ্বিতীয় কারণ, আপনার ফ্লাইং রেকর্ড অবিশ্বাস্য ভালো।'

'ধন্যবাদ,' শক্তগলায় বলল ল্যারি।

ইস্টম্যান লক্ষ করছে ওকে। 'এখানে একটা ট্রেনিং-প্রোগ্রামে অংশ নিতে হবে আপনাকে। ধরে নিন নতুন করে স্কুলে ভর্তি হচ্ছেন।'

ইতস্তত করল ল্যারি, আলোচনা কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছে বুঝতে পারছে না।

'ঠিক আছে,' সতর্ক গলায় বলল ও।

'নিউইয়র্কের লাগুয়ারডিয়ায় আপনার ট্রেনিং হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি। অপেক্ষা করছে।

'চার হপ্তা গ্রাউন্ড স্কুলের ট্রেনিং, একমাস ফ্লাইট ট্রেনিং।'

'আপনারা ডিসি-ফোর চালান?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'হ্যাঁ। ট্রেনিং শেষ হলে আপনাকে নেভিগেটরের দায়িত্ব দেব আমরা। আপনার ট্রেনিং-এর বেস-এর বেতন হবে মাসে সাড়ে তিনশো ডলার।'

ও চাকরিটা পেয়ে যাচ্ছে! ওর আর কিসের চিন্তা!

মুচকি হাসল ল্যারি। 'নেভিগেটর হিসেবে শুরু করতে আপত্তি নেই আমার, ইস্টম্যান। কিন্তু আমি একজন পাইলট। তার কী হবে?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইস্টম্যান, 'এয়ারলাইন্স ইউনিয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রমোশন হয়। আপনার সামনে অনেক লোক আছে। একবার চেষ্টা করে দেখবেন?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি, 'আমার হাবাবার কী আছে?'

'ঠিক,' বলল ইস্টম্যান, 'আমি ফর্মালিটিজগুলো সেরে ফেলছি। আপনার

শারীরিক পরীক্ষা হবে। কোনো সমস্যা নেই তো?'

দাঁত বের করল ল্যারি, 'জাপানিরা আমার কোনো সমস্যা পায়নি।'

'কবে কাজ শুরু করতে চান?'

'আজ বিকেল থেকে কি খুব বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে?'

'সোমবার থেকে কাজে লেগে যান,' একটা কার্ডে একটা নাম লিখে ল্যারির হাতে দিল ইস্টম্যান। 'এখানে সোমবার সকাল নটায় হাজির হয়ে যাবেন।'

ল্যারি ফোন করল ক্যাথেরিনকে খবরটা দিতে। ওর কণ্ঠে এমন উত্তেজনা বহুদিন টের পায়নি ক্যাথেরিন। ও জানে এখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

নোয়েল

এথেন্স : ১৯৪৬

১২

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একঝাঁক এরোপ্লেন আছে কনস্টানটিন ডেমিরিসের। তবে তাঁর গর্ব হকার সিডলি। রাজকীয় আরামে ষোলোজন যাত্রীর ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে বিমানটিতে। এটি ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ওড়ে, ক্রু-সংখ্যা চার। এটাকে উড়ন্ত রাজপ্রাসাদ বলা যায়। বিমানের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করেছেন ফ্রেডেরিক সারিন, দেয়ালের ম্যুরাল এঁকেছেন শাগাল। এয়ারপ্লেন সিটের বদলে কেবিনে আরামকেদারা এবং কাউচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমানের পেছনের কমপার্টমেন্টের রূপান্তর ঘটানো হয়েছে বিলাসবহুল বেডরুমে। ককপিটের পেছনে আছে আধুনিক কিচেন। ডেমিরিস কিংবা নোয়েল এ বিমানে ভ্রমণ করার সময় সঙ্গে একজন শেফ থাকে।

ডেমিরিস তাঁর বিমানে ব্যক্তিগত পাইলট হিসেবে নির্বাচন করেছেন এক গ্রিক বৈমানিক পল মেটাক্সাস এবং একজন ইংরেজ সাবেক RAF ফাইটার পাইলট আয়ান হোয়াইটস্টোনকে। গাট্টাগোট্টা সদালাপী ও হাসিখুশি মেটাক্সাস ছিল মেকানিক, নিজের প্রচেষ্টায় প্লেন ওড়াতে শিখেছে, সে বৃটেনের যুদ্ধে RAF-এ কাজ করেছে। সেখানে আয়ান হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে পরিচয়। লম্বা, লালচুলো, ভয়ানক রোগা আয়ান একজন জাত পাইলট। সে এবং মেটাক্সাস মিলে গত তিন বছর ধরে লুফতওয়াফ-এর চেয়েও বেশি উচ্চতায় উড়ে বেড়ানোর রেকর্ড গড়েছে।

নোয়েল এই পাইলট দুজনের প্রতি কখনো মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু যখন শুনল উভয়ের RAF-এ কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল সে। তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইল ককপিটে বসে, কিংবা নিজের কেবিনের ডেকে নিল। সরাসরি কোনো প্রশ্ন না করেই জেনে নিল ল্যারি ডগলাসের স্কোয়াড্রনের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা ছিল হোয়াইটস্টোন। তবে মেটাক্সাস যখন RAF-এ যোগ দেয় ততদিনে ওখান থেকে চলে গেছে ল্যারি।

নোয়েল মাসে একবার প্যারিসে যায় ক্রিশ্চিয়ান বারবেটের সঙ্গে দেখা করতে। বারবেট ওয়াশিংটনে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে লিয়াজোঁ করেছে। এদের কাছ থেকে ল্যারি ডগলাসের নানা তথ্য পায় বারবেট। নোয়েলকে সে প্রস্তাব দিয়েছিল রিপোর্টগুলো এথেন্সে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু নোয়েল বলেছে সে নিজে এসে রিপোর্ট নেবে। তার মানে নোয়েল চায় না কনস্টানটিন ডেমিরিস জানুক সে ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। নোয়েলকে ব্লাকমেইল করার কুবুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবেটের মস্তিষ্কে।

একদিন নোয়েল বলল, 'আপনি খুব হেল্পফুল, মি. বারবেট, আর অত্যন্ত সতর্ক।'

তেলতেলে হাসি উপহার দিল বারবেট, 'ধন্যবাদ, মিস পেজ। আমার ব্যবসা নির্ভরই করছে সতর্কতার ওপরে।'

'ঠিক তাই,' বলল নোয়েল, 'আপনি সতর্ক বলেই কনস্টানটিন ডেমিরিস কখনো আপনার নাম উচ্চারণ করেনি আমার সামনে। যেদিন করবে, বলব আপনাকে ধ্বংস করে দিতে,' হাসি হাসি মুখ করে কথাটা বলল নোয়েল। তবে ভিড়িম করে বোমা পড়ল বারবেটের মাথায়।

সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল নোয়েলের দিকে। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে ঠোঁট চাটল। নার্ভাসভঙ্গিতে ঊরুসন্ধি চুলকাল, বিড়বিড় করে বলল, 'আ-আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মাদমোয়াজেল যে আমি কোনোদিনই...'

'জানি আপনি উল্টোপাল্টা কিছু করার সাহস পাবেন না,' বলে চলে গেল নোয়েল।

বিমানে প্যারিস থেকে এথেন্সে ফেরার পথে বারবেটের দেয়া রিপোর্ট পড়ল নোয়েল। জানল প্যান অ্যাম-এ চাকরি নিয়েছে ল্যারি। এয়ারলাইনে এই নতুন চাকরি নোয়েলের পরিকল্পনা শ্লথ করে তুলতে পারে। তবে ওর ধৈর্য আছে। একসময় ল্যারিকে সে নিজের কাছে নিয়ে আসবে। ইতোমধ্যে এজন্য যা যা পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা সে নেবে।

আয়ান হোয়াইটস্টোন অত্যন্ত খুশি যে নোয়েল পেজ তাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছে। শুরুতে ভেবেছে নোয়েল বুঝি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। কারণ ঘন ঘন আয়ানকে সে ডাকত গল্প করার জন্য, শুনতে চাইত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু খুব শীঘ্রি আয়ান বুঝতে পারে সে একজন চাকুরে মাত্র আর নোয়েল স্পর্শের বাইরে এক নারী।

আজ নোয়েল এবং হোয়াইটস্টোন কেপ সানিয়নের কাছে, সমুদ্রের তীরঘেঁষা একটি ছোট শহরে চলে এল। নোয়েল পরেছে সাদা রঙের সামার ফ্রক, পায়ে স্যান্ডেল। বাতাসে উড়ছে তার নরম সোনালি চুল। দুর্দান্ত লাগছে তাকে। আয়ান

হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে লন্ডনি এক মডেলের সম্পর্ক আছে। সে সুন্দরী, তবে নোয়েলের তুলনায় কিছুই না। এরকম এক নারীকে পেয়েছেন বলে ডেমিরিসকে আয়ান ঈর্ষা করে। তবে এ মুহূর্তে নোয়েলকে তার ভয়ই লাগছে। কারণ নোয়েল তার কাছে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইছে। আয়ানের সন্দেহ হল, ডেমিরিসের নির্দেশে এই নারী হয়তো দেখতে চাইছে সে তার চাকরিদাতার প্রতি বিশ্বস্ত কিনা।

'আমার চাকরিটাকে আমি ভালোবাসি,' বলল আয়ান। 'যতদিন সম্ভব প্লেন চালাতে চাই।'

নোয়েল তাকে লক্ষ করছে। শেষে আফসোসের গলায় বলল, 'তুমি আমাকে হতাশ করলে। আমি ভেবেছি তুমি অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

বোকার মতো নোয়েলের দিকে তাকাল হোয়াইটস্টোন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি না একদিন আমাকে বলেছ একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির মালিক হতে চাও?'

আয়ানের মনে পড়ল কথায় কথায় একদিন নিজের এরকম একটি ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল নোয়েলের কাছে।

'ও তো স্রেফ স্বপ্ন,' বলল আয়ান। 'এজন্য প্রচুর টাকার দরকার।'

'তোমার মতো সমর্থ মানুষের টাকার অভাবে থেমে থাকা উচিত নয়,' বলল নোয়েল।

অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকল আয়ান হোয়াইটস্টোন, নোয়েল পেজ তার কাছে থেকে কী জবাব আশা করছে বুঝতে পারছে না। সে নিজের চাকরিটা পছন্দ করে। প্রচুর টাকা বেতন পাচ্ছে, কাজটা মজার। তবে অসুবিধে একটা আছে। খেয়ালি কোটিপতির ব্যক্তিগত পাইলট হবার সুবাদে রাত-দিন নেই, যখন খুশি প্লেন নিয়ে আকাশে উড়তে হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। যত ভালোই কামাক না কেন, আয়ানের ওপর সন্তুষ্ট নয় তার বাগদত্তা।

'আমার এক বন্ধুকে তোমার কথা বলেছি,' বলল নোয়েল। 'সে তোমার নতুন কোম্পানিতে বিনিয়োগে আগ্রহী।'

ঢোক গিলল হোয়াইটস্টোন, 'আ-আমি ঠিক জানি না কী বলব, মিস পেজ।'

'এখনই কিছু বলতে হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করল নোয়েল। 'বিষয়টা নিয়ে ভাবো কী করবে।'

কয়েক মিনিট কথাটা নিয়ে ভাবল হোয়াইটস্টোন। অবশেষে জিজ্ঞেস করল, 'মি. ডেমিরিস কি এ-ব্যাপারে জানেন?'

ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হাসল নোয়েল, 'মি. ডেমিরিস জানলে তোমার স্বপ্ন পূরণ হবে না। তিনি তোমাকে ছাড়তে চাইবেন না। তিনি তার কর্মচারীদেরকে হারাতে চান না।' বিশেষ করে খুব ভালো যারা, তাদেরকে। অবশ্য এ সুযোগ কাজে

লাগানো না-লাগানো সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। যদি সারাজীবনে একজনের অধীনে কাজ করে যেতে চাও তো করো।'

'করতে চাই না,' দ্রুত বলে ফেলেই বুঝতে পারল হোয়াইটস্টোন সে নোয়েলের প্রস্তাবে পরোক্ষভাবে সম্মতি দিয়ে ফেলেছে। নোয়েলের চেহারা লক্ষ করল সে ভালো করে, মেয়েটা তার জন্য কোনো ফাঁদ পেতেছে কিনা বুঝতে চায়। কিন্তু নোয়েলের চেহারায় সহানুভূতির ছাপ। 'প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার রয়েছে,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল সে।

'অবশ্যই,' সায় দিল নোয়েল। 'একটু ভাবো। পরে নাহয় আরেকবার এ নিয়ে বসব।' বিচলিত গলায় যোগ করল। 'এটা কিন্তু আমাদের দুজনের ব্যাপার।'

'তা আর বলতে হবে না,' বলল হোয়াইটস্টোন, 'এবং ধন্যবাদ। যদি কাজটা হয়, খুব মজা হবে।'

মাথা ঝাঁকাল নোয়েল। 'আমার মনে হচ্ছে কাজটা হবে।'

ক্যাথেরিন
ওয়াশিংটন-প্যারিস : ১৯৪৬

১৩

সোমবার সকালে নিউইয়র্কের লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে, প্যান আমেরিকান অফিসে চিফ পাইলট ক্যাপ্টেন হ্যাল সাকোভিৎজ-এর কাছে রিপোর্ট করল ল্যারি ডগলাস। ল্যারি ভেতরে ঢুকে দেখল সাকোভিৎজ তার সার্ভিস রেকর্ড পড়ছেন। পড়া শেষ হয়ে এসেছিল, ফাইলটা ডেস্কের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলেন তিনি।

ক্যাপ্টেন সাকোভিৎজের চেহারা কাঠখোট্টা, তাঁর মতো প্রকাণ্ড হাত কারো দেখেনি ল্যারি। এভিয়েশনের জগতে অন্যতম অভিজ্ঞ মানুষ তিনি। সাকোভিৎজ সরকারের হয়ে এক-ইঞ্জিন-বিশিষ্ট এয়ারমেল প্লেন চালিয়েছেন, এয়ারলাইন পাইলট হিসেবে কাজ করেছেন কুড়ি বছর, প্যান আমেরিকানের চিফ পাইলট তিনি গত পাঁচবছর ধরে।

'তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে খুশি হলাম, ডগলাস,' বললেন তিনি।

'আমিও এখানে আসতে পেরে খুশি,' বলল ল্যারি।

'আবার প্লেনে চড়তে চাইছ?'

'প্লেনের কী দরকার?' মুচকি হাসল ল্যারি। 'আমাকে বাতাসে ছেড়ে দিন, ঠিক উড়ে যাব আকাশে।'

একটা চেয়ার দেখালেন সাকোভিৎজ। 'বসো। যারা আমার জায়গাটা দখল করতে আসে তাদের সঙ্গে আগে বাতচিতটা সেরে নিই আমি।'

হেসে উঠল ল্যারি, 'লক্ষ করেছেন তাহলে।'

'লক্ষ না-করার কিছু নেই। তোমরা সবাই হটশট পাইলট। তোমাদের রয়েছে দারুণ কমব্যাট রেকর্ডস, তোমরা এখানে যারা আসো, ভাবো 'শামাক সাকোভিৎজ চিফ পাইলট হতে পারলে, ওরা আমাকে বোর্ডের চেয়ারম্যান বানাবে। তোমরা কেউই বেশিদিনের জন্য নেভিগেটর হতে আসো না। এটা পাইলট হওয়ার সিঁড়ি মাত্র। অবশ্য এই ভালো। এমনটিই হওয়া উচিত।'

'আপনি এভাবে চিন্তা করছেন জেনে কৃতজ্ঞবোধ করছি,' বলল ল্যারি।

'তবে একটা কথা তোমার জানা থাকা দরকার, ডগলাস। আমরা সবাই

ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এখানে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কেবল পদোন্নতি দেয়া হয়।'

'জানি আমি।'

'তবে যে-জিনিসটা তুমি জানো না তা হল এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় চাকরি বলে মানুষ যত আসে তার চেয়ে অনেক কম যায়। ফলে পদোন্নতির গতি অত্যন্ত মন্থর।'

সাকোভিৎজ-এর সেক্রেটারি কফি এবং ডেনিশ পেস্ট্রি নিয়ে এল। দুই পুরুষ আরো ঘণ্টাখানেক গল্প করে কাটাল। সাকোভিৎজের আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ, অমায়িক, নানান হালকা প্রশ্ন করে ল্যারি সম্পর্কে অনেককিছুই জেনে নিলেন। ল্যারি যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কার্ল ইস্টম্যান অফিসে ঢুকল।

'কেমন লাগল ওকে?'

'ঠিক আছে।'

কঠিন চোখে তাকাল ইস্টম্যান, 'তুমি কী ভাবছ?'

'ওকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখব।'

'আমি জানতে চেয়েছি ওকে তোমার কেমন লেগেছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সাকোভিৎজ, 'আমার ধারণা ও পাইলট হিসেবে খুবই ভালো। ওকে একটা প্লেনে বসিয়ে দাও, ওর চারপাশে শত্রুর দঙ্গল থাকলেও একজনও বেঁচে ফিরতে পারবে না।'

'বলে যাও,' বলল ইস্টম্যান।

'তবে ম্যানহাটানে শত্রুপক্ষের কোনো ফাইটার প্লেন নেই। ডগলাসের মতো লোকদের আমি চিনি। এদের জন্মই হয়েছে বিপদ চুম্বন করার জন্য। এরা অসম্ভব সব পাহাড় বাইবে, ডাইভ দেবে সাগরতলে, এরকম বিপজ্জনক কাজ করে বেড়ানোই এদের নেশা। ল্যারি ডগলাসের সাথে কথা বলে মনে হল সে আমাদের শিপের ক্যাপ্টেন হলে ভালোই চালাতে পারত। সে ইঞ্জিনিয়ার, ফার্স্ট অফিসার কিংবা পাইলটের কাছ থেকে নির্দেশ পালন করার মতো ছেলে নয়। কারণ সে মনে করে সে এদের চেয়ে উৎকৃষ্ট।'

'তোমার কথা শুনে নার্ভাস বোধ করছি,' বলল ইস্টম্যান।

'আমিও,' স্বীকার করলেন সাকোভিৎজ, 'আমার মনে হয় না—' বিরতি দিলেন, সঠিক শব্দটি খুঁজছেন, 'ও স্থির-প্রকৃতির মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বলো, মনে হবে ওর পাছায় ডিনামাইট বাঁধা আছে, যে-কোনো সময় ঘটতে পারে বিস্ফোরণ।'

'তুমি এখন কী করতে চাইছ?'

'কাজ শুরু করে দিয়েছি। ও স্কুলে যাচ্ছে। আমরা ওর ওপর নজরদারি রাখব।'

'ও হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়বে,' বলল ইস্টম্যান।

'এ ধরনের লোক তুমি চেনো না। সে স্কুলে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।'

সাকোভিৎজের কথাই ঠিক।

ল্যারি দুর্দান্ত এক ছাত্র। সে অত্যন্ত মনোযোগী, যা শেখানো হয়, হজম করে নেয় সব। বাড়ির কাজে কখনো ফাঁকি দেয় না, এবং খুব ভালোভাবে হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসে। তার ধৈর্যের কোনো অভাব নেই। সে কখনো একঘেয়েমি বা বিরক্তিতে ভোগে না। ক্লাসে নেভিগেশন, রেডিও, কম্যুনিকেশন, মানচিত্র পঠন, ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইং ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়। ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইং-এর ব্যবস্থা করা হয় লিঙ্ক ট্রেনার-এ, এটি একটি এয়ারপ্লেনের কৃত্রিম ককপিট। অনভিজ্ঞ পাইলটরা লিঙ্ক ট্রেনারে যায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু শীঘ্রি আবিষ্কার করে কাজটা যা ভেবেছিল তারচে' অনেক কঠিন। তবে ল্যারির কাছে এসব কঠিন নয়। তার কাছে নতুন ইকুইপমেন্ট হল একটি ডিসি-ফোর। এ বিমানের প্রতিটি ইঞ্চি সে আবিষ্কার করে প্রবল উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে।

ট্রেনিঙের আট হপ্তা বাদে ল্যারিকে নেভিগেটরের উইং পরিয়ে দেয়া হল। এ উপলক্ষে ছোটখাটো একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হল। ক্যাথেরিন উড়ে এল নিউইয়র্কে। ল্যারি তার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীদের নিয়ে ডিনার করতে গেল ইস্ট ফিফটি-সেকেন্ড স্ট্রিটের টুয়েন্টি ওয়ান ক্লাবে। ভয়ানক ভিড়। ওয়েটার জানাল রিজার্ভেশন ছাড়া এখানে টেবিল খালি পাওয়া সম্ভব নয়।

'জাহান্নামে যাক,' বলল ল্যারি, 'ক্যাথি, আরেকটা রেস্টুরেন্টে যাই চলো।'

'এক মিনিট,' বলল ক্যাথেরিন। সে ভেতরে গেল। রেস্টুরেন্টের মালিক জেরি বার্নসের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

কিছুক্ষণ পরে বেঁটে, পাতলা এক লোক হাজির হল, ধূসররঙের চোখ।

'আমি জেরি বার্নস,' বলল লোকটা। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি এবং আমার স্বামী কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এসেছি,' বলল ক্যাথেরিন, 'মোট দশজন।'

মাথা নাড়ল বার্নস, 'রিজার্ভেশন না থাকলে...'

'আমি উইলিয়াম ফ্রেজারের পার্টনার,' বলল ক্যাথেরিন।

জেরি বার্নস বলল, 'একথা আগে বলবেন তো! আমাকে পনেরো মিনিট সময় দিন।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল ক্যাথেরিন।

দলটা চত্বরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ক্যাথেরিন।

'খুশির খবর আছে!' বলল ক্যাথেরিন, 'একটা টেবিল পেয়ে গেছি।'

'ম্যানেজ করলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'কোনো সমস্যা হয়নি,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'বিল ফ্রেজারের নাম বলতেই কাজ হয়ে গেল।' ল্যারির চোখে অন্ধকার ঘনাতে দেখে যোগ করল দ্রুত, 'সে এখানে প্রায়ই খেতে আসে। আমাকে বলেছিল কখনো টেবিলের দরকার হলে আমি যেন তার নামটা বলি।'

ল্যারি অন্যদের দিকে ফিরল। 'এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে। অন্য কোথাও যাই চলো।'

দরজার দিকে পা বাড়াল সবাই। ল্যারি ঘুরল ক্যাথেরিনের দিকে, 'আসছ?'

'অবশ্যই,' ইতস্তত করল ক্যাথেরিন, 'ওদেরকে একটু বলে আসি আমরা—'

'গোল্লায় যাক ওরা,' উচ্চকিত গলায় বলল ল্যারি, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ কিনা বলো।'

রেস্টুরেন্টের লোকজন লক্ষ করছে ওকে। লাল হয়ে গেল ক্যাথেরিন।

'আসছি,' বলল ও। ঘুরল ক্যাথেরিন, এগোল ল্যারির পেছন পেছন।

সিক্সথ এভিন্যুতে একটি ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। ডিনার জমল না মোটেই। বাইরে ক্যাথেরিন ভান করল কিছুই হয়নি, তবে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল। ল্যারির ছেলেমানুষি আচরণ এবং সবার সামনে তাকে অপমান করায় বেজায় ক্ষুব্ধ সে।

বাড়ি ফিরে সোজা বেডরুমে ঢুকে পড়ল ক্যাথেরিন। ল্যারির সঙ্গে একটা কথাও বলল না। কাপড় ছাড়ল, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ল্যারি লিভিংরুমে, ড্রিঙ্ক করছে।

দশ মিনিট পরে ল্যারি ঢুকল শোবার ঘরে। জ্বালল আলো। হেঁটে এল বিছানার পাশে। 'খুব মহান হতে চাইছ মনে হচ্ছে।' বলল সে।

বিছানায় উঠে বসল ক্যাথেরিন, ক্রুদ্ধ। 'বাজে কথা বলবে না। আজ ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছ তুমি। তোমার মাথায় কী ঢুকেছিল?'

'যে লোক তোমার মাথায় ঢুকেছে, সেও আমার মাথায় ঢুকেছে।'

কটমট করে তাকাল ক্যাথেরিন, 'মানে?'

'মি. পারফেকশন বিল ফ্রেজারের কথা বলছি।'

ক্যাথেরিন ওর ব্যঙ্গ ধরতে পারল না। 'বিল আমাদের সবসময় সাহায্য করেছে।'

'হ্যাঁ, করেছে। তোমাকে কাজ পাইয়ে দিয়েছে, আমাকেও। এখন আমরা বিলের অনুমতি ছাড়া এমনকি রেস্টুরেন্টেও বসতে পারি না। প্রতিদিন এ লোকের কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত।' ল্যারির কণ্ঠে প্রবল হতাশা। ক্যাথেরিন ওর অসহায়ত্বের কারণ বুঝতে পারল। হতাশ হবেই বা না কেন? চার বছর যুদ্ধ করে এসে দেখেছে তার স্ত্রী সাবেক প্রেমিকের ব্যবসার অংশীদার হয়ে বসে আছে। এবং আরো বাজে ব্যাপার, ফ্রেজারের সাহায্যেই বর্তমান চাকরিটা পেয়েছে।

ল্যারির দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। ও উপলব্ধি করতে পারছে ওদের বিয়েটা একটা টার্নিং পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। ল্যারির সঙ্গে বাস করতে চাইলে ওকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্যাথেরিন কী ভাবছে বুঝতে পেরেই যেন ল্যারি বলল, 'সন্ধ্যার ঘটনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু তুমি যখন বললে ফ্রেজারের নাম বলার পরে ওখানে বসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, চট করে রক্ত উঠে গেল মাথায়, নিজেকে আর সামাল দিতে পারিনি।

'আমি দুঃখিত, ল্যারি,' বলল ক্যাথেরিন, 'আর কখনো ফ্রেজারের নাম করে

কিছু করব না।'

পরমুহূর্তে ওরা পরস্পরের বাহুডোরে বাঁধা পড়ল। ল্যারি বলল, 'প্লিজ, ক্যাথি, আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যেয়ো না।' ওকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ক্যাথেরিন। 'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, ডার্লিং।'

নেভিগেটর হিসেবে ল্যারির প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ওয়াশিংটন থেকে প্যারিসের ফ্লাইট। প্রতিটি ফ্লাইট শেষে দুদিন প্যারিসে থাকল সে, পরের ফ্লাইটে যাত্রার আগে তিনদিন বাড়ি থাকল।

একদিন সকালে ক্যাথেরিন কাজ করছে অফিসে, ফোন করল ল্যারি। উত্তেজিত। 'অ্যাই, দারুণ একটা রেস্টুরেন্টের খোঁজ পেয়েছি। লাঞ্চে আসতে পারবে?'

লে আউটের পাহাড়সমান স্তূপে তাকাল ক্যাথেরিন, দুপুরের আগে শেষ করতে হবে কাজ, দস্তখত করা বাকি অনেকগুলো। 'আচ্ছা,' বলল ও।

'তোমাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে তুলে নিতে আসছি।'

'আমাদেরকে ছেড়ে যেতে পারবে না,' আর্তনাদ ছাড়ল সহকারী লুসিয়া। 'আজকের মতো কাজ শেষ করতে না পারলে স্টুভেসান্ট আমাদের বারোটা বাজাবে।'

'এখন কাজ করতে পারব না,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমি আমার স্বামীর সঙ্গে লাঞ্চ করতে যাব।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুসিয়া, 'তোমার আর দোষ কী! তবে ওকে নিয়ে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাকে জানিও।'

মুচকি হাসল ক্যাথেরিন। 'ওর জন্য তোমার বয়স অনেক বেশি।'

ল্যারি ওকে অফিসের সামনে থেকে তুলে নিল গাড়িতে।

'তোমার দিনটা নষ্ট করলাম নাকি?' দুষ্টু হাসি ল্যারির ঠোঁটে।

'অবশ্যই না।'

ল্যারি গাড়ি ছোটাল এয়ারপোর্ট অভিমুখে।

'রেস্টুরেন্ট কত দূরে?' জানতে চাইল ক্যাথেরিন। বিকেলে পাঁচজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওর। শুরু হবে বেলা দুটো থেকে।

'বেশিদূরে নয়... বিকেলে কাজ আছে নাকি?'

'না,' মিথ্যা বলল ক্যাথেরিন, 'তেমন কাজ নেই।'

'ভালো।'

এয়ারপোর্টের এন্ট্রান্সে গাড়ি ঢোকাল ল্যারি।

'রেস্টুরেন্টটা এয়ারপোর্টে।'

'ওই মাথায়,' গাড়ি পার্ক করল ল্যারি। ক্যাথেরিনের হাত ধরে প্যান-অ্যাম-এর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ডেস্কের সুন্দরী মেয়েটা সম্ভাষণ জানাল ল্যারিকে তার নাম ধরে ডেকে।

'ও আমার স্ত্রী,' গর্বিত গলায় বলল ল্যারি, 'আর এ এমি উইনস্টন।'

ওরা পরস্পরকে হ্যালো বলল।

'এসো,' ল্যারি ক্যাথেরিনের হাত ধরে ডিপারচার র‍্যাম্পের দিকে পা বাড়াল।

'ল্যারি—' বলল ক্যাথেরিন, 'কোথায়...'

'ইশ্, এই মেয়েটা কত কথা বলে রে!'

গেট ৩৭-এ চলে এল ওরা। টিকেট কাউন্টারের পেছনে দুই লোক যাত্রীদের টিকেট প্রসেসিং-এ ব্যস্ত। ইনফরমেশন বোর্ডে লেখা: ফ্লাইট ১৪৭ টু প্যারিস—ছাড়ার সময় বেলা ১-০০টা।

ল্যারি ডেস্কের এক লোকের সামনে দাঁড়াল। 'এই যে ও, টনি।' লোকটাকে একটা প্লেনের টিকেট দিল সে। 'ক্যাথি, এ হল টনি লোমবারডো। আর ও ক্যাথেরিন।'

'আপনার কথা অনেক শুনেছি,' হাসল লোকটা। 'আপনার টিকেট ঠিক আছে।' সে টিকেটটা দিল ক্যাথেরিনকে।

ক্যাথেরিন টিকেটের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল। 'এটা কিসের জন্য?'

'তোমাকে মিথ্যা বলেছি আমি,' হাসল ল্যারি। 'আমি তোমাকে লাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছি না। নিয়ে যাব প্যারিসে। ম্যাক্সিম-এ।'

কথা বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল ক্যাথেরিনের। 'ম-ম্যাক্সিম? প্যারিস? এখন?'

'জি।'

'পারব না,' হাউমাউ করে উঠল ক্যাথেরিন। 'এখন আমি প্যারিসে যেতে পারব না।'

'অবশ্যই পারবে,' দাঁত বের করে হাসল ল্যারি, 'তোমার পাসপোর্ট আমার পকেটে।'

'ল্যারি,' বলল ক্যাথেরিন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ভালো কাপড় পরে আসিনি। আমার অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি—'

'প্যারিসে পৌঁছে তোমাকে ভালো কাপড় কিনে দেব। আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দাও। ফ্রেজার তোমাকে ছাড়া কয়েকদিন চলতে পারবে।'

ক্যাথেরিন ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বুঝতে পারছে ওকে প্যারিসে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ল্যারির, সে যে প্লেন নেভিগেট করছে তা ক্যাথেরিনকে দেখানোর জন্য। আর ক্যাথেরিন কিনা পুরো ব্যাপারটা নষ্ট করে দিতে যাচ্ছিল! সে ল্যারির হাত ধরল। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমরা অপেক্ষা করছি কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন, 'আমার খিদে লেগেছে!'

প্যারিসে কটা দিন কেটে গেল আনন্দের ঘূর্ণিতে। পুরো একটা হপ্তা ছুটি নিয়েছে ল্যারি। ক্যাথেরিনের কাছে প্রতিটি ঘণ্টা উপভোগ্য মনে হচ্ছে। লেফট ব্যাংক-এর

ছোট একটি হোটেলে উঠেছে ওরা।

প্যারিসে পৌঁছার পর, প্রথম সকালে চ্যাম্পস এলিসিস-এর একটা দোকানে ক্যাথেরিনকে নিয়ে গেল ল্যারি। পারলে পুরো দোকান কিনে দেয় সে প্রেয়সী পত্নীকে। শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনল ক্যাথেরিন, 'এমন আকাশছোঁয়া দাম! কোনোকিছুতে হাত ছোঁয়াতেই ভয় লাগে।

'তোমার সমস্যাটা কী জানো?' বলল ল্যারি। 'তুমি টাকাপয়সা নিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তা করো। তুমি এখন হানিমুনে বেরিয়েছ।'

'ইয়েস, স্যার।' বলল ক্যাথেরিন। তবে ল্যারির পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ইভনিং ড্রেসটা কিনল না দরকার নেই বলে। এত টাকা কোথায় পেল, ল্যারিকে জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন। জবাব দিল না ল্যারি। কিন্তু ওর গোঁর কাছে হার মানতেই হল।

'আগাম বেতন তুলে নিয়েছি,' জানাল ল্যারি, 'তাতে কী এসে যায়?'

ল্যারি ক্যাথেরিনকে প্যারিসের দর্শনীয় সমস্ত জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল। লুভর, তুইলেরি, লেস ইনভ্যালিডস-এ গেল নেপোলিয়নের কবর দেখতে। সরবর্ণে চমৎকার, ছোট একটি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করল। প্যারিসের বহুতলবিশিষ্ট বাজার এলাকা লেস হ্যালিস-এ গেল, খামার থেকে তুলে আনা তাজা ফলমূল, শাক-সবজি এবং মাংসের সমাহার সেখানে। শেষ রোববারটা কাটাল ভার্সাইতে, ডিনার সারল প্যারিসের বাইরে, কক হার্ডির রুদ্ধশ্বাস সুন্দর বাগানে। যথার্থই দ্বিতীয় হানিমুন ছিল এটা ওদের।

নিজের অফিসে বসে সাপ্তাহিক পারসোনেল রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছেন হ্যাল সাকোভিৎজ। তাঁর সামনে ল্যারি ডগলাসের রিপোর্ট। চেয়ারে হেলান দিয়ে রিপোর্ট পড়ছেন সাকোভিৎজ, নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। অবশেষে সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি, ইন্টারকম সুইচ টিপলেন। 'ওকে পাঠিয়ে দাও।'

ল্যারি ঢুকল ঘরে। পরনে প্যান-অ্যাম ইউনিফর্ম, হাতে ফ্লাইট ব্যাগ। সাকোভিৎজকে হাসি উপহার দিল, 'মর্নিং, চিফ।'

'বসো।'

সাকোভিৎজের বিপরীত একটি চেয়ার দখল করল ল্যারি, ধরাল সিগারেট।

সাকোভিৎজ বললেন, 'শুনলাম গত সোমবার প্যারিসে তুমি ফ্লাইট ব্রিফিং-এর চেক ইন করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করেছ।'

হাসিটা মুছে গেল ল্যারির মুখ থেকে। 'আমি চ্যাম্পস এলিসিস-এ একটা প্যারেডে আটকে যাই। প্লেন ঠিক সময়েই ছেড়েছে। জানতাম না ওখানে ছেলেরা ক্যাম্প করেছে।'

'আমরা একটা এয়ারলাইন চালাই,' শান্ত গলায় বললেন সাকোভিৎজ। 'আর ওটা চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে।'

'ঠিক আছে,' ল্যারির গলায় রাগ। 'আমি চ্যাম্পস এলিসিস দিয়ে যাতায়াত করব না। আর কিছু?'

'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন সুইফট বলেছে তুমি গত কয়েকটা ফ্লাইটের আগে মদ গিলেছ।'

'লোকটা ডাহা মিথ্যাবাদী!' গর্জে উঠল ল্যারি।

'সে মিথ্যা বলবে কেন?'

'কারণ তার ভয় তার চাকরিটা আমি খেয়ে ফেলব,' গনগনে শোনাল ল্যারির কণ্ঠ। 'বুড়ো হারামজাদা একটা ভিতুর ডিম। ওর আরো দশ বছর আগে অবসর নেয়া উচিত ছিল।'

'তুমি তো চারজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে প্লেন চালিয়েছ,' বললেন সাকোভিৎজ, 'কাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'কাউকে না,' খেঁকিয়ে উঠল ল্যারি। ফাঁদটা দেখতে পেল ও, তবে দেরিতে। দ্রুত যোগ করল, 'না-মানে। ওরা ঠিকই আছে। কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই।'

'তোমার সঙ্গে ওরা উড়তে চায় না,' ভাবলেশহীন গলা সাকোভিৎজ-এর। 'তুমি ওদেরকে নাকি ঘাবড়ে দাও।'

'মানে?'

'মানে কোনো ইমার্জেন্সি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ওরা তোমার ওপর ভরসা করতে পারে না।'

'ফর ক্রাইস্টস শেক!' বিস্ফোরিত হল ল্যারি। 'আমি চারবছর জার্মানি এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে কাজ করেছি প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আর ওরা এখানে বসে বেশি বেশি বেতন তুলে পাছার চর্বি বাড়িয়েছে। আর আমার ওপর তাদের ভরসা নেই?'

'কেউ বলেনি ফাইটার প্লেনের পাইলট হিসেবে তুমি মন্দ,' বললেন সাকোভিৎজ। 'তবে আমরা যাত্রীবাহী বিমান ওড়াই। এটা সম্পূর্ণ আলাদা।'

মুঠো শক্ত করল ল্যারি, রাগ সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'ঠিক আছে,' গম্ভীরমুখে বলল ও। 'আপনার কথা বুঝলাম। কথা শেষ হয়ে থাকলে বলুন, আমাকে উঠতে হবে। কয়েক মিনিট পরে আমার একটা ফ্লাইট আছে।'

'ও-কাজটার দায়িত্ব আরেকজনকে দেয়া হয়েছে,' বললেন সাকোভিৎজ। 'তোমাকে বরখাস্ত করা হল।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল ল্যারি।

'আমাকে কী করা হল?'

'আসলে দোষটা আমারই, ডগলাস। তোমাকে এ দায়িত্ব দেয়া ঠিক হয়নি।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ল্যারি, চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। 'তাহলে দিলেন কেন?' ষাঁড়ের মতো চেঁচাল ও।

'কারণ তোমার স্ত্রীর একজন বন্ধু আছে বিল ফ্রেজার...' কথাটা শেষ করতে পারলেন না সাকোভিৎজ, তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল ল্যারির শরীরে। একলাফে আগে বাড়ল ও, পরমুহূর্তে মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে দেয়ালে ছিটকে

পড়ে গেলেন সাকোভিৎজ। সিধে হতে কসরৎ করতে হল তাঁকে। ল্যারিকে পরপর দুটো ঘুসি মেরে পিছিয়ে গেলেন। 'বেরোও!' হিসিয়ে উঠলেন তিনি, 'এক্ষুনি।'

ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে ল্যারির চোখ। 'ইউ সন অফ আ বিচ! আমার পা ধরলেও এই এয়ারলাইনের ছায়াও মাড়াব না জীবনে।' ঘুরল ও, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

দ্রুতপায়ে সাকোভিৎজের সেক্রেটারি ঢুকল ঘরে। ওল্টানো চেয়ার আর বস্-এর রক্তমাখা ঠোঁট দেখল সে।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'হুঁ,' বললেন সাকোভিৎজ, 'ইস্টম্যানকে আসতে বলো।'

দশ মিনিট পরে পুরো ঘটনা কার্ল ইস্টম্যানকে খুলে বললেন সাকোভিৎজ।

'ডগলাসের সমস্যাটা কী?' জিজ্ঞেস করল ইস্টম্যান।

'ও একটা সাইকো।'

ইস্টম্যান তীক্ষ্ণচোখে দেখলেন বন্ধুকে। 'আমি খবর নিয়ে জেনেছি প্লেন চালানোর সময় ল্যারি মাতাল ছিল না। মাটিতে বসে ও মদ খেয়েছে এমন প্রমাণও কেউ দিতে পারেনি। আর ওরকম একটু-আধটু দেরি হতেই পারে।'

'এজন্য ওকে বরখাস্ত করিনি আমি। এর পেছনে অন্য কারণ আছে। আমার ধারণা ও আসলেই মানসিক রোগী। ওর সম্পর্কে কয়েকদিন আগে একটা গল্প শুনেছি। গল্পটা ভয়ংকর।'

'গল্পটা শুনি!'

সাকোভিৎজ বললেন, 'আমার এক পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি গল্পটা। সে ডগলাসের সঙ্গে RAF-এ কাজ করত। ডগলাস ঈগল স্কোয়াড্রনে থাকাকালীন এক ইংরেজ মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটি ক্লার্ক নামে এক ছেলের প্রেমিকা ছিল। ক্লার্ক ডগলাসের স্কোয়াড্রনে ছিল। ডগলাস মেয়েটিকে পটানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ক্লার্কের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার হপ্তাখানেক আগে দিয়েপ্পিতে স্কোয়াড্রন নিয়ে যায় ডগলাস। সে স্কোয়াড্রনে সবার পেছনে ছিল। ওখানে ওদের বিমান লক্ষ করে বোমা ছোড়া হয়। সবাই ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু চ্যানেল পার হবার সময় ওরা মেসেরশ্মিডট দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্লার্ক গুলিতে নিহত হয়।' বিরতি দিলেন সাকোভিৎজ। 'আমার বন্ধুর মতে, ক্লার্কের ধারেকাছেও কোনো মেসেরশ্মিডট ছিল না।'

চোখ গোল গোল হয়ে গেল ইস্টম্যানের। 'জেসাস! তুমি কী বলতে চাইছ ল্যারি ডগলাস...?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তোমাকে শুধু গল্পটা শোনালাম।' ঠোঁটের ওপর রুমাল চেপে ধরলেন। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ব্যথা করছে।

'আকাশে বিমানহামলার সময় আসলে কী ঘটেছিল বলা মুশকিল। হয়তো ক্লার্কের প্লেনের গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছিল।'

'মেয়েটার কী হল?'

'ডগলাস আমেরিকায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে ভোগ করেছে। তারপর তাকে ত্যাগ করেছে।' ইস্টম্যানের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'তোমাকে একটা কথা বলি। ডগলাসের স্ত্রীর জন্য আমার মায়া লাগছে।'

ক্যাথেরিন কনফারেন্স-রুমে স্টাফ মিটিঙে ব্যস্ত, এমন সময় ঘরে ঢুকল ল্যারি।

তার চোখ ফোলা, কেটে গেছে গাল। দ্রুতপায়ে ল্যারির কাছে চলে এল ক্যাথেরিন, 'কী হয়েছে?'

'চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি,' বিড়বিড় করল ল্যারি।

ক্যাথেরিন ওকে কৌতূহলী চোখগুলো থেকে আড়াল করতে নিয়ে এল নিজের অফিসে। ভেজা কাপড় দিয়ে চেপে রাখল চোখ এবং গাল। 'কী হয়েছে বলো আমাকে।' রাগ চেপে কোনোমতে বলল ক্যাথেরিন। ওদের এত সাহস তার স্বামীর গায়ে হাত তোলে!

'অনেকদিন ধরেই আমার ওপর ওরা মানসিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে, ক্যাথি। আমি যুদ্ধ করে এসেছি বলে ওরা আমাকে ঈর্ষা করে। সাকোভিৎজ আজ আমাকে ডেকে নিয়ে বলল আমাকে নাকি চাকরিটা দিয়েছে স্রেফ তুমি বিল ফ্রেজারের প্রেমিকা বলে।'

রা হারিয়ে ফেলল ক্যাথেরিন।

'ওর গায়ে হাত তুলি আমি,' বলল ল্যারি, 'নিজেকে সামলাতে পারিনি।'

'ওহ্, ডার্লিং,' বলল ক্যাথেরিন। 'আই অ্যাম সো সরি।'

'সাকোভিৎজ একটা কুত্তার বাচ্চা।' বলল ল্যারি, 'তোমার সম্পর্কে কেউ কিছু বললে মাথা ঠিক রাখতে পারি না, জানোই তো। সে চাকরি থাকুক আর নাই থাকুক।'

ওকে জড়িয়ে ধরল ক্যাথেরিন, 'চাকরি নিয়ে একদম ভাবতে হবে না। দেশের যে-কোনো এয়ারলাইন তোমাকে লুফে নেবে।'

কিন্তু ক্যাথেরিনের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না। ল্যারি সবগুলো এয়ারলাইনে আবেদন করল। প্রচুর ইন্টারভিউ দিল। কিন্তু কোথাও চাকরি হল না। বিল ফ্রেজারের সঙ্গে লাঞ্চ করার সময় যা ঘটেছে তাঁকে সব বলল ক্যাথেরিন। কিন্তু ফ্রেজার কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। শেষে বললেন, 'আমার সঙ্গে অনেক লোকের জানাশোনা আছে, ক্যাথি। ল্যারির জন্য এদের কাউকে বলব?'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল ক্যাথেরিন, 'তবে বলতে হবে না। দেখি আরো কিছুদিন চেষ্টা করে।

ফ্রেজার মাথা ঝাঁকালেন। 'মত বদলালে আমাকে জানিয়ো।'

'জানাব,' বলল ক্যাথেরিন।

ক্রিশ্চিয়ান বারবেটের কাছ থেকে ল্যারি ডগলাসের সমস্ত খবরই পাচ্ছে নোয়েল পেজ। জানল প্যান অ্যামের চাকরিটা খুইয়েছে ল্যারি, হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছে। ল্যারি সম্পর্কিত লেটেস্ট রিপোর্টগুলো বেডরুমের পেছনের ক্লজিটে, গোপন জায়গায় রাখার সময় নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটল নোয়েলের মুখে। প্রতিশোধ নেয়ার সময় হয়ে গেছে।

এবার কাজে নামবে সে।

শুরুটা হল ফোন দিয়ে।

ক্যাথেরিন এবং ল্যারি বাড়িতে ডিনার করছে অস্বস্তিকর এক নীরবতার মাঝে। ল্যারি ইদানীং মেজাজ খারাপ করে বাড়ি ফেরে। তার মন খারাপের কারণ বুঝতে পারে ক্যাথেরিন। আহত সিংহের মতো লাগে ল্যারিকে। অস্থিরতায় ফুঁসছে। ডেসার্ট পরিবেশন করছে ক্যাথেরিন, বেজে উঠল ফোন। সে ফোন তুলল।

'হ্যালো।'

ব্রিটিশ উচ্চারণে একজন জানতে চাইল, 'ল্যারি ডগলাস আছে, প্লিজ? আমি আয়ান হোয়াইটস্টোন।'

'এক মিনিট,' ল্যারির দিকে রিসিভার এগিয়ে দিল ক্যাথেরিন। 'তোমার ফোন। আয়ান হোয়াইটস্টোন।'

ভুরু কুঁচকে গেল ল্যারির, 'কে?' তারপর উজ্জ্বল দেখাল চেহারা। 'ফর ক্রাইস্টস শেক!' ক্যাথেরিনের কাছ থেকে রিসিভার নিল।

'আয়ান?' হেসে উঠল ও। 'মাই গড, সাতবছর পরে। আমার খোঁজ পেলে কী করে?'

ক্যাথেরিন দেখল ল্যারি ও-পক্ষের কথা শুনছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর হাসছে। ঝাড়া পাঁচমিনিট কথা চলল দুজনে। শেষে ল্যারি বলল, 'শুনে তো ভালোই লাগছে, দোস্ত। অবশ্যই পারব। কোথায়?' শুনল ও। 'ঠিক আছে। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।' রিসিভার রেখে দিল।

'তোমার বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

ল্যারি ফিরল ওর দিকে। 'না, ঠিক বন্ধু নয়। ওর সঙ্গে RAF-এ কাজ করতাম। খুববেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না দুজনের। কিন্তু বলল আমার জন্য নাকি একটা চাকরি ঠিক করেছে।

'কী ধরনের চাকরি?' জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারি, 'ফিরে এসে বলব।'

রাত তিনটায় বাড়ি ফিরল ল্যারি। ক্যাথেরিন ওর জন্য জেগে ছিল। বিছানায় বসে বই পড়ছিল। ল্যারি এসে দাঁড়াল বেডরুমের দোরগোড়ায়।

'হাই।'

ওর মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। এরকম

উত্তেজনা ওর মধ্যে বহুদিন দেখেনি ক্যাথেরিন। বিছানার পাশে হেঁটে এল ও।

'মিটিং কেমন হল?'

'দারুণ,' বলল ল্যারি। 'এতই ভালো যা কল্পনাও করিনি আমি। মনে হচ্ছে একটা চাকরি পেয়ে যাচ্ছি।'

'আয়ান হোয়াইটস্টোনের হয়ে কাজ করবে?'

'না। আয়ান আমার মতোই—পাইলট। তোমাকে বলেছি একসঙ্গে প্লেন চালাতাম আমরা।'

'হুঁ।'

'যুদ্ধের পরে ওর এক গ্রিক-বন্ধু ডেমিরিসের প্রাইভেট পাইলট হিসেবে একটা কাজ জুটিয়ে দেয়।'

'শিপিং টাইকুন?'

'শিপিং, তেল, সোনা—পৃথিবীর অর্ধেকই তো ডেমিরিসের দখলে। হোয়াইটস্টোন খুব সুখেই কাজ করছিল ওখানে।'

'তারপর কী হল?'

ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল ল্যারি।

'হোয়াইটস্টোন চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে। ওখানে নিজের ব্যবসা শুরু করবে।'

'এখনো বুঝতে পারছি না,' বলল ক্যাথেরিন, 'এর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'হোয়াইটস্টোন ডেমিরিসের সঙ্গে আমার ব্যাপারে কথা বলেছে। ও মাত্র চাকরিটা ছাড়ল। এ মুহূর্তে ওর বিকল্প খুঁজে পাচ্ছেন না ডেমিরিস। হোয়াইটস্টোন বলছে ওখানে চাকরিটা নাকি হয়ে যাবে আমার।' বিরতি দিল ল্যারি। 'এটা আমার জন্য কতবড় খুশির খবর তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, ক্যাথি।'

'তুমি না বললে হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে তোমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না?'

ইতস্তত করে জবাব দিল ল্যারি, 'হ্যাঁ।' ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, ল্যারি এবং হোয়াইটস্টোন একজন আরেকজনকে দেখতেই পারত না। আজ রাতের ফোনটা তাই ভয়ানক বিস্মিত করেছে ল্যারিকে। বৈঠকে অদ্ভুতরকম সহজ ছিল হোয়াইটস্টোন। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরে ল্যারি যখন বলেছে, 'তুমি আমার কথা চিন্তা করেছ ভেবে বিস্ময়বোধ করছি,' বিশ্রী একটা নীরবতা নেমে এসেছিল দুজনের মধ্যে। হোয়াইটস্টোন বলেছে, 'ডেমিরিস খুব ভালো একজন পাইলট চাইছেন। আর তুমি তাই।' যেন হোয়াইটস্টোন জোর করে কাজটা গছিয়ে দিচ্ছে, চাকরিটা ল্যারি নিলে যেন হোয়াইটস্টোনেরই উপকার করা হবে। ল্যারি যখন বলেছে কাজটার ব্যাপারে সে উৎসাহী, হোয়াইটস্টোন যেন স্বস্তির বিশ্বাস ফেলেছে।

'এটা সারাজীবনের জন্য একটা সুযোগ হতে পারে,' বলল ল্যারি ক্যাথিকে। 'ডেমিরিস হোয়াইটস্টোনকে মাসে বেতন দিতেন পনেরো হাজার দ্রাকমা। অর্থাৎ পাঁচশো ডলার। সে ওখানে রাজার হালে থাকত।'

'কিন্তু কাজটা নিলে তো তোমাকে গ্রিসে থাকতে হবে।'

'গ্রিসে থাকব আমরা,' স্ত্রীকে শুধরে দিল ল্যারি। 'অত টাকা দুজনে মিলে দুহাতে খরচ করলেও ফুরাবে না। একবছরের মধ্যে অনেক টাকা জমাতে পারব।'

ক্যাথেরিন ইতস্তত করছে, সাবধানে শব্দ বাছাই করল। 'ল্যারি, গ্রিস অনেক দূরের দেশ। তাছাড়া কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে তোমার পরিচয়ও নেই। এখানে যদি কোনো কাজ...'

'না!' খেঁকিয়ে উঠল ল্যারি। 'তুমি যত ভালো পাইলটই হও এখানে তোমাকে কেউ কাজ দেবে না। তারা শুধু দেখবে হারামজাদা ইউনিয়নের টাকা কতটা শোধ করেছ। ওখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাব। আমি এরকম কাজের স্বপ্নই দেখে এসেছি, ক্যাথি। ডেমিরিসের পুরো একটা বিমানবহর আছে। আমি আবার প্লেন চালাব, বেবি। শুধু ডেমিরিসকে খুশি করতে হবে। হোয়াইটস্টোন বলেছে আমাকে নাকি ডেমিরিসের পছন্দ হবে।' বিরতি দিল ল্যারি। 'আমার সঙ্গে আছ তো?'

আগ্রহে ভরপুর মুখটা দেখল ক্যাথেরিন। এ তার স্বামী, বিয়েটা যদি টিকিয়ে রাখতে চায়, ল্যারি যেখানে থাকবে, তাকেও সেখানে থাকতে হবে। ল্যারি মনের মতো একটা কাজ পেতে চলেছে। আবার সে আগের হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল ল্যারিতে পরিণত হবে।

'অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে আছি,' বলল ক্যাথেরিন।

'তুমি ডেমিরিসের সঙ্গে একবার দেখা করে আসো না কেন? চাকরিটা হয়ে গেলে আমি তোমার কাছে চলে আসব।'

সেই ছেলেমানুষি হাসিটা ফুটল ল্যারির মুখে। 'জানতাম তোমার ওপর ভরসা করা যাবে, বেবি।' ওকে জড়িয়ে ধরল। 'নাইট গাউনটা খুলে ফ্যালো। নয়তো আমি এটা ফুটো করে ফেলব।'

পরদিন সকালে কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করতে এথেন্স চলে গেল ল্যারি ।

পরের কটা দিন ল্যারির তরফ থেকে কোনো খবর পেল না ক্যাথেরিন। হপ্তা গড়িয়ে চলল। ভাবল চাকরিটা বোধহয় হয়নি ল্যারির। ফিরে আসবে ও বাড়িতে। এখানে ওর জন্য কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা করবে ক্যাথেরিন।

ছয়দিন পরে ফোন করল ল্যারি।

'ক্যাথি!'

'হ্যালো, ডার্লিং!'

'জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে নাও। তুমি কনস্টানটিন ডেমিরিসের নয়া ব্যক্তিগত পাইলটের সঙ্গে কথা বলছ।'

দশদিন পরে ক্যাথেরিন রওনা হল গ্রিসের উদ্দেশে।

দ্বিতীয় খণ্ড

নোয়েল ও ক্যাথেরিন
এথেন্স : ১৯৪৬

১৪

ল্যারি এথেন্সের হেলেনিকন এয়ারপোর্টে এসেছে ক্যাথেরিনকে নিয়ে যেতে। ক্যাথেরিন দেখল ল্যারি র‍্যাম্প ধরে হেঁটে আসছে দ্রুত। চেহারায় উত্তেজনা ও ব্যাকুলতা। ক্যাথেরিনকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। ওকে আগের চেয়ে রোগা-পাতলা এবং টেনশনমুক্ত লাগছে।

'তোমাকে আমি খুব মিস করেছি, ক্যাথি,' ক্যাথেরিনকে বাহুডোরে বেঁধে বলল ল্যারি।

' তোমাকেও আমি খুব মিস করেছি,' বলল ক্যাথেরিন।

'বিল ফ্রেজার খবরটা শুনে কী বলল?' কাস্টমসের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'শুনে খুব খুশি হয়েছে।' বলল ক্যাথেরিন। মনে পড়ে গেল ফ্রেজারের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎকারের কথা। ক্যাথেরিন গ্রিস যাচ্ছে শুনে তিনি খুব শক্‌ড্‌ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি গ্রিসে খুব বেশিদিন থাকতে পারবে না। মন টিকবে না।'

ল্যারি পোর্টারের হাতে তুলে দিয়েছে লাগেজ, সে ওগুলো একটা লিমুজিনে তুলল। পোর্টারের সঙ্গে ল্যারি এমন সাবলীল গ্রিকে কথা বলল, চমৎকৃত হল ক্যাথেরিন।

'তোমার সঙ্গে কনস্টানটিন ডেমিরিসের পরিচয় করিয়ে দেব,' বলল ল্যারি। 'উনি রাজার মতো। ইউরোপের রাঘব-বোয়ালরা ডেমিরিসের মন জয় করার জন্য সবসময় ব্যস্ত।'

'তোমার ওঁকে পছন্দ হয়েছে জেনে ভালো লাগল।'

'উনিও আমাকে পছন্দ করেছেন।'

ল্যারিকে এমন হাসিখুশি, উল্লসিত দেখেনি ক্যাথেরিন বহুদিন। এটা একটা শুভ লক্ষণ।

ডেমিরিসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিশদ বর্ণনা দিল ল্যারি। এয়ারপোর্ট থেকে

এক শোফার তাকে নিয়ে যায়। ল্যারি ডেমিরিসের প্লেনের বহর দেখতে চেয়েছিল। শোফার তাকে প্রকাণ্ড এক মাঠের শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। সেখানে বিশাল এক হ্যাঙ্গারে তিনটি প্লেন। হকার সাইডলি, পাইপার এবং একটি দু আসনের এল-ফাইভ। হকার সাইডলি খুব পছন্দ হয়েছে ল্যারির। পাইপার ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ওড়ে। আর এল-ফাইভ স্বল্প-দূরত্বের জন্য উৎকৃষ্ট।

প্লেন দর্শন শেষে শোফার ল্যারিকে নিয়ে যায় ভারকিজায়, এথেন্স থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে এক অভিজাত শহরতলি।

'ডেমিরিসের বাড়ি যে কী সুন্দর, না দেখলে বিশ্বাস করবে না,' বলল ল্যারি ক্যাথেরিনকে।

'কেমন দেখতে?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল ক্যাথেরিন।

'বর্ণনা করে বোঝানো অসম্ভব। দশ একর জমি নিয়ে বাড়ি। ইলেকট্রিক গেট, গার্ড, কুকুর সব মিলে এলাহি কাণ্ড। বাড়িটিকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় প্রাসাদ, ভেতরে যেন জাদুঘর। ইনডোর সুইমিংপুল, পুরো একটি স্টেজ এবং প্রজেকশন রুম আছে। একদিন দেখবে তুমি।'

'মানুষটা কেমন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'চমৎকার,' হাসল ল্যারি। 'আমাকে লাল-গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। আমার খ্যাতির জন্যই এমন খাতির-যত্ন।'

আসলে ল্যারিকে ছোট একটি ঘরে তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সাধারণ পরিস্থিতিতে এভাবে অপেক্ষা করতে হলে রেগে আগুন হয়ে যেত ল্যারি। কিন্তু সে জানত এই বৈঠকের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। রাগ নয় বরং নার্ভাস লাগছিল তার। সে ক্যাথেরিনকে বলেছে চাকরিটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চাকরিটা পাবার জন্য সে কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল তা বলেনি। সে আকাশে ওড়া ছাড়া অন্যকিছু চিন্তা করতে পারে না। তার সবকিছুই নির্ভর করছিল এই চাকরির ওপর।

তিনঘণ্টা অপেক্ষার পরে এক বাটলার এসে বলে মি. ডেমিরিস ল্যারির সঙ্গে এখন দেখা করতে পারবেন। সে প্রকাণ্ড একটি রিসেপশন হল দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ল্যারিকে। হলঘর নয়, যেন ভার্সাইর প্রাসাদ। দেয়ালে সোনালি, সবুজ এবং নীল রঙের কারুকাজ, ঝুলছে বুভেস-এর ট্যাপেস্ট্রি। মেঝেয় গোলাকার, দারুণ একটি স্যাভোনেরি কার্পেট। ছাদ থেকে ঝুলছে ক্রিস্টালের বিরাট ঝাড়বাতি।

লাইব্রেরির প্রবেশদ্বারে একজোড়া সবুজ অনিক্স কলাম। লাইব্রেরিটি আকারে বিশাল, দক্ষ কারিগরের তৈরি, কার্ভ-করা দেয়ালগুলোতে ফুটউডের প্যানেল লাগানো। এক দেয়ালের মাঝখানে একটি সাদা মার্বেল ম্যান্টেলপিস, সোনার কারুকাজ-করা। তার ওপর শোভা পাচ্ছে ফিলিপ্পি কাফিয়েরি, একজোড়া ব্রোঞ্জের সুন্দর শেনেট।

ম্যান্টেল থেকে সিলিং পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটি আয়না, তাতে জাঁ অনর ফ্রাগোনার্ডের একটি পেইন্টিং আছে। খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ল্যারি একঝলক দেখতে পেল বিশাল একটি প্যাশিও। প্যাশিওর ওপাশে একটি প্রাইভেট পার্ক, তাতে নানান মূর্তি এবং ঝর্না শোভা পাচ্ছে।

লাইব্রেরির দূরপ্রান্তে একটি বেশবড় ব্যুরো প্লাট ডেস্ক। তার পেছনে সুন্দর লম্বা চেয়ার, অবাসন ট্যাপিস্ট্রি দিয়ে মোড়া। ডেস্কের সামনে একজোড়া bergeres।

ডেমিরিস ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দেয়ালে ঝোলানো বড় একটি মার্কেটের মানচিত্রে নিবদ্ধ দৃষ্টি। ডজনখানেক জায়গায় লাল পিন লাগানো। ল্যারি ভেতরে ঢুকতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বাড়িয়ে দিলেন হাত।

'কনস্টানটিন ডেমিরিস,' বললেন তিনি। ল্যারি এ লোকের ছবি সারাবছরই পত্রিকায় দেখেছে। কিন্তু এ যেন শক্তির অগ্নিগিরি, সাক্ষাৎ না-হওয়ার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারেনি।

'চিনি আপনাকে,' ডেমিরিসের হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল ও, 'আমি ল্যারি ডগলাস।'

দেয়ালের মানচিত্রের দিকে ল্যারির দৃষ্টি চলে গেছে দেখে বললেন, 'আমার সাম্রাজ্য। বসুন।'

ল্যারির ডেস্কের বিপরীত দিকের একটি চেয়ার দখল করল।

'শুনেছি আপনি আর আয়ান হোয়াইটস্টোন একসঙ্গে RAF-এ বিমান চালাতেন?'

'জি।'

ডেমিরিস নিজের চেয়ারে হেলান দিলেন। তীক্ষ্ণচোখে দেখছেন ল্যারিকে। 'আয়ান আপনার অনেক প্রশংসা করেছে।'

হাসল ল্যারি। 'আয়ানও খুব ভালো পাইলট।'

'আপনার সম্পর্কে সেও একই কথা বলেছে। তবে সে 'গ্রেট' শব্দটা ব্যবহার করেছে।

ল্যারির আবার অবাক লাগল। আয়ান ওর সম্পর্কে এত প্রশংসা করার কারণ বুঝতে পারছে না। 'আমি প্লেন ভালোই চালাই,' বলল ও। 'আর এটাই আমার কাজ।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেমিরিস, 'যারা নিজেদের কাজ ভালো জানে তাদেরকে আমি পছন্দ করি। তবে খুব কম মানুষই নিজের কাজটাকে পছন্দ করে। শুধু সফল মানুষ ছাড়া।'

'ঠিকই বলেছেন,' বিনয়ের সঙ্গে বলল ল্যারি।

'কিন্তু আপনি সফল মানুষ নন।'

চেহারায় অন্ধকার ঘনাল ল্যারির। 'এটা নির্ভর করবে সাফল্য বলতে আপনি কী বোঝেন, মি. ডেমিরিস।'

'আমি বলতে চাইছি,' নীরস গলায় বললেন কনস্টানটিন, 'যুদ্ধের সময় আপনি খুব ভালো কাজ দেখিয়েছেন তবে শান্তির সময় নয়।'

ল্যারির চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে গেল। চট করে রাগ উঠে গেল মাথায়। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ও। কারণ কাজটা ওর খুবই দরকার। ডেমিরিসের জলপাই কালো রঙের দৃষ্টি নিবদ্ধ ল্যারির ওপর, ওর কোনো অভিব্যক্তি তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না।

'প্যান আমেরিকানের চাকরিটার কী হল, মি. ডগলাস?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ল্যারি। 'কো-পাইলট হওয়ার জন্য পনেরো বছর বসে থাকার বুদ্ধিটা আমার পছন্দ হয়নি।'

'তাই যে-লোকের অধীনে কাজ করতেন তাকে মেরে বসলেন।'

বিস্ময় গোপন করতে পারল না ল্যারি, 'একথা আপনাকে কে বলল?'

'মি. ডগলাস,' অধৈর্য শোনাল ডেমিরিসের কণ্ঠ, 'আপনি আমার জন্য কাজ করতে এলে আমার জীবন পুরোটাই আপনার ওপর নির্ভর করবে। মানে আমরা যখন প্লেনে থাকব। আর আমার জীবনের দাম অনেক। আপনি কী করে ভাবলেন আপনার সম্পর্কে সবকিছু না-জেনে আপনাকে আমি ভাড়া করব?'

'তা আমি ভাবছি না,' বলল ল্যারি।

'আপনি তেমন ডিসিপ্লিন মেনে চলেন না, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডেমিরিস।

'আমার ধারেকাছে আসার যাদের যোগ্যতা নেই সেরকম কোনো মূর্খের কাছ থেকে কোনো হুকুম আমি নিই না।'

'আশা করি আমি ওই দলের মধ্যে পড়ব না,' কাঠখোট্টা গলায় বললেন ডেমিরিস।

'যদি-না আপনি আমাকে কীভাবে প্লেন চালাতে হবে তার পরামর্শ দেয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন,' বলল ল্যারি।

'না, আমি সেরকম কোনো পরামর্শ দেব না। কারণ প্লেন চালানো আপনার কাজ। আমি দেখব আমি আরামে এবং নিরাপদে যাত্রা করতে পারছি কিনা।'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি, 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, মি. ডেমিরিস।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বললেন ডেমিরিস। 'আমার প্লেনগুলো তো দেখলেন। কেমন লাগল?'

নিজের উল্লাস গোপন করতে পারল না ল্যারি, 'চমৎকার।'

জিজ্ঞেস করলেন ডেমিরিস, 'হকার সিডলি কখনো চালিয়েছেন?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল ল্যারি, 'না, স্যার।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেমিরিস, 'শিখতে পারবেন?'

হাসল ল্যারি, 'দশ মিনিট কেউ আমার পেছনে ব্যয় করলেই হবে।'

ডেমিরিস সামনে ঝুঁকে এলেন। লম্বা, নমনীয় হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরলেন। 'আমি এমন একজন পাইলট চাই যে আমার সবগুলো

প্লেনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে।'

'পাবেন না,' বলল ল্যারি। 'কারণ আপনি নতুন নতুন প্লেন কিনছেন। কাজেই এমন একজনকে দরকার যে আপনার নতুন প্লেনগুলোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেমিরিস। 'ঠিক বলেছেন। আমার আসলে একজন পাইলট দরকার—খাঁটি পাইলট— যে প্লেন চালানোর সময় নিজেকে সবচেয়ে সুখি মনে করবে।'

ওই মুহূর্তে ল্যারি বুঝতে পারল চাকরিটা পেয়ে যাচ্ছে সে।

কনস্টানটিন ডেমিরিস সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পেরেছেন আগেভাগে বিপদ টের পেয়ে যান বলে। আয়ান হোয়াইটস্টোন যখন তাঁর কাছে এসে বলল সে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন ডেমিরিস। এর খানিকটা কারণ হোয়াইটস্টোনের আচরণ। অস্বাভাবিক আচরণ করছিল সে, কেমন অস্বস্তিতে ভুগছিল। টাকার জন্য সে চাকরি ছাড়ছে না, হোয়াইটস্টোন বলেছিল ডেমিরিসকে। সে সিডনিতে তার শ্যালকের সাথে ব্যবসা করবে। হোয়াইটস্টোন আরেকজন পাইলটের ব্যাপারে সুপারিশ করে।

'লোকটা আমেরিকান, তবে আমরা একসঙ্গে RAF-এ প্লেন চালিয়েছি। ও শুধু ভালোই নয়, মি. ডেমিরিস, হি ইজ গ্রেট। ওর চেয়ে দক্ষ পাইলট দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি আমার।'

ডেমিরিস নীরবে ল্যারি সম্পর্কে হোয়াইটস্টোনের প্রশংসা শুনে যাচ্ছিলেন। ওর অতি-উৎসাহের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। হোয়াইটস্টোনের চলে যাওয়ার পরে বিভিন্ন দেশে ফোন করেন তিনি। বিকেলের মধ্যে নিশ্চিত হয়ে যান অস্ট্রেলিয়ায় ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায় ঢুকতে হোয়াইস্টোনকে কেউ টাকা দিয়েছে। ডেমিরিস ব্রিটিশ এয়ার মিনিস্ট্রিতে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন ভূমিতে ল্যারি খানিকটা অস্থির প্রকৃতির, তবে শূন্যে সে দুর্দান্ত আকাশচারী। এরপর ডেমিরিস ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে ফোন করে ল্যারি সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য জেনে নেন।

কনস্টানটিন ডেমিরিস কেমন একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে নোয়েলের সঙ্গে কথা বলেছেন। আরো বেশি টাকা দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন হোয়াইটস্টোনকে। নোয়েল সব শুনে মন্তব্য করেছে, 'না, ওকে যেতে দাও, কোস্টা। আমেরিকান পাইলট সম্পর্কে ও যখন এত করে বলছে, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব সে কেমন প্লেন চালায়।'

শেষপর্যন্ত ল্যারির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ডেমিরিস।

নোয়েল যেদিন জানল ল্যারি ডগলাস এথেন্সে আসছে, সে অন্যকিছু ভাবতে

পারছিল না। গত কয়েক বছর ধরে সযত্নে সাজানো পরিকল্পনাগুলো নিয়ে ভাবছিল ও। ওর পরিকল্পনার কথা জানতে পারলে ডেমিরিসও শাবাশ দেবেন। ল্যারির সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ না হলে ডেমিরিসকে নিয়ে সুখি হতে পারত নোয়েল। ওরা পরস্পরের চাহিদা পূরণ করতে জানে। দুজনেই ভালোবাসে ক্ষমতা এবং জানে কীভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়। ওরা সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। ওরা দেবতার মতো, শাসন করতে এসেছে। ওরা কখনো হারবে না, কারণ ওদের রয়েছে গভীর ধৈর্য। ওরা অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনে সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে। আর নোয়েলের জন্য অপেক্ষার পালা ফুরিয়েছে।

সারাটা দিন বাগানের দোলনায় শুয়ে কাটিয়ে দিল নোয়েল। পরিকল্পনা আঁটছে। পশ্চিমাকাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, নিজের পরিকল্পনা নিয়ে সন্তুষ্টবোধ করল সে। গত ছয়বছর ধরে প্রতিশোধের যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় অস্থির নোয়েল, আর কিছুদিনের মধ্যে তার বাস্তবায়ন ঘটবে, প্রতিশোধের পালার অবসান ঘটবে। কিন্তু নোয়েল জানে না ঘটনার মাত্র শুরু হতে চলেছে।

ল্যারি পৌঁছার আগের রাতে একফোঁটা ঘুমাতে পারল না নোয়েল। সারারাত জেগে রইল, মনে পড়ল প্যারিসের কথা, যে মানুষটা তাকে হাসি উপহার দিয়ে তা আবার কেড়ে নিয়েছিল ওর কাছ থেকে। মনে পড়ল প্যারিসের ফ্লাটের সেই ভয়ংকর বিকেলের কথা। ওইদিন কোট হ্যাঙ্গার সুচালো করে জরায়ুর মধ্যে ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলেছিল নোয়েল ল্যারির অনাগত সন্তানকে। অসহ্য ব্যথায় পাগল হয়ে গিয়েছিল নোয়েল, শরীর থেকে বন্যার মতো দরদর ধারায় বইছিল রক্ত। সব কথা একে একে মনে করল ও... সেই কষ্ট, যন্ত্রণা, এবং ঘৃণা...

সকাল পাঁচটায় উঠে পড়ল নোয়েল। কাপড় পরল। নিজের ঘর থেকে তাকাল পুবাকাশে। ওখানে এজিয়ান সাগরের কোণ থেকে ভেসে উঠছে আগুনের প্রকাণ্ড একটা বল। মনে পড়ল প্যারিসের সেই সকালের কথা, সেজেগুজে খুব ভোরবেলায় হোটেলের জানালায় বসে ল্যারির জন্য অপেক্ষা করছিল। আজও ল্যারির জন্য অপেক্ষা করছে নোয়েল। আজ ল্যারি আসবে। ওকে আসতেই হবে। আগে নোয়েলের ওকে দরকার ছিল, এখন ল্যারির ওকে দরকার। যদিও একথা মোটেই জানে না ল্যারি।

এগারোটার খানিক বাদে একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। নার্ভাসনেস নিয়ন্ত্রণের জন্য বুক ভরে দম নিল নোয়েল। তারপর ধীরপায়ে হেঁটে গেল জানালায়। গাড়ি থেকে নামছে ল্যারি ডগলাস। সদরদরজার দিকে পা বাড়াল। ল্যারিকে অনেকদিন পরে দেখছে নোয়েল। ওর চেহারায় কাঠিন্য এসেছে, ফলে আরো সুদর্শন লাগছে। ওর কাছ থেকে ল্যারি দশ গজ দূরে, কিন্তু তার প্রতি সেই বুনো আকর্ষণটা আবার অনুভব করল নোয়েল। তবে এবার সেইসঙ্গে যোগ হল

ঘৃণা। আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে নিচতলায় চলল ও সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে যাকে সে ধ্বংস করে দেবে।

সিঁড়ি বেয়ে নামছে, নোয়েল ভাবল তাকে দেখে ল্যারির প্রতিক্রিয়া কীরকম হবে। রিসেপশন হল-এ এসে দেখল সদরদরজা খুলে দিয়েছে বাটলার। ভেতরে ঢুকছে ল্যারি। বিস্মিত চোখে প্রকাণ্ড হলঘর দেখছে সে। ঘুরতেই দেখতে পেল নোয়েলকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। প্রশংসা ফুটল চেহারায় সুন্দরী নারী দর্শনে। 'হ্যালো,' বলল সে মৃদুগলায়। 'আমি ল্যারি ডগলাস। মি. ডেমিরিসের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' নোয়েলকে সে চিনতে পারেনি।

একেবারেই না।

এথেন্সের রাস্তা দিয়ে হোটেলে যাচ্ছে ক্যাথেরিন। রাস্তার দুপাশে নানান ধ্বংসাবশেষ এবং মনুমেন্ট দেখে রীতিমতো মুগ্ধ সে।

সামনে, অ্যাক্রোপলিসের ওপরে সাদা মার্বেলপাথরের তৈরি পার্থেননের শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য। চারদিকে হোটেল এবং অফিসভবনের ছড়াছড়ি। ক্যাথেরিনের মনে হচ্ছিল নতুন ভবনগুলো যেন ক্ষণস্থায়ী এবং পার্থেনন চিরকালের।

'দারুণ, না?' হাসল ল্যারি। 'গোটা শহর এরকম, এক বড় এবং সুন্দর ধ্বংসাবশেষ।'

বড় একটি পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। পার্কের মাঝখানে ফোয়ারা। পার্কে সার-বাঁধা শত শত টেবিল, পাশে সবুজ এবং কমলা রঙের খুঁটি। মাথার ওপরে নীল চাঁদোয়া।

'ওটা কনস্টিপেশন স্কোয়ার,' বলল ল্যারি।

'কী?'

'আসল নাম কন্সটিটিউশন স্কোয়ার। লোকে ওখানে বসে সারাদিন গ্রিক কফি গেলে আর মানুষজন দেখে।'

প্রায় প্রতিটি ব্লকেই রয়েছে আউটডোর ক্যাফে, লোকজন সদ্য-আহরিত স্পঞ্জ বিক্রি করছে দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে। ফেরিঅলারা বিক্রি করছে ফুল।

'এত সাদার ছড়াছড়ি চারিদিকে,' বলল ক্যাথেরিন। 'ধাঁধিয়ে যায় চোখ।'

হোটেল স্যুইটটি প্রকাণ্ড, মনোহর। সামনেই সিনটাগমা স্কোয়ার। শহরের কেন্দ্রস্থলের বড় চত্বর। রুমে ফুলদানিতে সুন্দর সুন্দর ফুল, একটি বড় বাটিতে তাজা ফল।

'স্যুইটটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ডার্লিং,' বলল ক্যাথেরিন। বেলবয় ওর সুটকেস নামিয়ে রাখল মেঝেয়। ছেলেটাকে বখশিশ দিল ল্যারি, 'পারাপোলি,' বলল সে।

'পারাকালো,' বলল ল্যারি।

চলে গেল বেলবয় পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে।

ল্যারি হেঁটে গেল ক্যাথেরিনের কাছে, জড়িয়ে ধরল ওকে।

'গ্রিসে স্বাগতম,' ওকে ক্ষুধার্তের মতো চুমু খেল ল্যারি, ওর শক্ত পৌরুষ টের পেল ক্যাথেরিন নিজের নরম শরীরে। ক্যাথেরিন জানে ওকে কী সাংঘাতিক মিস করেছে ল্যারি। ওর ভালো লাগছে। ল্যারি ওকে বেডরুমে নিয়ে এল।

ড্রেসিং টেবিলে ছোট একটি প্যাকেট। 'খোলো,' বলল ল্যারি।

র‍্যাপিং পেপার ছিঁড়ে ফেলল ক্যাথেরিন। ভেতরে একটি ছোট বাক্স। বাক্সে জেড পাথরের ছোট একটি পাখি। ল্যারি তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার জন্য এটা কিনে এনেছে, ব্যাপারটা খুব স্পর্শ করল ক্যাথেরিনকে।

প্রেম করার পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা প্রার্থনা করল ক্যাথেরিন। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাল সে তার স্বামীর বাহুডোরে শুয়ে থাকতে পারছে বলে। এই মানুষটিকে সে খুবই ভালোবাসে। একে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে ক্যাথেরিন।

পরদিন ল্যারি একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে ক্যাথেরিনকে পাঠাল অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে। বেঁটে, মোটা, ইয়া গোঁফঅলা এজেন্টের নাম দিমিত্রোপুলাস। সারাক্ষণ বকবক করেই চলেছে। কথায় কথায় বোঝার অগম্য ইংরেজি প্রবাদবাক্য বলা তার বদভ্যাস। তার ধারণা সে খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারে। কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে গ্রিক মিশিয়ে জগাখিচুড়ি একটা ভাষা বলে সে, বোঝে কার সাধ্য! ক্যাথেরিন সে আশা ছেড়ে দিল। লোকটার কথায় শুধু 'হাঁ হুঁ' করে গেল।

এজেন্ট পরপর তিনটা বাড়ি দেখাল ক্যাথেরিনকে। এথেন্সের ফ্যাশনেবল শহরতলি কলোনাকি অঞ্চলে চার-রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ হল ওর। ভবনের চারপাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি এবং দোকান।

ল্যারি সেদিন সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরার পরে অ্যাপার্টমেন্টের কথা তাকে বলল ক্যাথেরিন। দুইদিন পরে নতুন বাড়িতে উঠে গেল ওরা।

ল্যারি দিনের বেলা বাইরে থাকে, তবে ক্যাথেরিনের সঙ্গে ডিনার করার চেষ্টা করে। এথেন্সে ডিনারের সময় রাত নটা থেকে বারোটা। বেলা দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে সবাই মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রা যায়। দোকান সন্ধ্যার সময় আবার খোলে। ক্যাথেরিন এ রুটিনের সঙ্গে নিজেকে একদম মানিয়ে নিল।

ল্যারি তার এথেন্স-বাসের তৃতীয় রাতে এক বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। কাউন্ট জর্জ পাপাস। পঁয়তাল্লিশ বছরের, সুদর্শন এক গ্রিক। লম্বা, হালকা-পাতলা গড়ন, কালো চুল, তালুতে সামান্য ধূসর রঙ ধরেছে। লোকটির মধ্যে পুরোনো আমলের একধরনের সহজাত ভাব আছে, প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ হল ক্যাথেরিনের। সে ওদেরকে শহরের প্রাচীন এলাকা প্লাকার ছোট একটি সরাইখানায় ডিনারে নিয়ে

গেল। একটা বাড়ির ছাদের ওপরে সরাইখানাটি। এখান থেকে শহর দেখা যায়। সরাইখানার ওয়েটারদের পরনে রঙিন জামা।

'কী খাবে?' কাউন্ট জিজ্ঞেস করল।

অচেনা মেনুতে অসহায় চোখ বুলাল ক্যাথেরিন, 'আমার জন্য অর্ডার দেবে, প্লিজ! আমি হয়তো মালিককেই খাবার ভেবে বসে থাকব।'

কাউন্ট প্রচুর খাবারের অর্ডার দিল, যাতে সবগুলো খাবার চেখে দেখতে পারে ক্যাথেরিন। এল ডোল মাডেস, দ্রাক্ষাপাতায় মোড়ানো মিটবল, মুসাকা, রসালো মাংস এবং এগপ্লান্ট পাই; স্টিফাডো, পেঁয়াজ দিয়ে স্টু-করা খরগোশ—অর্ধেক খাওয়ার পরেও বলে না দিলে বুঝতে পারত না ক্যাথেরিন, জানার পরে আর লোকমা তুলতে পারল না মুখে—এবং টারামোসালাটা, গ্রিক সালাদ, জলপাই তেল, লেবু এবং ক্যাভিয়ার দিয়ে তৈরি। কাউন্ট এক বোতল রেটসিনার অর্ডার দিল।

'এটা আমাদের জাতীয় মদ,' বলল সে। এই মদ পান করতে গিয়ে কড়া স্বাদে ঝিম খেল ক্যাথেরিন। ওটা আর ছুঁলো না।

ওরা খাচ্ছে, তিন মিউজিশিয়ান বোজুকিয়া মিউজিক বাজাতে শুরু করল। খদ্দেররা মিউজিকের তালে নাচতে লাগল। ক্যাথেরিনকে যে-ব্যাপারটা সবচে' মুগ্ধ করল তা হল নৃত্যশিল্পীদের সবাই পুরুষ এবং এরা নাচেও দারুণ। খুব মজা পাচ্ছিল ক্যাথেরিন।

রাত তিনটা পর্যন্ত ওই ক্যাফেতেই কাটাল ওরা।

তারপর কাউন্ট ওদেরকে ওদের নতুন অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিল। 'শহর ঘুরে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল সে ক্যাথেরিনকে।

'সেভাবে দেখা হয়নি,' স্বীকার করল ক্যাথেরিন। 'ল্যারির ব্যস্ততা কমার অপেক্ষায় আছি।'

ল্যারির দিকে ঘুরল কাউন্ট। 'আমি ক্যাথেরিনকে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' বলল ল্যারি। 'অবশ্য তোমার যদি কোনো সমস্যা না হয়।'

'ইট উড বি মাই প্লেজার,' বলল কাউন্ট। ক্যাথেরিনের দিকে ফিরল সে, 'আমি গাইড হলে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'অবশ্যই না,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

পরবর্তী কয়েকটা হপ্তা চমৎকার কেটে গেল। সকালবেলা বাড়িতে নানান কাজে সময় চলে যায় ক্যাথেরিনের, বিকেলে ল্যারি বাড়ি না থাকলে কাউন্ট তাকে শহর ঘুরিয়ে দেখায়।

ওকে অলিম্পিয়া নিয়ে গেল কাউন্ট। 'এখানে প্রথম অলিম্পিক গেমসের সূচনা

করা হয়,' বলল সে। 'এক হাজার বছর ধরে প্রতিবছর এখানে খেলা হয়েছে। যুদ্ধ, প্লেগ কিংবা দুর্ভিক্ষ কোনোকিছুই তারা পরোয়া করেনি।'

প্রকাণ্ড অ্যারেনার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন। ভাবছে এখানে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে কত খেলা হয়েছে। কেউ হেরেছে, কেউ জিতেছে।

ল্যারির যখন অবসর মেলে, ক্যাথেরিনকে নিয়ে সে শহর ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। নানান দোকানে ঢুঁ দেয়, জিনিসপত্রের দামদর দেখে, কোনোকিছু পছন্দ হলে তা কেনার জন্য দাম কমাতে দোকানির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। ফেরার পথে ছোট কোনো রেস্টুরেন্টে সেরে নেয় ডিনার। সঙ্গী হিসেবে চমৎকার ল্যারি। ক্যাথেরিন ভাবে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছে। নইলে স্বামীর সঙ্গে এভাবে উপভোগ করা হত না জীবন।

এমন সুখ জীবনে অনুভব করেনি ল্যারি ডগলাস। ডেমিরিসের চাকরিটা তার কাছে সারাজীবনের স্বপ্নের মতো।

বেতন খুব ভালো পায় ল্যারি। তবে টাকা নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার। তার কেবল আগ্রহ যে-যন্ত্র নিয়ে সে আকাশে ওড়ে তার ব্যাপারে। হকার সিডলি চালানো শিখতে তার মাত্র একঘণ্টা লেগেছে। পাঁচবার চালিয়ে মকশো করে নিয়েছে হাত। আকাশে ওড়ার সময় বেশিরভাগ সময় তার সঙ্গে থাকে পল মেটাক্সাস, ডেমিরিসের হাসিখুশি বেঁটে গ্রিক কো-পাইলট। আয়ান হোয়াইটস্টোনের আকস্মিক প্রস্থান বিস্মিত করে তুলেছিল মেটাক্সাসকে। তার জায়গায় কে আসে এ নিয়ে সন্দেহের দোলাচলে ছিল সে। সে ল্যারি ডগলাসের অনেক গল্প শুনেছে। তবে গল্পগুলো তার পছন্দ হয়নি। তবে ডগলাস তার নতুন চাকরি নিয়ে খুবই খুশি। মেটাক্সাস তার সঙ্গে প্রথমবার আকাশে ওড়ার পরেই বুঝতে পেরেছে ডগলাস তুখোড় পাইলট।

ধীরে ধীরে নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে মেটাক্সাস। এখন ওরা খুব ভালো বন্ধু।

যখন আকাশে থাকে না, ল্যারি ডেমিরিসের প্রতিটি প্লেনের আদ্যোপান্ত জেনে নেয়। ফলে এসব প্লেন চালাতে তার কোনো সমস্যা হয় না।

কাজের বৈচিত্র্য মুগ্ধ করে ল্যারিকে। সে ডেমিরিসের কর্মচারীদের নিয়ে বিজনেস ট্রিপে যায় ব্রিন্দিসি, কর্ফু এবং রোমে। অথবা অতিথিদেরকে পৌঁছে দেয় ডেমিরিসের দ্বীপের পার্টিতে, কিংবা সুইটজারল্যান্ডের শ্যালেতে, স্কি করার জন্য। যাদের ছবি খবরের কাগজ এবং পত্রিকার পাতায় নিয়মিত দেখে আসছে ল্যারি, এঁরাই তার যাত্রী হয় বেশি। এদের গল্প বলে সে ক্যাথেরিনকে। সে এক বলকান দেশের প্রেসিডেন্টকে যাত্রী হিসেবে পেয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, এক আরবীয় তেল সর্দার এবং তাঁর গোটা হারেম। সে অপেরা

নায়ক এবং ব্যালে নর্তকীদের নিয়েও আকাশে উড়েছে। ব্রডওয়ের নাটকের একটি দল এসেছিল ডেমিরিসের জন্মদিনে নাটক করতে। ল্যারির প্লেনে উঠেছেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, একজন কংগ্রেসম্যান, সাবেক একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বেশিরভাগ সময় ককপিটেই কাটায় ল্যারি, তবে মাঝে মাঝে কেবিনে ঢুকে যাত্রীদের আরাম-আয়েশের খোঁজখবর নেয়। মাঝেমধ্যে টাইকুনদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য দিয়ে দু-একটা কথা বলে। শেয়ারবাজার সম্পর্কে পাওয়া তথ্য বিক্রি করে প্রচুর টাকা কামাতে পারে ল্যারি, কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। তার আগ্রহ এবং আকর্ষণ শুধু যে-বিমান নিয়ে সে আকাশে ওড়ে, সেই ব্যাপারে।

দুই মাস পরে ডেমিরিসকে নিয়ে আকাশে উড়ল ল্যারি।

পাইপার চালাচ্ছে ও, মনিবকে নিয়ে এথেন্স থেকে দ্রুবভনিক-এ যাচ্ছে। মেঘাচ্ছন্ন একটি দিন। আবহাওয়ার খবরে বলা হয়েছে ঝড় আসতে পারে। ঝড়ো বাতাস এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল ল্যারি। কিন্তু বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া এড়িয়ে চলা গেল না।

এথেন্সের আকাশসীমা পার হওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে 'সিটবেল্ট' সংকেত জ্বেলে দিল ল্যারি, মেটাক্সাসকে বলল, 'হোল্ড অন, পল। আমাদের চাকরি নিয়ে আজই টানাটানি পড়ে যেতে পারে।'

ল্যারিকে বিস্মিত করে দিয়ে ককপিটে হাজির হলেন ডেমিরিস। 'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি?'

'আসুন,' বলল ল্যারি। 'পরিস্থিতি সুবিধের ঠেকছে না।'

মেটাক্সাস নিজের আসন ছেড়ে দিল। ডেমিরিস স্ট্রাপ বেঁধে নিলেন। কো-পাইলট পাশে বসা থাকলে সুবিধে হত ল্যারির, বিপদে পড়লে সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু প্লেনটার মালিক ডেমিরিস। তিনি সেধে কো-পাইলটের আসনে এসে বসে পড়লে ল্যারি কীই-বা করতে পারে?

ঝড়ের তাণ্ডব চলল দুঘণ্টা। সাদা মেঘের পাহাড় চক্কর দিল ল্যারি। সাদা তবে ভয়ংকর।

'অপূর্ব,' মন্তব্য করলেন ডেমিরিস।

'ওগুলো খুনে মেঘ,' বলল ল্যারি, 'কিউমুলাস, পুঞ্জীভূত এই মেঘের মধ্যে ফুঁসতে থাকে বাতাস। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই এটা ফাঁদ। ওই ফাঁদে আটকা পড়লে দশ সেকেন্ডের মধ্যে যে-কোনো প্লেন ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে। এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ত্রিশ হাজার ফুট উপর থেকে আপনি ছিটকে পড়ে যাবেন নিচে। প্লেনের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকবে না আপনার।'

'আশা করি আপনি তা ঘটতে দেবেন না,' শান্ত গলায় বললেন ডেমিরিস।

বাতাস পেয়ে বসল প্লেনটিকে, আকাশে লোফালুফি করার চেষ্টা করল। ওটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেল ল্যারি। ডেমিরিসের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল সে, পূর্ণ মনোযোগ দিল এয়ারক্রাফটে, নিজের শেখা প্রতিটি

দক্ষতা কাজে লাগাল। অবশেষে ঝড়ের কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ঘুরল ল্যারি, বিধ্বস্ত। ডেমিরিস ককপিটে নেই, মেটাক্সাস তার আসনে।

'আমার সঙ্গে প্রথম ভ্রমণ হিসেবে যাত্রাটা ওঁর জন্য সুখকর হয়নি, পল,' বলল ল্যারি। 'সমস্যায় পড়ে যেতে পারি।'

দ্রুবভনিকের পাহাড়ঘেরা ছোট বিমানবন্দরে প্লেন নামিয়ে এনেছে ল্যারি, ককপিটের দোরগোড়ায় উদয় হলেন ডেমিরিস।

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন,' তিনি ল্যারিকে বললেন, 'আপনি আপনার কাজে অত্যন্ত দক্ষ। আমি খুশি।'

চলে গেলেন ডেমিরিস।

একদিন সকালে ল্যারি মরক্কো যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কাউন্ট পাপাস ফোন করে অনুমতি চাইল সে ক্যাথেরিনকে গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। ল্যারি ক্যাথেরিনকে যেতে বলল।

'তুমি জেলাস বোধ করো না?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'কাউন্টকে নিয়ে?' হেসে উঠল ল্যারি।

ওর হাসির মানে বুঝে ফেলল ক্যাথেরিন। কাউন্ট-পাপাসের সঙ্গে সে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে ল্যারি একবারও কোনো মন্তব্য করেনি, 'লোকটা কি সমকামী?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি। 'এজন্যই তো ওর সঙ্গে তোমাকে যেতে দিতে সাহস করি আমি।'

কাউন্ট পাপাস এবং ল্যারির সঙ্গে এথেন্সের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাথেরিন। মজায় আছে ও। আশপাশের লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়ে যাচ্ছে। এরা বেশ খোলামেলা স্বভাবের। বাজার, দোকানপাট চিনে নিচ্ছে ক্যাথেরিন। সে জানে ডুকোরেস্টিও স্ট্রিটের কোন্ দোকানে জামাকাপড় মেলে, কোথায় মুদি সদয় কিনতে যাবে। গ্রিসের মানুষজনের মধ্যে কোনো তাড়া নেই। এখানে রাস্তা না চিনলে লোকে সেখানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ক্যাথেরিন এবং ল্যারি মিকোনোস-এ বেরিয়ে এসেছে। এখানে বর্ণালি উইন্ডমিল আছে, এখানেই আবিষ্কৃত হয় ভেনাস ডি মিলো। তবে ক্যাথেরিনের সবচেয়ে পছন্দ হল প্যারোস, ফুলে ফুলে মোড়া এক পাহাড়চুড়োর দ্বীপ। ওদের নৌকা ওকে পৌঁছানোর পরে এক গাইড এগিয়ে এল। জানতে চাইল সে ওদেরকে পাহাড় ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে যেতে পারে কিনা। তিনটে খচ্চরের পিঠে চড়ে ওরা রওনা হয়ে গেল।

দুইঘণ্টা পরে ওরা একটি মালভূমিতে পৌঁছুল। চারদিকে গাছগাছালির সমাহার, গাছে নানান রঙের লাখ লাখ ফুল ফুটে আছে। গাইড খচ্চরদের দাঁড়

করাল। ল্যারি এবং ক্যাথেরিন মুগ্ধচোখে দেখছে অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য।

'এর নাম প্রজাপতি উপত্যকা,' ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানাল গাইড।

তবে কোনো প্রজাপতি চোখে পড়ল না ক্যাথেরিনের।

'প্রজাপতিই নেই। তাহলে এরকম নাম কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

এ-প্রশ্নের অপেক্ষাতেই যেন ছিল গাইড। মুচকি হেসে বলল, 'দেখাচ্ছি আপনাদের।' খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়ল সে, মাটি থেকে তুলে নিল একটা বড় ডাল। একটা গাছের সামনে গেল সে, শরীরের সব শক্তি দিয়ে বাড়ি মারল। চোখের পলকে গাছে ফুটে থাকা ফুলগুলো জ্যান্ত হয়ে আকাশে উড়াল দিল, শূন্যে সৃষ্টি করল অপূর্ব এক রংধনু, নগ্ন হয়ে গেল গাছ। সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে লাগল হাজার হাজার প্রজাপতি।

দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেছে ক্যাথেরিন এবং ল্যারি। গাইড ওদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল, গর্বে জ্বলজ্বল করছে চেহারা। যেন প্রজাপতিদের এই বিস্ময়কর দৃশ্য সেই সৃষ্টি করেছে। ক্যাথেরিনের জীবনের অন্যতম সেরা দিন আজ। ল্যারির সঙ্গে কাটানো যথার্থ কোনো একটি দিনের কথা যদি স্মরণ করতে বলা হয় ওকে, প্যারোস-এর দিনটির কথা বলবে সে।

'হেই, আজ একজন ভিআইপি আসছেন আমাদের প্লেনে,' দাঁত বের করে হাসল পল মেটাক্সাস।

'কে তিনি?'

'নোয়েল পেজ। বস্-এর বান্ধবী। শুধু দেখতেই পাবে, স্পর্শ করা যাবে না।'

ল্যারির মনে পড়ে গেল এথেন্সে পৌঁছার দিন মহিলাকে একঝলক দেখেছে ডেমিরিসের বাড়িতে। খুব সুন্দরী, কেমন চেনা-চেনা লাগছিল। অবশ্য একে সে সিনেমার পর্দায় দেখেছে। ফরাসি একটি ছবি। ক্যাথেরিন নিয়ে গিয়েছিল ওকে দেখাতে। পৃথিবীতে যদি আর কোনো নারী না-ও থাকে তবু কনস্টানটিন ডেমিরিসের বান্ধবীর ধারেকাছেও ঘেঁষবে না ল্যারি। কারণ নিজের চাকরি সে খুব ভালোবাসে, নির্বোধের মতো কোনো কাজ করে এটা হারাতে চায় না। ল্যারি বরং ক্যাথেরিনের জন্য অটোগ্রাফ চেয়ে নেবে নোয়েল পেজের কাছ থেকে।

লিমুজিনে চড়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে নোয়েল পেজ। রাস্তা মেরামত চলছে বলে বারবার বিরতি হচ্ছে যাত্রায়। তবে বিরক্তবোধ করছে না নোয়েল। ডেমিরিসের বাড়িতে সাক্ষাতের পরে এই প্রথম ল্যারির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে।

গত ছয়বছরে নোয়েল বহুভাবে চিন্তা করেছে ল্যারির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে কী ঘটবে। কিন্তু সে কল্পনাও করেনি ল্যারি তাকে দেখে চিনতে পারবে না। নোয়েলের জীবনের প্রথম প্রেম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ল্যারির কাছে মোটেই গুরুত্ব বহন করেনি। এটাকে সে তার অসংখ্য সস্তা প্রেমের একটা হিসেবে ধরে

নিয়েছিল। ঠিক আছে, প্রতিশোধ নেয়ার আগে এমন কিছু কাজ করবে নোয়েল, ল্যারির মনে পড়ে যাবে নোয়েলের সঙ্গে সে প্রেম করত।

এয়ার-ফিল্ড দিয়ে হেঁটে আসছে ল্যারি, হাতে ফ্লাইট প্ল্যান, এমন সময় প্লেনের সামনে থামল একটি লিমুজিন। গাড়ি থেকে নামল নোয়েল পেজ। ল্যারি হেঁটে গেল গাড়ির সামনে, হেসে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস পেজ। আমি ল্যারি ডগলাস। আমি আপনাদেরকে কান-এ নিয়ে যাব।'

ঘুরে দাঁড়াল নোয়েল, ওর পাশ দিয়ে হেঁটে এগোল যেন ল্যারির কথা সে শুনতে পায়নি কিংবা ওর কোনো অস্তিত্বই নেই। ল্যারি নোয়েলের দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকল।

ত্রিশ মিনিট বাদে অন্যান্য যাত্রীরা হাজির হলেন, সংখ্যায় জনাবারো। সবাই চড়লেন প্লেনে। ল্যারি এবং পল মেটাক্সাস প্লেন নিয়ে উঠে পড়ল আকাশে। কোটে ডি আজুর-এ যাবে ওরা, ওখানে যাত্রীরা ডেমিরিসের ইয়টে উঠবেন।

যাত্রাপথে কোনো সমস্যা হল না। নিরাপদে বিমানবন্দরে অবতরণ করল ল্যারির প্লেন। থামল এসে অপেক্ষমাণ কয়েকটি লিমুজিনের পাশে। ল্যারি তার কো-পাইলটকে নিয়ে নেমে এল প্লেন থেকে। নোয়েল হেঁটে গেল মেটাক্সাসের কাছে, তাকালও না ল্যারির দিকে। কণ্ঠে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বলল, 'নতুন পাইলট অ্যামেচার। তোমার ওকে শেখানো উচিত কীভাবে চালাতে হয় প্লেন।' একটা গাড়িতে উঠে পড়ল নোয়েল। চলে গেল। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে অসহায় রাগে ফুঁসতে থাকল ল্যারি।

নোয়েলকে মনে মনে গালাগাল দিল ল্যারি। আজকের দিনটাই ওর কুফা গেছে। কিন্তু এক হপ্তা পরের একটা ঘটনা ভাবাতে বাধ্য করল সে সিরিয়াস সমস্যায় পড়েছে।

ডেমিরিসের আদেশে নোয়েলকে অসলো থেকে তুলে নিয়ে লন্ডনে পৌঁছে দিল ল্যারি। উত্তরে বাতাসের প্রবল চাপ ছিল, পুবের আকাশে জমা হচ্ছিল কালো মেঘ, ঝড়ের পূর্বাভাস নিয়ে। তবে ল্যারি কোনো ঝামেলা ছাড়াই প্লেন চালিয়ে নিয়ে এল লন্ডনে। বিমানবন্দরে অবতরণের পরে সে আর পল মেটাক্সাস ঢুকল নোয়েল পেজের কেবিনে। নোয়েল তখন ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে। ল্যারি বিনীত গলায় বলল, 'যাত্রাটা আশা করি উপভোগ করেছেন, মিস পেজ।'

নোয়েল এক সেকেন্ডের জন্য তাকাল ল্যারির দিকে, চেহারা ভাবলেশহীন। তারপর ফিরল পল মেটাক্সাসের দিকে। 'অযোগ্য লোক যখন প্লেন চালায়, আমি সবসময় নার্ভাস থাকি।'

মুখ লাল হয়ে গেল ল্যারির। সে কথা বলার জন্য মুখ খুলেছে, নোয়েল মেটাক্সাসকে বলল, 'ওকে নিষেধ করে দিও ভবিষ্যতে আমি কিছু জিজ্ঞেস না করার আগে যেন সেধে কথা বলতে না আসে।'

ঢোক গিলল মেটাক্সাস, বিড়বিড় করল, 'জি, ম্যাম।'

কটমট করে নোয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকল ল্যারি, রাগে জ্বলছে চোখ। ইচ্ছে করছে মহিলাকে কষে চড় লাগিয়ে দেয়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি চলে যাবে ওর। কিন্তু চাকরিটাকে সে যে-কোনোকিছুর চেয়ে ভালোবাসে। তাই এটা হারাতে চায় না। ল্যারি জানে এখান থেকে বরখাস্ত হলে আর কোথাও সে কাজ পাবে না। নাহ্, ভবিষ্যতে ওকে আরো সাবধান হতে হবে।

ল্যারি বাড়ি ফিরে সব খুলে বলল ক্যাথেরিনকে। 'আমার পেছনে খামোকাই লেগেছে সে,' বলল ও।

'মনে হচ্ছে মহিলা খুব বদমেজাজি,' বলল ক্যাথেরিন। 'ওর সঙ্গে তোমার কখনো কথা কাটাকাটি হয়েছে, ল্যারি?'

'আরে, দশটা শব্দও বিনিময় করিনি ওর সঙ্গে।'

ল্যারির হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিল ক্যাথেরিন, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন কনস্টানটিন ডেমিরিসকে নিয়ে তুরস্কের পথে রওনা হল ল্যারি এক বিজনেস ট্রিপে। ডেমিরিস ককপিটে এসে মেটাক্সাসের জায়গা দখল করলেন। ওকে হাত ইশারায় চলে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন দুজনে। ছোট ছোট স্তর মেঘ কেটে প্লেন উড়ছে। মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেমিরিস। তারপর নীরবতা ভেঙে বললেন, 'মিস পেজ আপনাকে পছন্দ করছেন না।'

কন্ট্রোলে শক্ত হয়ে গেল ল্যারির হাত, জোর করে রিল্যাক্স করল সে। কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখতে রীতিমতো কসরত করতে হল। 'উনি—উনি কী কারণটা বলেছেন?'

'বলেছেন আপনি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি।'

আপত্তি জানাতে মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না ল্যারি। জানে ফায়দা হবে না কোনো। এ সমস্যার সমাধান ওর নিজেকেই করতে হবে।

'আমি দুঃখিত, আমি আরো সংযত হওয়ার চেষ্টা করব, মি. ডেমিরিস,' অচঞ্চল গলায় বলল ও।

সিধে হলেন ডেমিরিস। 'তাই করুন। আর কখনো মিস পেজের মুখে মুখে তর্ক করবেন না।' তিনি চলে গেলেন ককপিট ছেড়ে।

আর কখনো! ল্যারি মনে করার চেষ্টা করল কবে সে নোয়েলের মুখে মুখে তর্ক করেছে। ল্যারিকে তার হয়তো কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই পছন্দ হয়নি। অথবা ডেমিরিস তাকে বিশ্বাস করেন, আস্থা রাখেন, এটা নোয়েলকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে। সে ল্যারির চাকরি খেয়ে ফেলতে চাইছে।

বেকার থাকার যন্ত্রণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে ল্যারি। বেকার থাকার সময় ক্যাথেরিন যে ধৈর্য দেখিয়েছে, সহ্য করেছে তার অত্যাচার, এতে বরং তার ওপর

রাগই হয়েছে ল্যারির। নাহ্; আবার বেকারত্বের কষ্ট সে পেতে চায় না। আরেকটা ব্যর্থতা সহ্য করতে পারবে না সে।

বৈরুতে কয়েক ঘণ্টার অবসর পেয়ে একটা প্রেক্ষাগৃহে ঢুকল ল্যারি নোয়েল পেজের সিনেমা দেখতে। যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে ঢুকেছিল সে, মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ছিল এ ছবি এবং তার তারকা দুটোকেই ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু নোয়েলের দুর্দান্ত অভিনয় তাকে রীতিমতো মুগ্ধ করে তুলল। মেয়েটাকে আবারো চেনা-চেনা লাগল তার।

পরের সোমবার নোয়েল পেজ এবং ডেমিরিসের কিছু ব্যবসায়িক সহযোগীকে নিয়ে জুরিখে আসতে হল ল্যারিকে। নোয়েল পেজকে একা পাবার জন্য অপেক্ষা করল ল্যারি। তারপর এগোল তার দিকে। কথা বলতে ইতস্তত করছিল গতবারের সতর্কবাণী মনে পড়ে যাওয়ায়। কিন্তু নোয়েল পেজ তার সম্পর্কে যে ভুল ধারণা করে আছে, সেটা ভেঙে দেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। অভিনেত্রীরা খুব অহংকারী হয়। তাদের মন গলানোর প্রধান উপায় তাদের অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা। ল্যারি নোয়েলের সামনে এসে সাবধানে বলল, 'এক্সকিউজ মি, মিস পেজ। আমি কাল রাতে আপনার 'দ্য থার্ড ফেস' দেখলাম। অসাধারণ অভিনয় করেছেন আপনি। মনে হয়েছে বিশ্বসেরা অভিনেত্রীদের অন্যতম আপনি।'

নোয়েল ল্যারিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখল একমুহূর্ত। তারপর বলল, 'আপনি পাইলট না হয়ে সমালোচক হলে ভালো করতেন। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে সমালোচনা করার মতো বুদ্ধি বা রুচি কোনোটাই আপনার আছে কিনা।' চলে গেল সে।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ল্যারি। মাগী! ইচ্ছে করল মহিলাকে গিয়ে অপমান করে আসে। কিন্তু তাতে ওর চাকরি খাওয়ার চমৎকার মওকা পেয়ে যাবে কুত্তীটা। তারচে' এখন থেকে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে ল্যারি, মহিলার কাছ থেকে যত দূরে থাকা সম্ভব, থাকবে।

পরবর্তী কয়েক হপ্তা বেশ কয়েকটি ফ্লাইটে ল্যারির যাত্রী হল নোয়েল। নোয়েলের সঙ্গে একদমই কথা বলল না ও, সবসময় মহিলাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল। কেবিনের ধারেকাছেও গেল না ল্যারি, যাত্রীদের কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে তা দেখভাল করল মেটাক্সাস। ল্যারি সম্পর্কে নোয়েল পেজ আর কোনো মন্তব্য করেনি। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করল ল্যারি।

একদিন সকালে ডেমিরিস ল্যারিকে তাঁর ভিলায় ডেকে পাঠালেন। 'মিস পেজ আমার বিশেষ কাজে প্যারিস যাবেন। আপনি তার সঙ্গে থাকবেন।'

'জি, মি. ডেমিরিস।'

ডেমিরিস ওকে লক্ষ করছেন, কিছু বলতে গিয়েও চেপে গেলেন। 'দ্যাটস অল।'

প্যারিসের ফ্লাইটে যাত্রী শুধু নোয়েল। পাইপার নিয়ে যাবে ঠিক করল ল্যারি। পল মেটাক্সাসকে পাঠিয়ে দিল নোয়েলের খেদমতের জন্য, সে গোটা ফ্লাইটে একবারও ককপিট থেকে বেরুল না। মাটিতে অবতরণের পরে ল্যারি হেঁটে গেল নোয়েলের কাছে। 'এক্সকিউজ মি, মিস পেজ। মি. ডেমিরিস বলেছেন প্যারিসে থাকাকালীন আমি যেন আপনাকে সঙ্গ দিই।'

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ল্যারিকে দেখল নোয়েল, 'বেশ। তবে আমার আশপাশে আপনাকে যেন ঘুরঘুর করতে না দেখি।'

বরফশীতল নীরবতার মাঝে শুধু মাথা ঝাঁকাল ল্যারি।

প্রাইভেট লিমুজিনে চেপে ওরলি বিমানবন্দর ছাড়ল ওরা। ল্যারি সামনে, ড্রাইভারের সঙ্গে বসল, নোয়েল পেছনে। যাত্রাপথে সে একটা কথাও বলল না ল্যারির সঙ্গে। গাড়ি প্রথম যাত্রাবিরতি দিল পারিবাস-এ, ব্যাংক ডি প্যারিস। ল্যারি নোয়েলের সঙ্গে ব্যাংকে গেল, তবে দাঁড়িয়ে থাকল লবিতে। নোয়েল ভেতরে ঢুকে গেল, ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে। তারপর বেযমেন্টে গেল। এখানে সেফ-ডিপোজিট বক্স আছে। ত্রিশ মিনিট বেযমেন্টে কাটাল নোয়েল, ফিরে এসে ল্যারির দিকে তাকাল না পর্যন্ত, হনহন করে ওর পাশ কাটাল। ল্যারি স্থিরদৃষ্টিতে দেখল ওকে, তারপর ওর পেছন পেছন এগোল।

এরপর নোয়েল গেল রু দু ফবার্গ সেন্ট-অনর-এ। এখানে গাড়ি ছেড়ে দিল সে। ঢুকল একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে, বেশকিছু জিনিস কিনে প্যাকেটগুলো ধরিয়ে দিল ল্যারির হাতে। অন্তত আধডজন দোকানে কেনাকাটা করল নোয়েল : হারমেস থেকে কিনল কয়েকটি পার্স এবং কয়েকজোড়া বেল্ট, গুয়েরলেন থেকে সুগন্ধি, সেলিন থেকে জুতো, প্যাকেটের ওজনের ভারে নুয়ে যাওয়ার দশা হল ল্যারির। ওর কষ্ট দেখেও গ্রাহ্য করল না নোয়েল। যেন ল্যারি তার পোষা জানোয়ার। তাকে যেরকম নির্দেশ দেয়া হবে, তাই সে মেনে চলতে বাধ্য।

ওরা সেলিন থেকে বেরিয়ে দেখল বৃষ্টি পড়ছে। পথচারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। 'এখানে দাঁড়াও,' ল্যারিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করল নোয়েল নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সুরে।

ল্যারি দাঁড়িয়ে থাকল। নোয়েল রাস্তার ওপাশে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। দুইঘণ্টা হাতভর্তি প্যাকেট নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল ল্যারিকে। নোয়েলের মা-বাপ তুলে গালাগাল দিল ও মনে-মনে, শাপশাপান্ত করল। গালাগাল করল নিজেকেও নোয়েলের এমন অপমানকর আচরণ সহ্য করছে বলে। সে ফাঁদে পড়েছে এবং জানে এ থেকে বেরুবার রাস্তা নেই।

ল্যারির মনে হচ্ছে ওর কপালে আরো খারাবি আছে।

ক্যাথেরিনের সঙ্গে কনস্টানটিন ডেমিরিসের সাক্ষাৎ হল তাঁর ভিলায়। কোপেনহেগেন থেকে নিয়ে আসা একটা প্যাকেজ তাঁকে দিতে গিয়েছিল ল্যারি। ক্যাথেরিন তার সঙ্গী হল। প্রকাণ্ড রিসেপশন হল-এ দাঁড়িয়ে একটি চিত্রকলা

মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছিল ক্যাথেরিন, এমন সময় খুলে গেল দরজা। ঢুকলেন ডেমিরিস। ক্যাথেরিনকে এক ঝলক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যানেট আপনার পছন্দ, মিসেস ডগলাস?'

পাঁই করে ঘুরল ক্যাথেরিন। মুখোমুখি হয়ে গেল সেই কিংবদন্তির সঙ্গে যাঁর বহু গল্প সে শুনেছে। ডেমিরিসকে দেখে তাৎক্ষণিক যে দুটি বিষয় ওকে প্রভাবিত করল তা হল : কনস্টানটিন ডেমিরিস ওর কল্পনার চেয়ে লম্বা এবং তার গোটা অবয়ব থেকে ভীতিকর একটা শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভদ্রলোক ওর নাম এবং পরিচয় জানেন, ব্যাপারটা বিস্মিত করে তুলল ক্যাথেরিনকে। তবে সহজ করে তোলার জন্য মামুলি কিছু প্রশ্ন করলেন ডেমিরিস। জানতে চাইলেন গ্রিস কেমন লাগছে ক্যাথেরিনের। ওর বাড়িটি আরামদায়ক কিনা, এমনকি উনি এটাও জানেন মিনিয়েচার পাখি সংগ্রহের নেশা আছে ওর। 'আমার কাছে অমন একটি পাখি আছে,' বললেন তিনি ক্যাথেরিনকে। 'পাঠিয়ে দেব আপনাকে।'

চলে এল ল্যারি। চলে গেল ক্যাথেরিনকে নিয়ে।

'কেমন লাগল ডেমিরিসকে?' জানতে চাইল ল্যারি।

'মজার মানুষ,' জবাব দিল ক্যাথেরিন, 'এজন্যই ওঁর সঙ্গে কাজ করে মজা পাচ্ছ তুমি।'

'এবং ওনার সঙ্গে আমি কাজ করে যাব,' ল্যারির গলা কেন গম্ভীর শোনাল বুঝতে পারল না ক্যাথেরিন।

পরদিন পোর্সেলিনের খুবই সুন্দর একটি পাখি ক্যাথেরিনকে পাঠিয়ে দিলেন ডেমিরিস।

এরপরে আরো দুবার ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা হল ক্যাথেরিনের। একবার ল্যারির সঙ্গে ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়ে, আরেকবার ডেমিরিসের ভিলায়, ক্রিসমাস পার্টিতে। প্রতিবারই তিনি ক্যাথেরিনের সঙ্গে মজা করলেন। ক্যাথেরিন ভাবল কনস্টানটিন ডেমিরিসের মতো মানুষই হয় না।

আগস্টে এথেন্স ফেস্টিভ্যাল শুরু হল। দু মাস ধরে নগরী মেতে রইল নাটক, ব্যালে, অপেরা কনসার্ট নিয়ে। ক্যাথেরিন ল্যারির সঙ্গে অনেক নাটক দেখল। সে কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন কাউন্ট পাপাস সঙ্গ দিল ক্যাথেরিনকে। একরাতে নাটক দেখে প্লাকা থেকে ওমোনিয়া স্কোয়ারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল দুজন। রাস্তা পার হচ্ছে, মোড় থেকে উদয় হল একটা গাড়ি, সোজা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল ওদের দিকে। পাপাস টান মেরে ফুটপাতে তুলে নিল ক্যাথেরিনকে। একটুর জন্য গাড়ি চাপা পড়ল না ও।

'ইডিয়েট!' অপসৃয়মাণ গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মুখ খিঁচাল কাউন্ট পাপাস।

'এখানকার সবাই একরম বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়,' মন্তব্য করল ক্যাথেরিন।

'কারণটা কী জানো?' বলল পাপাস, 'গ্রিকরা এখনো যান্ত্রিক গাঁড়িতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। এরা গাড়ি চালানোর সময় ভাবে গাধা চরাচ্ছে।'

ওরা স্কোয়ারে চলে এল। ছোট ছোট দোকানের জানালার সাইনবোর্ড নজর কাড়ল ক্যাথেরিনের। ওতে লেখা : 'এখানে ভাগ্য গণনা করা হয়'।

'এদিকে জ্যোতিষীদের ছড়াছড়ি, না?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'আমরা কুসংস্কারে খুব বিশ্বাস করি তো তাই।' জবাব দিল পাপাস।

ক্যাথেরিন বলল, 'আমি অবশ্য এসব বিশ্বাস করি না।'

ছোট একটি পানশালার সামনে চলে এল ওরা। জানালায় হাতে লেখা : **মাদাম পিরিস, গণক।**

'ডাইনি বিশ্বাস করো তুমি?' জিজ্ঞেস করল কাউন্ট পাপাস। পাপাস ঠাট্টা করছে কিনা দেখতে মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন। কিন্তু পাপাসের চেহারা সিরিয়াস। 'শুধু হ্যালোউন উৎসবে।'

'আমি ঝাড়ু হাতে, কালো বেড়াল আর টগবগে জল ভরা কেটলিঅলা ডাইনির কথা বলছি না।'

'মানে?'

সাইনবোর্ডে ইঙ্গিত করল পাপাস। 'মাদাম পিরিস একজন ডাইনি। সে অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে।'

ক্যাথেরিনের চেহারায় সন্দেহ ফুটেছে দেখে যোগ করল পাপাস, 'তোমাকে একটা গল্প বলি। বহুদিন আগে এথেন্সের পুলিশ প্রধান ছিল সফোক্লিস ভ্যাসিলি। সে ছিল আমার বন্ধু। আমি প্রভাব খাটিয়ে চাকরিটা ওকে পাইয়ে দিই। ভ্যাসিলি খুব সৎমানুষ ছিল। অনেকেই তাকে দুর্নীতির মধ্যে জড়াতে চেয়েছে কিন্তু তাদের ফাঁদে পা দেয়নি ভ্যাসিলি। শেষে ওরা ভ্যাসিলিকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার মতলব আঁটে।' ক্যাথেরিনের হাত ধরে রাস্তা পার হল সে, এগোল একটা পার্কের দিকে।

'একদিন ভ্যাসিলি এসে আমাকে বলল ওকে একজন জানের হুমকি দিয়েছে। ভ্যাসিলি সাহসী মানুষ হলেও এই হুমকি ওকে ভয় পাইয়ে দেয়। কারণ প্রভাবশালী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির এক কালোবাজারি জানের ভয় দেখিয়েছিল তাকে। কালোবাজারির ওপর নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়া হয়, তারা ভ্যাসিলিকেও পাহারা দিতে থাকে। তবু ভ্যাসিলির মন থেকে দূর হচ্ছিল না ভয়। একধরনের অস্বস্তি কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে। ভাবছিল আর বেশিদিন আয়ু নেই তার। ওই সময় একদিন আমার কাছে আসে সে।'

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল ক্যাথেরিন। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর তুমি কী করলে?'

'আমি ওকে মাদাম পিরিসের কাছে যেতে বললাম,' নীরব হয়ে গেল পাপাস, মন চলে গেছে সুদূর অতীতে।

'উনি গেলেন সেখানে?' প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন।

'কী? ও, হ্যাঁ। পিরিস বলল আকস্মিক এবং দ্রুত মৃত্যু হবে ভ্যাসিলির।

দুপুরবেলার সিংহ সম্পর্কে সাবধান করে দিল সে। গ্রিসে চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও সিংহ নেই। আর কয়েকটা পাথুরে সিংহ আছে ডেলোস-এ।'

পাপাসের কণ্ঠে কেমন উত্তেজনা টের পেল ক্যাথেরিন।

'ভ্যাসিলি চিড়িয়াখানায় বুড়ো সিংহগুলোকে দেখতে গেল। খাঁচায় ওরা ঠিকমতো বন্দি আছে কিনা দেখে এল। খবর নিল এথেন্সে সম্প্রতি কোনো বুনো জানোয়ার নিয়ে আসা হয়েছে কিনা। জানা গেল আনা হয়নি।

'এক হপ্তা চলে গেল। ঘটল না কিছুই। ভ্যাসিলি ভাবতে শুরু করল বুড়ি ডাইনি খামোকাই একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেছে বলে নিজেকে তার খুব বোকা লাগল। সে বুড়ির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

'এক শনিবারের সকালে আমি থানায় গেলাম ভ্যাসিলিকে নিয়ে আসতে। ওদিন ওর ছেলের চতুর্থ জন্মদিন। আমরা নৌকা চড়ে ফাইরন-এ যাব স্ফূর্তি করতে।

'আমি থানার সামনে গাড়ি থামিয়েছি, ঠিক তখন টাউন হলের ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বাজল দুপুর বারোটা। থানায় ঢুকতে যাচ্ছি, ভবনের ভেতর থেকে ভেসে এল প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ। আমি একছুটে ঢুকে পড়লাম ভ্যাসিলির অফিসে।'

পাপাসের কণ্ঠ আড়ষ্ট এবং বিকৃত শোনাল। 'অফিসের কোনো চিহ্ন ছিল না—ভ্যাসিলিরও।'

'কী ভয়ংকর!' বিড়বিড় করল ক্যাথেরিন।

ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল। 'কিন্তু ডাইনির ভবিষ্যদ্বাণী তো ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'ওকে তো সিংহ হত্যা করেনি।'

'তোমাকে বলেছি ভ্যাসিলির ছেলের জন্মদিন ছিল সেদিন। ভ্যাসিলির ডেস্ক বোঝাই হয়ে গিয়েছিল নানান উপহারে। উপহারগুলো ছেলের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল ভ্যাসিলি। একজন একটা উপহার দিয়েছিল। একটা খেলনা। ভ্যাসিলির ডেস্কে ছিল ওটা।'

ক্যাথেরিনের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। 'খেলনা সিংহ।'

মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট পাপাস। 'হ্যাঁ। মাদাম পিরিস বলেছিল দুপুরের সিংহ থেকে দূরে সরে থাকতে।'

শিউরে উঠল ক্যাথেরিন, 'আমার গা শিরশির করছে।'

ওর দিকে তাকাল পাপাস, 'সেজন্যই তো বললাম মাদাম পিরিস সাধারণ কোনো গণক নয়।'

পার্ক পার হয়ে ওরা পিরাইডস স্ট্রিটে চলে এল। খালি একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। হাত তুলে ওটাকে থামাল পাপাস। দশ মিনিট পরে বাড়ি ফিরল ক্যাথেরিন।

রাতে ল্যারিকে গল্পটা বলল ক্যাথেরিন। আবার ছমছম করে উঠল গা। ল্যারি ওকে শক্ত করে জড়িয়ে থাকল। প্রেম করল ওরা। তবে সে রাতে অনেকক্ষণ ঘুম এল না ক্যাথেরিনের চোখে।

নোয়েল ও ক্যাথেরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

১৫

নোয়েল পেজ না থাকলে দুশ্চিন্তাহীন চমৎকার জীবন-যাপন করতে পারত ল্যারি ডগলাস। চাকরিটা তার পছন্দের। যে-সব লোকজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এদেরকেও সে পছন্দ করে, যার সঙ্গে সে কাজ করছে তিনিও ওর পছন্দের মানুষ। অবসরে দারুণ সময় কেটে যায় ল্যারির ক্যাথেরিনের সঙ্গে। তবে ল্যারির কাজটা ঘরের মধ্যে বসে নয় বলে ক্যাথেরিন জানে না তার স্বামী কখন, কোথায় যাচ্ছে। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর যথেচ্ছ স্বাধীনতা ভোগ করে ল্যারি। সে কাউন্ট পাপাস এবং পল মেটাক্সাসের সঙ্গে পার্টিতে যায়। গ্রিক নারীদের মধ্যে আছে আবেগ এবং আগুন। হেলেনা নামে এক স্টুয়ার্ডসের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে ল্যারির। হেলেনা ডেমিরিসের কর্মচারী। এথেন্স থেকে দূরে এক স্টপওভারে একবার ল্যারির সঙ্গে সে এক হোটেলে রাত কাটিয়েছে। হেলেনা সুন্দরী, স্লিম, কালো চোখের প্রচণ্ড কামুকী এক মেয়ে। সবকিছু বিবেচনা করলে ল্যারি মনে করে তার জীবনে কোনো ঝামেলা নেই।

শুধু ডেমিরিসের স্বর্ণকেশী রক্ষিতা মাগীটা ছাড়া।

নোয়েল পেজ কেন তাকে ঘৃণা করে সে-ব্যাপারে সামান্যতম ধারণাও নেই ল্যারির। তবে মহিলার ঘৃণা তার জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ল্যারি তার সঙ্গে বিনয়ী, নম্র, উদাসীন, বন্ধুত্বপূর্ণ সবরকম আচরণ করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই নোয়েল পেজ তাকে অপদস্থ করে ছেড়েছে। ল্যারি ডেমিরিসের কাছে নালিশ জানাতে পারে। কিন্তু এরপরে কী ঘটবে তাও তার জানা। চাকরি ঘ্যাচাং! দুবার নোয়েলের ফ্লাইটের ভার পল মেটাক্সাসের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল ল্যারি। প্রতিবারই ডেমিরিসের সেক্রেটারি ফোন করে বলেছে মি. ডেমিরিস চান ল্যারি নিজে প্লেন চালাবে।

শেষ নভেম্বরের এক ভোরবেলা ল্যারি ফোন পেল। বলা হল বিকেলে নোয়েল পেজকে আমস্টারডাম পৌঁছে দিতে হবে। ল্যারি এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানল আমস্টারডামের আবহাওয়া বিরূপ আচরণ করছে। শহরে কুয়াশা।

বিকেল নাগাদ কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না বলে তাদের আশঙ্কা। ল্যারি ডেমিরিসের সেক্রেটারিকে ফোনে জানাল আজ আমস্টারডাম যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। পনেরো মিনিট পরে সেক্রেটারি বলল আজই নোয়েল পেজকে নিয়ে আমস্টারডাম যেতে হবে ল্যারিকে। মিস পেজ দুটোর সময় বিমানবন্দরে হাজির হয়ে যাবেন। আবার এয়ারপোর্টে ফোন করল ল্যারি। আশা করল ইতোমধ্যে কিছুটা হলেও কুয়াশা কেটে যাবে। কিন্তু ওয়েদার রিপোর্টে কোনো পরিবর্তন নেই। ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে আমস্টারডামের আকাশ।

'জেসাস ক্রাইস্ট,' আর্তনাদ ছাড়ল পল মেটাক্সাস, 'ভদ্রমহিলার মাথাটাথা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি! এমন আবহাওয়াতেও ওখানে যেতে চাইছে?'

তবে ল্যারি বুঝতে পারছিল আমস্টারডাম মূল ইস্যু নয়। আসল ঘটনা হল দুজনের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির প্রতিযোগিতা। ল্যারি চিন্তা করল নোয়েল পেজকে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় আছড়ে পড়লে কেমন হয়। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তা। নির্বোধ মাগীর জন্য আত্মহত্যার কোনো মানে নেই। পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে ডেমিরিসকে ফোন করল ল্যারি। বস্ মিটিঙে ব্যস্ত, জানাল সেক্রেটারি, এখন কথা বলা যাবে না। ল্যারি ঠাস করে নামিয়ে রাখল ফোন। এয়ারপোর্টে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে দেড়টায় হাজির হল বিমাবন্দরে। তিনটার সময়ও নোয়েল পেজ এল না দেখে মেটাক্সাস মন্তব্য করল, 'সম্ভবত আজ যাচ্ছেন না উনি।'

কিন্তু ল্যারি জানত আসবে নোয়েল। সময় যত বয়ে যাচ্ছে, রাগ তত বাড়ছে ওর। বুঝতে পারছিল ইচ্ছে করে দেরি করছে মহিলা। রাগিয়ে দিতে চাইছে ল্যারিকে যাতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে চাকরিটা খুইয়ে ফেলে ও। ল্যারি টার্মিনাল বিল্ডিঙে এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময় ডেমিরিসের ধূসর রঙের রোলস রয়েস এসে থামল বিল্ডিঙের সামনে। বেরিয়ে এল নোয়েল পেজ। ল্যারি হেঁটে গেল তার কাছে।

'আজকের যাত্রা বোধহয় বাতিল করতে হবে, মিস পেজ,' গলার স্বর নিরাসক্ত রাখল ল্যারি, 'আমস্টারডামের এয়ারপোর্ট কুয়াশায় ঢাকা।'

ল্যারির দিকে তাকাল না পর্যন্ত নোয়েল, যেন ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। পল মেটাক্সাসকে উদ্দেশ করে বলল, 'প্লেনে অটোমেটিক ল্যান্ডিং ইকুইপমেন্ট আছে না?'

'জি, আছে,' জবাব দিল পল।

'আমি জেনে সত্যি বিস্মিত,' বলল নোয়েল, 'যে মি. ডেমিরিস এক ডরপুক পাইলট ভাড়া করেছেন। আমি বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

ঘুরল নোয়েল, হাঁটা দিল প্লেনের উদ্দেশে। মেটাক্সাস তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জেসাস ক্রাইস্ট! জানি না ওর কী হয়েছে। এরকম আরচণ করতে কখনো দেখিনি ওকে। আমি দুঃখিত, ল্যারি।'

ল্যারি দেখছে এয়ারফিল্ড ধরে হেঁটে যাচ্ছে নোয়েল, বাতাসে উড়ছে সোনালি

চুল। এমন ঘৃণা হচ্ছে তার মহিলার প্রতি!

মেটাক্সাস ল্যারিকে বলল, 'আমরা কি যাচ্ছি?'

'যাচ্ছি।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কো-পাইলট, দুই পুরুষ ধীরপায়ে এগোল প্লেনের দিকে।

নোয়েল পেজ কেবিনে বসে অলস ভঙ্গিতে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। ওরা ভেতরে ঢুকল। ল্যারি বিষদৃষ্টি নিয়ে নোয়েলকে দেখল। তারপর ঢুকে পড়ল ককপিটে, প্রিফ্লাইট চেক শুরু করল।

দশ মিনিট পরে ক্লিয়ারেন্স পেল সে টাওয়ার থেকে। আকাশে উড়ল বিমান। চলল আমস্টারডামের উদ্দেশে।

যাত্রার প্রথম অর্ধাংশে ঘটল না কিছুই। সুইটজারল্যান্ডকে ওপর থেকে মনে হল বরফে ঢাকা স্বর্গরাজ্য। জার্মানির কাছাকাছি পৌঁছুতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল। ল্যারি আবহাওয়ার খবর জানতে আমস্টারডাম এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ওরা জানাল উত্তরসাগর থেকে ভেসে আসছে কুয়াশা, ক্রমে ঘন হয়ে উঠছে। নিজের দুর্ভাগ্যকে শাপান্ত করল ল্যারি। ওকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমস্টারডামে ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং করবে নাকি বিকল্প কোনো বিমানবন্দরে উড়ে যাবে। মহামান্য যাত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল ল্যারি। জানে নোয়েল অপমানসূচক কথা বলে ওর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।

'স্পেশাল ফ্লাইট এয়ার-ওহ্-নাইন, তোমাদের ফ্লাইট প্ল্যান জানাবে দয়া করে?' মিউনিখ টাওয়ার থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ল্যারিকে। সে এখনো ব্রাসেলস, কোলন কিংবা লুক্সেমবার্গে অবতরণ করতে পারে।

অথবা আমস্টারডামে।

স্পিকারে খনখন করে উঠল আগের কণ্ঠ, 'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন, তোমাদের ফ্লাইট প্ল্যান জানাও প্লিজ।'

ল্যারি থাবড়া মারল ট্রান্সমিটিং কীতে, 'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন টু মিউনিখ। আমরা আমস্টারডাম যাচ্ছি।' ও অফ করে দিল সুইচ।

'জেসাস,' বলল পল মেটাক্সাস, 'আমার লাইফ ইনসিওরেন্স দ্বিগুণ করা উচিত ছিল। আমরা সত্যি নামতে পারব বলে মনে করো?'

'সত্যি জানতে চাও?' তেতো গলা ল্যারির। 'কোনো আশা দেখছি না আমি।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মেটাক্সাস। 'দুই ফাকিং ম্যানিয়াকের কবলে পড়েছি আমি!'

পরবর্তী ঘণ্টাটা প্লেন চালানো ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দিল না ল্যারি। কোনো মন্তব্য ছাড়াই ঘনঘন শুনে গেল ওয়েদার রিপোর্ট। আশা করছে বাতাসের

গতি বদলে যাবে। কিন্তু আমস্টারডাম থেকে ওরা যখন আধঘণ্টার দূরত্বে তখনো একই তথ্য দিল আবহাওয়ার খবর। প্রচণ্ড কুয়াশা। ইমার্জেন্সি ছাড়া অন্য সমস্ত এয়ারট্রাফিক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ল্যারি আমস্টারডামে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন টু আমস্টারডাম টাওয়ার। অ্যাপ্রোচিং এয়ারপোর্ট ফ্রম সেভেনটি ফাইভ মাইলস ইস্ট অভ কোলন, ইটি এ নাইনটিন হাড্রেড আওয়ারস।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রেডিওতে খ্যাকখ্যাক করে উঠল একটা কণ্ঠ। 'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন। আমরা এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছি। তোমরা কোলনে ফিরে যাও অথবা ব্রাসেলসে ল্যান্ড করো।'

ল্যারি হ্যান্ডমাইকে বলল, 'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন টু আমস্টারডাম টাওয়ার। নেগেটিভ। উই হ্যাভ অ্যান ইমার্জেন্সি।'

স্পিকারে ভেসে এল নতুন কণ্ঠ, 'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন, আমস্টারডামের চিফ অব অপারেশন্স বলছি। এখানে পুরোটাই কুয়াশায় ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার বলছি : কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তোমাদের ইমার্জেন্সির ধরন কীরকম?'

'আমাদের ফুয়েল শেষ হয়ে যাচ্ছে,' বলল ল্যারি, 'বড়জোর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করা পর্যন্ত ফুয়েল থাকবে।'

মেটাক্সাস ফুয়েল গজে চোখ বুলাল। এখনো অর্ধেক ফুয়েল আছে। 'ফর ক্রাইস্টস শেক,' বিস্ফোরিত হল সে, 'যে ফুয়েল আছে তা দিয়ে চীন পর্যন্ত যাওয়া যাবে।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। একটু পরেই সরব হল।

'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট-ওহ্-নাইন। তোমাদেরকে ইমার্জেন্সি ক্লিয়ারেন্স দেয়া হল। তোমরা নামতে পারো।'

'রজার,' সুইচ অফ করে দিল ল্যারি, ফিরল মেটাক্সাসের দিকে। 'ফুয়েল ফেলে দাও,' হুকুম করল সে।

ঢোক গিলল মেটাক্সাস, কথা বলার সময় বিকৃত শোনাল কণ্ঠ। 'ফে-ফেলে দেব ফুয়েল?'

'যা বললাম শুনেছ তো, পল। এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার মতো ফুয়েল রেখে বাকিটা ফেলে দাও।'

'কিন্তু ল্যারি...'

'আহ্, তর্ক কোরো না। আধ-ট্যাঙ্ক-ভরা গ্যাস নিয়ে ওখানে নামলে ওরা এত দ্রুত আমাদের লাইসেন্স কেড়ে নেবে তুমি জানতেও পারবে না কিসে আঘাত করল তোমাকে।'

চেহারা অন্ধকার করে মাথা ঝাঁকাল মেটাক্সাস। হাত বাড়াল ফুয়েল-ইজেকশন

হাতলের দিকে। পাম্প শুরু করল, তীক্ষ্ণ একটা চোখ গজের দিকে। পাঁচ মিনিট কুয়াশার রাজ্যে প্রবেশ করল ওরা। সাদা নরম কাপড়ে মোড়ানো কুয়াশা সবকিছু গ্রাস করেছে। গা কেমন ছমছম করে উঠল ওদের। ওরা যেন বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। ইশ্, পেছনের যাত্রী যদি ভয় পেয়ে হার্ট-অ্যাটাক করত বেশ হত, ভাবল ল্যারি। আমস্টারডাম কন্ট্রোল টাওয়ার আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল।

'আমস্টারডাম কন্ট্রোল টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন। আমি যা বলি ঠিক সেভাবে কাজ করবে।' তোমরা আমাদের রাডারে আছ। পশ্চিমে তিন ডিগ্রি ঘুরে যাও এবং নতুন নির্দেশনা না-পাওয়া পর্যন্ত বর্তমান উচ্চতায় উড়তে থাকো। তোমাদের বর্তমান এয়ার স্পিড অনুযায়ী তোমরা আর আঠারো মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করবে।'

রেডিওতে কণ্ঠ আড়ষ্ট শোনাল। স্বাভাবিক, ভাবল ল্যারি। সামান্য ভুল হলেই প্লেন সোজা সাগরে আছড়ে পড়বে। সে প্লেনটাকে এমনভাবে উড়িয়ে নিয়ে চলল যেন এটা তার শরীরের একটা অংশ। পল মেটাক্সাস তার পাশে বসে দরদর করে ঘামছে, সে-ব্যাপারে ল্যারি সচেতন নয় বললেই চলে। ল্যারি এমন কুয়াশা জীবনেও দেখেনি। এ যেন এক ভৌতিক শত্রু, চারদিক থেকে ওকে হামলা করছে, ওকে অন্ধ করে দিচ্ছে, ভুল করতে প্রলুব্ধ করছে। ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল বেগে আকাশ চিরে উড়ে চলেছে ল্যারি। ককপিটের উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কুয়াশার ব্যাপারে পাইলটদের প্রথম নিয়ম হল : ওটার ওপর দিয়ে যাও অথবা নিচ দিয়ে কেটে পড়ো, কুয়াশা থেকে তোমাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। কিন্তু ঘন এই কুয়াশা চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, বেরুবার পথ নেই। অসহায় বোধ করছে ল্যারি। ইন্সট্রুমেন্টের দয়ার ওপর নির্ভর করছে ওদের জীবন। যন্ত্র ভুল করতে পারে, টাওয়ারের মানুষের ভুল হতে পারে। স্পিকারে ভৌতিক কণ্ঠটা ভেসে এল আবার নতুন নার্ভাসনেস নিয়ে।

'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-ওহ্-নাইন। ইউ আর কামিং ইন টু দ্য ফার্স্ট লেগ অব ইয়োর ল্যান্ডিং প্যাটার্ন, লোয়ার ইয়োর ফ্ল্যাপস অ্যান্ড বিগিন ইয়োর ডিসেন্ট। দু'হাজার ফিটে নেমে এসো... পনেরোশো ফিট... এক হাজার ফিট...

নিচে এয়ারপোর্টের এখনো চিহ্ন নেই।

'এয়ার স্পিড কমিয়ে একশো কুড়িতে নিয়ে এসো... চাকা নামাও... তোমরা এখন মাটি থেকে ছয়শো ফিট ওপরে আছ... এয়ার স্পিড একশো করো... তোমরা এখন চারশো ফিট ওপরে আছ...' এখনো হারামজাদা এয়ারপোর্ট দেখতে পাচ্ছে না ল্যারি! কুয়াশার চাদরটাকে আরো ঘন লাগছে।

মেটাক্সাসের কপাল চকচক করছে ঘামে। 'শুয়োরের বাচ্চাটা কই?' ফিসফিস করল সে।

অলটিমিটারে চট করে একবার চোখ বুলাল ল্যারি। নিড্‌ল্ তিনশো ফিটে

নেমে যাচ্ছে। তারপর তিনশো ফিটের নিচে। প্লেনের গতি এখন ঘণ্টায় একশো মাইল। অলটিমিটার দেড়শো ফিট শো করছে। কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। এতক্ষণে এয়ারপোর্টের আলো চোখে পড়ার কথা। কিন্তু উইন্ডশিল্ডের বাইরে চোখধাঁধানো কুয়াশা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মেটাক্সাস কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'আমরা মাটি থেকে আর মাত্র ষাট ফিট ওপরে আছি।'

'চল্লিশ ফিট।'

অন্ধকারে মাটির সঙ্গে সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে ওদের।

'কুড়ি ফিট।'

আর দুই সেকেন্ড। তারপরই ক্রাশ করবে প্লেন। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ল্যারিকে।

'আমি ফিরে যাচ্ছি,' বলল ও। হুইলে শক্ত হল মুঠো, ওটাকে পেছনে টান দেবে, ঠিক তখন ওদের সামনে ফুটে উঠল সারি সারি বৈদ্যুতিক তীর, আলোকিত করে তুলল নিচের রানওয়ে। দশ সেকেন্ড পরে মাটিতে নেমে পড়ল ওরা, দৌড় শুরু করল শিফল টার্মিনাল অভিমুখে।

প্লেন থামল। ভোঁতা আঙুল দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল ল্যারি। অনেকক্ষণ নিজের আসনে বসে রইল নিশ্চল। অবশেষে সিধে হল। অবাক হল দেখে ওর হাঁটু কাঁপছে থরথর করে। বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধ। মেটাক্সাসের দিকে ঘুরল ও। লাজুক হাসল মেটাক্সাস।

'সরি,' বলল ও, 'ভয়ে হিসু করে ফেলেছি।'

ল্যারি মাথা ঝাঁকাল, পা বেরিয়ে এল ককপিট থেকে। ঢুকল কেবিনে। মাগী দিব্যি বসে আছে। এখনো পত্রিকা পড়ছে। নোয়েল পেজ নিশ্চয় জানে মৃত্যুকে একচুলের জন্য ফাঁকি দিতে পেরেছে ওরা। অথচ চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই।

'আমস্টারডাম,' ঘোষণা করল ল্যারি।

চেপে বসা নীরবতার মাঝ দিয়ে ওরা আমস্টারডামের রাস্তায় চলেছে। মার্সিডিস ৩০০'র পেছনের আসনে বসেছে নোয়েল পেজ, ল্যারি সামনে, ড্রাইভারের পাশে। প্লেনের সার্ভিসিং-এর জন্য এয়ারপোর্টে থেকে গেছে মেটাক্সাস। কুয়াশা এখনো ঘন। ধীরগতিতে চলছে গাড়ি। ওরা লিন্ডেনপ্লাকে পৌঁছার পরে আকস্মিকভাবে পাতলা হতে শুরু করল কুয়াশা।

সিটি স্কোয়ার ধরে চলল ওরা, আমস্টেল নদীর উপরে এইডার ব্রিজ পার হল, থামল আমস্টেল হোটেলের সামনে। লবিতে পৌঁছে নোয়েল ল্যারিকে বলল, 'আমাকে কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় নিয়ে যাবে।' ঘুরল সে, পা বাড়াল এলিভেটরের দিকে। হোটেল ম্যানেজার ওকে দেখে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল, অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে খটাশ করে দাঁড়িয়ে গেল দুই পায়ের ওপর। বেলবয়

দোতলায়, হোটেলের পেছনদিকে একটি সিঙ্গল রুমে নিয়ে এল ল্যারিকে। রুমের পাশেই রান্নাঘর। দেয়ালের ওপাশ থেকে খন্তা-কড়াইর ঝনঝন শব্দ ভেসে আসছে, বাতাসে মশলার গন্ধ।

ল্যারি অস্বস্তিকর ছোট ঘরটিতে এক নজর বুলিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এ ঘরে তো আমি আমার কুকুরও রাখব না।'

'আমি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল বেলবয়, 'মিস পেজ আপনাকে হোটেলের সবচে' সস্তা রুমটি দিতে বলেছেন।'

ঠিক আছে, ভাবল ল্যারি, *ওকে আমি দেখে নেব। কনস্টানটিন ডেমিরিসই একমাত্র মানুষ নয় যে প্রাইভেট পাইলট ব্যবহার করে। কাল থেকেই চাকরি খুঁজতে শুরু করব। ডেমিরিসের বহু ধনীবন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। এদের মধ্যে অন্তত আধডজন আমার মতো পাইলট পেলে বর্তে যাবেন। তবে, ভাবল ও, ডেমিরিস যদি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন তাহলে কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।*

ল্যারি হোটেল বার-এ গেল। ড্রিঙ্কের জন্য আইঢাই করছে প্রাণ। তিন নম্বর মার্টিনি শেষ করার পরে ঘড়ির দিকে চোখ গেল ওর। সোয়া দশটা বাজে। মহিলা বলেছে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় তার ঘরে যেতে। হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল ল্যারি। বার-এর লোকটার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিয়ে দ্রুত পা বাড়াল এলিভেটর অভিমুখে। নোয়েল পাঁচতলার এমপেরর স্যুইটে উঠেছে। লম্বা করিডর ধরে ছুটতে শুরু করল ল্যারি। স্যুইটের সামনে এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়ল দরজায়। কেউ সাড়া দিল না। নব ঘোরাল ল্যারি। খুলে গেল দরজা। প্রকাণ্ড, সাজানো গোছানো বিলাসবহুল লিভিংরুমে ঢুকল ল্যারি। দাঁড়িয়ে থাকল একমুহূর্ত। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মিস পেজ।' কোনো জবাব নেই। তাহলে এরকম পরিকল্পনাই করেছে সে! ডেমিরিসকে গিয়ে বলবে, *আমি দুঃখিত, কোস্টা ডার্লিং, তোমাকে আগেই বলেছিলাম ওর ওপর ভরসা করা যায় না। ওকে দশটার সময় আসতে বলেছিলাম। কিন্তু সে বার-এ গিয়েছিল মদ খেয়ে মাতাল হতে। বাধ্য হয়ে একা আসতে হয়েছে আমাকে।*

বাথরুমে কিসের শব্দ হল। ল্যারি পা বাড়াল ওদিকে। বাথরুমের দরজা খোলা। ল্যারি ভেতরে ঢুকল, ঠিক তখন শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল নোয়েল পেজ। মাথায় শুধু টার্কিশ তোয়ালে জড়ানো, এছাড়া বাকি শরীর সম্পূর্ণ নগ্ন।

নোয়েল ঘুরতেই দেখতে পেল ল্যারিকে। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিল ল্যারি, কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই নোয়েল হুকুম করল, 'ওই তোয়ালেটা দাও।' যেন ল্যারি তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। অথবা খোজা। নোয়েলের রাগ কিংবা ঘৃণা সহ্য করতে পারে ল্যারি কিন্তু উদ্ধত উন্নাসিকতা এবং অবহেলা ওর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। ওর ভেতরে কিছু একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

নোয়েলের দিকে এগিয়ে গেল ল্যারি, খপ করে দুহাতে চেপে ধরল ওকে,

জানে প্রতিশোধের নেশায় সস্তা তৃপ্তি পেতে সে যা করছে তা ওর সবকিছু ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে পারেনি ল্যারি। দীর্ঘদিন ধরে মনের ভেতরে পুষে রাখা ক্রোধ, নোয়েলের প্রচণ্ড অপমানের আচরণ ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল। নোয়েল চিৎকার দিলে ওকে ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে ফেলত ল্যারি। কিন্তু ল্যারির চোখের বুনোদৃষ্টি ওকে চুপ করিয়ে রাখল। ল্যারি নোয়েলকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল বেডরুমে।

ল্যারির মনের কোথাও একটা কণ্ঠ চিৎকার করে ওকে থামতে বলছিল, বলছিল নোয়েলের কাছে ক্ষমা চাইতে, বলতে সে মাতাল হয়ে এমন কাণ্ড করে ফেলেছে। কিন্তু ল্যারি জানে দেরি যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। নোয়েলকে দড়াম করে বিছানায় ফেলল ল্যারি। এগোল ওর দিকে।

নোয়েলের শরীরে মনোনিবেশ করল ল্যারি, ভুলে যেতে চাইল সে যা করছে তার জন্য কী মারাত্মক শাস্তি অপেক্ষা করছে। সে জানে ডেমিরিস ওকে চাকরিচ্যুত করেই ক্ষান্ত হবেন না, গ্রিক টাইকুনের প্রতিশোধ হবে আরো ভয়ংকর। এসব জেনেও নিজেকে থামাতে পারছে না ল্যারি। নোয়েল বিছানায় শুয়ে আছে , আগুন জ্বলছে চোখে। ওর শরীরের ওপর উঠে এল ল্যারি, প্রবেশ করল শরীরের ভেতরে। ল্যারি টের পেল ওর ঘাড় জড়িয়ে ধরেছে নোয়েল, টানছে নিজের দিকে, যেন ওকে ছাড়বে না, সে বলল, 'ওয়েলকাম ব্যাক।'

ল্যারির মনে হল মহিলা নির্ঘাত পাগল কিংবা ওকে কোনোভাবে বিভ্রান্ত করে তুলতে চাইছে। অবশ্য এসব নিয়ে আর ভাবতে চাইল না। কারণ তার নিচের শরীরটা মোচড় খেতে শুরু করেছে, সাড়া দিচ্ছে, ল্যারি সবকিছু ভুলে গেল। শুধু তীব্র শারীরিক সুখ ওকে স্বর্গে নিয়ে চলল এবং ল্যারির হঠাৎ মনে হল এবারে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নোয়েল ও ক্যাথেরিন
এথেন্স : ১৯৪৬

১৬

সময় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাথেরিনের। প্রথমে ব্যাপারটা টের পায়নি, পেছনে ফিরে তাকিয়ে বলতে পারল না সময় ঠিক কবে থেকে তার সঙ্গে বৈরিতা শুরু করেছে। তার প্রতি ল্যারির ভালোবাসা কীভাবে ম্লান হতে লাগল সে-ব্যাপারেও সচেতন ছিল না ক্যাথেরিন। অ্যাপার্টমেন্টে একা বসে চিন্তা করার চেষ্টা করে সে সমস্যাটা কোথায়।

ল্যারি কনস্টানটিন ডেমিরিসকে নিয়ে তিন হপ্তার সাফারিতে আফ্রিকা গিয়েছিল। ক্যাথেরিন ওকে খুব মিস করছিল। ও সবসময় বাইরে থাকে, ভাবে ক্যাথেরিন। সেই যুদ্ধের সময়ের মতো। তবে পার্থক্য হল এবারে কোনো শত্রু নেই।

ক্যাথেরিনের ধারণা ভুল। একজন শত্রু আছে।

'তোমাকে সুখবরটা তো দেয়াই হয়নি,' বলল ল্যারি। 'আমার বেতন বেড়েছে। এখন থেকে মাসে সাতশো ডলার। শুনে কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারব।' ল্যারির চেহারা শক্ত হয়ে গেছে দেখে প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

'এটাই বাড়ি,' কাঠখোট্টা গলা ল্যারির।

ওর দিকে বোকা-বোকা চোখে তাকাল ক্যাথেরিন, 'এখনকার জন্য ঠিক আছে,' দুর্বল গলায় সম্মতি জানাল ও, 'কিন্তু আমি মানে—তুমি সারাজীবন নিশ্চয় এখানে থাকবে না।'

'এরচে ভালো জায়গা কোথাও পাবে না তুমি,' আপত্তি করল ল্যারি। 'এখানে যেন ছুটি কাটাচ্ছি।'

'কিন্তু আমেরিকার মতো তো আর থাকতে পারছি না, তাই না?'

'জাহান্নামে যাক আমেরিকা,' বলল ল্যারি। 'চার বছর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য লড়াই করলাম। বিনিময়ে পেয়েছিটা কী? কতগুলো মেডেল। ওই

মেডেল যুদ্ধের পরে একটা চাকরি পর্যন্ত আমাকে জুটিয়ে দিতে পারেনি।'

'কথাটা ঠিক না,' বলল ক্যাথেরিন, 'তুমি...'

'আমি কী?'

ক্যাথেরিন ওর সঙ্গে তর্ক করতে চাইল না। কারণ এতদিন পরে ঘরে ফিরেছে মানুষটা। 'কিছু না, ডার্লিং,' বলল ও। 'তুমি ক্লান্ত, আজ একটু তাড়াতাড়ি শোবে চলো।'

'এখনই বিছানায় যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই,' গ্লাসে মদ ঢালল ল্যারি। 'আর্জেন্টিনা নাইট ক্লাবে নতুন নাটক শুরু হয়েছে। পল মেটাক্সাসকে বলেছি কজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যাব নাটক দেখতে। ও টিকেট করে রাখবে।'

ক্যাথেরিন ল্যারির দিকে তাকাল, 'ল্যারি—' কণ্ঠস্বর প্রাণপণে স্বাভাবিক রাখল। 'ল্যারি, অনেকদিন বাদে তুমি ঘরে ফিরেছ। আমরা অনেকদিন একসঙ্গে বসে গল্প করার সুযোগ পাই না।'

'কাজ থাকলে তো বাইরে যেতেই হবে,' বলল ল্যারি, 'আমারও কি ইচ্ছে করে না তোমার সঙ্গে থাকতে?'

মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, 'জানি না। ওইজা বোর্ডকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

ওকে জড়িয়ে ধরল ল্যারি, মুখে ফুটল সেই বিখ্যাত ছেলেমানুষি, নিষ্পাপ হাসি। 'মেটাক্সাস আর তার বন্ধুরা গোল্লায় যাক। আজ রাতে আমরা বাসায় থাকব। শুধু দুজনে, ঠিক আছে?'

ক্যাথেরিন স্বামীর মুখের দিকে চাইল। জানে একটু বেশি দাবি করে ফেলেছে। ল্যারির চাকরিটাই এরকম—বাইরে বাইরে থাকতে হয়। ও যখন বাড়ি ফিরবে, স্বভাবতই চাইবে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে, 'তুমি চাইলে আমরা বাইরেও যেতে পারি,' বলল ক্যাথেরিন।

'উঁহুঁ,' ওকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ল্যারি, 'আজ শুধু দুজনে দুজনার।'

গোটা সাপ্তাহিক ছুটিটা ওরা বাড়ি বসেই কাটিয়ে দিল। ক্যাথেরিন রান্না করল, ওরা প্রেম করল, আগুনের সামনে বসে গল্প করল, বই পড়ল। ক্যাথেরিন যা যা চেয়েছে তেমনটি ঘটল।

রোববার রাতে সুস্বাদু ডিনার শেষে ওরা বিছানায় গেল, প্রেম করল। ক্যাথেরিন শুয়ে শুয়ে দেখল বাথরুমে ঢুকল ল্যারি। নগ্ন। ক্যাথেরিন ভাবল তার স্বামী কত চমৎকার মানুষ, সে কত ভাগ্যবতী এমন একজন বর পেয়েছে। মিষ্টি হাসি ফুটল ক্যাথেরিনের অধরে। ল্যারি বাথরুমের দোরগোড়ায় উদয় হল, নিরাসক্ত গলায় বলল, 'সামনের হপ্তায় অনেকগুলো ডেট করবে, তাহলে এভাবে ঘরে বসে ফালতু সময় কাটাতে হবে না,' আবার বাথরুমে ঢুকে গেল সে। লক্ষ করল না ক্যাথেরিনের মুখ থেকে মুছে গেছে হাসি।

সমস্যার শুরু সুন্দরী গ্রিক স্টুয়ার্ডেস হেলেনাকে নিয়ে। গ্রীষ্মের এক উত্তপ্ত বিকেলে

ক্যাথেরিন কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল, ল্যারি শহরের বাইরে। ওইদিনই বাড়ি ফেরার কথা ল্যারির। ওর প্রিয় জিনিস রান্না করে ওকে অবাক করে দেবে ক্যাথেরিন। দুহাত ভর্তি মুদি সদয় নিয়ে দোকান থেকে বেরুচ্ছে ক্যাথেরিন, একটা ট্যাক্সি চলে গেল পাশ দিয়ে। ভেতরে, পেছনের সিটে স্টুয়ার্ডেসের ইউনিফর্ম পরা এক তরুণীকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে ল্যারি। ওদের হাসিমুখ একঝলক দেখতে পেল ক্যাথেরিন। ট্যাক্সি মোড় ঘুরে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাথেরিন। কয়েকটি ছোটছেলে ছুটে আসার পরে বুঝতে পারল তার অসাড় হাত থেকে মুদি সদয়ের প্যাকেটগুলো পড়ে গেছে। বাচ্চাগুলো ওকে তুলে দিল প্যাকেট, টলতে টলতে বাড়ি ফিরল ক্যাথেরিন। কিছুই ভাবতে পারছে না। মনকে বোঝাতে চাইছে চোখে ভুল দেখেছে সে, ওটা ল্যারি ছিল না, ল্যারির মতো কেউ। কিন্তু সত্য এটাই ল্যারির মতো পুরুষ দ্বিতীয়টি নেই পৃথিবীতে। ল্যারি অদ্বিতীয়, ঈশ্বরের নিজের সৃষ্টি, প্রকৃতির এক অমূল্য অবদান। সে ওর। ওর এবং ট্যাক্সির ওই কৃষ্ণকেশীর এবং আরো কতজনের?

সারারাত ল্যারির অপেক্ষায় জেগে রইল ক্যাথেরিন। কিন্তু সে বাড়ি ফিরল না। ও জানে ল্যারি এমন কোনো অজুহাত দিতে পারবে না যেটা ওদের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারে। ল্যারি একটা মিথ্যাবাদী, প্রতারক। এর সঙ্গে আর কিছুতেই ঘর করতে পারবে না ক্যাথেরিন।

ল্যারি সেদিন বিকেলের আগে ফিরল না।

'হাই,' খুশি-খুশি গলায় বলল সে। ফ্লাইট ব্যাগ নামিয়ে রাখল মেঝেতে। ক্যাথেরিনের শুকনো চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'শহরে ফিরেছ কখন?' শক্ত গলায় প্রশ্ন করল ক্যাথেরিন। বিস্মিত দেখাল ল্যারিকে। 'ঘণ্টাখানেক আগে। কেন?'

'গতকাল ট্যাক্সিতে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখেছি তোমাকে,' বলল ক্যাথেরিন। ভাবল, *ল্যারি নিশ্চয় অস্বীকার করবে, সে ল্যারিকে মিথ্যাবাদী বলে চলে যাবে ঘর ছেড়ে। আর কোনোদিন ওর মুখ দেখবে না।*

ল্যারি স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ক্যাথেরিনকে।

'বলো,' বলল ক্যাথেরিন, 'বলো যে ওটা তুমি ছিলে না।'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি, 'অবশ্যই ওটা আমি ছিলাম।' কেউ খামচে ধরল ক্যাথেরিনের পেট। ও আসলে মনেপ্রাণে চাইছিল ব্যাপারটা অস্বীকার করুক ল্যারি।

'ক্রাইস্ট,' বলল ল্যারি, 'তুমি কী ভাবছিলে?'

কথা বলার চেষ্টা করল ক্যাথেরিন, রাগে বুজে গেল গলা। 'আমি—'

একটা হাত তুলল ল্যারি, 'এমন কিছু বোলো না যাতে পরে তোমাকে পস্তাতে হয়।'

অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে গেল ক্যাথেরিনের, 'আমি পস্তাব! কিসের জন্য?'

'আমি গতকাল এথেন্সে এসেছিলাম পনেরো মিনিটের জন্য হেলেনা মেরেলিস নামে একটি মেয়েকে নিয়ে যেতে। ক্রিটে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ডেমিরিস। হেলেনা তাঁর স্টুয়ার্ডেস।'

'কিন্তু...' এটা সম্ভব। ল্যারি হয়তো সত্যিকথাই বলছে।

'আমাকে ফোন করলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'করেছিলাম,' নীরস গলায় বলল ল্যারি। 'জবাব পাইনি। তুমি বোধহয় বাইরে ছিলে। ছিলে না?'

ঢোক গিলল ক্যাথেরিন, 'আ-আমি তোমার জন্য বাজার করতে গিয়েছিলাম।'

'আমার খিদে পায়নি,' খেঁকিয়ে উঠল ল্যারি, 'সারাক্ষণ সন্দেহ আমার খিদে নষ্ট করে দেয়।' ঘুরল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে। ক্যাথেরিন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল, ডান হাতটা ওপরে তোলা, যেন নিঃশব্দে ল্যারিকে বলছে ফিরে আসতে।

কিছুক্ষণ পরে মদ খেতে শুরু করল ক্যাথেরিন। আশা করেছিল সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে ল্যারি, কিন্তু নটার মধ্যেও ও ফিরল না দেখে ব্রান্ডির বোতল খুলে বসল ক্যাথেরিন। মদ খেয়ে সময় কাটাবে।

দশটা বাজল। ইতোমধ্যে অনেকটা মদ পেটে গেছে ক্যাথেরিনের। তার এখন মনে হচ্ছে বিয়ের পর থেকে তার সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে ল্যারি। একদিন লন্ড্রিতে ল্যারির ইউনিফর্ম দেয়ার আগে ওতে শুকনো বীর্যের দাগ দেখতে পেল ক্যাথেরিন। আরেকদিন শর্টসে লিপস্টিকের দাগ দেখল সে।

ল্যারি এখন পরনারীর সঙ্গে ঘুমায়।

ওকে খুন করবে ক্যাথেরিন।

নোয়েল ও ক্যাথেরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

১৭

সময় ক্যাথেরিনের শত্রু হয়ে উঠছে, ল্যারির বন্ধু। নিজেকে তার রীতিমতো ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। নোয়েলের সঙ্গে আবার তার সাক্ষাৎ হয়েছে নানান ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে।

সে রাতে আমস্টারডামে নোয়েলের সঙ্গে উন্মাদের মতো প্রেম করার পরে নোয়েল ল্যারির বুকে মাথা রেখে বলেছিল, 'তুমি আমার। তুমি এখন আমার।'

তবে নোয়েলের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, অস্বস্তিবোধ করেছে ল্যারি। অবশ্য পরে ভেবেছে : আমার হারানোর কী আছে!

নোয়েলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারলে সে যদি চায় সারাজীবনের জন্য ডেমিরিসের সঙ্গে কাজ করতে পারবে।

নোয়েল অদ্ভুত দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল ল্যারিকে, যেন ওর মনের কথা পড়ে ফেলছিল। তার চোখের অদ্ভুত ভাষা বুঝতে পারেনি ল্যারি।

বুঝতে পারলে সতর্ক হয়ে যেত।

মরক্কো থেকে এক রিটার্ন ট্রিপে ল্যারি হেলেনাকে নিয়ে ডিনার করল। সারারাত কাটাল ওর অ্যাপার্টমেন্টে।

সকালে গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল ল্যারি তার প্লেন চেক করতে। লাঞ্চ করল পল মেটাক্সাসের সঙ্গে।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন লটারি জিতে এসেছ,' বলল মেটাক্সাস। 'আমাকে একটু ভাগ দাও না।'

'খোকা,' খিলখিল হাসল ল্যারি। 'তুমি এ জিনিস সামাল দিতে পারবে না। ওস্তাদেরাই কেবল এসব পারে।'

লাঞ্চ শেষে শহরে ফিরে চলল ল্যারি। হেলেনাকে নিয়ে আসবে। ও-ও এবারের ফ্লাইটে আছে।

হেলেনার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় অনেকক্ষণ নক করল ল্যারি। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। অবশেষে হেলেনা এসে খুলে দিল দরজা। নগ্ন। তার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ল্যারি। চেনা যাচ্ছে না হেলেনাকে। সুন্দর মুখখানা থেঁতলানো, ফুলে ঢোল ঠোঁট। চোখ কুঁচকে আছে ব্যথায়। কেউ প্রচণ্ড মেরেছে হেলেনাকে।

'ক্রাইস্ট!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যারি। 'কী হয়েছে?'

মুখ খুলল হেলেনা। ওর সামনের সারির তিনটা দাঁত নেই।

'দুজন লোক,' ফোঁপাচ্ছে হেলেনা, 'তুমি যাবার পরপরই ঢুকে পড়েছিল ঘরে।'

'তুমি পুলিশে খবর দাওনি?' জিজ্ঞেস করল আতঙ্কিত ল্যারি।

'ও-ওরা বলল কাউকে একথা বললে আমাকে খুন করে ফেলবে। ওরা সত্যি আমাকে খুন করে ফেলত ল-ল্যারি।' দরজা আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল হেলেনা।

'ওরা ডাকাতি করেছে?'

'ন্-না। আমাকে ধর্ষণ করেছে। তারপর—তারপর মেরেছে।'

'কাপড় পরে নাও,' বলল ল্যারি। 'আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

'আমি এই চে-চেহারা নিয়ে কোথাও যাব না,' বলল হেলেনা।

ল্যারি ওর এক ডাক্তারবন্ধুকে ফোন করল। বলল হেলেনার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসতে।

'দুঃখিত তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না,' হেলেনাকে বলল ল্যারি। 'আধঘণ্টার মধ্যে ডেমিরিসকে নিয়ে উড়াল দিতে হবে আকাশে। ফিরে এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

তবে হেলেনার সঙ্গে আর দেখা হল না ল্যারির। দুইদিন পরে এসে দেখল অ্যাপার্টমেন্ট খালি। বাড়িউলি জানাল চলে গেছে হেলেনা। কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি।

হেলেনার এ দুর্গতির কারণ নিয়ে ওইসময় ল্যারির মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি। তবে বেশ কিছুদিন পরে সে যখন নোয়েলের সঙ্গে প্রেম করছিল, তখন আভাস পেল আসলে কী ঘটেছিল।

'তুমি আসলেই ফ্যান্টাস্টিক,' বলল ল্যারি। 'তোমার মতো মেয়ে আমার জীবনে আসেনি।'

'তুমি যা চাও সব কি আমি দিতে পারি?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'অবশ্যই,' গুঙিয়ে উঠল ল্যারি, 'ওহ, ক্রাইস্ট, ইয়েস।'

নোয়েল ল্যারির শরীর নিয়ে একটা কাণ্ড করছিল। থেমে গিয়ে নরম গলায় বলল, 'তাহলে আর কখনো অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিছানায় যাবে না। যদি যাও ওই মেয়েকে খুন করব আমি।'

নোয়েলের কথাটা মনে পড়ে গেল ল্যারির : *তুমি আমার*। এই প্রথম সে

উপলব্ধি করল এটা আর দশটা সম্পর্কের মতো নয়, মস্তি-মৌজ করলাম, তারপর ছেড়ে দিলাম। নোয়েল পেজ এক ভয়ংকর নারী। ওকে ভয় লাগে ল্যারির। বেশ কয়েকবার হেলেনার প্রসঙ্গ তুলতে চেয়েও থেমে গেছে ও। কারণ আসল সত্যটা জানার সাহস পায়নি ল্যারি।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে নোয়েলকে লক্ষ করছিল ল্যারি। ওকে মোটেই নিষ্ঠুর এবং স্যাডিস্ট মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রেমময়ী অপূর্ব সুন্দরী এক নারী যে ল্যারির সমস্ত চাহিদা পূরণে সক্ষম। *আমি আসলে ওকে ভুল ভেবেছি।* ভাবে ল্যারি। তবে সে এখন অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ডেট করে না। নোয়েল তার কাছে এখন অবসেশনে পরিণত হয়েছে।

শুরুতেই নোয়েল ল্যারিকে সাবধান করে দিয়েছে ওদের সম্পর্কের কথা যেন কনস্টানটিন ডেমিরিস কোনোভাবেই জানতে না পারেন।

'আমাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের ফিসফাসও যেন না হয়,' সাবধান করেছে নোয়েল।

'একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করলেই পারি?' পরামর্শ দিয়েছে ল্যারি, 'ওখানে আমরা...'

ডানে বামে মাথা নেড়েছে নোয়েল। 'এথেন্সে বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব না। কারো-না-কারো চোখে পড়ে যাব। আমাকে ভাবতে দাও।'

দিনদুই পরে ডেমিরিসের দপ্তরে ডাক পড়ল ল্যারির। বুক শুকিয়ে গেল তার অমঙ্গলের আশঙ্কায়। গ্রিক টাইকুন কি নোয়েলের সঙ্গে তার সম্পর্ক টের পেয়ে গেছেন?

কিন্তু ডেমিরিস ওকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। নতুন একটা প্লেন কেনার চিন্তাভাবনা করছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করতে চান ল্যারির সঙ্গে।

'এটা একটা কনভার্টেড মিচেল বোম্বার,' বললেন ডেমিরিস, 'তুমি প্লেনটা একবার দ্যাখো।'

উজ্জ্বল দেখাল ল্যারির চেহারা, 'এটা খুব ভালো প্লেন। এর ওজন এবং আকার এমন যে চড়ে খুব আরাম পাবেন।'

'কতজন যাত্রী বহন করতে পারবে?'

একমুহূর্ত ভাবল ল্যারি, 'নয়জন। সেইসঙ্গে পাইলট, একজন নেভিগেটর এবং ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। এটা ঘণ্টায় চারশো আশি মাইল বেগে ওড়ে।'

'শুনে তো আগ্রহ বোধই করছি। একবার চেক করে দেখে আমাকে রিপোর্টটা দেবে?'

'প্লেনটা দেখার তর সইছে না আমার,' দাঁত বের করে হাসল ল্যারি।

আসন ছাড়লেন ডেমিরিস। 'ভালো কথা, ডগলাস। মিস পেজ সকালে বার্লিন যাচ্ছেন। তুমি ওকে পৌঁছে দাও।'

'জি, স্যার,' বলল ল্যারি। তারপর ভালোমানুষি চেহারা করে যোগ করল,

'মিস পেজ কি বলেছেন তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে?'

'না তো!' বিস্মিত গলায় বললেন ডেমিরিস, 'বরং আজ সকালেই তোমার আচরণ দুর্বিনীত বলে অভিযোগ করল।'

ল্যারি হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মনিবের দিকে। পরক্ষণে বুঝতে পারল নোয়েল কেন একথা বলেছে। সে ব্যাকুল গলায় বলল, 'আমি চেষ্টা করছি, মি. ডেমিরিস। আরো বেশি বেশি চেষ্টা করব।'

মাথা নাড়লেন ডেমিরিস, 'তাই ভালো। তুমি আমার দেখা সেরা পাইলট। ব্যাপারটা খুব লজ্জার হবে যদি...' কথা শেষ করলেন না তিনি। তবে যা বোঝার বুঝে নিল ল্যারি।

বাড়ি ফেরার পথে নোয়েলের কথা ভাবছিল ল্যারি। নোয়েল ডেমিরিসের কাছে তার বিরুদ্ধে ইচ্ছে করেই নালিশ করেছে। কারণ হঠাৎ প্রশংসা শুরু করলে গ্রিক টাইকুনের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। আগের সম্পর্কটা ওদের বর্তমান সম্পর্ক আড়াল করে রাখার জন্য যথার্থ কাভার। ডেমিরিস নোয়েলের সঙ্গে ওর সখ্য স্থাপন করতে চাইছেন। কথাটা মনে পড়তে হো হো করে হেসে উঠল ল্যারি। ভাবতে ভালোই লাগে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন মানুষ ল্যারির ভালো-মন্দ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

বার্লিন যাত্রার ফ্লাইটে ল্যারি পল মেটাক্সাসকে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে বলল সে কেবিনে যাচ্ছে নোয়েল পেজের সঙ্গে কথা বলতে।

'মাথা গুঁড়িয়ে যাওয়ার ভয় নেই?' জিজ্ঞেস করল মেটাক্সাস।

ইতস্তত করল ল্যারি, ইচ্ছে করল সত্যকথাটা জানিয়ে দেয়। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ও। 'প্লেনে উঠলে মহিলার মাথা খারাপ হয়ে যায়।' বলল ল্যারি। 'কিন্তু তার মাথা ঠিক রাখতে না পারলে আমার চাকরিই তো থাকবে না।'

'গুড লাক,' বলল মেটাক্সাস।

'ধন্যবাদ।'

ল্যারি সাবধানে বন্ধ করে দিল ককপিটের দরজা। চলে এল লাউঞ্জে। এখানে বসে আছে নোয়েল। দুই স্টুয়ার্ডেস ব্যস্ত প্লেনের পেছনের অংশে। ল্যারি নোয়েলের পাশে বসতে গিয়ে বাধা পেল।

'সাবধান,' মৃদু গলায় বলল নোয়েল, 'কনস্টানটিনের জন্য যারাই কাজ করে, সবার রিপোর্ট কিন্তু চলে যায় তাঁর কাছে।'

ল্যারি আড়চোখে স্টুয়ার্ডেসদেরকে দেখল। মনে পড়ে গেল হেলেনার কথা।

'একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি,' বলল নোয়েল। কণ্ঠে উত্তেজনা।

'অ্যাপার্টমেন্ট?'

'বাড়ি। রাফিনার নাম শুনেছ কখনো?'

মাথা নাড়ল ল্যারি, 'না।'

‘এথেন্সের একশো মাইল উত্তরে, সাগরঘেঁষা ছোট একটি গ্রাম। ওখানে নির্জন একটি ভিলা আছে।’

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি, ‘কার নামে ভাড়া করলে?’

‘ওটা আমি কিনেছি,’ বলল নোয়েল, ‘অন্য কারো নামে।’

ল্যারি ভাবল একজন মানুষের কত টাকা থাকলে সে সাময়িক বিনোদনের জন্য একটা ভিলা কিনতে পারে। ‘দারুণ,’ বলল ও। ‘ওটা দেখার জন্য মরে যাচ্ছি।’

ওকে একমুহূর্ত পরখ করল নোয়েল, ‘ক্যাথেরিনকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পারবে?’

বিস্মিত চোখে নোয়েলের দিকে তাকাল ল্যারি। এই প্রথম সে তার স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করল। বিয়ের কথা গোপন করেনি ল্যারি, তবে নোয়েলের মুখে ক্যাথেরিনের নামটা শুনতে কেমন যেন লাগছে। জবাবের অপেক্ষা করছে নোয়েল।

‘কোনো সমস্যা হবে না,’ বলল ল্যারি, ‘আমার স্ত্রী দেখেছে কাজের চাপে খুব কমই ঘরে থাকতে পারি আমি।’

মাথা ঝাঁকাল নোয়েল। সন্তুষ্ট। ‘বেশ। কনস্টানটিন দুবরোভনিক-এ ব্যবসার কাজে যাচ্ছে। আমি বলেছি ওর সঙ্গে যেতে পারব না। আমরা টানা দশটা দিন স্ফূর্তি করতে পারব। তুমি এখন যাও।’

ল্যারি ফিরে এল ককপিটে।

‘রশি ঢিল দেয়া গেছে?’ জানতে চাইল পল মেটাক্সাস।

‘তেমন না,’ সতর্ক গলায় জবাব দিল ল্যারি, ‘সময় লাগবে।’

ল্যারির একটা গাড়ি আছে। সিত্রো কনভার্টিব্‌ল। কিন্তু নোয়েল ওকে গাড়ি ভাড়া নিতে বলেছে। সে এথেন্সের ছোট একটি রেন্ট-এ-কার এজেন্সিতে গেল। ভাড়া করল গাড়ি। নোয়েল একাই চলে গেছে রাফিনা। ল্যারি তার সঙ্গে যোগ দেবে। সাগরপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে ধুলোমাখা, ফিতের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ভাড়া-করা গাড়ি ছোটাল ল্যারি।

আড়াইঘণ্টা একটানা গাড়ি চালিয়ে সাগর-উপকূল-ঘেঁষা একটি ছোট গ্রামে ঢুকল ল্যারি। বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে নোয়েল যাতে বাড়ি খুঁজে পেতে কারো সাহায্যের দরকার না হয়। গাঁয়ে পৌঁছে বামে মোড় নিল ল্যারি, ছোট, সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে সাগরকোলে। এদিকে অনেকগুলো ভিলা ছড়িয়েছিটিয়ে আছে, প্রতিটি বাড়ি উঁচুপাথরের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। রাস্তার শেষমাথায় পানির মাঝ থেকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রকাণ্ড একটি পাথরখণ্ডের ওপরে নোয়েলের সুদৃশ্য, অভিজাত এবং বৃহৎ ভিলা।

গেটে চলে এল ল্যারি। বেল বাজাল। একমুহূর্ত বাদে খুলে গেল বৈদ্যুতিক ফটক। ভেতরে ঢুকল ল্যারি। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট। বেশ বড়সড় একটা

উঠোনে চলে এসেছে ল্যারি, মাঝখানে একটি ফোয়ারা। উঠোনের চারপাশে ফুলের ঝাড়। বাড়িটি মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো। সদর দরজা খুলে গেল। উদয় হল নোয়েল পেজ। পরনে সূতির সাদা পোশাক। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল। নোয়েলকে জড়িয়ে ধরল ল্যারি। ‘এসো, তোমার নতুন বাড়ি দেখবে,’ বলল নোয়েল। ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বাড়ির ভেতরটা দারুণভাবে সাজানো। বড়-বড় ঘর, উঁচু সিলিং। নিচতলায় প্রকাণ্ড লিভিংরুম, লাইব্রেরি, ডাইনিংরুম এবং পুরোনো আদলের রান্নাঘর। বেডরুম দোতলায়।

‘চাকরবাকর কই?’ জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

‘তোমার সামনে।’

অবাক হল ল্যারি। ‘তমি নিজেই সব কাজ করো নাকি?’

মাথা ঝাঁকাল নোয়েল। ‘এক বুয়া আসে। ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, জামাকাপড় ধোয়া। রান্নাটা নিজেই করি।’

নোয়েল ল্যারিকে নিয়ে দোতলায় উঠে গেল। প্রকাণ্ড বেডরুম। জানালা দিয়ে সুনীল সাগর দেখা যায়। ফুরফুরে হাওয়া আসছে জুড়িয়ে যায় দেহ-মন। তবে সাগরের বাতাস উত্তেজিত করে তুলল ল্যারিকে। সে কাছে টেনে নিল নোয়েলকে। তারপর পা বাড়াল দুগ্ধফেনিল শয্যার দিকে।

প্রেম করার পরে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা। নোয়েল মৃদু গলায় বলল, ‘একটা কথা কী জানো, ল্যারি, কনস্টানটিনের সঙ্গে আমি থাকি বটে কিন্তু সারাক্ষণ মনে পড়ে তোমারই কথা। তোমাকে আগেও বলেছিলাম আমি তোমার সবটা চাই। কাউকে তোমার ভাগ দেব না আমি। আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে করো।’

বিস্মিত দৃষ্টিতে নোয়েলের দিকে তাকাল ল্যারি।

নোয়েল বলল, ‘তুমি আমাকে বিয়ে করবে?’

‘তুমি জানো আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু কীভাবে? ডেমিরিস জানতে পারলে কী দশা হবে জানোই তো।’

মাথা নাড়ল নোয়েল, ‘সে জানতে পারবে না। যদি সতর্কভাবে প্ল্যান করি। ও আমাকে কিনে নেয়নি, ল্যারি। আমি ওকে ত্যাগ করব। ডেমিরিস কিছুই করতে পারবে না। ও খুব অহংকারী। আমাকে বাধা দেবে না। এক/দুই মাস পরে চাকরি ছেড়ে দেবে তুমি। আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। তবে আলাদাভাবে। সম্ভবত আমেরিকায়। সেখানে বিয়ে করব। আমার টাকার অভাব নেই। তোমাকে একটা চার্টার এয়ারলাইন কিনে দেব। অথবা ফ্লাইং স্কুলের ব্যবস্থা করব। তোমার যেখানে ইচ্ছা কাজ করবে।’

ল্যারি ভাবছে। লাভ-লোকসানের হিসাব কষছে। নোয়েলের প্রস্তাবে রাজি হলে লাভই হবে বেশি। ওকে কী ত্যাগ করতে হবে? পাইলট হিসেবে এটা একটা

জঘন্য চাকরি। নিজের প্লেন থাকার কথা চিন্তা করতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর। ওর নিজের কনভার্টেড মিশেল থাকবে। অথবা নতুন আসা ডিসি-৬-এর মালিক হবে। এর চারটে রেডিয়াল ইঞ্জিন, যাত্রী ধারণক্ষমতা পঁচাশি। আর নোয়েল, হ্যাঁ, নোয়েলকে সে চায়। জেসাস, এত দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার কী আছে?'

'আমার স্ত্রীর কী হবে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'ওকে বলো তোমাকে ডিভোর্স দিতে।'

'সে আমাকে ডিভোর্স দেবে বলে মনে হয় না।'

'অনুরোধ করতে হবে না,' বলল নোয়েল, 'আদেশ করবে।' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ঘোষণা যেন নোয়েলের কণ্ঠে।

মাথা দোলাল ল্যারি, 'ঠিক আছে।'

'তোমাকে এজন্য আফসোস করতে হবে না, ডার্লিং, কথা দিচ্ছি,' বলল নোয়েল।

ছন্দহীন, অসহ্য একটা জীবন কাটছে ক্যাথেরিনের। ল্যারি এখন বাড়ি ফেরে না বললেই চলে। ক্যাথেরিন তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেয়া বাদ দিয়েছে। কাউন্ট পাপাস বেশ কয়েকবার ক্যাথেরিনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। লোকজনের সঙ্গে ক্যাথেরিনের এখন যোগাযোগ হয় টেলিফোন, চিঠি কিংবা কেবল-এর মাধ্যমে। মানসিক হতাশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে ক্যাথেরিন। সে এখন প্রায় সারাদিনই মদ গেলে।

এথেন্সে আসার পরে শুরুর দিকে উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগ ছিল ক্যাথেরিনের। কিন্তু ল্যারির সঙ্গে দাম্পত্য অশান্তি শুরুর পরে ফ্রেজারকেও আর চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে না ওর। ফ্রেজারের গত তিনটি চিঠির জবাব দেয়া হয়নি। চতুর্থ চিঠিটি খোলেইনি ও।

একদিন একটা কেব্‌ল্ এল ক্যাথেরিনের কাছে। কিন্তু টেলিগ্রামটি খুলল না ও, ওটা টেবিলের ওপর পড়ে থাকল। হপ্তাখানেক পরে ক্যাথেরিনের বাসায় চলে এলেন উইলিয়াম ফ্রেজার। তাঁকে দেখে রীতিমতো বিস্মিত ক্যাথেরিন। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। 'বিল!' শ্বাস-আটকানো গলায় বলল ও। 'বিল ফ্রেজার! তুমি এখানে কী করছ?'

'ব্যবসার কাজে এসেছি এথেন্সে,' বললেন ফ্রেজার। 'আমার টেলিগ্রাম পাওনি?'

ক্যাথেরিন মনে করার চেষ্টা করল, 'মনে পড়ছে না,' অবশেষে বলল ও। ফ্রেজারকে নিয়ে লিভিংরুমে চলে এল। ঘরের মেঝেতে পুরোনো খবরের কাগজ, অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই, আধখাওয়া প্লেট। 'ঘরের এমন দশা দেখে কিছু মনে কোরো না,' বলল ক্যাথেরিন, 'পরিষ্কার করার সময় পাইনি।'

উদ্বেগ নিয়ে ক্যাথেরিনকে দেখছেন ফ্রেজার, 'তুমি ঠিক আছ তো, ক্যাথেরিন?'

'আমি? খুব ভালো আছি। একটু ড্রিঙ্ক দিই?'

'মাত্র তো সকাল এগারোটা বাজে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন, 'ঠিক। তুমি ঠিক বলেছ, বিল। মদ খাওয়ার জন্য খুব বেশি সকাল হয়ে যায়। আমি ভাবিনি তুমি আসবে। তোমার মতো মানুষের আগমন উপলক্ষে সকাল এগারোটার সময়ও মদ খাওয়া যায়।'

ফ্রেজার ভুরু কুঁচকে দেখলেন ক্যাথেরিন টলতে টলতে লিকার কেবিনেটের দিকে এগিয়েছে। একটা গ্লাসে নিজের জন্য অনেকটা মদ ঢেলে নিল, ফ্রেজারের জন্য অল্প।

'গ্রিক ব্রান্ডি চলবে তো?' ড্রিঙ্ক নিয়ে এল ক্যাথেরিন, 'খেতে বিশ্রী লাগে তবে তোমার সয়ে যাবে।'

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে সোফায় বসলেন ফ্রেজার। 'ল্যারি কই?'

'ল্যারি? ল্যারিবাবু তো কোথাও উড়ে বেড়াচ্ছেন। সে এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মানুষের প্লেন চালায়। ডেমিরিস। সে পৃথিবীর সবকিছু কিনে নিয়েছে, এমনকি ল্যারিকেও।'

ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে লক্ষ করছেন, 'ল্যারি জানে তুমি মদ খাও?'

ঠকাশ করে গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখল ক্যাথেরিন, টলছে। 'আমি মদ খাই ল্যারি তা জানে কিনা প্রশ্ন করার মানে কী?' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'কে বলল আমি মদ খাই? পুরোনো একজন বন্ধু এসেছে বাসায়, তার সম্মানে একটু সেলিব্রেট করছি মাত্র। একে মদ খাওয়া বলে না। তুমি আমাকে খামোকাই হামলা করছ।'

'ক্যাথেরিন,' বললেন ফ্রেজার, 'আমি...'

'তুমি ভেবেছ আমাকে মাতাল বলে অভিযুক্ত করবে?'

'আমি দুঃখিত, ক্যাথেরিন,' কষ্ট ফুটল ফ্রেজারের কণ্ঠে, 'তোমার বোধহয় সাহায্য দরকার।'

'ভুল ভেবেছ,' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাথেরিন, 'আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। কেন জানো? কারণ আমি নিজে... নিজে... নিজে...' উপযুক্ত শব্দ হাতড়িয়ে না পেয়ে ক্ষান্ত দিল। 'আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই।'

ফ্রেজার বললেন, 'আমি এখন একটা কনফারেন্সে যাব। রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'করব,' রাজি হল ক্যাথেরিন।

'বেশ। আমি রাত আটটায় এসে তোমাকে নিয়ে যাব।' চলে গেলেন ফ্রেজার।

টলোমলো পায়ে বেডরুমে ঢুকল ক্যাথেরিন, আস্তে খুলল ক্লজিটের দরজা। দরজার পিঠে লাগানো আয়নায় তাকিয়ে চমকে উঠল। এ কাকে দেখছে সে! বিষণ্ন, বিশ্রী চেহারা হয়েছে ওর। অথচ একটা সময় কতমানুষ ওর রূপের প্রশংসা করেছে। মদ খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ক্যাথেরিন। নিজেকেই চিনতে পারছে

না। বেঢপ অবয়বের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে কান্না এল ওর। ডুকরে কাঁদতে লাগল।

পরদিন সকাল নটায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্যাটিসন স্ট্রিটে চলে এল ক্যাথেরিন। ডাক্তারের নাম নিকোডিস। প্রকাণ্ডদেহী, সিংহের কেশরের মতো চুল মাথায়, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মায়াভরা চোখ, সহজ আচরণ।

এক নার্স ক্যাথেরিনকে ডাক্তারের প্রাইভেট অফিসে নিয়ে গেল। ডক্টর নিকোডিস একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন, মিসেস ডগলাস।'

বসল ক্যাথেরিন। নার্ভাস এবং আড়ষ্ট। শরীরের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছে।

'আপনার সমস্যা কী?'

জবাব দিতে গিয়েও মুখ বুজে ফেলল ক্যাথেরিন অসহায়ভাবে। *হে ঈশ্বর, কীভাবে শুরু করব আমি?* ভাবল ও। 'আমার সাহায্য দরকার,' অবশেষে বলল ক্যাথেরিন। তার কণ্ঠ শুকনো, কাঁপাকাঁপা, ড্রিঙ্কের জন্য আকুলিবিকুলি করছে মন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ডাক্তার লক্ষ করছেন ওকে। 'আপনার বয়স কত?'

'আঠাশ,' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

'আপনি আমেরিকান?'

'জি?'

'এথেন্সে থাকছেন?'

মাথা দোলাল ক্যাথেরিন।

'কদ্দিন ধরে এখানে আছেন?'

'হাজার বছর ধরে। পোলোপোনেশিয়ান যুদ্ধ শুরু হওয়ারও আগে আমরা এখানে আসি।'

হাসলেন ডাক্তার, 'মাঝে মাঝে আমারও এমনই মনে হয়,' ক্যাথেরিনকে একটা সিগারেট দিলেন। কাঁপা হাতে শলাকাটি নিল ও। ডাক্তার ওর আঙুলের কাঁপুনি লক্ষ করলেও কিছু বললেন না। সিগারেট জ্বেলে দিলেন তিনি। 'আপনার কী-ধরনের সাহায্য প্রয়োজন, মিসেস ডগলাস?'

অসহায় দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল ক্যাথেরিন, 'আমি জানি না,' ফিসফিস করল ও, 'আমি জানি না।'

'আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?'

'আমি অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। আমার চেহারা খুবই কুৎসিত হয়ে গেছে।' গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে ক্যাথেরিনের।

'আপনি মদ খান, মিসেস ডগলাস?' নম্রস্বরে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। আতঙ্ক নিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল ক্যাথেরিন, 'মাঝে মাঝে।'

'কতটা?'

গভীর দম নিল ও, 'তেমন বেশি না। এটা—এটা নির্ভর করে—'

'আজ মদ খেয়েছেন?'

'না।'

ডাক্তার লক্ষ করছেন ক্যাথেরিনকে, 'আপনি মোটেও কুৎসিত দেখতে নন, কথাটা আপনি নিজেও জানেন', মৃদু গলায় বললেন তিনি। আপনার শুধু ওজন বেড়েছে। ফুলে গেছে শরীর, আপনি ত্বক কিংবা চুল কোনোটারই যত্ন নিচ্ছেন না। এসবের আড়াল সরিয়ে দিলে আপনি খুবই সুন্দরী একজন নারী।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্যাথেরিন। ডাক্তার ওকে কাঁদার সুযোগ দিল। কাঁদুক। কেঁদে বুকটা হালকা হোক। বেশ কয়েকবার ইন্টারকমের বাজার বাজল। কিন্তু ডাক্তার জবাব দিলেন না। কান্নার দমক ক্রমে কমে এল। অবশেষে থেমে গেল। ক্যাথেরিন রুমাল দিয়ে নাক মুছল। 'আমি দুঃখিত,' ক্ষমা চাইল ও। 'আ-আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনার নিজের ওপর,' বললেন ডাক্তার নিকোডিস। 'আপনারা সমস্যাটা কিন্তু এখনো জানতে পারিনি।'

'আমার দিকে তাকান। লক্ষ করুন আমাকে।' বলল ক্যাথেরিন।

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'ওটা সমস্যা নয়, মিসেস ডগলাস। ওটা সমস্যার লক্ষণ মাত্র। সোজাসুজি বলছি বলে ক্ষমা করবেন, তবে আপনাকে সাহায্য করতে হলে আমাদের পরস্পরের প্রতি সৎ থাকতে হবে। আপনার মতো সুন্দরী নারী যখন ইচ্ছে করে নিজের চেহারার এমন দশা করে, বুঝতে হবে এর পেছনে গুরুতর কোনো কারণ রয়েছে। আপনার স্বামী বেঁচে আছেন?'

'শুধু ছুটির দিন আর উইকএন্ডগুলোতে।'

'আপনি কি তার সঙ্গে থাকেন?'

'যখন সে বাড়িতে থাকে।'

'উনি কী কাজ করেন?'

'সে কনস্টানটিন ডেমিরিসের পার্সোনাল পাইলট,' ডাক্তারের চেহারায় যে প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল তার দুটো কারণ থাকতে পারে, ডেমিরিসের নামটা শোনার সাধারণ প্রতিক্রিয়া অথবা ল্যারি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন। 'আমার স্বামীকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'না,' হয়তো মিথ্যা বলছে ডাক্তার। 'আপনি আপনার স্বামীকে ভালোবাসেন, মিসেস ডগলাস?'

জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও বুজে ফেলল ক্যাথেরিন। জানে ও যা বলতে যাচ্ছে তা শুধু ডাক্তার নয়, নিজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সে তার স্বামীকে ভালোবাসে। তবে সে তার স্বামীকে ঘৃণাও করে। মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি এমন রাগ হয়, মনে হয় খুন করে ফেলবে। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সে স্বামীর প্রতি এমন মায়া অনুভব করে, মনে হয় নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না। হয়তো এটাই

ভালোবাসা। 'হ্যাঁ।' জবাব দিল ক্যাথেরিন।

'তিনি কি আপনাকে ভালোবাসেন?'

ল্যারির জীবনের পরনারীদের কথা মনে পড়ল ক্যাথেরিনের, স্মৃতিতে ভিড় করল তার অবিশ্বস্ততা। কাল রাতে নিজেকে আয়নার সামনে দেখে মনে হয়েছে অচেনা কেউ। ল্যারি যে ওকে চায় না এজন্য ল্যারিকে দোষ দিতে পারে না ক্যাথেরিন। কিন্তু আসল দোষটা কার? ল্যারির ব্যাভিচারের জন্য সৃষ্ট আয়নার ওই নারী নাকি ল্যারি নিজে? ক্যাথেরিন টের পেল তার চোখ আবার ভরে উঠছে জলে।

অসহায় ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিন, 'আ-আমি জানি না।'

'আপনি কখনো নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়েছেন?'

'না। শিকার হওয়া দরকার।'

রসিকতায় হাসলেন না ডাক্তার। ধীরে ধীরে কথা বললেন তিনি, প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করলেন সাবধানে। 'মানুষের মন বড় জটিল জিনিস, মিসেস ডগলাস। মন অনেক যন্ত্রণা নিতে পারে, কিন্তু কষ্টগুলো যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, হৃদয়ের নিভৃতে ওটা পালাতে চায়। আপনার আবেগগুলো এখন টান টান হয়ে আছে। আপনি সাহায্যের জন্য এসে ভালোই করেছেন।'

'আমি জানি আমি খানিকটা নার্ভাস,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল ক্যাথেরিন, 'এজন্যই মদ খাই। নিজেকে একটু হালকা করার জন্য।'

'না,' নীরস গলায় বললেন ডাক্তার, 'আপনি মদ খান নিজের কাছ থেকে পালানোর জন্য।' চেয়ার ছাড়লেন নিকোডিস, হেঁটে গেলেন ওর কাছে। 'আমরা মনে হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আমরা বলতে আপনি এবং আমি। কাজটা সহজ হবে না।'

'কী করতে হবে বলুন।'

'আপনাকে প্রথমেই একটা ক্লিনিকে পাঠাব শারীরিক পরীক্ষার জন্য। যদিও আমার ধারণা ওরা আপনার তেমন কোনো শারীরিক সমস্যা খুঁজে পাবে না। এরপর মদ খাওয়া ছাড়তে হবে আপনাকে। তারপর আপনাকে একটা ডায়েট চার্ট দেব। ওটা মেনে চলবেন। ঠিক আছে?'

গা মোচড়াল ক্যাথেরিন, তারপর সম্মতির ভঙ্গিতে ঝাঁকাল মাথা।

'আপনি জিমনেশিয়ামে যাবেন। ব্যায়াম করে শরীরটাকে আগের কাঠামোয় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। আমি এক চমৎকার ফিজিওথেরাপিস্টকে চিনি। সে খুব ভালো ম্যাসেজ করে। হপ্তায় একদিন যাবেন বিউটি পার্লারে। কাজগুলো করতে সময় লাগবে, মিসেস ডগলাস। হুট করে সব করতে পারবেন না। হুট করে সব বদলাবেও না।' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসলেন ডাক্তার। 'তবে একটা কথা বলতে পারি—কিছুদিনের মধ্যেই নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন টের পেয়ে যাবেন। আয়নায় যখন দেখবেন নিজেকে, গর্ব অনুভব করবেন। আপনার স্বামীর চোখে আবার আকর্ষণীয়া হয়ে উঠবেন।'

ডাক্তারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন। মনে হচ্ছে ওর ভেতর থেকে বিরাট একটা বোঝা যেন সরিয়ে দিল কেউ, নতুন করে বাঁচার যেন সুযোগ পেয়েছে ও।

'একটা কথা মনে রাখবেন—আমি শুধু একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে দিলাম আপনার জন্য,' বললেন ডাক্তার, 'আপনাকে রুটিনটা মেনে চলতে হবে।'

'চলব,' আন্তরিক গলায় বলল ক্যাথেরিন, 'প্রমিজ।'

'মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়াটা এ প্রোগ্রামের সবচে' কঠিন অংশ।'

'না, কঠিন হবে না,' বলল ক্যাথেরিন। ও জানে ও সত্যিকথাই বলছে। ডাক্তার ঠিকই ধরেছেন : নিজের কাছ থেকে পালাতেই মদ খায় ক্যাথেরিন। এখন ওর সামনে একটা লক্ষ্য আছে। ও জানে কোথায় যাচ্ছে। সে ল্যারির মন জয় করবে। 'আমি আর একফোঁটা মদও ছোঁব না,' দৃঢ়গলায় ঘোষণা করল ক্যাথেরিন।

ডাক্তার ওর চেহারায় আত্মপ্রত্যয় লক্ষ করে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি, মিসেস ডগলাস।'

সিধে হল ক্যাথেরিন। ওর বেঢপ শরীরটা এখন ঠিক হয়ে যাবে।

'আমি কয়েকটা টাইট পোশাক কিনে নিয়ে আসি,' হাসল ও। ডাক্তার একটা কার্ডে কিছু লিখলেন। 'এটা ক্লিনিকের ঠিকানা। ওরা আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। শারীরিক পরীক্ষা শেষে আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করব।'

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি খুঁজছিল ক্যাথেরিন। ভাবল, ধ্যাৎ, এখন থেকেই বরং ব্যায়াম শুরু করে দিই। ও হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে সালোনিকা ডিস্ট্রিক্টে চলে এল ও। একটা বিউটি পার্লারে চোখ পড়াতে ভেতরে ঢোকার অদম্য ইচ্ছে জাগল মনে। ভেতরে গেল ক্যাথেরিন। রিসেপশন রুম সাদা মার্বেলে তৈরি, বড়, অভিজাত। সেক্সি চেহারার এক রিসেপশনিস্ট ক্যাথেরিনকে ভুরু কুঁচকে দেখে বলল, 'ইয়েস, মে আই হেল্প ইউ?'

'কাল সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাই,' বলল ক্যাথেরিন। এদের টপ হেয়ার স্টাইলিস্টের নামটা পড়ে গেল হঠাৎ করে, 'আমি আলেকোকে দিয়ে চুল কাটাব।'

মাথা নাড়ল মহিলা, 'আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি, ম্যাডাম। তবে অন্য কাউকে নিতে হবে।'

'শুনুন,' দৃঢ় গলায় বলল ক্যাথেরিন, 'আলেকোকে বলবেন সে যদি আমার চুল কাটতে রাজি না হয় তবে গোটা এথেন্সে রটিয়ে দেব আমি তার রেগুলার কাস্টমার হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে আপনারা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মহিলার। 'আ-আমি দেখছি কী করা যায়।' দ্রুত বলল সে, 'কাল সকাল দশটায় আসুন।'

'ধন্যবাদ,' মুচকি হাসল ক্যাথেরিন, 'আসব।' দোকান থেকে বেরিয়ে এল ও।

সামনে ছোট একটি পানশালা। জানালায় লেখা : 'মাদাম পিরিস—গণক।'

নামটা চেনা-চেনা লাগল। মনে পড়ে গেল কাউন্ট পাপাস মাদাম পিরিসকে নিয়ে একদিন একটা গল্প বলেছিল। এক পুলিশ কর্মকর্তা আর একটা সিংহ নিয়ে—গল্পটা পুরো মনে পড়ছে না। ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাস নেই ক্যাথেরিনের। তবু কেন যেন ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে। কারো মুখ থেকে শুনতে চায় : চমৎকার নতুন একটি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য, আবার সুন্দর হয়ে উঠবে জীবন, বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাবে। দরজা খুলল ক্যাথেরিন, পা বাড়াল ভেতরে।

উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে হঠাৎ অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঠাহর করতে পারল না ক্যাথেরিন। ঘরের অল্প আলো চোখ সয়ে আসার পরে দেখতে পেল এককোণে একটি বার রয়েছে, সেইসঙ্গে ডজনখানেক টেবিল-চেয়ার। শ্রান্ত চেহারার এক ওয়েটার হেঁটে এল ক্যাথেরিনের কাছে, ওকে সম্বোধন করল গ্রিকভাষায়।

'কিছু খাব না, ধন্যবাদ,' গ্রিকভাষায় বলল ক্যাথেরিন। মজাই লাগছে গ্রিকে কথা বলতে। কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল ও, 'কিছু খাব না আমি। মাদাম পিরিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি আছেন?'

ঘরের এককোনার খালি একটা টেবিলে ইঙ্গিত করল ওয়েটার। ক্যাথেরিন হেঁটে গিয়ে দখল করল টেবিল। কয়েক মিনিট পরে একজন এসে দাঁড়াল ওর পাশে। মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন।

মহিলা অবিশ্বাস্যরকম বুড়ি এবং রোগা, পরনে কালো পোশাক, মুখে সময় তার চিহ্ন রেখেছে—অসংখ্য বলিরেখা।

'আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে চেয়েছেন?' ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধা।

'জি,' জবাব দিল ক্যাথেরিন। 'আমি হাত দেখাতে এসেছি।'

টেবিলে বসল মহিলা, একটা হাত তুলতেই ওয়েটার ছোট একটি ট্রেতে এক কাপ ঘন, কালো কফি নিয়ে হাজির হয়ে গেল। রাখল ক্যাথেরিনের সামনে।

'আমার লাগবে না,' বলল ক্যাথেরিন, 'আমি...'

'খান,' বলল মাদাম পিরিস।

বিস্মিত চোখে মহিলাকে দেখল ক্যাথেরিন, তারপর কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল। তেতো। কাপটা নামিয়ে রাখল ও।

'আবার খান,' বলল বৃদ্ধা।

ক্যাথেরিন আপত্তি করতে গিয়েও করল না। সে আরেক ঢোক গিলল। বিশ্রী।

'আরেক চুমুক,' বলল মাদাম পিরিস।

শ্রাগ করে কাপে শেষ চুমুকটা দিল ক্যাথেরিন। কাপের তলানিতে ঘন গাদ পড়ে আছে। মাথা ঝাঁকাল মাদাম পিরিস, হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে নিল ক্যাথেরিনের কাছ থেকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওদিকে। কিছুই বলছে না। চুপচাপ বসে রইল ক্যাথেরিন। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। *আমার মতো বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে কী করছে এখানে? দেখছে এক গ্রিক পাগলী তাকিয়ে আছে*

খালি কফি কাপের দিকে।

'আপনি বহুদূরের দেশ থেকে এসেছেন,' হঠাৎ বলে উঠল মহিলা।

'ঢিল লেগে গেছে,' হাসল ক্যাথেরিন।

মাদাম পিরিস চোখ তুলে চাইল ওর দিকে। মহিলার চাউনিতে এমন কিছু ছিল, হিম হয়ে গেল ক্যাথেরিনের গা।

'বাড়ি ফিরে যান।'

ঢোক গিলল ক্যাথেরিন, 'আ-আমি বাড়িতেই আছি।'

'যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান।'

'আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন?'

'যেখানে খুশি যান। এখান থেকে চলে যান—জলদি।'

কেন?' একটা আতঙ্ক ঘিরে ধরল ক্যাথেরিনকে। 'সমস্যা কী?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। তার কণ্ঠ কর্কশ, তার কথা বুঝতে রীতিমতো বেগ পেতে হল ক্যাথেরিনের।

'ওটা আপনাকে ঘিরে রেখেছে।'

'কী?'

'চলে যান!' বৃদ্ধার কণ্ঠে আকুল আবেদন, যেন ব্যথায় কাতরাচ্ছে কোনো জন্তু। ক্যাথেরিনের ঘাড়ের কাছের সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

'আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন,' কাঁদোকাঁদো গলা ক্যাথেরিনের। 'কী হয়েছে বলুন না!'

ডানে-বামে মাথা নাড়ছে মহিলা। চোখে বুনোদৃষ্টি। 'ওটা আপনাকে ধরার আগে চলে যান।'

শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা জল নামল ক্যাথেরিনের। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। 'আমাকে কিসে ধরবে?'

ব্যথা এবং আতঙ্কে বিকৃত বৃদ্ধার চেহারা। 'মৃত্যু। আপনাকে গ্রাস করতে আসছে।' ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনের ঘরে।

মূর্তির মতো বসে রইল ক্যাথেরিন, ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কাঁপছে হাত। কাঁপুনি থামাতে মুঠো করল। ওয়েটারের চোখে চোখ পড়ল ওর, মদের অর্ডার দিতে গিয়েও দিল না। এক উন্মাদিনী বুড়ির জন্য নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে চায় না। বসে ঘনঘন নিশ্বাস নিতে লাগল ও। আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ চলে এল নিজের ওপর। তারও অনেকক্ষণ পরে টেবিল ছাড়ল। পার্স এবং গ্লাভস নিয়ে বেরিয়ে এল পানশালা থেকে।

বাইরের কড়া রোদ ঝলসে দিল চোখ। তবু ভালো লাগছে ক্যাথেরিনের। এক বুড়ি ভয় পাইয়ে দিয়ে রীতিমতো বোকা বানিয়েছে ওকে। আর জীবনেও এমুখো হবে না ক্যাথেরিন।

বাড়ি ফিরল ক্যাথেরিন। অগোছালো লিভিংরুমের দিকে চোখ যেতে বিষিয়ে উঠল মন। ইশ্, কী দশা করে রেখেছে সে ঘরটির! চারদিকে ঘন ধুলোর আস্তর,

জামাকাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা মেঝে জুড়ে। ভেবে অবাক লাগল ক্যাথেরিনের ও এমনই মাতাল হয়ে থাকত, ঘরদোর পরিষ্কার করার চিন্তাও আসেনি মাথায়। ওর প্রথম কাজ হল ঘর পরিষ্কার করা। কিচেনে পা বাড়িয়েছে, বেডরুমে একটা ড্রয়ার বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। ধক্ করে উঠল বুক। পা টিপে টিপে এগোল বেডরুমের দরজায়।

বেডরুমে ল্যারি। বিছানায় একটি সুটকেস। তালা মারা। দ্বিতীয় সুটকেসে মালপত্র ভরা প্রায় শেষ। ক্যাথেরিন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে ওকে। ওর সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চাইল ল্যারি।

'আমি যাচ্ছি।'

'ডেমিরিসের সঙ্গে আবার সফর?'

'না,' বলল ল্যারি, 'এটা আমার নিজের সফর। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'ল্যারি...'

'আলোচনা করার কিছু নেই।'

বেডরুমে ঢুকে পড়ল ক্যাথেরিন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'কিন্তু—কিন্তু আলোচনা করার অনেক কিছু আছে। আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলল আমি ঠিক হয়ে যাব।' স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে শব্দগুলো। 'আমি মদ খাওয়া বন্ধ করে দেব এবং...'

'ক্যাথি, ইটস ওভার। আমি ডিভোর্স চাই।'

কথাগুলো একঝাঁক ঘুসির মতো আঘাত হানল ক্যাথেরিনকে। জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, শক্ত চোয়াল, গলায় ঠেসে আসা বমি ঠেকাতে চেষ্টা করছে। 'ল্যারি,' আস্তে আস্তে কথা বলল ও, যাতে কাঁপুনিটা বোঝা না যায়। 'আমার ব্যাপারে তোমার অনুভূতি যাই হোক সেজন্য দোষ দিই না তোমাকে। অনেক দোষ আমার—হয়তো বেশিরভাগ দোষই আমি করেছি—তবে এখন থেকে সব কিছু বদলে যাবে। আমি বদলে যেতে চলেছি—সত্যিকারের পরিবর্তন ঘটবে আমার।' আকুল আবেদনের ভঙ্গিতে হাত মেলে ধরল ও। 'আমি শুধু একটা সুযোগ চাই।'

ওর মুখোমুখি হতে ঘুরল ল্যারি। হিমশীতল চোখে প্রবল ঘৃণা।

'আমি একজনকে ভালোবাসি। আমি তোমার কাছে যা চাই তা হল ডিভোর্স।'

ক্যাথেরিন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, ফিরে চলল লিভিংরুমে। বসে পড়ল একটা কাউচে। একটা গ্রিক ফ্যাশন ম্যাগাজিনের দিকে পাথরদৃষ্টি। ল্যারির জিনিসপত্র গোছানো শেষ। শুনল ও বলছে, 'আমার উকিল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।' দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্যাথেরিন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগল। পত্রিকা দেখা শেষ করে ওটা সাজিয়ে রাখল টেবিলে, ঢুকল বাথরুমে, খুলল মেডিসিন চেস্ট, বের করল রেজর ব্লেড। তারপর ঘ্যাচ করে কেটে ফেলল কব্জি।

নোয়েল ও ক্যাথেরিন
এথেন্স : ১৯৪৬

১৮

সাদা পোশাক গায়ে কতগুলো ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর চারপাশে। শূন্যে ভেসে আছে ক্যাথেরিন। ফিসফিস শব্দ আসছে কানে। অদ্ভুত একটা ভাষা, বুঝতে পারছে না ও। তবে উপলব্ধি করতে পারছে নরকে আছে ও, নিজের পাপকর্মের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। ওরা বিছানার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে ওকে, হয়তো শাস্তির একটা অংশ এটা। স্ট্রাপ দিয়ে বেঁধে রাখার কারণে খুশিই ক্যাথেরিন, না হলে ও হয়তো গ্রহ থেকে ছিটকে পড়ে যেত। তবে সবচে' ভয়ংকর ব্যাপার ওরা ক্যাথেরিনের সবগুলো নার্ভ শরীর থেকে বের করে নিয়েছে, প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে গায়ে। ওর শরীর জেগে আছে, অচেনা, ভয়ংকর সব শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। শিরায় প্রবাহিত রক্তস্রোতের শব্দও শুনছে। যেন প্রবল গর্জনে লাল একটা নদী বয়ে চলেছে শরীরের মাঝে। হৃদপিণ্ডের ধুকপুক কানে আসছে ক্যাথেরিনের। যেন কোনো দানব বিশাল এক ঢাক বাজাচ্ছে। ওর চোখে কোনো পাপড়ি নেই, সাদা আলো প্রবেশ করছে মস্তিষ্কে। এমন তীব্র সাদা, ঝলসে দেয় চোখ। ওর শরীরের প্রতিটি পেশি জ্যান্ত, যেন চামড়ার নিচে মোচড় খাচ্ছে সাপের মতো, আঘাত হানতে প্রস্তুত।

ইভানজেলিমস হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পাঁচদিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল ক্যাথেরিন। দেখল সে সাদা, ছোট একটি হাসপাতাল কক্ষে রয়েছে। ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম-পরা নার্স তার বিছানার চাদর গুঁজে দিচ্ছে, ড. নিকোডিস ওর বুকে ঠেকিয়ে রেখেছেন স্টেথিস্কোপ।

'ঠাণ্ডা লাগছে তো!' দুর্বল গলায় আপত্তি জানাল ক্যাথেরিন।

ডাক্তার ওর দিকে তাকালেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো ওর জ্ঞান ফিরেছে।'

ঘরের চারপাশে ধীরে ধীরে চোখ বুলাল ক্যাথেরিন। আলোটা এখন স্বাভাবিক লাগছে, রক্তে স্রোতের শব্দ কিংবা হৃদপিণ্ডে ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

'মনে হচ্ছিল নরকে আছি,' ফিসফিসে শোনাল ক্যাথেরিনের কণ্ঠ।

'তাই ছিলেন।'

হাতের কব্জি দেখল ক্যাথেরিন। কোনো কারণে ব্যান্ডেজ করা। 'কতদিন ধরে আমি এখানে আছি?'

'পাঁচদিন।'

হাতে কেন ব্যান্ডেজ করা তার কারণ মনে পড়ে গেল ক্যাথেরিনের। 'বোকার মতো একটা কাজ করেছি, না?'

'জি।'

শক্ত করে চোখ বুজল ক্যাথেরিন, 'আমি দুঃখিত।' আবার চোখ মেলল। এখন রাত। বিল ফ্রেজার বিছানার পাশের চেয়ারে বসে আছেন, লক্ষ করছেন ওকে। বেডসাইড টেবিলের ওপর ফুল এবং মিষ্টি।

'হাই,' উৎফুল্ল গলায় বললেন তিনি, 'তোমাকে আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে।' তিনি একটা হাত রাখলেন ওর গায়ে। 'তুমি আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছ, ক্যাথেরিন।'

'আমি দুঃখিত, বিল,' গলা ভেঙে গেল ওর, মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে।

'তোমার জন্য কিছু ফুল আর মিষ্টি এনেছি। শরীর আরেকটু ভালো ঠেকলে বই নিয়ে আসব।'

ফ্রেজারের দয়ালু মুখটা দেখল ক্যাথেরিন। ভাবল : *আমি ওকে কেন ভালোবাসি না? যাকে ঘৃণা করি তাকে কেন ভালোবাসি?*

'আমি এখানে এলাম কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে।'

'মানে—কে নিয়ে এল আমাকে?'

বিরতি দিলেন ফ্রেজার। 'আমি। আমি অনেকবার ফোন করেছিলাম তোমাকে। জবাব না পেয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। তারপর তোমার বাসায় চলে আসি।'

'তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত,' বলল ক্যাথেরিন। 'কিন্তু কীভাবে দেব বুঝতে পারছি না।'

ফ্রেজার বললেন, 'কাল সকালে আমি চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।'

ঝুঁকে ক্যাথেরিনের কপালে আলতো চুমু খেলেন ফ্রেজার। চোখ বুজল ক্যাথেরিন। যখন চোখ মেলে তাকাল, দেখল ঘরে ও একা। তখন মাঝরাত।

পরদিন সকালে ল্যারি এল ওকে দেখতে। ক্যাথেরিনের বিছানার পাশে এসে বসল। ক্যাথেরিন ভেবেছিল ওর চেহারা শুকনো, মনমরা দেখাবে। কিন্তু খুব হাসিখুশি, নির্ভার লাগছে।

'কেমন বোধ করছ, ক্যাথি?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'দারুণ। আত্মহত্যার চিন্তা আমাকে সবসময় উত্তেজিত করে তোলে।'

'ওরা তোমার বেঁচে ওঠার আশা ছেড়ে দিয়েছিল।'

'তোমাকে হতাশ করার জন্য দুঃখিত।'

'কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হল না।'

'তবে এটাই সত্যিকথা, তাই না, ল্যারি? তুমি তো আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছ।'

'ফর ক্রাইস্টস শেক, তোমার কাছ থেকে এভাবে মুক্তি চাইনি আমি। ক্যাথেরিন। আমি শুধু ডিভোর্স চেয়েছি।'

ওর দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। সুদর্শন, ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো চেহারার মানুষটির দিকে, যাকে সে বিয়ে করেছে। ক্যাথেরিন আসলে কী নিয়ে বেঁচে আছে? সাতবছরের স্বপ্ন পুঁজি করে? ল্যারিকে সে এত ভালোবাসা দিয়েছে, ওকে নিয়ে এত আশা করেছে, এগুলো ছেড়ে দেয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেনি ও, নিজের কাছে স্বীকার করতে সাহস হয়নি তার একটা ভুলের কারণে জীবনটা ঊষর মরুভূমিতে রূপান্তর ঘটেছে। ওর মনে পড়ল বিল ফ্রেজার এবং ওয়াশিংটনের বন্ধুদের কথা। কত মজা করেছে সবাই মিলে। তবে ক্যাথেরিনের মনে পড়ে না শেষ কবে সে উঁচুগলায় হেসেছে কিংবা আদৌ হেসেছে কিনা। কিন্তু এসব কোনো বিষয় নয়। আসল বিষয় হল সে ল্যারিকে যেতে দেবে না। কারণ ল্যারিকে সে এখনো ভালোবাসে। ল্যারি ক্যাথেরিনের জবাবের অপেক্ষা করছিল। 'না,' বলল ক্যাথেরিন। 'তোমাকে আমি কোনোদিনই ডিভোর্স দেব না।'

সে রাতে পাহাড়ে, কাইসারিয়ানির নির্জন মঠে নোয়েলের সঙ্গে দেখা করল ল্যারি। ক্যাথেরিনের সঙ্গে আলাপচারিতার বিশদ জানাল।

মনোযোগ দিয়ে সব কথা শোনার পরে জিজ্ঞেস করল নোয়েল, 'তোমার কি মনে হয় না ও মত বদলাতে পারে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ল্যারি, 'ক্যাথেরিন ভয়ানক জিদ্দি।'

'ওর সঙ্গে আরেকবার কথা বলো।'

তাই করল ল্যারি। পরের তিন হপ্তা ক্যাথেরিনকে ডিভোর্স দেয়ার জন্য নানান চেষ্টা চালাল। অনুনয় করল, পা ধরল, রাগ করল, টাকা দিতে চাইল, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল ক্যাথেরিন। সে এখনো ল্যারিকে ভালোবাসে। তার বদ্ধমূল ধারণা ল্যারি আরেকটা সুযোগ দিলে সে ওকে আবার ভালোবাসতে শুরু করবে।

'তুমি আমার স্বামী,' দৃঢ়গলায় বলল ক্যাথেরিন। 'আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাই থাকবে।'

নোয়েলের কাছে ক্যাথেরিন বৃত্তান্ত তুলে ধরল ল্যারি।

নোয়েল শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ।'

অবাক হল ল্যারি, 'হুঁ মানে?'

ভিলার সৈকতে শুয়ে আছে ওরা, পিঠের নিচে নরম, সাদা তোয়ালে। আকাশ ঝকঝকে নীল, তুলোর মতো পেঁজা মেঘ ছড়ানো-ছিটানো।

'ওর কবল থেকে তোমাকে মুক্তি পেতেই হবে,' সিধে হল নোয়েল, পা বাড়াল ভিলার দিকে। লম্বা সুঠাম পা যেন নৃত্যের তালে হাঁটছে। ল্যারি শুয়ে শুয়ে ভাবছে নোয়েলের কথার মানে কী। ও নিশ্চয় ক্যাথেরিনকে খুন করতে চাইছে না।

হঠাৎ হেলেনের কথা মনে পড়ে গেল ল্যারির।

টেরেসে বসে সাপার খাচ্ছে ওরা। 'তুমি বুঝতে পারছ না ওর বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে?' বলল নোয়েল। 'সে তোমার জীবন ধ্বংস করতে চায়, আমাদেরকে শেষ করে দিতে চায়, ডার্লিং।'

ওরা বিছানায় শুয়ে ধূমপান করছে। ছাদে লাগানো আয়নায় সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে।

'তুমি ওর একটা উপকার করবে। সে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। সে মরতে চায়।'

'আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারব না, নোয়েল।'

'পারবে না?'

ল্যারির নগ্ন পা বেয়ে নোয়েলের আঙুল উঠছে, নখের ডগা দিয়ে ছোট ছোট বৃত্ত করে উঠে যাচ্ছে পেটের দিকে।

'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

আপত্তি জানিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল ল্যারি, কিন্তু বাধা দিল নোয়েল। ওর দুটো হাতই এখন সক্রিয়। ল্যারির শরীর নিয়ে খেলা করছে হাতজোড়া। একটি হাত ধীরে ধীরে, নরমভাবে, অপরটি দ্রুত এবং শক্তভাবে। সুখের আতিশয্যে গোঙাতে লাগল ল্যারি, মাথা দিয়ে দূর করে দিল ক্যাথেরিনের চিন্তা।

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেল ল্যারি। ঘামে ভিজে গেছে গা। দেখেছে নোয়েল ওকে ছেড়ে চলে গেছে। নোয়েল শুয়ে আছে ওর পাশেই, ওকে জড়িয়ে ধরল ল্যারি, টেনে নিল কাছে। সারারাত আর ঘুম এল না, ভাবছে নোয়েল যদি ওকে সত্যি ছেড়ে চলে যায় তাহলে ওর দশা কী হবে।

পরদিন সকালে নোয়েল নাস্তা বানাচ্ছে, ল্যারি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'আমরা যদি ধরা পড়ে যাই?'

'মাথায় বুদ্ধি থাকলে ধরা পড়ব না,' জবাব দিল নোয়েল।

‘নোয়েল,’ ব্যাকুল গলায় বলল ল্যারি, ‘এথেন্সের সবাই জানে ক্যাথেরিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। ওর কিছু হয়ে গেলে পুলিশ সন্দেহ করে বসবে।’

‘তা তো করবেই,’ শান্ত গলায় বলল নোয়েল। ‘এজন্যই সাবধানে সমস্ত পরিকল্পনা করতে হবে।’

টেবিলে নাস্তা দিল নোয়েল। দুজনে চুপচাপ বসে খেতে লাগল। ল্যারি খাবার একটু মুখে তুলেই ঠেলে সরিয়ে দিল প্লেট। বিস্বাদ লাগছে।

‘খেতে ভালো লাগছে না?’ উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল নোয়েল।

স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ল্যারি। ভাবছে এ কেমন মহিলা যে খেতে খেতে আরেকজন নারীকে হত্যার পরিকল্পনা করছে।

পরে, বোটে উঠে বিষয়টি নিয়ে আরো কথা বলল ওরা। বিষয়টি আরো বাস্তব হয়ে উঠল। ফিকশন এখন ফ্যাক্টসে মোড় নিচ্ছে।

‘ঘটনা এমনভাবে ঘটাতে হবে দেখে যেন মনে হয় এটা দুর্ঘটনা,’ বলল নোয়েল। ‘তাহলে আর পুলিশি তদন্ত হবে না। এথেন্সের পুলিশ খুব চালাক।’

‘যদি ওরা তদন্ত করে?’

‘করবে না। দুর্ঘটনা এখানে ঘটবে না।’

‘কোথায় ঘটবে, কখন?’

‘আইওনিনায়,’ সামনে ঝুঁকে এল নোয়েল, পরিকল্পনা খোলাসা করছে। মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে ল্যারি, কোথাও আপত্তি থাকলে তা জানাচ্ছে। নোয়েলের কথা বলা শেষ হলে ল্যারি স্বীকার করল পরিকল্পনার কোথাও কোনো ফাঁকফোকর নেই। ওদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না কেউ।

পল মেটাক্সাস নার্ভাস। সর্বদা হাসিখুশি মুখখানা শুকনো, পাঁশুটে। কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে কখনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করার প্রয়োজন হয়নি তার। কিন্তু আজ হয়েছে। মেটাক্সাস বাটলারকে বলেছিল বিষয়টি খুব জরুরি। এ মুহূর্তে ডেমিরিসের ভিলার প্রকাণ্ড হলওয়েতে মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে তোতলাচ্ছে মেটাক্সাস।

‘আ-আমি আপনাকে বিরক্ত করার জন্য খুবই দুঃখিত, মি. ডেমিরিস।’ ফ্লাইট ইউনিফর্মে ঘামে-ভেজা হাতের তালু মুছল সে।

‘প্লেন নিয়ে কোনো সমস্যা?’

‘না, স্যার। এ-এ-এটা ব্যক্তিগত বিষয়।’

ভাবলেশশূন্য চেহারায় ওকে লক্ষ করলেন ডেমিরিস। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে তাঁর আগ্রহ নেই। তাঁর সেক্রেটারিই এসব বিষয়ের সমাধান করে। তবু তিনি মেটাক্সাসকে বলতে দিলেন।

পল মেটাক্সাস আরো বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে। মনিবকে কথাটা জানাবে কি

জানাবে না সিদ্ধান্ত নিতে অসংখ্য নিদ্রাহীন রাত কেটেছে তার। আজ সে যা করছে তা তার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই মানায় না। কিন্তু সে অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী একজন মানুষ। আর মনিবের নুন খেয়েছে বলে তার সঙ্গে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।

'বিষয়টি মিস পেজকে নিয়ে,' অবশেষে বলল সে।

একমুহূর্ত নীরবতা।

'ভেতরে এসো,' বললেন ডেমিরিস। পাইলটকে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকলেন। বন্ধ করলেন দরজা। প্লাটিনিয়াম কেস খুলে একটি সমতল মিশরীয় সিগারেট বের করলেন। ওতে আগুন ধরালেন। তারপর তাকালেন ঘেমে নেয়ে ওঠা মেটাক্সাসের দিকে। 'মিস পেজের বিষয়টা কী?' প্রায় অন্যমনস্ক সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ঢোক গিলল মেটাক্সাস, বুঝতে পারছে না ভুল করছে কিনা। যদি পরিস্থিতি ঠিকমতো যাচাই করে থাকে সে, তথ্যের জন্য সে বাহবা পাবে, কিন্তু যদি ভুল হয়ে থাকে...'

হুড়মুড় করে এখানে ছুটে আসার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিল মেটাক্সাস। কিন্তু এখন মুখ না-খোলা ছাড়া উপায় নেই।

'মিস পেজ এবং ল্যারি ডগলাসকে নিয়ে,' ডেমিরিসকে লক্ষ করছে মেটাক্সাস, তার চেহারার অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করছে। কোনো আগ্রহই ফুটে নেই ওখানে। 'ওঁরা—ওঁরা রাফিনার একটি বিচ হাউজে একত্রে বসবাস করছেন।'

গম্বুজ আকৃতির, সোনার ছাইদানিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন ডেমিরিস। মেটাক্সাসের মনে হল ওকে এক্ষুনি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। কারণ মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে সে এবং চাকরিটা হারাচ্ছে। ডেমিরিসকে বোঝাতে হবে যে সে সত্যিকথা বলছে। ভল ভল করে শব্দগুলো বেরিয়ে এল মুখ থেকে। 'আমার—আমার বোন ওখানকার একটি ভিলার হাউজকিপার। সে ওদের দুজনকে একত্রে বহুবার সৈকতে দেখেছে। কাগজে মিস পেজের ছবি দেখেছে আমার বোন। ওনাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। তবে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কয়েকদিন আগে সে এয়ারপোর্টে আসে আমার সঙ্গে ডিনার করতে। আমি তার সঙ্গে ল্যারি ডগলাসের পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বোন জানায় ল্যারির সঙ্গে ওই বিচ হাউজে একত্রে বসবাস করছেন মিস পেজ।'

ডেমিরিসের জলপাই কালো চোখের স্থিরদৃষ্টি সেঁটে রয়েছে মেটাক্সাসের ওপর, তাতে কোনো ভাব ফুটে নেই।

'আ-আমি ভাবলাম বিষয়টি আপনাকে জানানো দরকার,' দুর্বল গলায় কথা শেষ করল মেটাক্সাস।

যখন কথা বললেন ডেমিরিস গলার স্বরে কোনো ওঠানামা করল না।

'মিস পেজ যদি কিছু করেও থাকেন তা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ তাঁর ওপর স্পাইগিরি করছে বিষয়টি নিশ্চয় পছন্দ করবেন না তিনি।'

মেটাক্সাসের কপাল ভরে গেল বিন্দু বিন্দু ঘামে। জেসাস ক্রাইস্ট, পুরো পরিস্থিতি সে ঘোলাটে করে ফেলেছে। অথচ ও শুধু বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে চেয়েছে। 'বিশ্বাস করুন, মি. ডেমিরিস। আমি শুধু...'

'আমি বুঝতে পারছি তুমি ভেবেছ আমার বিরাট একটা উপকার করেছ। কিন্তু ভুল ভেবেছ। আর কিছু বলবে?'

'ন্-না, স্যার।' ঘুরল মেটাক্সাস, প্রায় ছুটে পালাল।

নিজের চেয়ারে হেলান দিলেন কনস্টানটিন ডেমিরিস, কালো চোখজোড়া নিবদ্ধ ছাদে, ফাঁকা দৃষ্টি।

পরদিন সকাল নটায় পল মেটাক্সাস একটি ফোন পেল। তাকে কঙ্গোতে ডেমিরিসের মাইনিং কোম্পানিতে রিপোর্ট করতে বলা হল। ওখানে দশদিন থাকতে হবে মেটাক্সাসকে, ব্রাজাভিল থেকে মাল এনে দিতে হবে খনিতে। বুধবারের এক সকালে, মাল বহনের তৃতীয় ফ্লাইটের সময় তার প্লেন গহিন সবুজ অরণ্যে আছড়ে পড়ল। মেটাক্সাসের ছিন্নভিন্ন শরীর কিংবা বিমানের ধ্বংসাবশেষ কিছুরই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না কোনোদিন।

ক্যাথেরিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার হপ্তাদুই পরে তার সঙ্গে দেখা করতে এল ল্যারি। শনিবারের সন্ধ্যা, ক্যাথেরিন রান্নাঘরে ডিম ভাজছিল। প্যানের শব্দে শুনতে পেল না খুলে গেছে সদরদরজা, ল্যারির আগমনও টের পেল ও ভেতরে ঢোকার পরে। চোখ তুলে দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ল্যারি। লাফিয়ে উঠল সে। ল্যারি বলল, 'তোমাকে চমকে দেয়ার জন্য দুঃখিত। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম দেখে যাই কেমন আছ।'

'ভালো আছি,' বলল ক্যাথেরিন। ঘুরল সে, প্যান থেকে তুলে নিল ওমলেট।

'গন্ধ তো ভালোই আসছে,' বলল ল্যারি। 'এখনো ডিনার করিনি। আমার জন্য একটা অমলেট বানাবে, প্লিজ?'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন, তারপর শ্রাগ করল।

ল্যারির জন্য ডিনারের আয়োজন করল ক্যাথেরিন। তবে ওর আকস্মিক আগমন ওকে এমন ঘাবড়ে দিয়েছে, খাবারই তুলতে পারল না মুখে। ল্যারি একাই বকবক করে গেল। সাম্প্রতিক এক ফ্লাইটের বিস্তারিত বর্ণনা দিল সোৎসাহে। এ সেই আগের ল্যারি—আমুদে, হাসিখুশি, যার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা কঠিন। ল্যারি এমনভাবে কথা বলছে যেন ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, ঘটেনি সম্পর্কের অবসান, সে ক্যাথেরিনের জীবনটাকে ধ্বংস করে দেয়নি।

ডিনার খেয়ে বাসনকোসনও ধুয়ে দিল ল্যারি। সিঙ্কে ক্যাথেরিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও, শারীরিক একটা কষ্ট টের পেল ক্যাথেরিন।

'রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে,' মুখে ছেলেমানুষি হাসি ফুটিয়ে বলল ল্যারি,

'ধন্যবাদ, ক্যাথি।'

ব্যস্, এখানেই সবকিছুর শেষ, ভাবল ক্যাথেরিন।

তিনদিন পরে ক্যাথেরিনের ঘরে বেজে উঠল ফোন। ল্যারি। মাদ্রিদ থেকে ফোন করেছে। বলল বাড়ি ফিরছে। জানতে চাইল সন্ধ্যায় ক্যাথেরিন তার সঙ্গে ডিনারে যেতে পারবে কিনা। শক্ত করে মুঠোয় রিসিভার চেপে ধরে থাকল ক্যাথেরিন, ওর সহজ কণ্ঠ শুনছে। 'আমি আজ রাতে ফ্রি আছি,' বলল ও।

পিরাউসের জেটির ধারের রেস্টুরেন্ট টুর্কোলিমানোতে ডিনার করল ওরা। ক্যাথেরিন খাবার প্রায় স্পর্শই করল না। ল্যারির সঙ্গে স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে ওর। খেতে পারছে না।

'তুমি তো কিছুই মুখে তুলছ না, ক্যাথি। অন্যকিছুর অর্ডার দেব?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'আমি আজ দেরিতে লাঞ্চ করেছি,' মিথ্যা বলল ক্যাথি।

কয়েকদিন পরে ল্যারি আবার ফোন করল। এবারে সিনটাগমা স্কোয়ারের একটি চমৎকার রেস্টুরেন্টে ক্যাথেরিনকে নিয়ে লাঞ্চে গেল। যথারীতি মজায় ভরিয়ে রাখল ল্যারি।

পরের রোববার ক্যাথেরিনকে নিয়ে ভিয়েনা উড়ে গেল ল্যারি। সাচার হোটেলে ডিনার সেরে ওই রাতেই ফিরে এল বাড়ি। চমৎকার একটি সন্ধ্যা ছিল ওটি। মিউজিক বাজছিল, জ্বলছিল মোমের আলো। ক্যাথেরিনের অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। ভাবছিল এসব তার জন্য নয়। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সে ল্যারিকে বলল, 'ধন্যবাদ, ল্যারি। আজকের দিনটি খুব সুন্দর ছিল।'

ল্যারি এগিয়ে এল ওর দিকে, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। সরে গেল ক্যাথেরিন, শক্ত শরীর, অপ্রত্যাশিত আতঙ্কে ভীত মন।

'না,' বলল ও।

'ক্যাথি...'

'না!'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি, 'ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি।'

শরীর কাঁপছে ক্যাথেরিনের। 'সত্যি বুঝতে পারছ?'

'জানি তোমার সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেছি,' নরম গলায় বলল ল্যারি। যদি একটা সুযোগ দাও আমাকে, নিজেকে শুধরে নেব আমি, ক্যাথি।'

গুড গড, ভাবল ক্যাথেরিন। ঠোঁটে ঠোঁট চাপল ও, কান্না থামানোর চেষ্টা করছে, ডানে-বামে মাথা নাড়ল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' ফিসফিস করল ও।

দেখল চলে গেল ল্যারি।

হপ্তাখানেক পরে ল্যারি ক্যাথেরিনকে ফুল পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে চিরকুট। এরপর নানান দেশের মিনিয়েচার পাখি। পাখিগুলো জোগাড় করতে ওর নিশ্চয় অনেক খাটনি গেছে। পাখিগুলো খুবই সুন্দর। একটি পোর্সেলিনের, একটি জেড পাথরের, একটি টিক কাঠের।

একদিন বেজে উঠল ফোন। ল্যারি। 'হেই,' বলল ও, 'আমি দারুণ একটি গ্রিক রেস্টুরেন্টের খোঁজ পেয়েছি। ওদের চাইনিজ খাবারের তুলনা হয় না।'

হেসে উঠল ক্যাথেরিন, 'আমার তর সইছে না।'

এভাবে শুরু হল। ধীরে ধীরে, ইতস্তত ভঙ্গিতে। তবে শুরুটা হয়ে গেল। ল্যারি ক্যাথেরিনকে আর চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেনি, সেও সুযোগ দেয়নি। কারণ ক্যাথেরিন জানত সে যদি আবার আবেগের সাগরে ভেসে যায়, এই মানুষটির কাছে নিজেকে আবার তুলে দেয়, লোকটি আবার তার সঙ্গে বেঈমানি করবে। তখন ধ্বংস হয়ে যাবে ক্যাথেরিন। চিরদিনের জন্য।

প্রায় প্রতিরাতেই দেখা হল ওদের। কখনো বাড়িতে ল্যারির জন্য ডিনার রান্না করল ক্যাথেরিন, আবার কখনো ল্যারি ওকে বাইরে খেতে নিয়ে গেল। একবার ল্যারিকে তার প্রেমিকার কথা জিজ্ঞেস করেছিল ক্যাথেরিন। ল্যারি জবাব দিয়েছে, 'ওই মেয়ের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।' ক্যাথেরিন ওই প্রসঙ্গে আর কখনো টেনে আনেনি। সে খুব ভালোভাবে লক্ষ করছিল ল্যারি আর কোনো মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে কিনা। তেমন কাউকে চোখে পড়েনি ওর। ল্যারি এখন ক্যাথেরিন ছাড়া কিছু চেনে না, বোঝে না। ক্যাথেরিনের সঙ্গে তার আচরণ অত্যন্ত মধুর। যেন অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে ল্যারি।

একটা পার্টিতে গিয়েছিল ওরা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সকাল চারটা। সন্ধ্যাটা চমৎকার কেটেছে। ক্যাথেরিন নতুন একটি পোশাক পরেছে। ওকে বেশ সুন্দর লাগছিল। ওর গায়ের মেদ গত কদিনে ঝরে গেছে অনেকটাই।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল ওরা, বাতি জ্বালাতে হাত বাড়িয়েছে ক্যাথেরিন, বাধা দিল ল্যারি। 'দাঁড়াও, অন্ধকারেই তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমি।' ওর খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে, তবে স্পর্শ করছে না। ক্যাথেরিনের শরীরে জেগে উঠল কামনা।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, ক্যাথি,' বলল ল্যারি। 'আমি তোমার মতো কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি। আমাকে আরেকটা সুযোগ দাও।'

আলো জ্বেলে দিল ল্যারি। তাকাল ক্যাথেরিনের দিকে। আড়ষ্ট শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। 'আমি জানি ব্যাপারটার জন্য তুমি প্রস্তুত নও, তবে আমরা ধীরে ধীরে শুরু করতে পারি,' হাসল ও। ছেলেমানুষি, মিষ্টি, নিষ্পাপ হাসি। 'হাতে হাত ধরে শুরু করা যায়।'

ক্যাথেরিনের হাত ধরল ল্যারি। ওকে কাছে টানল ক্যাথেরিন, দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট মিলে গেল। ল্যারি সাবধানে চুমু খাচ্ছে কিন্তু ক্যাথেরিন বুনো হয়ে উঠল।

বহুদিন পুরুষসঙ্গ থেকে বঞ্চিত সে। ভাঁপ বেরুচ্ছে যেন গা থেকে।

ওরা বিছানায় উঠে এল। এমনভাবে প্রেম শুরু করল যেন ফুরিয়ে যাবে সময়, যেন মধুচন্দ্রিমায় এসেছে ওরা। ওদের প্যাশন এখনো আগের মতোই ফ্রেশ। ওরা পরস্পরকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করছে, যেন ওরা বুঝতে পেরেছে আর কখনো কেউ কাউকে আঘাত দেবে না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

'চলো, আরেকবার হানিমুন করে আসি,' প্রস্তাব দিল ল্যারি।

'ওহ্, ইয়েস, ডার্লিং। সত্যি যাবে?'

'অবশ্যই। আমার একটা ছুটি পাওনা আছে। আমরা শনিবার রওনা হব। চমৎকার একটি জায়গায় যাব। জায়গাটির নাম আইওনিনা।'

নোয়েল ও ক্যাথেরিন
এথেন্স : ১৯৪৬

১৯

গাড়িতে আইওনিনা পৌঁছুতে নয় ঘণ্টা লাগল। ঈজিয়ান সাগরের তীর ঘেঁষে এগোল ওরা, রাস্তার দুপাশে সাদারঙের কুটির, ছাদে ক্রস লাগানো। আসার পথে অসংখ্য ফলের গাছ চোখে পড়ল। মাঠভর্তি লেবু, চেরি, আপেল আর কমলালেবু। জমিনের প্রতিটি ইঞ্চি চাষ করা হয়েছে, খামারবাড়িগুলোর জানালা এবং ছাদ নীলরঙের। গ্রামগুলোর নাম অদ্ভুত। উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় : মেসোসোনিয়ান, আজেলকাসট্রেন, ইটোলিকন, আমফিলহোইয়া ইত্যাদি।

শেষ বিকেলে ওরা রিও নদীর তীরের গ্রাম রিওন-এ পৌঁছুল। এখান থেকে ফেরিবোটে চেপে পৌঁছুবে আইওনিনা।

ফেরির ওপরের ডেকে একটা বেঞ্চিতে বসেছে ক্যাথেরিন এবং ল্যারি। দূরে বিকেলের কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠল বড় একটি দ্বীপের কাঠামো। অতি প্রাচীন দ্বীপ, যেন দেবতারা তৈরি করেছেন এ দ্বীপ। বোট কাছিয়ে যেতে ক্যাথেরিন দেখতে পেল দ্বীপটি বড় বড় পাথরে ঘেরা। দ্বীপের পাহাড়ের মাঝখানটা কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

পঁচিশ মিনিট বাদে ইপিরাসের ছোট জেটিতে ভিড়ল ফেরি। কয়েক মিনিট পরে ক্যাথেরিন এবং ল্যারি পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলল আইওনিনা অভিমুখে।

সন্ধ্যার আগে আগে হোটেলে পৌঁছে গেল ওরা। পাহাড়ের ওপর একতলা একটি ভবন। পাহাড়ের পাদদেশে এক-সার অতিথি-বাংলো। ইউনিফর্ম পরা এক বুড়ো বেরিয়ে এল ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে।

'হানিমুন করতে এসেছেন, না?' বলল বুড়ো।

ক্যাথেরিন ল্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'বুঝলে কী করে?'

'দেখলেই বোঝা যায়,' বলল বুড়ো। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল লবিতে। এখানে খাতায় নাম লেখাতে হল। তারপর বাংলোয় নিয়ে গেল।

বাংলোয় একটি লিভিংরুম, বেডরুম, বাথরুম এবং কিচেন ছাড়াও টেরেস

রয়েছে। এখান থেকে গ্রাম এবং নিচের হ্রদ দেখা যায়। অন্ধকার লেক। অপার্থিব এক সৌন্দর্য।

'খুশি?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন। 'এমন খুশি লাগেনি কোনোদিন।' সে হেঁটে গেল ল্যারির পাশে। শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল। 'আমাকে ছেড়ে আর কখনো যাবে না।' ফিসফিস করল ক্যাথেরিন। শক্তিশালী বাহু দিয়ে ক্যাথেরিনকে আলিঙ্গন করল ল্যারি। 'যাব না।'

ক্যাথেরিন সুটকেস খোলায় ব্যস্ত, ল্যারি লবিতে রুমক্লার্কের সঙ্গে কথা বলতে গেল।

'এখানকার লোকেরা করে কী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সবকিছু,' গর্বিত গলায় ঘোষণা করল ক্লার্ক। 'হোটেলে হেলথ স্পা আছে। গাঁয়ে হাইকিং, ফিশিং, সুইমিং, বোটিং সবকিছুর সুবিধা আছে।'

'লেক কতটা গভীর?'

শ্রাগ করল ক্লার্ক। 'কেউ জানে না, স্যার। ভলকানিক লেক। এ হ্রদের তল খুঁজে পাওয়া ভার।'

'এদিকে গুহাটুহা নেই?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'আছে তো। পেরামার গুহা। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।'

'ওই গুহায় সবাই যায়?'

'অল্প কটা গুহা পরিচিত। বাকিগুলো এখনো অজানা।'

'ও, আচ্ছা।' বলল ল্যারি।

বলে চলল ক্লার্ক, 'পাহাড়ে চড়তে চাইলে মাউন্ট জুমের্কায় যাবেন। অবশ্য অনেক উঁচু পাহাড়। মিসেস ডগলাস ভয় পেতে পারেন।'

'ভয় পাবে না,' হাসল ল্যারি, 'সে দক্ষ ক্লাইম্বার।'

'তাহলে তো কথাই নেই। এখন আবহাওয়াও ভালো। মেলটেমির আশঙ্কা করছি বটে তবে বোধহয় আসবে না।'

'মেলটেমিটা কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'ভয়ানক ঝড়। উত্তরদিক থেকে ধেয়ে আসে। আপনাদের হারিকেনের মতো। মেলটেমি এলে সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে। এথেন্সে, এমনকি জাহাজ পর্যন্ত জেটি ছাড়ার সাহস করে না।'

'ভাগ্যিস এখন ঝড় হবে না,' বলল ল্যারি।

ল্যারি ফিরে এল বাংলোয়। ক্যাথেরিনকে প্রস্তাব দিল গাঁয়ে গিয়ে ডিনার করবে। খাড়া ঢাল সটান নেমে গেছে নিচে, মিশেছে গ্রামের কোণে। আইওনিনায় রাজপথ আছে একটাই—কিং জর্জ এভিন্যু। এর দুপাশে দু-তিনটে ছোটছোট রাস্তা। এসব রাস্তা থেকে একটি সরু গলি বেরিয়েছে, মিশেছে বাড়ি এবং অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গে।

পাথুরে ভবনগুলো পুরোনো, কালের আঘাতে বিবর্ণ।

কিং জর্জ এভিন্যুর মাঝখানে রশি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে যাতে গাড়ি বামদিক দিয়ে যায় এবং পথচারীরা রাস্তার ডানে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারে।

'পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে এরকম ব্যবস্থা করা উচিত,' মন্তব্য করল ক্যাথেরিন।

টাউন স্কোয়ারে ছোট একটি পার্ক আছে। পার্কে উঁচু একটি টাওয়ার। টাওয়ারের মাথায় বড়সড় একটি ঘড়ি। রাস্তার দুপাশে প্লাটানাস গাছের সারি চলে গেছে লেক অবধি। ক্যাথেরিনের মনে হল গাঁয়ের সবগুলো রাস্তাই যেন লেকের জলে গিয়ে নেমেছে। লেকটা দেখে ঢিবঢিব করল বুক। লেকের তীরে লম্বা নলখাগড়া ঝোপ, যেন ক্ষুধার্ত আঙুল বাড়িয়ে রেখে অপেক্ষা করছে কারো জন্য।

ক্যাথেরিন এবং ল্যারি বর্ণালি শপিং সেন্টারে হাঁটছে। রাস্তার দুপাশে সারিসারি দোকান। জুয়েলারি স্টোর, তারপাশে বেকারি, কসাইর দোকান, একটি শুঁড়িখানা, জুতোর দোকান। কতগুলো বাচ্চা একটি নাপিতের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে এক লোকের দাড়ি কামানোর দৃশ্য দেখছে। এত সুন্দর বাচ্চা খুব কমই দেখেছে ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিন ল্যারিকে বেশ কয়েকবারই সন্তান নিতে বলেছে। কিন্তু প্রতিবারই 'প্রস্তুত নয়' বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে ল্যারি। এবারে হয়তো অন্যরকম কিছু ভাববে ল্যারি। ক্যাথেরিন তার স্বামীর দিকে তাকাল। এখানকার সবার চেয়ে লম্বা ল্যারি, ওকে গ্রিক দেবতার মতো লাগছে। ক্যাথেরিন সিদ্ধান্ত নিল এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে সন্তান নেয়ার বিষয়ে আবার কথা বলবে ল্যারির সঙ্গে। শত হলেও এটা ওদের হানিমুন।

স্কোয়ারে বসে মুসাকা খেল ওরা। মাথার ওপরে অবিশ্বাস্য সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ। ডিনার শেষে হোটেলে ফিরল দুজনে। প্রেম করল। সারাটা দিন চমৎকার কেটেছে আজ।

পরদিন সকালে গ্রামে চলে এল ওরা। সরু রাস্তায় হেঁটে বেড়াল, পাথুরে উপকূল ধরে ছোটাছুটি করল। পাহাড়ে ঢালের কিনারে পাথরের বাড়ি। তারপর জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে সাদা একটি ভবন নজর কাড়ল ওদের। প্রাসাদের মতো দেখতে ভবনটি। জঙ্গলের মধ্যে রাজপ্রাসাদ?

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'কী জানি!' বলল ল্যারি।

'চলো তো দেখে আসি।'

'চলো।'

কাদামাখা রাস্তায় গাড়ি চালাল। একটা তৃণভূমি পড়ল সামনে। ছাগল আর ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। জানোয়ারগুলো ওদেরকে মুখ তুলে দেখল। ভবনের সামনে গাড়ি থামাল ল্যারি। পুরোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের মতো লাগছে।

ল্যারি এবং ক্যাথেরিন নেমে এল গাড়ি থেকে। প্রকাণ্ড কাঠের দরজায় পা বাড়াল। বিরাট এক লোহার ডাণ্ডা দরজার মাঝখানে। ডাণ্ডায় কয়েকবার বাড়ি দিল ল্যারি। তৃণভূমির পোকাদের ঐকতান ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। আর শুধু ঘাসের ভেতরে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফাস।

'মনে হয় এখানে কেউ থাকে না,' বলল ল্যারি।

এমন সময় ভবনের প্রকাণ্ড দরজা ক্যাচম্যাচ শব্দে খুলে গেল। কালো পোশাক পরা এক নান এসে দাঁড়াল সামনে।

ক্যাথেরিন বলল, 'আ-আমি দুঃখিত। ভবনটা কিসের জানার জন্য এসেছিলাম।'

নান একমুহূর্ত দেখল ওদেরকে, তারপর ইশারা করল ভেতরে যেতে। ওরা পা বাড়াল ভেতরে।

বড়সড় একটা উঠোনে চলে এল। কেমন অদ্ভুত একটা পরিবেশ, থমথমে। মানুষজনের সাড়া নেই।

নানের দিকে ফিরল ক্যাথেরিন, 'এ জায়গাটা কিসের?'

নান কিছু বলল না, শুধু ইঙ্গিত করল ওদেরকে অপেক্ষা করতে। কমপাউন্ডের শেষমাথায়, পুরোনো একটি ভবনের দিকে পা বাড়াল সে।

'ও ড্রাকুলা বেলা লুগোসিকে খবর দিতে গেল,' ফিসফিস করল ক্যাথেরিন। একটা কবরস্থান দেখতে পেল ওরা সাগরের ধার ঘেঁষে। চারপাশ ঘিরে আছে লম্বা সাইপ্রাস গাছে।

'আমার গা ছমছম করছে,' বলল ল্যারি।

'যেন অন্য আরেক শতাব্দীতে পৌঁছে গেছি,' বলল ক্যাথেরিন। ওরা নিজেদের অজান্তেই ফিসফিস করে কথা বলছে যেন অখণ্ড নীরবতা ভেঙে যাওয়ার ভয়ে। মূল ভবনের জানালায় কয়েকটি মুখ দেখতে পেল ওরা। সবাই মহিলা। কালো পোশাক পরনে। তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'এটা কোনো ধর্মীয় পাগলা গারদ,' বলল ল্যারি।

ভবন থেকে এক লম্বা, রোগা মহিলা বেরিয়ে এলেন। দ্রুত হেঁটে আসছেন ওদের দিকে। তাঁরও পরনে নানের পোশাক, মুখখানাও হাসিখুশি।

'আমি সিস্টার টেরেসা,' বললেন তিনি, 'আপনাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আমরা এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলল ক্যাথেরিন, 'ভবনটা দেখে খুব কৌতূহল হল।' জানালায় উঁকিঝুঁকি দিতে থাকা মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে যোগ করল, 'আমরা আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি।'

'আমাদের এখানে দর্শনার্থী আসে না বললেই চলে,' বললেন সিস্টার টেরেসা। 'বাইরের জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন আমরা। আমরা অর্ডার অভ ফারমেলিট নান। আমরা নীরব থাকার শপথ নিয়েছি।'

'কতদিনের জন্য?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'জিয়া পানটা—যতদিন বেঁচে থাকব। একমাত্র আমারই অনুমতি আছে প্রয়োজনের সময় কথা বলার।'

ক্যাথেরিন প্রকাণ্ড, জনশূন্য উঠোনে চোখ বুলিয়ে শিউরে উঠল, 'এখানে আর কেউ থাকে না?'

হাসলেন সিার টেরেসা। 'না। থাকার কারণও নেই। আমাদের জীবন চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

'আপনাদেরকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি,' বলল ক্যাথেরিন।

মাথা নাড়লেন সিস্টার, 'না, ঠিক আছে। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।'

ভবন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল প্রকাণ্ড গেট। ক্যাথেরিন পেছন ফিরে দেখল। এ যেন এক জেলখানা। কিংবা জেলখানার চেয়েও খারাপ। জানালায় দেখা তরুণী মুখগুলোর কথা ভাবল ও। চার দেয়ালের মাঝে বন্দি, সারাজীবনের জন্য বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ওরা, কবরের স্থায়ী নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটাতে হবে বাকি দিনগুলো। এ জায়গার কথা জীবনেও ভুলবে না ক্যাথেরিন।

নোয়েল ও ক্যাথেরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

২০

ওইদিন সকালেই ল্যারি গ্রামে গেল। ক্যাথেরিনকে সঙ্গে নিতে চাইল। কিন্তু ও যাবে না। ঘুমাবে। ল্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ক্যাথেরিন। জামাকাপড় পরে চলে এল হোটেল জিমনাশিয়ামে। ইন্সট্রাক্টর এক গ্রিক আমাজন। মহিলা নগ্ন হতে বলল ক্যাথেরিনকে। ওর শরীর খুঁটিয়ে দেখল।

'আপনি বড্ড অলস,' ভৎর্সনা করল সে ক্যাথেরিনকে। 'আপনার শরীর বেশ সুন্দর ছিল। তবে ব্যায়াম ট্যায়াম করলে আবার আগের চেহারা ফিরে পাবেন।'

'ফিরে পেতে চাই,' বলল ক্যাথেরিন।

শরীরচর্চা শুরু হয়ে গেল ওর। যন্ত্রণাদায়ক বডি ম্যাসাজ, স্পার্টান ডায়েট এবং কঠোর অনুশীলন। ল্যারির কাছে বিষয়টি গোপন রাখল। তবে চতুর্থ দিনের দিন ল্যারির কাছ থেকে প্রশংসাসূচক মন্তব্য শুনে খুশি হল ক্যাথেরিন।

'এ জায়গাটাতে তোমাকে ভালোই মানিয়ে গেছে,' বলল ল্যারি। 'তোমাকে অন্যরকম লাগছে।'

'আমি এখন অন্যরকমই,' বলল ক্যাথেরিন, হঠাৎ একরাশ লজ্জা ঘিরে ধরল ওকে।

রোববার ভোরে গির্জায় গেল ক্যাথেরিন। আইওনিনার মতো ছোট গাঁয়ে লিলিপুট সাইজের গির্জা আশা করেছিল ও। কিন্তু বৃহদায়তনের চার্চটি দেখে কপালে উঠে গেল চোখ। সুসজ্জিত গির্জার ছাদ ও দেয়ালে দারুণ সুন্দর সব ছবি, মেঝে মার্বেলপাথরের। বেদির সামনে ডজনখানেক প্রকাণ্ড রুপোর মোমদানি। প্রিস্ট হালকা পাতলা গড়নের, মুখে কালো দাড়ি। পরনে সোনালি-লাল রঙের আলখেল্লা এবং লম্বা, কালো হ্যাট।

দেয়াল ঘেঁষে সবার জন্য আলাদা কাঠের বেঞ্চি। তারপাশে সারবাঁধা কাঠের চেয়ার। পুরুষরা গির্জার সামনের দিকে বসে, মেয়েরা পেছনে। পুরুষরা বোধহয়

আগে স্বর্গে যেতে চায়, ভাবল ক্যাথেরিন।

গ্রিক ভাষায় স্তোত্র পাঠ শুরু হল। উঁচু প্লাটফর্ম থেকে নেমে এলেন প্রিস্ট, এগোলেন বেদির দিকে। লাল একটি পর্দা সরে গেল, পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন দামি আলখেল্লা পরা, সাদা দাড়ির বিশপ। তাঁর সামনে একটি টেবিল। তাতে রত্নখচিত একটি খাট এবং সোনার ক্রুশ। একসঙ্গে বাঁধা তিনটি মোমবাতি জ্বালালেন বৃদ্ধ। ক্যাথেরিন অনুমান করল এটা হলি ট্রিনিটি। মোমবাতিগুলো প্রিস্টের হাতে তুলে দিলেন বিশপ।

প্রার্থনাসভা চলল একঘণ্টা। শব্দ এবং দৃশ্য মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছে ক্যাথেরিন। নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হচ্ছে। সে প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতা জানাল ঈশ্বরের প্রতি।

পরদিন সকাল। লেকের দিকে মুখ ফেরানো বাংলোর টেরেসে বসে নাস্তা করছে ক্যাথেরিন এবং ল্যারি। হ্রদ থেকে বয়ে আসছে অলস বাতাস। এক তরুণ ওয়েটার খাবার দিয়ে গেছে। ক্যাথেরিনের পরনে পাতলা নেগলিজি। ওয়েটারকে আসতে দেখে ল্যারি জড়িয়ে ধরল ক্যাথেরিনের কোমর, চুমু খেল গালে।

আড়ষ্ট হেসে দ্রুত চলে গেল ওয়েটার। একটু অস্বস্তি লাগছে ক্যাথেরিনের। সবার সামনে এভাবে বউকে আদর করে না ল্যারি। ও সত্যি বদলে গেছে, ভাবল ক্যাথেরিন। লক্ষ করেছে যখনই কোনো মেইড বা বেলবয় ঘরে ঢুকেছে, ল্যারি ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। যেন গোটা দুনিয়াকে দেখাতে চায় সে ক্যাথেরিনকে কত ভালোবাসে। ব্যাপারটা উপভোগ করে ক্যাথেরিন।

'দারুণ একটা প্ল্যান করেছি আমি,' বলল ল্যারি। হাত তুলে পুবদিক দেখাল। ওদিকে আকাশ ছুঁয়েছে বিশাল এক পাহাড়চুড়ো। 'আমরা মাউন্ট জুমেরকায় উঠব।'

'আমার একটা নীতি আছে,' ঘোষণার সুরে বলল ক্যাথেরিন, 'খটোমটো নামঅলা পাহাড়ে আমি চড়ি না।'

'আরে, ওখান থেকে দারুণভাবে উপভোগ করা যায় নিসর্গ।'

ল্যারি সিরিয়াস বুঝতে পেরে আবার পাহাড়ের দিকে তাকাল ক্যাথেরিন। 'আমি আসলে তেমন পাহাড় বাইতে পারি না, ডার্লিং।'

'কোনো সমস্যা হবে না। ওই পাহাড়ে চড়া খুব সোজা,' ইতস্তত করল ল্যারি, 'অবশ্য তুমি যেতে না চাইলে আমি একাই যাব।' ওর কণ্ঠে হতাশার সুর।

ওকে 'না' বলে দিতে পারে ক্যাথেরিন। কিন্তু ল্যারি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে। না-গেলে বেচারা প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। ওকে কষ্ট দিতে চায় না ক্যাথেরিন।

'ঠিক আছে। দেখি কত উঁচুতে উঠতে পারি,' বলল ক্যাথেরিন।

স্বস্তির ছায়া পড়ল ল্যারির মুখে। ক্যাথেরিন ওকে খুশি করতে যেতে রাজি হয়েছে বটে, তবে সত্য হল জীবনেও পাহাড়ে ওঠেনি সে।

গাড়ি নিয়ে একটি তৃণভূমিতে চলে এল ওরা। গ্রামের একটি বাঁক থেকে শুরু হয়েছে পাহাড়ের ট্রেইল। ওখানে গাড়ি থামাল ল্যারি। রাস্তার পাশে খাবারের ছোট্ট একটি দোকান। ল্যারি ওখান থেকে কিছু স্যান্ডউইচ, ফল, ক্যান্ডি বার এবং বড় এক থার্মোফ্লাস্ক কফি কিনল।

'পাহাড়টি পছন্দ হয়ে গেলে,' ল্যারি বলল দোকানের মালিককে, 'আমি আর আমার বধূ রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেব।' ক্যাথেরিনকে আলিঙ্গন করল ও। মুচকি হাসল দোকানদার।

ট্রেইলের মাথায় এসে দাঁড়াল ক্যাথেরিন এবং ল্যারি। আসলে ট্রেইল দুটো, শাখাটা চলে গেছে বিপরীত দিকে। দেখে মনে হচ্ছে পাহাড় বাইতে কষ্ট হবে না। রাস্তা চওড়া এবং খুব বেশি খাড়া নয়। মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে পাহাড়চুড়োয় তাকাল ক্যাথেরিন। চুড়োটা গম্ভীর এবং নিষিদ্ধ মনে হল। অবশ্য অত উঁচুতে ওরা যাবে না। অল্প উঁচুতে উঠে পিকনিক করবে।

'এই পথে,' বলল ল্যারি। ক্যাথেরিনকে নিয়ে বামদিকের ট্রেইলে এগোল। ওরা পাহাড় বাইতে শুরু করেছে। 'ভুরু কুঁচকে ওদেরকে দেখল দোকানদার। সে কি ছুটে গিয়ে বলবে ওরা ভুল রাস্তায় যাচ্ছে? যে রাস্তায় ওরা যাচ্ছে ওটা খুবই বিপজ্জনক, একমাত্র দক্ষ পর্বতারোহীরাই এ রাস্তায় যাওয়ার সাহস দেখায়। কিন্তু ওই মুহূর্তে কয়েকজন খদ্দের চলে আসায় দোকানদার তাদের দিকে মনোযোগ ফেরাল।

সূর্য উত্তপ্ত। তবে ওরা যত ওপরে উঠছে, ততই শীতল বাতাসের ছোঁয়া পাচ্ছে গায়ে। চমৎকার একটি দিন। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে থাকতে খুব ভালো লাগছে ক্যাথেরিনের। মাঝে মাঝেই নিচের দিকে তাকাচ্ছে। অবাক লাগছে ভেবে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। বাতাস এখানে পাতলা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ল্যারির পেছনে ক্যাথেরিন। রাস্তা সাংঘাতিক সরু বলে পাশাপাশি চলার জো নেই। ল্যারি কখন থামবে, কখন পিকনিক করবে বুঝতে পারছে না ক্যাথেরিন।

ল্যারি পেছন ফিরে দেখল পাহাড় বাইতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাথেরিনের। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সরি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ক্যাথেরিন। 'উচ্চতার কারণে মাথাটা একটু ভোঁ ভোঁ করছে।' নিচে তাকাল। 'নামতে অনেক সময় লাগবে।'

'লাগবে না,' বলল ল্যারি। ঘুরল। আবার বাইতে শুরু করল পাহাড়। ক্যাথেরিন ওর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর টলতে টলতে উঠতে শুরু করল ট্রেইল বেয়ে।

'আমার আসলে একজন দাবা খেলোয়াড়কে বিয়ে করা উচিত ছিল,' পেছন

থেকে বলল ক্যাথেরিন। জবাব দিল না ল্যারি।

ল্যারি হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বাঁকে এসে হাজির হল। ওর সামনে কাঠের ছোট একটি সেতু, দুপাশে রশি বাঁধা। গভীর খাদ হাঁ হয়ে আছে সেতুর নিচে। বাতাসে দুলছে সেতু, একজন মানুষের ওজনও বইতে পারবে কিনা সন্দেহ। সেতুর পচা কাঠের তক্তায় একটা পা রাখল ল্যারি, ওজনের ভারে মড়মড় করে উঠল, দেবে গেল নিচের দিকে। নিচে তাকাল ও। খাদটা কমপক্ষে এক হাজার ফুট গভীর। ল্যারি সেতু পার হতে লাগল। সাবধানে ফেলছে প্রতিটি পা। শুনতে পেল ক্যাথেরিনের ডাক। 'ল্যারি!'

ঘুরল ও। ক্যাথেরিন সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'এ সেতু তো পার হতে পারব না,' বলল ও, 'একটা বেড়ালের ভারও সইতে পারবে না এটা।'

'আমরা তো উড়তে জানি না। কাজেই পার হতেই হবে।'

'কিন্তু সেতুটা আমার কাছে মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না।'

'লোকে প্রতিদিন এ সেতু পার হয়,' ঘুরল ল্যারি, পা বাড়াল। ক্যাথেরিন দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়।

সেতুতে পা রাখল ক্যাথেরিন, দুলতে শুরু করল ওটা। গভীর খাদে তাকাল ও, ভয়ে শিরশির করে উঠল গা। মুখ তুলে চাইল। ল্যারি অপরপ্রান্তে প্রায় পৌঁছে গেছে। দাঁতে দাঁত চাপল ক্যাথেরিন, রশি ধরল এবং চলা শুরু করল। প্রতিটি পদক্ষেপে দোল খেল সেতু। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ক্যাথেরিন, শক্ত করে ধরে আছে রশি, নিচের অতল খাদের দিকে না-তাকানোর চেষ্টা করছে। ওর চেহারায় ভয় ফুটে আছে দেখতে পেল ল্যারি। যখন ল্যারির পাশে চলে এল ক্যাথেরিন, কাঁপছে রীতিমতো। ভয়ে এবং শীতে। বরফঢাকা পাহাড়চুড়ো থেকে হু হু করে বইছে শীতল হাওয়া।

ক্যাথেরিন বলল, 'আমার মনে হয় না কোনোদিন পর্বতারোহী হতে পারব। এখন কি আমরা ফিরে যাব, ডার্লিং?'

অবাকচোখে ওর দিকে তাকাল ল্যারি। 'আমরা তো এখনো চুড়োয় উঠে নিসর্গই দেখলাম না?'

'যা দেখার অনেক দেখেছি। সারাজীবন মনে থাকবে।'

ক্যাথেরিনের বাহুতে হাত রাখল ল্যারি। 'সামনে পিকনিক করার চমৎকার একটি জায়গা আছে। ওখানে গিয়ে আমরা শেষ করব যাত্রা। ঠিক আছে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল ক্যাথেরিন, 'আচ্ছা।'

'এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কথা।'

ল্যারি আবারো রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করল। ওর পেছনে ক্যাথেরিন। এখান থেকে গ্রামটিকে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, যেন কুরিয়ার অ্যান্ড ইভস-এর

পোস্টকার্ড। তবে পাহাড় বাইতে জান ছুটে যাচ্ছে ক্যাথেরিনের। পাজোড়া সিসার মতো ভারি। নিশ্বাস এখন হাঁপানিতে পরিণত হয়েছে। ও জানে না কতক্ষণ ধরে পাহাড় বাইছে। নিচে তাকালে গ্রামটিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মনে হচ্ছে। রাস্তাটা ক্রমে সরু এবং খাড়া হয়ে উঠছে। একটা খাদের পাশ দিয়ে বেঁকে চলে গেছে। পাহাড়ি দেয়াল আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠছে ক্যাথেরিন। ল্যারি বলছিল এই পাহাড় বাওয়া পানির মতো সোজা। কিন্তু পাহাড়ি ছাগল ছাড়া এ পাহাড় কেউ বাইতে পারবে না, ভাবল ক্যাথেরিন। ট্রেইলটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ওটার কোনো অস্তিত্ব আছে বলেও মনে হচ্ছে না। এ ট্রেইল হয়তো কেউ ব্যবহারও করে না। এদিকে ফুল নেই, আছে শুধু শ্যাওলা আর পাহাড়ের গায়ে জমানো বাদামি রঙের আগাছা। ক্যাথেরিন জানে না আর কতক্ষণ সে পাহাড় বাইতে পারবে। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরতেই রাস্তাটা অদৃশ্য হয়ে গেল সামনে থেকে, পায়ের নিচে আত্মপ্রকাশ করল অতলস্পর্শী খাদ। 'ল্যারি?' আর্তনাদ করে উঠল ক্যাথেরিন।

চট করে ওর পাশে চলে এল ল্যারি। হাত ধরে টেনে নিয়ে এল পেছনে। কতগুলো পাথরের পাশ দিয়ে আবার দেখা গেল রাস্তাটি। ক্যাথেরিনের পাঁজরে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ভোঁ ভোঁ করছে মাথা। ল্যারির সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘুরল। দেখল ওর পাশের বাঁকেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়চুড়ো। ওরা চুড়োয় উঠে এসেছে!

সমতল জমিনে শুয়ে পড়ল ক্যাথেরিন। শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। ওর চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। কেটে গেছে ভয়। এখন আর আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ল্যারি বলেছে নিচে নামতে কষ্ট হবে না।

'এখন কি একটু ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন, 'হ্যাঁ।' থেমে গেছে বুকের ধুকপুক। আবার স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে। গভীর দম নিল ক্যাথেরিন, হাসল স্বামীর দিকে তাকিয়ে।

'কঠিন পর্বটা শেষ হয়েছে, না?' জিজ্ঞেস করল ও।

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ল্যারি। তারপর জবাব দিল, 'হ্যাঁ, শেষ হয়েছে, ক্যাথি।'

এক কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হল ক্যাথেরিন। ছোট্ট মালভূমিতে কাঠের একটি অবজারভেশন প্লাটফর্ম দেখতে পাচ্ছে ও। কিনারে রেলিং দিয়ে ঘেরা। এখান থেকে নিচের শ্বাসরুদ্ধকর নিসর্গ উপভোগ করা যায়। কয়েক হাত দূরে একটা পথ নেমে গেছে পাহাড়ের অপর পাশ দিয়ে।

'ওহ্, ল্যারি, দৃশ্যটা সত্যি খুব সুন্দর,' বলল ক্যাথেরিন, 'নিজেকে ম্যাগেল্লানের মতো লাগছে।' হাসল সে ওর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু ল্যারি তাকিয়ে

রয়েছে অন্যদিকে, শুনছে না ক্যাথেরিনের কথা। ওকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছে, কী নিয়ে যেন দুশ্চিন্তা করছে। মুখ তুলে তাকাল ক্যাথেরিন, চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো! একগুচ্ছ সাদা মেঘ ভেসে আসছে ওদের দিকে, পাহাড়ি বাতাস ঠেলে নিয়ে আসছে। এদিকেই আসছে মেঘ। এত কাছে মেঘ কখনো দেখিনি আমি। মনে হচ্ছে স্বর্গে আছি।'

ল্যারি দেখছে ক্যাথেরিন টলতে টলতে সিধে হল, পা বাড়াল চুড়োর কিনারে, কাঠের পচা রেলিঙের দিকে। মেঘের ভেলা প্রায় ক্যাথেরিনের কাছে চলে এসেছে, গ্রাস করতে চলেছে ওকে। পরমুহূর্তে ধূসর কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

সিধে হল ল্যারি। দাঁড়িয়ে থাকল একমুহূর্ত, তারপর নীরবে এগোল ক্যাথেরিনের দিকে। কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ল। থেমে দাঁড়াল। ঠাহর করতে পারছে না ক্যাথেরিন ঠিক কোথায় আছে। সামনে থেকে ভেসে এল ওর কণ্ঠ, 'ওহ্, ল্যারি। কী দারুণ লাগছে! আমার কাছে চলে এসো।'

কণ্ঠ লক্ষ্য করে ধীরপায়ে এগিয়ে চলল ল্যারি। 'ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে যেন,' উল্লাসে চেঁচাচ্ছে ক্যাথেরিন। 'টের পাচ্ছ না?' ক্যাথেরিনের কণ্ঠ আরো কাছ থেকে শোনা গেল, মাত্র কয়েক হাত দূরে। আরেক কদম এগোল ল্যারি, হাত থাবার মতো বাড়িয়ে রেখেছে, ক্যাথেরিনকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

'ল্যারি! কোথায় তুমি?'

ক্যাথেরিনের কাঠামো এখন দেখতে পাচ্ছে ল্যারি, কুয়াশায় যেন মোচড় খাচ্ছে। চুড়োর একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঠিক ল্যারির সামনে। ঠিক সে মুহূর্তে মেঘটা সরে গেল। ঘুরল ক্যাথেরিন। ঘুরেই ল্যারিকে দেখতে পেল। ওর থেকে দু হাত দূরেও নয়।

চমকে উঠে এক কদম পিছিয়ে গেল ক্যাথেরিন। 'বাপরে! একদম ভয় পাইয়ে দিয়েছ আমাকে!'

আরেক পা বাড়ল ল্যারি, হাসছে। দুহাত দিয়ে ধরল ওকে। ঠিক তখন কথা বলে উঠল কে যেন, 'ফর ক্রাইস্ট শেক, ডেনভারে এরচেয়ে বড় পাহাড় আছে!'

পাঁই করে ঘুরল ল্যারি। মুখ সাদা। পাহাড়ের অপরপাশের রাস্তা দিয়ে উঠে এসেছে একদল ট্যুরিস্ট, তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে গ্রিক এক গাইড। ক্যাথেরিন এবং ল্যারিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সুপ্রভাত,' বিস্মিত গলায় বলল সে। 'আপনারা নিশ্চয় পুবের ঢাল বেয়ে উঠেছেন।'

'হুঁ,' শক্ত গলা ল্যারির।

মাথা নাড়ল গাইড, 'ওদের আসলে মাথার ঠিক নেই। ওদের উচিত ছিল আপনাদেরকে বলে দেয়া ওটা অত্যন্ত বিপজ্জনক রাস্তা। বরং এদিকের ঢাল অনেক নিরাপদ।'

‘পরের বারে মনে রাখব কথাটা,’ কর্কশ গলায় বলল ল্যারি।

ওর ভেতরে যে উত্তেজনা লক্ষ করেছিল ক্যাথেরিন, তা হঠাৎই যেন মিইয়ে গেল। যেন একটা সুইচ আকস্মিক বন্ধ করে দেয়া হল।

‘এ নরক থেকে বেরিয়ে পড়ি, চলো,’ বলল ল্যারি।

‘কিন্তু—মাত্রই তো এলাম। কোনো সমস্যা?’

‘না,’ খেঁকিয়ে উঠল সে, ‘লোকজনের ভিড় ভাল্লাগে না আমার।’

নামার সময় সহজ রাস্তাটা ব্যবহার করল ওরা। সারাটা পথ একটা কথাও বলল না ল্যারি। বরফশীতল রাগে যেন ফুঁসছে, কিন্তু ক্যাথেরিন জানে না কেন। ও তো ল্যারির সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। লোকগুলোকে দেখার পরেই যেন মুড বদলে গেল ল্যারির। ওর রাগের কারণ হঠাৎ বুঝতে পারল ক্যাথেরিন। হাসি ফুটল মুখে। ল্যারি আসলে মেঘের মধ্যে প্রেম করতে চেয়েছে ওর সঙ্গে! এজন্যই দু'বাহু বাড়িয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছিল। ট্যুরিস্টদের আগমনে তার পরিকল্পনাটাই ভেস্তে গেছে। খুশিতে জোরে হেসে ফেলল ক্যাথেরিন। ল্যারি ওর আগে আগে লম্বা পা ফেলে চলেছে। ক্যাথেরিন সিদ্ধান্ত নিল হোটেলে ঢুকেই ল্যারির মনের ইচ্ছে পূরণ করবে।

কিন্তু বাংলোতে ঢুকে ক্যাথেরিন ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গেছে, ঠেলে সরিয়ে দিল ল্যারি। বলল ক্লান্ত।

রাত তিনটার সময়ও ঘুম এল না ক্যাথেরিনের। এখনো উত্তেজনা বোধ করছে। আজকের দিনটি ভয় এবং আনন্দ দুইয়ের মধ্যেই কেটেছে। পাহাড়ি খাড়া ঢাল, নড়বড়ে সেতু এবং পাহাড়চুড়োর কথা ভাবছে ও। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা রিসেপশন ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলতে গেল ল্যারি।

‘আপনি কী একটা গুহার কথা বলছিলেন সেদিন,’ শুরু করল সে।

‘ও, হ্যাঁ,’ বলল ক্লার্ক। ‘কেভস অব পেরামা। দারুণ সুন্দর। ওই গুহা না দেখলে মিস করবেন।’

‘দেখতে চাই,’ হালকা গলায় বলল ল্যারি। ‘গুহাটুহা আমার পছন্দের জিনিস না হলেও আমার স্ত্রী এ গুহার কথা শোনার পর থেকে বলছে ওখানে তাকে নিয়ে যেতে। সে আবার এসব জিনিস খুব পছন্দ করে।’

‘আপনাদের দুজনেরই গুহা পছন্দ হবে, মি. ডগলাস। শুধু সঙ্গে একজন গাইড নেবেন।’

‘গাইড নেয়া কি খুব দরকার?’ জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

মাথা দোলাল ক্লার্ক। ‘দরকার আছে। ওই গুহায় নানান করুণ ঘটনা ঘটেছে। অনেকেই গুহায় ঢুকে আর বেরুতে পারেনি। হারিয়ে গেছে।’ গলা নামাল সে। ‘এক দম্পতির আজতক খোঁজ মেলেনি।’

'গুহাটা যদি এতই বিপজ্জনক হয়ে থাকে,' জিজ্ঞেস করল ল্যারি, 'তাহলে মানুষজনকে যেতে দেয় কেন?'

'নতুন সেকশনটা কেবল বিপজ্জনক,' ব্যাখ্যা করল ক্লার্ক। 'ওদিকটা এখনো অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে। ওদিকে আলো-টালোরও ব্যবস্থা নেই। তবে সঙ্গে গাইড থাকলে চিন্তা নেই।'

'গুহা বন্ধ হয় ক'টায়?'

'ছটায়।'

ল্যারি ক্যাথেরিনকে একটি দানব ওক্সায়া গাছের নিচে দেখতে পেল। বই পড়ছে।

'কেমন বই?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বাজে।'

ওর পাশে কুঁজো হয়ে বসল ল্যারি। 'হোটেল ক্লার্ক এখানকার সুন্দর এক গুহার সন্ধান দিল আমাকে।'

মুখ তুলে চাইল ক্যাথেরিন। 'গুহা?'

'বলল ও গুহা না দেখলে নাকি জীবন বৃথা। নব-দম্পতিদের সবাই নাকি ওখানে যায়। তুমি ভেতরে ঢুকে মনে মনে যা চাইবে, তোমার মনের আশা পূরণ হবে।' বাচ্চাদের মতো উচ্ছ্বসিত ল্যারির কণ্ঠ, 'যাবে?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে জবাব দিল ক্যাথেরিন, 'তুমি যেতে চাইলে যাব।'

হাসল ল্যারি। 'বেশ। লাঞ্চের পরে রওনা হয়ে যাব আমরা। তুমি বইটা শেষ করো। আমি একটু শহরে যাব। কিছু জিনিস কিনব।'

'তোমার সঙ্গে যাব?'

'না,' বলল ল্যারি, 'আমি ফিরব এখুনি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন, 'আচ্ছা।'

চলে গেল ল্যারি।

শহরে একটি ছোট মুদি দোকানে ঢুকল ল্যারি। কিনল একটি পকেট ফ্লাশলাইট, কয়েকজোড়া ব্যাটারি এবং এক রোল পাকানো সুতা।

'আপনি কি হোটেলে উঠেছেন?' খুচরা পয়সা গুনতে গুনতে জিজ্ঞেস করল দোকানদার।

'না,' জবাব দিল ল্যারি, 'এথেন্সে যাচ্ছিলাম পথে থামলাম।'

'আপনার জায়গায় হলে সাবধানে থাকতাম আমি,' বলল দোকানদার।

তীক্ষ্ণচোখে লোকটার দিকে তাকাল ল্যারি। 'মানে?'

'ঝড় আসছে। ভেঁপু বাজাচ্ছে জাহাজ।'

তিনটার দিকে হোটেলে ফিরে এল ল্যারি। চারটা নাগাদ গুহার উদ্দেশে

বেরিয়ে পড়ল ওরা। জোরে বাতাস বইছে, উত্তরের আকাশে পুঞ্জীভূত হচ্ছে কালো মেঘমালা, ঢেকে দিচ্ছে সূর্য।

আইওনিনার ত্রিশ মাইল পুবে কেভস অভ পেরামা। শত শত বছর ধরে স্টালাগামাইট এবং স্টালাকাটাইট জমে গিয়ে নানান প্রাণী, প্রাসাদ এবং মণি-মাণিক্যের রূপ নিয়েছে। পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছে এ গুহা।

ক্যাথেরিন এবং ল্যারি যখন গুহায় পৌঁছুল তখন পাঁচটা বাজে। আর এক ঘণ্টা পরেই বন্ধ হয়ে যাবে গুহা। টিকেট-বুথ থেকে দুটো টিকেট এবং একটি প্যামফ্লেট কিনল ল্যারি। জীর্ণ-পোশাক-পরা এক গাইড এসে হাজির।

'মাত্র পঞ্চাশ ড্রাকমা,' ঘ্যানঘেনে সুরে বলল সে, 'আপনাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব।'

'আমাদের গাইডের দরকার নেই,' চাঁছাছোলা গলা ল্যারির।

ক্যাথেরিন ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল।

ওর হাত ধরল ল্যারি, 'চলো।'

'তুমি ঠিক জানো গাইড লাগবে না আমাদের?'

'গাইডের দরকার কী? ভেতরে ঢুকব, গুহা দেখব, ব্যস্। কোনোকিছু জানার দরকার হলে প্যামফ্লেটেই তো লেখা আছে।

'ঠিক আছে,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ক্যাথেরিন।

গুহার প্রবেশপথটি বেশ বড়। ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত। গিজগিজ করছে ট্যুরিস্ট। গুহার দেয়াল এবং ছাদে পাথর দিয়ে তৈরি নানান মূর্তি।

'দারুণ!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। চোখ বুলাল প্যামফ্লেটে। 'কেউ জানে না এগুলোর বয়স কত।'

ওর কণ্ঠ পাথুরে ছাদে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। মাথার ওপরে ঝুলছে স্টালাকটাইট। একটা টানেল বাঁক নিয়ে ছোট একটি ঘরে ঢুকে গেছে। গুহার ধারে, ছাদে জ্বলছে নগ্ন বাল্ব। এদিকে আরো দারুণ-দারুণ মূর্তি আছে, প্রকৃতির অবাধ ও আদিম প্রদর্শনী। গুহার দূরপ্রান্তে একটি সাইনবোর্ডে লেখা : *বিপজ্জনক : দূরে থাকুন।*

সাইনবোর্ডের পরেই প্রবেশপথ। হাঁ করে আছে কালো খাদ। হেলেদুলে ওদিকে এগোল ল্যারি, তাকাল চারপাশে। প্রবেশপথের ধারে একটা বাঁক লক্ষ করছে ক্যাথেরিন। ল্যারি সাইনবোর্ডটা তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর ফিরে এল ক্যাথেরিনের দিকে।

'এ জায়গাটা খুব স্যাঁতসেঁতে,' বলল ক্যাথেরিন, 'চলে যাবে?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠ ল্যারির।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্যাথেরিন।

'এদিকে দেখার মতো আরো অনেক কিছু রয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করল ল্যারি। 'হোটেলে ক্লার্ক বলল সবচেয়ে মজার জায়গা নাকি নতুন সেকশন। বারবার বলেছে আমরা যেন ওটা অবশ্যই দেখে যাই।'

'কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন।

'ওদিকে,' ক্যাথেরিনের হাত ধরল ল্যারি। হেঁটে গেল গুহার পেছনে, দাঁড়াল অতল গিরিখাদের সামনে।

'ওখানে যেতে পারব না,' বলল ক্যাথেরিন, 'ওদিকটা অন্ধকার।'

ল্যারি ওর হাত চাপড়ে দিল। 'ভয়ের কিছু নেই। ক্লার্ক আমাকে ফ্লাশলাইট নিয়ে যেতে বলেছে।' পকেট থেকে ফ্লাশলাইট বের করল ও। জ্বালল আলো। সরু আলোর রেখা পড়ল লম্বা করিডরে।

ক্যাথেরিন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে টানেলের দিকে। 'কী বিশাল!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল ও, 'তুমি ঠিক জানো জায়গাটা নিরাপদ?'

'অবশ্যই।' জবাব দিল ল্যারি। 'ওরা স্কুলের বাচ্চাদেরকেও নিয়ে আসে ওখানে।'

তবু ইতস্তত করছে ক্যাথেরিন, যেতে ইচ্ছে করছে না। বিপজ্জনক মনে হচ্ছে টানেলটা।

'ঠিক আছে,' বলল ও।

প্যাসেজ ধরে এগোতে শুরু করল ওরা। কয়েক কদম মাত্র এগিয়েছে, আঁধার গ্রাস করল ওদেরকে। প্যাসেজটা হঠাৎই বাঁক নিয়েছে বামে, তারপর আবার ডাইনে। প্রাগৈতিহাসিক সময়ের পৃথিবীতে ওরা একা। ফ্ল্যাশলাইটের একঝলক আলোয় মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হল ল্যারির চেহারা। ওকে উত্তেজিত লাগছে। পাহাড়ে যেরকম উত্তেজিত দেখেছে সেরকম। ক্যাথেরিন ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

ওদের সামনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে টানেল। নিচু ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে কর্কশ পাথর। ল্যারি বলল, 'এবার বামে যাব আমরা।'

ক্যাথেরিন ওর দিকে তাকাল, 'ডার্লিং, আমাদের এখন ফেরা উচিত না? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। বন্ধ করে দেবে গুহা।'

'রাত ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকবে,' জানাল ল্যারি। 'একটা বিশেষ গুহা দেখতে এসেছি আমি। সদ্য আবিষ্কৃত। খুব দারুণ নাকি।'

ইতস্তত করল ক্যাথেরিন, না-যাওয়ার ধুয়ো তুলতে চাইল। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তা। যাবে না কেন? নিশ্চয় যাবে। ল্যারি খুব উপভোগ করছে ব্যাপারটা।

ল্যারি অপেক্ষা করছে ক্যাথেরিনের জন্য। 'আসছ?' অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস করল।

ক্যাথেরিন উৎসাহ ফোটাতে চাইল গলায়। 'অবশ্যই। তবে আমাকে হারিয়ে ফেলো না যেন।'

জবাবে কিছু বলল না ল্যারি। শাখা-টানেল ধরে বামে মোড় নিল, হাঁটতে লাগল। পায়ের নিচে নুড়িখণ্ড, পিছলে যেতে চায়। ল্যারি হাত ঢোকাল পকেটে, একমুহূর্ত পরে মাটিতে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনল ক্যাথেরিন। ল্যারি হাঁটছেই।

'কিছু ফেললে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন, 'কিসের যেন শব্দ...'

'একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়েছি,' বলল ল্যারি, 'জলদি চলো।' ক্যাথেরিন জানল না সুতোর গুটলি খুলছে ল্যারি।

এদিকে ছাদ আরো ঢালু, দেয়াল আরো বেশি স্যাঁতসেঁতে। টানেলটা যেন ওদেরকে চেপে ধরতে চাইছে। 'জায়গাটা মনে হয় আমাদেরকে পছন্দ করছে না।' মন্তব্য করল ক্যাথেরিন।

'হাস্যকর কথা বোলো না তো, ক্যাথি; এটা স্রেফ একটা গুহা।'

'আমরা ছাড়া তো অন্য কাউকে দেখছি না।'

ইতস্তত গলায় বলল ল্যারি, 'খুব কম মানুষই এ সেকশনের খবর রাখে।'

ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। ক্যাথেরিন সময়ের তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলল, কোথায় চলেছে নিজেও যেন জানে না।

প্যাসেজ আবার সরু হতে শুরু করেছে। দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পাথরখণ্ডগুলো সুচালো, গায়ে বিঁধে যাচ্ছে।

'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথেরিন। 'চীনের কাছাকাছি এসে পড়েছি।'

'আর বেশিদূর না।'

ওদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা লাগছে ক্যাথেরিনের স্যাঁতসেঁতে গুহার কারণে। শিউরে উঠল ও। ফ্লাশলাইটের আলোয় দেখতে পেল প্যাসেজটা আবারো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। ডানদিকের টানেল বামের চেয়ে ছোট লাগল।

'ওদের এখানে নিওন রোডসাইন লাগানো উচিত ছিল,' বলল ক্যাথেরিন। 'আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।'

'না,' বলল ল্যারি, 'গুহাটা বোধহয় ডানদিকে।'

'ঠাণ্ডায় জমে গেলাম, ডার্লিং,' বলল ক্যাথেরিন। 'এখন ফিরে যাই চলো।'

ওর দিকে ঘুরল ল্যারি। 'আমরা প্রায় এসে পড়েছি, ক্যাথি।' ওর হাত খামচে ধরল। 'বাংলোয় ফিরেই তোমাকে গরম করে তুলব।' ক্যাথেরিনের চেহারায় বিরক্তির ভাব দেখে যোগ করল, 'দুই মিনিটের মধ্যে যদি জায়গাটা খুঁজে না পাই,

কথা দিচ্ছি বাড়ি ফিরে যাব, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' খুশি হল ক্যাথেরিন।

'এসো।'

ডানদিকের টানেলে ঢুকল ওরা। সামনের ধূসর পাথরে আলো পড়ে ভীতিকর সব ছায়ার সৃষ্টি করেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ক্যাথেরিন। পেছনে নিকষ আঁধার। ল্যারি দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

'ধুস্ শালা।' খিস্তি করে উঠল সে।

'কী হল?'

'আমরা বোধহয় ভুল রাস্তায় এসেছি।'

'তাহলে ফিরে চলো,' বলল ক্যাথেরিন।

'দাঁড়াও ব্যাপারটাতে নিশ্চিত হয়ে নিই। তুমি এখানে থাকো।'

অবাকচোখে ওর দিকে তাকাল ক্যাথেরিন, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'প্রবেশপথের দিকে,' আড়ষ্ট এবং অস্বাভাবিক শোনাল কণ্ঠ।

'তোমার সঙ্গে আসি।'

'একা তাড়াতাড়ি যেতে পারব, ক্যাথেরিন। শেষ বাঁকটা যেখানে ঘুরলাম সেই শাখা-টানেলটা শুধু দেখে আসছি।' অধৈর্য ল্যারির কণ্ঠে। 'দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরছি।'

'ঠিক আছে,' অস্বস্তি নিয়ে বলল ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিন দেখল ল্যারি যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে পা বাড়াল। হাতে ফ্ল্যাশলাইট। একমুহূর্ত পরে অদৃশ্য হয়ে গেল আলো। আলকাতরার চেয়ে কালো আঁধারে ডুবে গেল ক্যাথেরিন। ওখানে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেকেন্ড গুনে চলল ক্যাথেরিন। তারপর মিনিট।

কিন্তু ল্যারি আর ফিরল না।

অপেক্ষা করছে ক্যাথেরিন, ভয়ংকর অন্ধকার অশুভ ঢেউ হয়ে যেন গড়িয়ে পড়ছে গায়ে। ডাক দিল ও, 'ল্যারি!' কণ্ঠ কর্কশ এবং অনিশ্চিত। ওর গলা গিলে খেল আঁধার। আতঙ্কবোধ করল ক্যাথেরিন। মনে মনে বলল *অবশ্যই ফিরে আসবে ল্যারি। আমার উচিত শান্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।*

কালো মিনিটগুলো বয়ে যেতে লাগল। ক্যাথেরিনের মনে হচ্ছে কোথাও মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ল্যারির, আলগা পাথরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাতে পারে। হয়তো এ মুহূর্তে ওর কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে আছে ল্যারি, অঝোর রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছে। অথবা হারিয়ে ফেলেছে পথ। হয়তো নিভে গেছে ফ্ল্যাশলাইট, গুহার গোলকধাঁধার ফাঁদে আটকে পড়ে গেছে ক্যাথেরিনের মতো।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ক্যাথেরিনের। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে। ঘুরল ও, যে-পথ দিয়ে এসেছে সেদিকে এগোল ধীরগতিতে। টানেলটি সরু, ল্যারি যদি মাটিতে পড়ে থাকে আহত হয়ে, ওকে খুঁজে পাবার একটা সম্ভাবনা আছে। প্যাসেজটা যেখানে দুই ভাগ হয়ে গেছে, সে-জায়গায় চলে এল ক্যাথেরিন। সাবধানে হাঁটছে, পায়ের নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে আলগা পাথর। দূর থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। থমকে দাঁড়াল ক্যাথেরিন। ল্যারি? শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। আবার চলা শুরু করল ও। শব্দটা শোনা গেল আবার। ঘরঘর একটা আওয়াজ, যেন কোথাও টেপরেকর্ডার চলছে। কেউ আছে এখানে।

জোরগলায় চেঁচাল ক্যাথেরিন। কান পাতল। নৈঃশব্দ গিলে খেল ওর চিৎকার। আবার শোনা গেল শব্দটা! ঘরঘর শব্দ। আসছে এদিকেই। ক্রমে বেড়ে চলল আওয়াজ, ঝড়ো বাতাসের বেগে ছুটে আসছে। ক্রমে আরো কাছে চলে এল অন্ধকারে। হঠাৎ ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাথেরিনের গায়ে; ঠাণ্ডা, চটচটে চামড়া ঘষা খেল ওর গালে এবং ঠোঁটে, থাবা বসাল মাথায়, তীক্ষ্ণ নখ ঢুকে গেল চুলে, মুখে পাগলের মতো ঝাপটাচ্ছে ডানা। নামহীন ভয়ংকর কিছু একটা পিচকালো অন্ধকারে হামলা চালিয়েছে ক্যাথেরিনের ওপর।

অজ্ঞান হয়ে গেল ক্যাথেরিন।

সুচালো পাথরের খোঁচা খেয়ে দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেল ক্যাথেরিন। মেঝেতে শুয়ে আছে ও। গাল উষ্ণ এবং আঠালো। বুঝতে পারল এটা ওর শরীরের রক্ত। মনে পড়ে গেল অন্ধকারে ডানা-ঝাপটানো আর ধারালো নখের কথা। ভয়ে কাঁটা দিল গায়ে।

গুহায় বাদুড় ঢুকেছে!

বাদুড় সম্পর্কে কী জানে মনে করার চেষ্টা করল ক্যাথেরিন। সে কোথায় যেন পড়েছে এরা উড়ন্ত ইঁদুরের মতো, হাজার হাজার একসঙ্গে উড়ে বেড়ায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কথাও মনে পড়ে গেল ওর। সাথে সাথে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে। উঠে বসল ও। হাতের তালু জ্বালা করছে। ধারালো পাথরের খোঁচায় ছিলে গেছে চামড়া।

এখানে এভাবে বসে থেকে কোনো লাভ নেই, মনে মনে বলল ক্যাথেরিন। *তোমাকে খাড়া হতে হবে, কিছু একটা করতে হবে।* অনেক কষ্টে শরীরটাকে টেনে তুলল ও। অন্ধকারে একপাটি জুতো হারিয়েছে ও, পরনের পোশাকটাও ছিঁড়ে গেছে। অবশ্য ল্যারি কালই ওকে নতুন একটা ড্রেস কিনে দেবে। কল্পনায় দেখল ওরা গাঁয়ের ছোট দোকানে ঢুকেছে, ল্যারি খুশিমনে ওকে নতুন একটি সামারড্রেস কিনে দিচ্ছে। কিন্তু ড্রেসটাকে কফিনের কাপড় মনে হল, আবার আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। আগামীকাল নিয়ে ভাববে ক্যাথেরিন, এই দুঃস্বপ্ন নিয়ে

নয়।

ওকে হাঁটতে হবে। কিন্তু হেঁটে কোন্‌দিকে যাবে? ভুল রাস্তায় গেলে গুহার আরো ভেতরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ক্যাথেরিন অনুমান করার চেষ্টা করল ওরা কতক্ষণ ধরে গুহায় আটকে আছে। হয়তো দু'ঘণ্টা। ও কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল জানে না। ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে ল্যারি এবং ক্যাথেরিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু যদি বেরিয়ে না পড়ে? কে গুহায় ঢুকল আর কে বেরুল তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চয় নেই। হয়তো আমৃত্যু আটকে থাকতে হবে ক্যাথেরিনকে।

পায়ের বাকি পাটি জুতো খুলে ফেলল ক্যাথেরিন। ধীরগতিতে হাঁটছে। হাতজোড়া সামনে বাড়ানো কোনোকিছুর সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে মুখ না ভাঙে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাথেরিন। 'ঘরঘর আওয়াজটা শোনা গেল আবার। ভৌতিক ট্রেনের মতো ছুটে আসছে ওর দিকে। গায়ে কাঁপুনি উঠে গেল ক্যাথেরিনের। কিছুতেই থামাতে পারছে না কাঁপুনি। একের-পর-এক চিৎকার বেরিয়ে আসতে লাগল ওর গলা চিরে। একমুহূর্ত পরেই ওগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাথেরিনের গায়ে। শত শত। সারা গায়ে গিজগিজ করছে। ঠাণ্ডা, আঠালো ডানা দিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে, রোমশ শরীরের ভীতিকর স্পর্শ ভয়ংকর দুঃস্বপ্নকেও হার মানায়।

ল্যারি! ল্যারি! বলে ডাকতে ডাকতে জ্ঞান হারাল ক্যাথেরিন।

গুহার ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে শুয়ে আছে ক্যাথেরিন। চোখ বোজা। তবে সজাগ হয়ে উঠল মন। ভাবল ল্যারি আমাকে খুন করতে চাইছে। অবচেতন মন যেন এ ভাবনাটা ঢুকিয়ে দিল ওর মাঝে। ল্যারির কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে : আমি একজনকে ভালোবাসি... আমি ডিভোর্স চাই... ল্যারি পাহাড়ে, মেঘের মাঝ দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, সামনে বাড়ানো হাত... মনে পড়ল পাহাড়ের খাড়া ঢালের দিকে তাকিয়ে ক্যাথেরিন যখন বলছিল নামতে সময় লাগবে, ল্যারি তখন বলছিল না, লাগবে না। ... ল্যারি বলছিল আমাদের গাইড লাগবে না... আমরা ভুল রাস্তায় এসেছি। এখানে অপেক্ষা করো... আমি দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে আসছি... তারপর সেই ভীতিকর আঁধার।

ল্যারির ফিরে আসার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। পুনর্মিলন, মধুচন্দ্রিমা... সবই ছিল ভান, ওকে খুন করার পরিকল্পনার অংশ। আর ল্যারি তার কাজে সফল হয়েছে। কারণ ক্যাথেরিন জানে জীবনেও এখান থেকে বেরুতে পারবে না। সে আতঙ্কের কালো সমাধিতে জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে। বাদুড়গুলো চলে গেছে। কিন্তু ওদের শরীরের উৎকট গন্ধ রেখে গেছে ক্যাথেরিনের মুখে এবং গায়ে। ক্যাথেরিন জানে ওরা ফিরে আসবে আবার। আবার হামলার শিকার হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে

যাবে ক্যাথেরিন। ভাবনাটা ওর শরীরের সমস্ত রোম খাড়া করে দিল। কাঁপতে লাগল গা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গভীর দম নিল ক্যাথেরিন।

আবার শোনা গেল শব্দ। এবার আর সহ্য করতে পারবে না ও। মৃদু গুঞ্জন তুলল প্রথমে, তারপর শব্দের জোরালো ঢেউ ছুটে আসতে লাগল। হঠাৎ কেউ যন্ত্রণাকাতর চিৎকার দিল, অন্ধকারে অনেকক্ষণ গড়াল শব্দ। তারপর আরেকটা শব্দ ভেসে এল আরো জোরালো হয়ে। অন্ধকার টানেল ফুঁড়ে আবির্ভূত হল একচিলতে আলো, মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেল ক্যাথেরিন, টের পেল একজোড়া হাত স্পর্শ করছে ওকে, তুলে নিচ্ছে শূন্যে। বাদুড়ের হামলার ভয়ের কথা ওদেরকে বলতে চাইল ক্যাথেরিন। কিন্তু পারল না। কারণ ও চিৎকার করেই চলেছে।

নোয়েল ও ক্যাথেরিন
এথেন্স : ১৯৪৬

২১

স্থির এবং শক্ত হয়ে শুয়ে আছে ক্যাথেরিন যাতে বাদুড়রা দেখতে না পায় তাকে। ওদের ডানার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চোখ বুজে রয়েছে শক্ত করে।

একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ওকে পাব কল্পনাও করিনি। এ তো রীতিমতো মিরাক্‌ল।'

'ওর কোনো সমস্যা হবে না তো?'

ল্যারির গলা।

আবার আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ক্যাথেরিনের গোটা শরীরে। পালাবার জন্য আকুল হয়ে উঠল দেহ-মন। ওর খুনি ফিরে এসেছে ওকে খুন করতে। গুঙিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। 'না...' চোখ মেলে তাকাল। ও নিজের বাংলোতে শুয়ে আছে। ল্যারি বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে এক লোক। একে কখনো দেখেনি ক্যাথেরিন। ল্যারি এগিয়ে এল ওর দিকে।

'ক্যাথেরিন...'

ওকে দেখে কুঁকড়ে গেল ক্যাথেরিন। 'আমাকে ছোঁবে না।' ওর কণ্ঠ দুর্বল এবং কর্কশ।

'ক্যাথেরিন!' হতাশা ল্যারির চেহারায়।

'ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলুন,' অচেনা লোকটিকে অনুনয় করল ক্যাথেরিন।

'উনি এখনও শকের মধ্যে আছেন,' বলল আগন্তুক, 'আপনি নাহয় পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

ল্যারি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ক্যাথেরিনের দিকে। চেহারা ভাবলেশশূন্য। 'ঠিক আছে। যাচ্ছি আমি।' ঘুরল সে, চলে গেল।

আগন্তুক ক্যাথেরিনের পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটা খাটো, মোটা, হাসিখুশি মুখ। টেনে টেনে ইংরেজিতে বলল, 'আমি ডক্টর কাজোমিডস, আপনি বিরাট এক

বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছেন, মিসেস ডগলাস। তবে ঠিক হয়ে যাবেন। সামান্য খিঁচুনি আর বড়সড় শক। তবে কদিনের মধ্যেই এগুলো কাটিয়ে উঠবেন।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ওই শয়তান গুহাগুলো ওদের বন্ধ করে দেয়া উচিত। এ বছরে এ নিয়ে তৃতীয় দুর্ঘটনা ঘটল।'

মাথা নাড়তে গেল ক্যাথেরিন, থেমে গেল। ভীষণ দপদপ করছে মাথা। 'এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়', ভারী গলায় বলল ও। 'ও আমাকে খুন করতে চেয়েছে।'

ডাক্তার তাকাল ওর দিকে। 'কে আপনাকে খুন করতে চেয়েছে?'

ক্যাথেরিনের মুখের ভেতরটা শুকনো, জিভ ভারী। শব্দগুলো প্রকাশ করতে কষ্ট হল। 'আ-আমার স্বামী।'

'না,' বলল ডাক্তার।

ডাক্তার ওর কথা বিশ্বাস করছে না। ঢোক গিলল ক্যাথেরিন। আবার বলার চেষ্টা করল। 'সে আমি—আমাকে গুহায় ফেলে রেখে গিয়েছিল যাতে আমি মরে যাই।'

মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'এটা দুর্ঘটনাই ছিল। আমি আপনাকে সিডেটিভ দিচ্ছি। ঘুমিয়ে পড়ুন। জেগে উঠে দেখবেন অনেক ভালো লাগছে।'

সীমাহীন আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। 'না!' আর্তনাদ করল ক্যাথেরিন। 'আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি আর কখনোই ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারব না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান, প্লিজ!'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসছে ডাক্তার। 'আমি তো বলেছি আপনি ঠিক হয়ে যাবেন, মিসেস ডগলাস। আপনার শুধু দরকার চমৎকার, লম্বা একটা ঘুম।' সে কালো মেডিকেল ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল, হাইপডারমিক খুঁজছে।

উঠে বসার চেষ্টা করল ক্যাথেরিন, মাথায় তীব্র খোঁচা লাগাল ব্যথা, সাথে সাথে শরীর ভিজে গেল ঘামে। আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

'নড়াচড়া করবেন না,' সতর্ক করে দিল ডা. কাজোমিডস, 'বললাম না অল্পের জন্যে বেঁচে এসেছেন।' হাইপডারমিক বের করেছে সে, একটি ভায়াল থেকে পীত রঙের তরল ঢোকাল ইনজেকশনে, ঘুরল ক্যাথেরিনের দিকে। 'একটু পাশ ফিরে শোন্, প্লিজ। যখন জেগে উঠবেন, নিজেকে মনে হবে নতুন মানুষ।'

'আমি কখনোই জেগে উঠব না,' ফিসফিস করল ক্যাথেরিন। 'ও আমাকে ঘুমের মধ্যে মেরে ফেলবে।'

ক্যাথেরিনকে পাশ ফিরে শোয়াল ডাক্তার। নাইট-গাউন তুলল। নিতম্বে তীক্ষ্ণ দংশন অনুভব করল ও। 'এই তো হয়ে গেছে।'

চিৎ হয়ে শুলো ক্যাথেরিন। ফিসফিস করল, 'আপনি এইমাত্র আমাকে মেরে ফেললেন,' তার চোখ ভরে গেল জলে।

'মিসেস ডগলাস,' শান্তগলায় বলল ডাক্তার, 'আপনি কি জানেন আপনাকে আমরা কীভাবে খুঁজে পেয়েছি?'

মাথা নাড়তে গেল ক্যাথেরিন, ব্যথার কথা মনে পড়তে ক্ষান্ত দিল। 'আপনার স্বামী আমাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে গেছেন।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্যাথেরিন, ডাক্তার কী বলছে বুঝতে পারছে না।

'তিনি ভুল বাঁক নিয়ে গুহায় রাস্তা হারিয়ে ফেলেন,' ব্যাখ্যা করল ডাক্তার। 'আপনার খোঁজ না-পেয়ে তিনি উন্মাদ হয়ে ওঠেন। পুলিশে খবর দেন এবং আমরা তাৎক্ষণিকভাবে একটি সার্চপার্টি গঠন করি।'

ক্যাথেরিন তাকিয়েই আছে, এখনো বুঝতে পারেনি যেন কথাগুলো। 'ল্যারি... সাহায্য এনেছে?'

'তাঁকে উন্মাদের মতো লাগছিল। বারবার বলছিলেন তাঁর জন্যই আপনাকে বিপদে পড়তে হয়েছে।'

ক্যাথেরিন নতুন এই তথ্য হজম করার চেষ্টা করছে। ল্যারি খুন করতে চাইলে তাকে খুঁজে বের করার জন্য সার্চপার্টির ব্যবস্থা করত না, ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে উন্মাদ হয়ে উঠত না। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে ওর। ডাক্তার সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'আপনি এখুনি ঘুমিয়ে পড়বেন,' বলল সে। 'আমি কাল সকালে একবার এসে আপনাকে দেখে যাব।'

ক্যাথেরিন কিনা তার ভালোবাসার মানুষকে খুনি ভেবেছে। ল্যারির কাছে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে ওকে। কিন্তু ওর মাথাটা ভারী লাগছে, মুদে আসছে চোখ। ওকে পরে সব কথা বলব, ভাবল ক্যাথেরিন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে। ও নিশ্চয় আমাকে বুঝতে পারবে। ক্ষমাও করে দেবে। এবং সবকিছু আবার হয়ে উঠবে আগের মতো, যেভাবে ছিল সবকিছু...।

বজ্রপাতের কানফাটানো শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্যাথেরিনের। চোখ মেলে চাইল। ধড়াশ ধড়াশ করছে বুক। বেডরুমের জানালা দিয়ে স্রোতের ধারায় গড়াচ্ছে বৃষ্টির জল, বিদ্যুতের নীলচে ম্লান আলোয় এক লহমার জন্য আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। বাতাস যেন শক্তমুঠিতে চেপে ধরে ঝাঁকাচ্ছে বাড়িটাকে। ছাদে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ, যেন হাজার হাজার ক্ষুদে ঢোল বাজছে। একটু পরপর বিশ্বচরাচর আলোকিত করে তুলে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, পরমুহূর্তে বিকট শব্দে পড়ছে বাজ।

বিছানা থেকে শরীর টেনে তুলল ক্যাথেরিন, বসল। বিছানার পাশের ঘড়ি দেখল। সিডেটিভের কারণে ঝিমঝিম করছে মাথা। ঘড়ির সময় দেখতে রীতিমতো বেগ পেতে হল ওকে। চোখ কুঁচকে দেখল রাত তিনটা বাজে। ঘরে ও একা। ল্যারি নিশ্চয় পাশের ঘরে। দুশ্চিন্তা করছে ওকে নিয়ে। ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে ক্যাথেরিন। সাবধানে বিছানার কিনারে চলে এল ও, সিধে হওয়ার চেষ্টা করল। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। পড়েই যাচ্ছিল, চট করে খাটের বাজু

ধরে রক্ষা করল ভারসাম্য। দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, ঝিমঝিম ভাবটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। টলমল পায়ে দরজার দিকে এগোল ক্যাথেরিন, শরীরের পেশিগুলো আড়ষ্ট, মাথায় সারাক্ষণ কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। দরজার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাথেরিন, ডোরনব ধরে আছে যাতে পড়ে না যায়। তারপর খুলল দরজা। পা রাখল লিভিংরুমে।

এ ঘরে নেই ল্যারি। রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। টলতে টলতে ওদিকে পা বাড়াল ক্যাথেরিন। রান্নাঘরে আছে ল্যারি, ওর দিকে পেছন ফেরা। ডাক দিল ক্যাথেরিন, 'ল্যারি!' কিন্তু ডাক শুনতে পেল না ল্যারি গুড়ুম করে বজ্রপাত হওয়ার কারণে। আবার ডাকতে যাচ্ছে ক্যাথেরিন, এক মহিলা চলে এল দৃশ্যপটে। ল্যারি বলল, 'তোমার এখানে আসা মোটেই উচিত—' বাকিটুকু শোনা গেল না বাতাসের আর্তনাদে। তবু খাপছাড়াভাবে যা শুনল ক্যাথেরিন তা হল এই—

'—আসতেই হল। এসেছি নিশ্চিত হতে তুমি—'

'—আমাদের একসঙ্গে দেখলে। কেউ কোনোদিন—'

'—তোমাকে তো বলেইছি আমি একাই—'

'— সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। এখন কোনোকিছু—'

'—এখন করো। এখন তো ও ঘুমাচ্ছে।'

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ক্যাথেরিন। শেষের সংলাপগুলো হারিয়ে গেল বাতাসের হাহাকার আর বজ্রের শব্দে।

'—ও টের পাবার আগেই আমাদের জলদি—'

সেই পুরোনো ভয়টা ফিরে এল ক্যাথেরিনের মাঝে, শিউরে শিউরে উঠল শরীর। ওকে গ্রাস করল অজানা আতঙ্ক। ওর দুঃস্বপ্ন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ল্যারি ওকে সত্যি সত্যি খুন করতে চাইছে। ওরা ভয়ংকর কাজটা করার আগেই এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে ক্যাথেরিনকে। ধীরে ধীরে, কাঁপতে কাঁপতে পিছু হটল ও। ধাক্কা খেল একটা ল্যাম্পের সঙ্গে, ওটা মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই ধরে ফেলল ক্যাথেরিন। বুকের ভেতরে এমন ধড়াশ ধড়াশ করছে হৃৎপিণ্ড। ক্যাথেরিনের ভয় হল বৃষ্টি ও বজ্রের শব্দ ছাপিয়েও আওয়াজটা শুনতে পাবে ওরা। সামনের দরজায় চলে এল ও, খুলল। বাতাসের তীব্র ধাক্কায় কবাট প্রায় ছুটে যাচ্ছিল হাত থেকে।

রাতের অন্ধকারে পা রাখল ক্যাথেরিন। পেছনে দ্রুত বন্ধ করে দিল দরজা। ঠাণ্ডা বৃষ্টির জলে মুহূর্তে গোসল হয়ে গেল। এই প্রথম টের পেল ওর পরনে পাতলা নাইটগাউন ছাড়া কিছু নেই। এতে কিছু আসে যায় না। ওকে পালাতে হবে এটাই আসল কথা। বৃষ্টির অঝোর ধারা ভেদ করে দূরে হোটেল লবির আলো দেখতে পেল ক্যাথেরিন। ওখানে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারে ও। কিন্তু ওর কথা কি তারা বিশ্বাস করবে? ডাক্তারের চেহারাটা মনে পড়ে গেল। ক্যাথেরিনকে ল্যারি খুন করতে চাইছে, বিশ্বাসই করতে চায়নি সে। না, ওরা ভাববে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ক্যাথেরিনের। তারা ল্যারির কাছে ধরে নিয়ে যাবে ওকে। এ জায়গা থেকে

পালাতে হবে ক্যাথেরিনকে। ঢালু পাহাড়ি রাস্তার দিকে পা বাড়াল ও। রাস্তাটা গাঁয়ের দিকে চলে গেছে।

মুষলধারে বৃষ্টি কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল করে রেখেছে পথ। চেষ্টা করেও চলার গতি বাড়াতে পারছে না ক্যাথেরিন। মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ছুটছে ও, সিনেমার স্লোমোশন গতিতে বৃথাই পালাতে চাইছে ওর অনুসরণকারীদের কাছ থেকে। বারবার পা পিছলে গেল ক্যাথেরিনের, আছাড় খেল বেশ কয়েকবার। ধারালো পাথরের আঘাতে পা কেটে রক্ত বেরুতে লাগল।

পথটা হঠাৎ মিশে গেছে অন্ধকার, জনমানবশূন্য একটি রাস্তায়। তাড়া খাওয়া প্রাণীর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে ছুটছে ক্যাথেরিন। কাটা পা, মুষলধারে বৃষ্টি কোনোকিছুই আমলে আনছে না।

লেকের ধারে চলে এল ক্যাথেরিন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদিকে। বাতাসে ভেজা নাইটগাউন পতপত করে উড়ছে, পেঁচিয়ে ধরছে ওকে। উন্মত্ত হাওয়া শান্ত হ্রদে ঘূর্ণি তুলেছে। সাগরের মতো বড় বড় ঢেউ ছুটে আসছে হাঁ হাঁ করে। ভেঙে পড়ছে তীরে এসে।

একটা রো বোট দেখতে পেল ক্যাথেরিন। কূলে বাঁধা। ঢেউয়ের তালে নাচছে। হাঁচড়েপাঁচড়ে হ্রদের ঢাল বেয়ে নেমে এল ও। লাফ মেরে উঠল নৌকায়। ভারসাম্য রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বোটের রশি খোলার চেষ্টা করল। রশি খুলতেই ডক থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল বোট, ঘুরে গেল পাঁই করে। দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল ক্যাথেরিন। কোনোমতে একটা সিটে উঠে বসল, তুলে নিল বৈঠা। কিন্তু বৈঠা চালাতে পারছে না ক্যাথেরিন। দানব ঢেউগুলো প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ছে নৌকার গায়ে, বনবন করে ঘুরছে জলযান। ঝাঁকির চোটে হাত থেকে বৈঠা পড়ে গেল। মুহূর্তে ওগুলো গ্রাস করে নিল খলবলে জলরাশি। বোট ঢেউ আর বাতাসের ধাক্কায় ছুটে চলল হ্রদের মাঝখানে। ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে ক্যাথেরিন, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। শরীরে এমন কাঁপুনি উঠে গেল কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল বোটে পানি উঠছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ছে বোটের গায়ে। তারপর পাহাড়সমান একটা ঢেউ ছুটে এল। উল্টে দিল বোট।

তৃতীয় খণ্ড

বিচার

এথেন্স : ১৯৪৭

এথেন্সের আরসাকিওন আদালতের ৩৩ নম্বর কক্ষে নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের হত্যা মামলা শুরু হওয়ার ঘণ্টাপাঁচেক আগেই ঘর উপচে পড়ল দর্শকে। ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট এবং স্টাডার গোটা একটি ব্লক নিয়ে গড়ে উঠেছে ধূসর রঙের প্রকাণ্ড আদালত ভবন। ভবনের ত্রিশটি কক্ষের শুধু তিনটি কক্ষ ক্রিমিনাল ট্রায়ালের জন্য ব্যবহার করা হয় : কক্ষ ২১, ৩০ এবং ৩৩। ৩৩ নম্বর কক্ষ এই বিচারের জন্য বাছাই করার কারণ, ঘরটি বেশ প্রশস্ত। ৩৩ নম্বর কক্ষের বাইরের করিডর ধূসর ইউনিফর্ম আর ধূসর শার্ট পরা পুলিশে গিজগিজ করছে। তারা দুটি প্রবেশপথে দাঁড়িয়েছে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। করিডরের স্যান্ডউইচের দোকানের সমস্ত খাবার প্রথম পাঁচ মিনিটেই বিক্রি হয়ে গেছে। টেলিফোন বুথের সামনে লম্বা লাইন।

চিফ অব পুলিশ জর্জিয়াস স্কুরি ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তার দিকটা দেখভাল করছেন। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ফটোগ্রাফাররা, স্কুরি হাসিমুখে পোজ দিচ্ছেন ক্যামেরার সামনে। এ মামলা দেখার জন্য গ্রিক জুডিসিয়ারি বিভাগের সদস্যদের কাছে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা মিনতি করে কেউ কেউ ৩৩ নং কক্ষে বসার সুযোগ পেয়েছে। কেউ পাঁচশো দ্রাকমার বিনিময়ে একটি আসন কিনে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

আদালতভবনের দোতলায় ৩৩ নং কক্ষ। ঘরটি ৪০ ফুট চওড়া, ৩০০ ফুট লম্বা। আসনগুলো তিন সারিতে বিভক্ত। প্রতি সারিতে নয়টি কাঠের বেঞ্চি। প্রতি সারির মাঝখানে হাত তিনেক জায়গা ফাঁকা।

আদালতকক্ষের সামনে একটি ডায়াস। ডায়াসের সামনে পালিশ করা মেহগনির ছয়ফুট উঁচু পার্টিশন। তিনজন বিচারকের চামড়ার চেয়ার ওখানে রয়েছে। মাঝখানের চেয়ারে বসেন কোর্টের প্রেসিডেন্ট। তার ওপরে ঝুলছে চৌকোনা, নোংরা একটি আয়না। আয়নায় গোটা আদালতকক্ষের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে।

ডায়াসের সামনে সাক্ষীর কাঠগড়া, ছোট একটি প্লাটফর্ম। ওখানে একটি

টেবিল আছে, টেবিলের সঙ্গে কাগজপত্র রাখার জন্য একটি কাঠের ট্রে। টেবিলে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি। দূরপ্রান্তের দেয়ালে জুরিবক্স, এ মুহূর্তে জুরিবক্সে আছেন দশজন জুরি। বামদিকের দূরপ্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে একটি বক্স। ওটা আসামির কাঠগড়া। আসামির কাঠগড়ার সামনে আইনজীবীদের টেবিল।

শতাব্দীপ্রাচীন চেহারার এ আদালতকক্ষের কাঠের মেঝে তেল-চকচকে। যদিও একতলার মেঝে ঘুণে-ধরা। ছাদ থেকে ঝুলছে ডজনখানেক বৈদ্যুতিক বাল্ব। ঘরের দূরপ্রান্তে পুরোনো আমলের একটি হিটার। ঘরের একটি অংশ সংরক্ষিত সংবাদমাধ্যমের লোকজনের জন্য। ওই অংশে বসেছেন রয়টার্স, ইউনাইটেড প্রেস, ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস, শিন হুয়া এজেন্সি, ফ্রেঞ্চ প্রেস এজেন্সি এবং তাস থেকে আসা সাংবাদিকরা।

দর্শকদের আসনের প্রথম সারিতে বসেছে তারকা ফিলিপ্পি সোরেল, নোয়েল পেজের প্রাক্তন প্রেমিক। আদালতকক্ষে ঢোকার আগে সে একটি ক্যামেরা ভেঙেছে এবং প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। সে চুপচাপ বসে আছে নিজের আসনে। তার একসারি পেছনের আসন দখল করেছে পরিচালক আরমন্দ গটিয়ের। তার ব্যস্ত চোখ ঘুরছে সারা আদালতকক্ষে, যেন পরবর্তী ছবির উপাদান এখান থেকে সংগ্রহ করবে। গটিয়েরের কাছাকাছি বসেছে বিখ্যাত ফরাসি সার্জন ইসরায়েল কাৎজ।

কাৎজ থেকে দুই আসন দূরে বসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট উইলিয়াম ফ্রেজার। সবাই বলাবলি করছে কনস্টানটিন ডেমিরিসও নাকি আসবেন।

দর্শকরা যেদিকে তাকাচ্ছে বিখ্যাত লোকদের দেখতে পাচ্ছে : রাজনীতিবিদ, গায়ক, ভাস্কর, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। তবে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বসেছে ডিফেনডান্ট বক্সে।

ডিফেনডান্ট বক্সের এক কিনারে বসে রয়েছে অপূর্ব সুন্দরী নোয়েল পেজ। তার মধুরঙা ত্বক সামান্য বিবর্ণ, ড্রেস দেখে মনে হচ্ছে ম্যাডাম শ্যানেল-এর শো থেকে মাত্র বেরিয়ে এসেছে। তবে শুধু নোয়েল পেজ নয়, দর্শক তাকাচ্ছে ডিফেনডান্ট বক্সের আরেকপ্রান্তে বসা আরেকজন মানুষের দিকেও। এ ল্যারি ডগলাস। তার দিকে ক্রোধ এবং ঘৃণা নিয়ে তাকাচ্ছে লোকে। ল্যারির সুদর্শন চেহারা শুকনো, সে অনেকটা ওজনও হারিয়েছে। তবে এতে তার ভাস্কর্যের মতো শরীরের তীক্ষ্নতা যেন ফুটে উঠেছে আরো। আদালতকক্ষের অনেক নারীই তাকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার বাণী শোনানোর ব্যাকুলতা অনুভব করছে। গ্রেফতার হওয়ার পরে ল্যারি সারাবিশ্বের অসংখ্য নারীর কাছ থেকে শত শত চিঠি, উপহার এবং বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছে।

দর্শকদের আকর্ষণের তৃতীয় কেন্দ্রবিন্দু নেপোলিয়ন চোটাস। তিনি গ্রিসে নোয়েল পেজের মতোই জনপ্রিয়। নেপোলিয়ন চোটাসকে বিশ্বের অন্যতম সেরা

ক্রিমিনাল ল ইয়ার বলা হয়। তিনি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সরকারের রাঘববোয়ালদের নির্দোষ প্রমাণ করেছেন, পুলিশের হাতে হাতেনাতে ধরাপড়া হত্যামামলার আসামি তার অদ্ভুত কূটকৌশলে বেকসুর খালাস পেয়েছে। তিনি কোনোদিন কোনো মামলায় হারেননি। হালকা-পাতলা গড়নের চোটাস ব্লাড হাউন্ডের চোখ দিয়ে দর্শকদের দেখছেন। চোটাস যখন কোনো জুরিকে সম্বোধন করে কিছু বলতে যান তোতলাতে থাকেন, নিজেকে প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পান না। মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর অসহায়ত্বের যন্ত্রণায় তিনি এমন দগ্ধ হতে থাকেন, তাঁকে দেখে মায়া লাগে জুরিদের। যে-শব্দটি স্মৃতি হাতড়েও উদ্ধার করতে পারেন না চোটাস, জুরি সেই শব্দের খেই ধরিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন এই প্রবীণ আইনজীবীকে। কিন্তু আদালতের বাইরে চোটাস অত্যন্ত বাকপটু একজন মানুষ। তিনি সাতটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, অবসর মিললে সারাবিশ্বের জুরিদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন।

চোটাস থেকে কয়েক হাত দূরে, আইনজীবীদের বেঞ্চে বসেছে ফ্রেডরিক স্টাভরোস, ল্যারি ডগলাসের ডিফেন্স অ্যাটর্নি। অভিজ্ঞদের ধারণা, রুটিন কেসগুলো দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিলেও এ কেসে কিছুই করতে পারবে না স্টাভরোস।

নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে পত্রিকায়। এদের অপরাধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই পাঠকদের। পেশাদার জুয়াড়িরা বাজি ধরেছে বাদীপক্ষ হেরে যাবে এ মামলায়। তবে সবাই উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী তার মক্কেলকে রক্ষা করতে পারেন কিনা তা দেখার জন্য।

যখন ঘোষণা করা হল নোয়েল পেজের হয়ে আইনি লড়াই লড়বেন চোটাস, যে নারী কিনা কনস্টানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তাকে প্রকাশ্যে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে, খবরটা দারুণ উত্তেজনার খোরাক যোগায়। চোটাস শক্তিশালী তাতে কারো সন্দেহ নেই কিন্তু কনস্টানটিন ডেমিরিস চোটাসের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী। কেউ ভাবতেই পারছে না চোটাস কেন কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিরুদ্ধে গেলেন। তাঁকে কি ভূতে পেয়েছে? তবে একই সঙ্গে বাতাসে আরেকটি গুজব উড়ে বেড়াচ্ছিল।

আইনজীবীটি নাকি নোয়েল পেজের পক্ষ নিয়েছেন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত অনুরোধে।

বিচার শুরুর তিনমাস আগে, সেইন্ট নিকোডেমাস স্ট্রিট প্রিজন-এ নোয়েলের কারাকক্ষে এক ওয়ার্ডেন এসে বলেছিল কনস্টানটিন ডেমিরিস ওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। শুনে অবাক হয়েছিল নোয়েল। কারণ গ্রেফতার

হওয়ার পর ডেমিরিসের তরফ থেকে কোনো সাড়া পায়নি সে। ছিল শুধুই গভীর নীরবতা।

নোয়েল ডেমিরিসের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসের অভিজ্ঞতায় জানত এই মানুষটি যেমন সজ্জন তেমনই প্রতিহিংসাপরায়ণ। কেউ তাঁর সামান্যতম ক্ষতি করলেও তিনি তাকে ছাড়েন না। প্রতিশোধ নেবেনই। আর নোয়েল তাঁর যে ক্ষতি করেছে, এমন ক্ষতি কেউ কোনোদিন করেনি। এর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা ডেমিরিসের আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল : প্রতিশোধটা তিনি নেবেন কীভাবে? বিচারক বা জুরিদের ঘুস দিয়ে কিনে নেয়া ডেমিরিসের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। কারাকক্ষে দিনের পর-দিন নির্ঘুম কাটিয়ে ডেমিরিসের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করেছে নোয়েল পেজ। ভেবেছে সে ডেমিরিস হলে প্রতিশোধের ধরনটা কীরকম হত। ডেমিরিসের সঙ্গে যেন সে মানসিক দাবা খেলছিল, তবে ঘুঁটি ছিল সে এবং ল্যারি আর বাজিটা ছিল জীবন-মৃত্যু।

এটাই স্বাভাবিক ডেমিরিস তাকে এবং ল্যারিকে ধ্বংস করে দিতে চাইবেন। তবে ডেমিরিসকে চেনে নোয়েল। জানে তাঁর পক্ষে এরকম পরিকল্পনা করাও অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি ওদের একজনকে শেষ করে দেবেন, অপরজন বেঁচে থেকে ভোগ করবে যন্ত্রণা। হয়তো ল্যারিকে তিনি মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছেন, বাঁচিয়ে রাখবেন নোয়েলকে। হয় কারাগারে নয়তো তার নিয়ন্ত্রণে বাকি জীবনটা বন্দি থাকতে হবে নোয়েলকে। প্রথমে ভালোবাসার মানুষটিকে হারানোর যন্ত্রণা সইতে হবে নোয়েলকে, তারপর ডেমিরিসের নির্যাতন। হয়তো ডেমিরিস তার পরিকল্পনার কথা কিছুটা বলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলতে চাইছেন নোয়েলকে। তাই হয়তো দেখা করতে চাইছেন ওর সঙ্গে।

ওয়ার্ডেনের ঘরে প্রথমে ঢুকল নোয়েল। তার কেশ এবং চেহারা পরিচর্যার জন্য মেকআপ বক্স নিয়ে হাজির হয়েছে চাকরানি। টেবিলে রাখা চিরুনি এবং ব্রাশের দিকে ফিরেও তাকাল না নোয়েল। হেঁটে গেল জানালার সামনে, তাকাল বাইরে। গত তিনমাসে এই প্রথম বাইরের জগৎটাকে দেখছে। এর মধ্যে ওকে বারকয়েক কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে বাইরের দুনিয়া দেখার সুযোগ মেলেনি। প্রিজন ভ্যানে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বেযমেন্ট থেকে খাঁচার এলিভেটরে চেপে উঠেছে দোতলায়। ওখানে শুনানি শেষে আবার প্রত্যাবর্তন কারাগারে।

জানালা দিয়ে ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের ব্যস্ততা দেখছে নোয়েল। পুরুষ, নারী, বাচ্চাকাচ্চা দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরছে তাদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। গ্রিকরা নোয়েলকে ঘৃণা করে, কারণ সে বিয়ের মতো পবিত্র বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে, তাকে ঈর্ষা করে তার রূপ-সৌন্দর্য এবং অগাধ সম্পদের জন্য।

আগে জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিল নোয়েল। কিন্তু এখন অনেকটাই বদলে

গেছে ও। মৃত্যু কাছিয়ে আসছে বুঝতে পেরে জীবনটাকে বড্ড ভালোবাসতে মন চাইছে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। ওর ভেতরে ক্যান্সারের মতো একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ছে। জানে ডেমিরিস ওর জীবন নরক বানিয়ে ফেলবেন। তবে সেটা যখন ঘটবে দেখা যাবে। সময় হলে বুদ্ধি এবং কৌশলে ডেমিরিসকে ঠেকিয়ে দেবে সে। কিন্তু এ মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য দরকার তার। তবে একটা সুবিধে ভোগ করছে নোয়েল। মৃত্যুকে কখনো সিরিয়াসভাবে নেয়নি সে। ডেমিরিস জানেন না জীবন এখন তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জানলে নিশ্চয় ওকে মেরে ফেলতেন। নোয়েল জানে না ডেমিরিস গত কয়েক মাসে তার জন্য কী ধরনের জাল বিছিয়েছেন।

দরজা খোলার শব্দে ঘুরল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। তাঁকে দেখে প্রবল একটা ধাক্কা খেল নোয়েল। বুঝতে পারল এই মানুষটিকে তাঁর ভয় পাবার কিছু নেই।

গত কয়েকমাসে দশবছর বয়স বেড়ে গেছে ডেমিরিসের। তাকে শান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগছে, কাঠামোটায় আলুথালু ঝুলে আছে পোশাক। তবে তাঁর চোখ মনোযোগ কেড়ে নিল ক্যাথেরিনের। এ চোখ যেন নরকের মাঝ দিয়ে গেছে। যে চোখ তীব্রশক্তির আধার ছিল তা এখন একদম ম্রিয়মাণ। তিনি নোয়েলকে দেখছেন ব্যথাতুর দৃষ্টিতে।

এক সেকেন্ডের জন্য নোয়েল ভাবল এটা হয়তো একটা কৌশল, পরিকল্পনার অংশ, কিন্তু পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে এমন নিখুঁত অভিনয় করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করল নোয়েলই। 'আমি দুঃখিত, কোস্টা।'

ধীরে মাথা দোলালেন ডেমিরিস। 'আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলাম,' করুণ গলায় বললেন তিনি। 'সব প্ল্যান আঁটা হয়ে গিয়েছিল।'

'করলে না কেন?'

শান্ত গলায় জবাব দিলেন তিনি, 'কারণ তুমিই আমাকে আগে খুন করে ফেলেছ। তোমার মতো আর কারো প্রয়োজন এত প্রকলভাবে অনুভব করিনি আমি। এত কষ্ট এবং যন্ত্রণাও পাইনি।'

'কোস্টা—'

'না। আমাকে শেষ করতে দাও। আমি দয়ালু মানুষ নই। কাউকে ক্ষমা করি না। তোমাকে ছাড়া যদি চলতে পারতাম, বিশ্বাস করো চলতাম। তোমাকে আবার আমি চাই, নোয়েল।'

ভেতরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটল না নোয়েলের চেহারায়। 'কিন্তু ফিরে যাওয়াটা তো আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না, তাই না?'

'তোমাকে মুক্ত করতে পারলে আমার কাছে ফিরে আসবে তো? থাকবে আমার সঙ্গে?'

ল্যারির চেহারা ভেসে উঠল নোয়েলের চোখে। ওকে কখনো দেখতে পাবে না,

ছুঁতে পারবে না, ধরতে পারবে না। নোয়েলের কোনো উপায় নেই। তবে যতদিন বেঁচে থাকবে কোনো-না-কোনো সুযোগ নিশ্চয় আসবে। ল্যারিকে ছাড়া তার বেঁচে থাকা হয়ে উঠবে অর্থহীন। ল্যারির প্রতিতার প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল একসময়। কিন্তু আমস্টারডামের হোটেলে সেদিনের মিলনের পরে নোয়েল বুঝতে পারে ল্যারিকে ছাড়া তার চলবে না। ল্যারির প্রতি পুরোনো প্রেম প্রবলভাবে আবার ফিরে আসে তার মাঝে। ডেমিরিসের দিকে তাকাল সে।

'থাকব কোস্টা।'

ডেমিরিস স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন নোয়েলের দিকে। আবেগে টলমল করছে চোখ। কথা বলার সময় খসখসে শোনাল কণ্ঠ। 'ধন্যবাদ।' বললেন তিনি, 'আমরা অতীত ভুলে যাব। আমরা শুধু ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবব,' তার গলার স্বর জোরালো হয়ে উঠল, 'আমি তোমার জন্য একজন উকিল নিয়োগ করব।'

'কে?'

'নেপোলিয়ন চোটাস।'

আর ঠিক সে-মুহূর্তে নোয়েল বুঝতে পারল সে জিতে গেছে দাবায়।

নেপোলিয়ন চোটাস আইনজীবীর লম্বা কাঠের টেবিলে বসে আসন্ন যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন। এথেন্সের চেয়ে আইওনিনায় বিচার হলে ভালো হত। কিন্তু তা অসম্ভব, কারণ গ্রিক আইনে আছে যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে জায়গায় বিচার হতে পারবে না। নোয়েল পেজের অপরাধকর্ম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই চোটাসের, তবে এ-বিষয়টি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্য সব ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের মতো তাঁরও ধারণা একজন মক্কেল দোষী বা নির্দোষ কিনা তা খুব জরুরি কোনো বিষয় নয়। সুবিচার সবাই পেতে পারে।

বিচার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। নেপোলিয়ন চোটাস তাঁর পেশাদারী জীবনে এই প্রথমবার কোনো মক্কেলের সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়েছেন: তিনি নোয়েল পেজের প্রেমে পড়েছেন। কনস্টানটিন ডেমিরিসের অনুরোধে তিনি নোয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। নোয়েল তাঁকে অতিথির মতো বরণ করে নেয়। তাঁর মধ্যে নার্ভাসনেস বা ভয় কিছুই ছিল না। নোয়েলের মতো বুদ্ধিমতী এবং অপূর্ব সুন্দরী জীবনে দেখেননি চোটাস। তিনি নোয়েলের সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন। তাঁরা আইন, শিল্প, অপরাধ এবং ইতিহাস নিয়ে কথা বলেন। এবং যতই কথা বলছিলেন ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন চোটাস। কনস্টানটিন ডেমিরিসের মতো মানুষের সঙ্গে নোয়েলের সম্পর্ক তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলেও ল্যারি ডগলাসের বিষয়টি তাঁকে বিস্মিত করে তোলে। তাঁর মনে হয়েছে ল্যারির চেয়ে নোয়েল অনেক ওপরের স্তরের মানুষ। তবে চোটাস শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ব্যাখ্যাতীত কিছু রসায়ন রয়েছে যে-কারণে মানুষ অসম পার্টনারদের সঙ্গে প্রেম করে। প্রতিভাবান

বিজ্ঞানীরা বিয়ে করেন শূন্যমস্তিষ্কের স্বর্ণকেশীদের, বিখ্যাত লেখকরা বোকা অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হন, বুদ্ধিমান স্টেটসম্যানরা জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেন বারবণিতাদের।

ডেমিরিসের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে আছে চোটাসের। তাঁরা পরস্পরকে সামাজিকভাবে চেনেন দীর্ঘদিন ধরে। তবে চোটাসের ল ফার্ম ডেমিরিসের জন্য কোনো কাজ করেনি। ডেমিরিস চোটাসকে ভালকিজায়, তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই সরাসরি কাজের কথায় চলে আসেন তিনি। 'আপনি বোধহয় জানেন এই বিচার নিয়ে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে আমার। মিস পেজ আমার জীবনে একমাত্র নারী যাকে আমি প্রকৃতঅর্থেই ভালোবাসি।' ওঁরা দুজন একটানা ছ'ঘণ্টা কথা বলেন। কেস নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন, প্রতিটি সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নোয়েল নির্দোষ হিসেবে নিজেকে দাবি করবে। চোটাস যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, ততক্ষণে দুজনের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে। নোয়েলের পক্ষে কাজ করার জন্য নেপোলিয়ন চোটাস তাঁর পারিশ্রমিকের দ্বিগুণ অর্থ পাবেন এবং তাঁর ফার্ম কনস্টানটিন ডেমিরিসের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবে। এজন্য ফার্ম যে বহু মিলিয়ন ডলার পাবে তা বলাবাহুল্য।

'আপনি কাজটা কীভাবে করবেন জানতে চাই না আমি,' শেষে বলেছেন ডেমিরিস। 'তবে চাই যেন কোনো সমস্যা না হয়।'

চোটাস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। এবং মজার ব্যাপার নোয়েলের প্রেমে পড়ে গেছেন। চোটাস অবিবাহিত, তবে তার রক্ষিতার সংখ্যা প্রচুর। অবশেষে বিয়ে করার জন্য একজন নারীকে যদিও পছন্দ হল, কিন্তু সে তাঁর নাগালের বাইরে! নোয়েলের দিকে তাকালেন তিনি। সে বিবাদীর বক্সে বসে আছে। সুন্দরী এবং শান্ত। কালো উলের সুটের সঙ্গে সাধারণ, উঁচুগলার সাদা ব্লাউজেও তাকে রূপকথার রাজকন্যার মতো লাগছে।

মুখ ফেরাল নোয়েল। চোটাস তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে উষ্ণ একটি হাসি উপহার দিল। হাসি ফিরিয়ে দিলেন চোটাস, তবে তিনি সামনের কঠিন কাজটি নিয়ে ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন। ক্লার্ক আদালত শুরু হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

বিজনেস-সুট-পরা দুই বিচারককে এজলাসে ঢুকতে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জনতা। ওরা দুটি চেয়ার দখল করলেন। প্রধান বিচারক বসলেন মাঝের আসনে। তিনি ঘোষণা দিলেন 'I synethriassis archetai।'

শুরু হয়ে গেল বিচার।

সরকারপক্ষের বিশেষ কৌঁসুলী পিটার ডেমোনিডস নার্ভাসভঙ্গিতে সিধে হলেন জুরিদের উদ্দেশে উদ্বোধনী-ভাষণ দেয়ার জন্য। ডেমোনিডস দক্ষ কৌঁসুলী, বহুবার

নেপোলিয়ন চোটাসের সঙ্গে আইনি লড়াই করেছেন। প্রতিবারই একই ফল হয়েছে। বুড়ো ভামকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ট্রায়াল ল-ইয়ার সাক্ষীর প্রতি মারমুখী হলেও চোটাস তার বিপরীত। তিনি বিপক্ষের সাক্ষীর সঙ্গে অত্যন্ত সদয় আচরণ করেন, তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তার যুক্তির কাছে ধরা খেয়ে যায় রাঘববোয়াল আইনজীবীরা। জুরিসপ্রুডেন্স সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবে এটা তাঁর শক্তি নয়। তাঁর শক্তি মানুষকে বুঝতে পারা। একবার এক সাংবাদিক চোটাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে এত জানেন কীভাবে।

'আমি মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানি না,' জবাব দিয়েছিলেন চোটাস। 'আমি শুধু মানুষ সম্পর্কে জানি। তাঁর এই মন্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ডেমোনিডস একটা ব্যাপারে নিশ্চিত : নেপোলিয়ন চোটাস এ মামলায় যেভাবেই হোক জিতে যেতে চাইবেন। তবে ডেমোনিডসও হারতে রাজি নন। বিবাদীদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রমাণ আছে তাঁর কাছে। চোটাস এসব প্রমাণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তিন বিচারককেই প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ডেমোনিডস তার বক্তৃতার শেষে বললেন, 'এ মামলা শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্র প্রমাণ করে দেবে এই দুজন মানুষ একত্রে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ঠাণ্ডামাথায় ক্যাথেরিন ডগলাসকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কারণ তিনি ওদের পরিকল্পনার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ান। ক্যাথেরিনের একমাত্র অপরাধ ছিল তার স্বামীকে ভালোবাসা। এজন্যই তাঁকে মরতে হয়েছে। এই দুই আসামি হত্যার মঞ্চ তৈরি করেছেন। তাদের হত্যার মোটিভ এবং সুযোগ দুটোই ছিল। আমরা প্রমাণ করে ছাড়ব...'

ডেমোনিডসের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল দ্রুত। এবার বিবাদীপক্ষের উকিলের বলার পালা।

আদালতকক্ষের দর্শকরা দেখল নেপোলিয়ন চোটাস অলসভঙ্গিতে নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন। বক্তৃতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। ধীরগতিতে জুরিবক্সের দিকে এগোলেন তিনি। তারপর শুরু করলেন বলা।

'এই যে মহিলাকে বিচারের জন্য আনা হয়েছে,' জুরিদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন চোটাস, 'তাকে খুনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে না। কারণ আদপেই কোনো খুন হয়নি। খুন হলে আমি নিশ্চিত আমার বিজ্ঞ সহকর্মী ভিক্টিমের লাশ আমাদেরকে দেখাতেন। তিনি তা করেননি, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি কোনো লাশের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই কোনো খুনও হয়নি।' বিরতি দিয়ে কিছুক্ষণ খসখস করে মাথার তালু চুলকালেন তিনি, মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন কোথায় থেমেছেন তা মনে করার চেষ্টা করছেন। আপনমনে মাথা ঝাঁকালেন, তারপর তাকালেন জুরিদের দিকে। 'না, ভদ্রমহোদয়গণ, বিচার এজন্য

হচ্ছে না। আমার মক্কেলের বিচার হচ্ছে, কারণ তিনি আরেকটি আইন ভেঙেছেন, অলিখিত একটি আইন—যাতে বলা হয়েছে পরস্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে ব্যাভিচার বা সহবাস করা যাবে না। সংবাদমাধ্যমগুলো ইতোমধ্যে এ অপরাধের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বসেছে। জনগণের চোখে তিনি অপরাধী এবং তারা এখন তার শাস্তি দাবি করছে।'

চোটাস পকেট থেকে বড়, সাদা একটি রুমাল বের করলেন। বিহ্বল দৃষ্টিতে একমুহূর্তের জন্য ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন যেন জানেন না রুমালটা কীভাবে তার পকেটে এল। নাক ঝাড়লেন রুমাল দিয়ে তারপর ওটা চালান করে দিলেন পকেটে।

'বেশ। উনি যদি অপরাধ করেই থাকেন, আসুন তাকে শাস্তি দিই। তবে হত্যার জন্য নয়, ভদ্রমহোদয়গণ। যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি তার জন্য তাঁকে শাস্তি দেয়া যাবে না। নোয়েল পেজ অপরাধী কারণ তিনি—' নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি দিলেন তিনি—'একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষের রক্ষিতা। তার নামটি গোপন থাক্, তবে জানতে চাইলে যে-কোনো খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা ঘাঁটলেই নামটি পেয়ে যাবেন।'

দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠল।

অগাস্তি ল্যানচন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দর্শকদের দিকে। তার কুঁৎকুঁতে চোখজোড়া রাগে জ্বলছে। এদের কতবড় সাহস নোয়েলকে নিয়ে হাসাহাসি করে। নোয়েলের কাছে ডেমিরিস কিছু না। কিছুই না। তার কাছে অগাস্তি অনেক কিছু। কারণ অগাস্তির কাছেই নোয়েল তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে। মার্সেইর বেঁটে, মোটা এই দোকানদারটি এখনো নোয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি বটে, তবে কোর্টরুম পাস-এর জন্যে চারশো দ্রাকমা খরচ করেছে যাতে প্রিয় নোয়েলকে প্রতিদিন দেখার সুযোগ মেলে। নোয়েল খালাস পেলেই সে ওর কাছে যাবে, ওর সমস্ত ভার গ্রহণ করবে। আইনজীবীর দিকে মনোযোগ ফেরাল অগাস্তি।

'সরকারপক্ষের কৌসুলী বলেছেন দুই বিবাদী মিস পেজ এবং মি. লরেন্স ডগলাস মি. ডগলাসের স্ত্রীকে হত্যা করেছেন যাতে দুই বিবাদী একে অন্যকে বিবাহ করতে পারেন। ওদের দিকে একবার তাকান।'

চোটাস তাকালেন নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের দিকে। আদালতকক্ষের প্রতিটি চোখ ঘুরে গেল ওদের দিকে।

'ওরা কি পরস্পরের প্রেমে মাতোয়ারা? হয়তোবা। কিন্তু এতেই কি তারা ষড়যন্ত্রকারী এবং খুনি হয়ে গেলেন? না। এ বিচারের ভিক্টিম ওরা। আমি বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি, আপনাদেরকেও বোঝাতে পারব যে এই দুটি মানুষ নিরপরাধ। তবে জুরিদেরকে একটি বিষয়ে পরিষ্কার বলতে চাই আমি লরেন্স ডগলাসের পক্ষের আইনজীবী নই। তাঁর পরামর্শক আছেন যিনি নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ

বলছে এই মানুষদুটি ষড়যন্ত্রকারী এবং তারা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন। কাজেই একজন অপরাধী হলে দুজনেই অপরাধী। আমি বলছি এরা নির্দোষ। আমার সিদ্ধান্ত থেকে কেউ আমাকে সরাতে পারবে না।'

ক্রুদ্ধ শোনাচ্ছে চোটাসের কণ্ঠ। 'এ যেন এক উপন্যাস। আপনারা যেমন জানেন না ক্যাথেরিন ডগলাস বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে তেমনি আমার মক্কেলও তা জানেন না। কীভাবে জানবেন! ক্যাথেরিনের সঙ্গে তাঁর কোনোদিনই সাক্ষাৎই হয়নি, তার ক্ষতি করা দূরে থাক। ভেবে দেখুন যাকে তিনি কোনোদিনই দেখেনইনি, সে মানুষটিকে হত্যার অভিযোগ যখন চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন কেমন লাগে? মিসেস ডগলাসের তো অনেক কিছুই ঘটতে পারে বলে শোনা যায়। এর মধ্যে একটি হল তাকে ওদের দুজনের কেউ একজন হত্যা করেছেন। তবে মাত্র একজন। তবে এমনটি হওয়াই সবচেয়ে স্বাভাবিক যে মিসেস ডগলাস যখন জানতে পারলেন তার স্বামী মিস পেজের প্রেমে পড়েছেন, তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়ে—ভয় নয়, ভদ্রমহোদয়গণ—আঘাত পেয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালালেন। আর ঘটনা এমন ঘটলে আপনারা এক নিরপরাধ নারী এবং নির্দোষ পুরুষকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না।'

ল্যারি ডগলাসের উকিল ফ্রেডরিক স্টাভরোস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন ছিল— নোয়েল পেজ খালাস পেয়েছে আর তার মক্কেল দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এরকম ঘটলে সে তার পেশায় সবার চোখে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবে। স্টাভরস চেষ্টা করছিল নেপোলিয়ান চোটাসকে দিয়ে ফায়দা লুটতে। লোকটা নিজেই তার জন্য কাজটা করে দিয়েছে। সে যেভাবে দুই বিবাদীকে একই সুতোয় বেঁধে ফেলেছে, এর মানে নোয়েলের আত্মরক্ষা স্টাভরোসের মক্কেলের জন্যও আত্মরক্ষা হয়ে উঠেছে। এ মামলায় জিততে পারলে ফ্রেডরিক স্টাভরসের গোটা ভবিষ্যৎ বদলে যাবে, সে যা যা চেয়েছে সব চলে আসবে হাতের মুঠোয়। বুড়ো চোটাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল স্টাভরস।

স্টাভরোস সন্তুষ্টি নিয়ে লক্ষ করল জুরিরা চোটাসের প্রতিটি শব্দ গিলছেন।

'এই নারীর জাগতিক কোনোকিছুর প্রতি মোহ নেই,' বলে চলেছেন চোটাস। 'ভালোবাসার মানুষের জন্য তিনি যা-কিছু ত্যাগ করতে রাজি। বন্ধুগণ, কোনো খুনি নিশ্চয় এরকম হয় না।'

চোটাস কথা বলছেন, জুরিদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে নোয়েলের জন্য। ধীরে ধীরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চোটাস নোয়েলকে দাঁড়া করিয়ে দিলেন একজন অসাধারণ দরদী প্রেমিকা হিসেবে, যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনবান মানুষটিকে ছেড়ে দিয়েছে স্বল্পপরিচিত দরিদ্র এক যুবককে ভালোবাসার জন্য।

জুরিদের আবেগ নিয়ে খেলছেন চোটাস একজন দক্ষ সংগীতপরিচালকের মতো। তাঁদেরকে হাসাচ্ছেন, জল নিয়ে আসছেন চোখে—এবং সবসময়ই তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকছেন নিজে।

উদ্বোধনী-বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে চোটাস টলতে টলতে এগুলেন লম্বা টেবিলের দিকে, ধপাস করে বসে পড়লেন দর্শকদের করতালির মাঝে।

ল্যারি ডগলাস উইটনেস-বক্সে বসে শুনছে চোটাস তাকে সমর্থনের চেষ্টা করছেন। খুব রাগ হচ্ছে ল্যারির। কারো সমর্থন তার দরকার নেই। সে কোনো অপরাধ করেনি, পুরো বিচারটাই একটা ভুল জিনিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। দোষ কাউকে দিতে হলে নোয়েলকেই দিতে হবে। গোটা আইডিয়া তো তারই। ল্যারি নোয়েলের দিকে তাকাল। সুন্দরী, স্নিগ্ধ, সমাহিত। তবে ওর প্রতি আর কোনো কামনা অনুভব করছে না সে। শুধু প্যাশনের স্মৃতি, আবেগের আবছা একটা ছায়া আছে ওর মধ্যে। এই মহিলার জন্য জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে ল্যারির। প্রেসবক্সে চোখ ফেরাল ল্যারি। বছরকুড়ির এক আকর্ষণীয়া সাংবাদিক ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ল্যারি মৃদু হাসল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তরুণীর মুখ।

পিটার ডেমোনিডস এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন।

'আপনি কি অনুগ্রহ করে আপনার নামটি বলবেন?'

'আলেক্সিস মিনোস।'

'আপনার পেশা?'

'আমি একজন আইনজীবী।'

'আপনি ডিফেনডান্ট বক্সে বসা দুই বিবাদীর দিকে একবার তাকান, মি. মিনোস। আদালতকে বলুন এদের আগে কখনো দেখেছেন কিনা।'

'জি, স্যার। একজনকে দেখেছি।'

'কোন্ জনকে?'

'পুরুষটিকে।'

'মি. লরেন্স ডগলাস?'

'জি।'

'কোথায় কবে কী পরিস্থিতিতে মি. ডগলাসকে দেখেছেন বলবেন কি?'

'উনি ছয়মাস আগে আমার অফিসে এসেছিলেন।'

'আপনার কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইতে?'

'জি।'

'কী পরামর্শ চাইছিলেন তিনি?'

'ডিভোর্স চাইছিলেন। তিনি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরে আমি তাঁকে বলি গ্রিসে ডিভোর্স পাওয়া সম্ভব নয়।'

'কী পরিস্থিতি?'

'তিনি বলেন বিষয়টি যেন কোনোভাবেই জানাজানি না হয়। এ ছাড়া জানান

তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডিভোর্স দিতে রাজি নন।'

'আপনি তাকে তখন বললেন আপনার পক্ষে তাঁকে সাহায্য করা সম্ভব নয়? ডিভোর্স দিতে হলে তা প্রকাশ পেয়ে যাবে?'

'জি।'

এবারে নেপোলিয়ন চোটাসের পালা। সাক্ষীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। পিটার ডেমোনিডস চিন্তিত নন। মিনোস একজন আইনজীবী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাকে চোটাস বোকা বানাতে পারবেন না।

'আপনি একজন আইনজীবী, মি. মিনোস?'

'জি।'

'আমিও একটি ফার্ম চালাই। আইনের বিভিন্ন শাখায় কাজ করে আমার ফার্ম। হয়তো আমার কোনো পার্টনারের সঙ্গে আপনি কোনো করপোরেট কাজে সহায়তা করেছেন।'

'না, আমি কোনো করপোরেট কাজ করি না।'

'আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে?'

'আমি ট্যাক্স ল-ইয়ার নই।'

'ও আচ্ছা,' হতভম্ব দেখাল চোটাসকে, যেন প্রশ্নটা করে বোকা বনে গেছেন। 'সিকিউরিটি?'

'না,' চোটাসের অসহায় চেহারা উপভোগ করছে মিনোস। পিটার ডেমোনিডসের এবার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। নেপোলিয়ন চোটাস সাক্ষীদের জবাই করার আগে এরকম অসহায় ভাব ফুটিয়ে তোলেন চেহারায়। তাঁর এ চেহারা বহুবার দেখেছেন ডেমোনিডস।

বোকা-বোকা চেহারা নিয়ে মাথা চুলকাচ্ছেন চোটাস।

'আমি হার মানছি,' সরল স্বীকারোক্তি তাঁর। 'তাহলে কী নিয়ে কাজ করেন আপনি।'

'ডিভোর্স কেস,' জবাব এল।

'আপনি নিশ্চয় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন,' বললেন চোটাস।

'নিজের পক্ষে যতটা করা সম্ভব করি।'

'যতটা করা সম্ভব করেন!' প্রশংসা চোটাসের কণ্ঠে।

'মাঝে মাঝে আরো বেশি।'

পিটার ডেমোনিডস মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন, বুঝতে পারছেন না কী ঘটতে চলেছে।

চোটাস বললেন, 'আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যবসায় উঁকি দিতে চাই না, মি. মিনোস। তবে পেশাদার কৌতূহল থেকে জানতে চাইছি, প্রতিবছর কত ক্লায়েন্ট আপনার কাছে আসে?'

'বলা মুশকিল।'

'অনুমান তো অন্তত করুন।'

'ধরুন শ-দুয়েক। কাছাকাছি হবে আর কী।'

'একবছরে দুশো ডিভোর্স কেস! একা এতগুলো কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে নিশ্চয়।'

'ঠিক দুশো ডিভোর্স কেস নয়।'

থুতনি ঘষলেন চোটাস, 'মানে?'

'সবগুলো ডিভোর্স কেস থাকে না।'

হতভম্ব ভাবটা ফিরে এল চোটাসের চেহারায়। 'আপনি বললেন না একা ডিভোর্সের মামলাগুলো সামাল দেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—' গলা কেঁপে গেল মিনোসের।

'কিন্তু কী?' জিজ্ঞেস করলেন চোটাস।

'কিন্তু সবাই ডিভোর্সের জন্য আসে না।'

'আপনার কাছে তো তারা এজন্যই আসে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে কেউ কেউ তাদের মত বদলেও ফেলে।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন চোটাস, 'অহ্! তার মানে পুনর্মিলনের মতো বিষয় থাকে, তাই তো?'

'ঠিক,' জবাব দিলেন মিনোস।

'তার মানে অন্তত দশ শতাংশ ডিভোর্সে যেতে চায় না?'

অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মিনোস, 'সংখ্যাটা তার চেয়ে বেশি।'

'কত বেশি? পনেরো পার্সেন্ট? কুড়ি পার্সেন্ট?'

'চল্লিশের কাছাকাছি।'

নেপোলিয়ন চোটাস বিস্ময় নিয়ে তাকালেন মিনোসের দিকে। 'মি. মিনোস, আপনি কি বলতে চাইছেন যারা আপনার কাছে আসে তাদের অর্ধেকই ডিভোর্স চায় না?'

'জি।'

মিনোসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটল। পিটার ডেমোনিডসের দিকে ফিরল সে। ডেমোনিডস গভীর মনোযোগে মেঝের একটি ফাটল লক্ষ করছেন।

'আপনার দক্ষতা নিয়ে নিশ্চয়ই কারো কোনো সন্দেহ নেই,' বললেন চোটাস।

'অবশ্যই না,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বললেন মিনোস, 'ওরা আসে বোকার মতো আবেগতাড়িত হয়ে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়, পরস্পরকে তারা ঘৃণা করে, ভাবে ডিভোর্স নেবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বদলে ফেলে মত।'

'ধন্যবাদ,' নরম গলায় বললেন চোটাস, 'আপনার তথ্য অনেক কাজে লাগবে।'

পিটার ডেমোনিডস আরেকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিচ্ছেন।

'আপনার নাম?'

'কান্তা, আইরিন কান্তা।'

'মিস নাকি মিসেস?'

'মিসেস, আমি একজন বিধবা।'

'আপনার পেশা, মিসেস কান্তা?'

'আমি একজন হাউজকিপার।'

'কোথায় কাজ করেন?'

'রাফিনায় এক ধনী পরিবারে।'

'সাগরের কাছে গ্রামটি, তাই না? এথেন্সের একশো কিলোমিটার উত্তরে?'

'জি।'

'টেবিলে বসা দুই বিবাদীকে একবার লক্ষ করুন। এদেরকে আগে কখনো দেখেছেন?'

'অবশ্যই, বহুবার।'

'কোন্ পরিবেশে দেখেছেন বলবেন কি?'

'আমি যে ভিলায় কাজ করি ওরা তার পাশের বাড়িতে থাকেন। সাগরসৈকতে ওদেরকে অনেকবার দেখেছি। ওরা নগ্ন ছিলেন।'

দর্শকদের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ হল, সৃষ্টি হল গুঞ্জন। পিটার ডেমোনিডস চোটাসের দিকে তাকালেন। ভাবলেন বুড়ো বোধহয় আপত্তি জানাবেন, কিন্তু মুখে স্বপ্নালু হাসি এঁটে বসে আছেন তিনি টেবিলে। হাসিটি ডেমোনিডসকে আরো ঘাবড়ে দিল। তিনি সাক্ষীর দিকে তাকালেন।

'আপনি কি নিশ্চিত এ দুজনকেই দেখেছেন? আপনি কিন্তু শপথ নিয়েছেন।'

'ওদের দুজনকেই দেখেছি।'

'সৈকতে ওদেরকে দেখে কি মনে হয়েছে ওরা বন্ধুর মতো আচরণ করছেন?'

'ওরা যে ভাই-বোনের মতো আচরণ করেননি তা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

হেসে উঠল দর্শক।

'ধন্যবাদ, মিসেস কান্তা।' ডেমোনিডস ফিরলেন চোটাসের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়লেন নেপোলিয়ন চোটাস। উইটনেস বক্সে পা বাড়ালেন।

'আপনি এ ভিলায় কদ্দিন ধরে কাজ করছেন, মিসেস কান্তা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি ভয়ংকর চেহারার মহিলাকে।

'সাত বছর।'

'সাত বছর! তার মানে আপনি নিজের কাজে খুবই দক্ষ।'

'তা বলতে পারি।'

'আমার একজন ভালো হাউজকিপার দরকার। রাফিনার সাগরসৈকতে একটি বাড়ি কিনব ভাবছি। আশা করি আমার জন্য একজন হাউজকিপার জোগাড় করে দিতে পারবেন। তবে আমার সমস্যা হল আমি একান্তে কাজ করতে চাই। যদ্দূর মনে পড়ে ওখানকার ভিলাগুলো সব একসারিতে।'

'জি, না, স্যার। প্রতিটি ভিলায় বড় দেয়াল আছে। অন্য ভিলা থেকে বিচ্ছিন্ন।'

'তাহলে তো ভালোই। একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে নেই তো?'

'না, স্যার। ওই ভিলাগুলোর একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব কমপক্ষে একশো গজ। একটা ভিলার কথা জানি বিক্রি হবে। আপনার প্রাইভেসিতে কেউ নাক গলাতে আসবে না। আমার বোনকে বলব আপনার জন্য কাজ করতে। ও ঘরকন্নার কাজে খুব পটু, রাঁধেও ভালো।'

'ধন্যবাদ, মিসেস কাস্তা। শুনে খুশি হলাম। আমি আজ বিকেলেই ওকে আসতে বলব।'

'দিনের বেলায় ওর কাজ থাকে। আমার বোন বাড়ি ফেরে ছ'টায়।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'আমি ঘড়ি পরি না।'

'অহ্ দেয়ালে বড় একটা ঘড়ি আছে। কটা বাজে?'

'বুঝতে পারছি না। ঘড়িটা তো ঘরের একদম শেষ প্রান্তে।'

'ঘড়িটি কত দূরে বলে মনে হচ্ছে?'

'আ—পঞ্চাশ ফুট হবে বোধহয়।

'তেইশ ফুট, মিসেস কাস্তা। নো মোর কোয়েশ্চেন।'

মামলার শুনানি আজ পাঁচদিন ধরে চলছে। ডাক্তার ইসরায়েল কাৎজ-এর কাটা পা আবার ব্যথা করছে। সে কৃত্রিম পায়ে ভর করে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা অপারেশন চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখানে বসে ওর পায়ে হঠাৎই ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। এথেন্সে আসার পরে প্রতিদিন সে চেষ্টা করেছে নোয়েলের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নেপোলিয়ন চোটাসের সঙ্গে কথা বলেছে সে। আইনজীবী বলেছেন পুরোনো বন্ধুদের দেখলে খুব আপসেট হয়ে পড়তে পারে নোয়েল। মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। ইসরায়েল কাৎজ চোটাসকে বলেছে তিনি যেন নোয়েলকে বলে দেন সে এখানে এসেছে ওকে সাহায্য করার জন্য। তবে ম্যাসেজটি নোয়েলের কাছে আদৌ পৌঁছেছে কিনা জানে না সে। সে প্রতিদিন আদালতে বসে থাকে নোয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার আশায়। কিন্তু দর্শকদের দিকে ভুলেও তাকায় না নোয়েল।

নোয়েলের জন্য জীবন রক্ষা পেয়েছে ইসরায়েল কাৎজ-এর। সে এই ঋণ শোধ করতে সাহায্য করার সুযোগ পাচ্ছে না বলে অত্যন্ত মর্মাহত। বিচার কোন্‌দিকে যাচ্ছে কোনো ধারণা নেই তার, জানে না নোয়েল দোষী প্রমাণিত হবে

নাকি নির্দোষ। চোটাস বলেছেন আইনের সম্ভাব্য রায় দুটো : নির্দোষ অথবা দোষী। নির্দোষ হলে ছাড়া পাবে নোয়েল, দোষী হলে শাস্তি পাবে।

একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য চলছে।

'আপনার নাম?'

'ক্রিশ্চিয়ান বারবেট।'

'আপনি জাতিতে ফরাসি, মি. বারবেট?'

'জি।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'প্যারিসে।'

'আদালতকে কি বলবেন আপনার পেশা কী?'

'আমি একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার।'

'এজেন্সিটি কোথায়?'

'মূল অফিস প্যারিসে।'

'কী ধরনের কেস নিয়ে আপনি কাজ করেন?'

'নানান ধরনের... বাণিজ্যিক জালিয়াতি, নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজা, ঈর্ষাকাতর স্বামীর বা স্ত্রীর ওপর নজর রাখা...'

'মশিউ বারবেট, এ কক্ষের কে আপনার মক্কেল হয়েছিল বলতে পারবেন?'

সারা ঘরে চোখ বুলাল বারবেট। 'জি, স্যার।'

'কে?'

'ওই যে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। নোয়েল পেজ।'

দর্শকসারি থেকে ভেসে এল বিড়বিড়ানি।

'আপনি কি বলতে চাইছেন মিস পেজ তার জন্য কিছু গোয়েন্দাধর্মী কাজ করতে আপনাকে ভাড়া করেছিলেন?'

'জি, মশিউ।'

'ঠিক কী-ধরনের কাজ বলবেন কি?'

'জি, স্যার। উনি ল্যারি ডগলাস নামে এক লোকের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। সে কী করে না করে তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইতেন আমার কাছে।'

'আদালতে যে ল্যারি ডগলাস হাজির আছেন তিনি আর মিস পেজের লোক কি একজন?'

'জি, স্যার।'

'এ কাজের জন্য মিস পেজ আপনাকে টাকা দিতেন?'

'জি, স্যার।'

'মশিউ বারবেট, কীভাবে আপনি খবর সংগ্রহ করতেন?'

'কাজটা খুব কঠিন ছিল, মশিউ। আমি ছিলাম ফ্রান্সে, মি. ডগলাস থাকতেন

ইংল্যান্ডে। পরে উনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।'

'আমরা মিস পেজের আইনজীবীর কাছে শুনেছি মিস পেজের সঙ্গে ল্যারি ডগলাসের পরিচয় কিছুদিন আগে। তারা পাগলের মতো পরস্পরের প্রেমে পড়ে যান। আচ্ছা, ওদের প্রেম কবে থেকে শুরু হয় বলতে পারবেন?'

'কমপক্ষে ছয় বছর আগে থেকে।'

ডেমোনিডস বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকালেন চোটাসের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

চোখ ঘষলেন চোটাস। লম্বা টেবিল ছেড়ে উঠে উইটনেস-বক্সের দিকে এগোলেন।

'আপনার সময় বেশিক্ষণ নষ্ট করব না, মি. বারবেট। জানি আপনি প্যারিসে, আপনার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন।'

'আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে জেরা করতে পারেন, মশিউ।'

'ধন্যবাদ। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি খুব সুন্দর একটি সুট পরেছেন, মি. বারবেট।'

'ধন্যবাদ, মশিউ।'

'এটা প্যারিসে বানিয়েছেন, না?'

'জি, স্যার।'

'আপনার গায়ে বেশ মানিয়ে গেছে সুটটি। তবে আমার গায়ে সুট কখনোই ঠিকমতো লাগে না। ইংরেজ দর্জি দিয়ে কখনো সুট বানিয়েছেন! ওরাও চমৎকার সুট বানায়।

'না, মশিউ।'

'আপনি নিশ্চয় বহুবার ইংল্যান্ডে গেছেন?'

'আ—না।'

'কক্ষনো না?'

'না, স্যার।'

'আমেরিকায় যাননি?'

'না।'

'কক্ষনো না?'

'না, স্যার।'

'সাউথ প্যাসিফিকে ভ্রমণ করেছেন?'

'না, স্যার।'

'তাহলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনি একজন দুর্দান্ত গোয়েন্দা, মি. বারবেট। আপনাকে সালাম জানাই। আপনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও সাউথ প্যাসিফিকে ল্যারি ডগলাসের গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছেন অথচ বলছেন এসব জায়গায় জীবনেও যাননি। আপনি আসলে একজন সাইকিক।'

'আপনার ভুল শুধরে দেয়ার জন্য বলছি, মশিউ। ওসব জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন আমার হয়নি। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় করেসপন্ডেন্ট এজেন্সি ছিল আমার।'

'অহ্ আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষমা চাইছি। তার মানে ওই প্রতিনিধিরাই মি. ডগলাসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করত।'

'অবশ্যই!'

'তার মানে ল্যারি ডগলাসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিজে থেকে কিছু জানার সুযোগ হত না আপনার।'

'আ—ইয়ে না, স্যার।'

'তার মানে আপনার তথ্যগুলো বাস্তবতার ভিত্তিতে নিরিখ করলে বলা যায় সব সেকেন্ডহ্যান্ড।'

'এক অর্থে, তাই...'

বিচারকদের দিকে ফিরলেন চোটাস, 'আমি এই সাক্ষীর পুরো টেস্টিমনি চাই। ইনি শুধু শোনা-কথার ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট দিয়েছেন। এটা ভুয়া।'

লাফ মেরে খাড়া হলেন পিটার ডেমোনিডস, 'অবজেকশন, ইয়োর অনার। নোয়েল পেজ মি. বারবেটকে ভাড়া করেছিলেন ল্যারি ডগলাসের ওপর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এর মধ্যে ভুয়ামির কিছু নেই।'

'আমার বিজ্ঞ সহকর্মী প্রমাণ হিসেবে রেকর্ড জমা দিয়েছেন,' মৃদুগলায় বললেন চোটাস, 'আমি সেসব প্রমাণ গ্রহণ করতে রাজি আছি যদি তিনি মি. ডগলাসের ওপর যারা নজর রেখে চলছিল তাদেরকে নিয়ে আসতে পারেন। নতুবা আমি আদালতকে ধরে নিতে বলব কোনো সার্ভিলেন্স বা গোয়েন্দা নজরদারির ব্যাপার ছিল না এবং এই সাক্ষীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।'

প্রধান বিচারক ডেমোনিডসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সাক্ষীকে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন?'

'এ অসম্ভব! তোতলাল পিটার ডেমোনিডস, 'মি. চোটাস জানেন ওদেরকে খুঁজে পেতে অনেক দিন লেগে যাবে।'

বিচারপতি চোটাসের দিকে ফিরলেন, 'মোশন গ্রান্টেড।'

জেরা করছেন পিটার ডেমোনিডস।

'আপনার নাম বলবেন দয়া করে?'

'জর্জ মুলো।'

'আপনার পেশা।'

'আমি আইওনিনার প্যালেস হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক।'

'টেবিলে বসা বিবাদী দুজনের দিকে একবার তাকান। এদেরকে আগে কখনো দেখেছেন?'

'পুরুষটিকে দেখেছি। উনি গত আগস্টে হোটেলে উঠেছিলেন।'
'মি. লরেন্স ডগলাস নামে?'
'জি, স্যার।'
'হোটেলে ওঠার সময় তিনি কি একা ছিলেন?'
'না, স্যার।'
'কে ছিলেন সঙ্গে?'
'তাঁর স্ত্রী।'
'ক্যাথেরিন ডগলাস?'
'জি, স্যার।'
'মি. এবং মিসেস ডগলাস নামে তারা রেজিস্ট্রি করেছেন?'
'জি, স্যার।'
'মি. ডগলাসের সঙ্গে কেভস অব পেরামা নিয়ে কখনো কথা বলেছেন?'
'জি, স্যার। বলেছি।'
'বিষয়টি উত্থাপন কে করেছিল—আপনি নাকি মি. ডগলাস?'
'যদ্দূর মনে পড়ে উনি। তিনি গুহাগুলো সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন তাঁর স্ত্রী চাইছেন তাঁকে নিয়ে গুহায় যেতে। তিনি নাকি গুহা পছন্দ করেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।'
'আচ্ছা! অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কারণ?'
'মহিলাদের এ-ধরনের গুহাটুহা আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ থাকে না বলেই জানতাম।'
'আপনি কি কখনো মিসেস ডগলাসের সঙ্গে গুহা নিয়ে কথা বলেছেন?'
'না, স্যার। শুধু মি. ডগলাসের সঙ্গে কথা বলেছি।'
'কী বলেছিলেন?'
'বলেছিলাম গুহাগুলো বিপজ্জনক।'
'গাইডের বিষয়ে কিছু বলেছিলেন?'
মাথা দোলাল ক্লার্ক। 'জি, আমি গাইড নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমাদের হোটেলের অতিথিদের সবাইকে এ পরামর্শ দিই।'
'নো মোর কোয়েশ্চেন, ইয়োর উইটনেস, মি. চোটাস।'

'হোটেল ব্যবসায় কতদিন ধরে আছেন, মি. মুলো?'
'কুড়ি বছরেরও বেশি।'
'এর আগে সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন?'
'আমি? না, স্যার।'
'সাইকোলজিস্ট?'
'না, স্যার।'

'অ। তার মানে আপনি নারী মন বুঝতে পারার মতো এক্সপার্ট নন।'

'আমি সাইকিয়াট্রিস্ট হতে না পারি তবে হোটেল ব্যবসায়ে মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে হয়, শিখতে হয়।'

'ওসা জনসনকে চেনেন?'

'ওসা—? না।'

'বিশ্বখ্যাত এক্সপ্লোরার। এমিলিয়া ইয়ারহার্টের নাম শুনেছেন?'

'না, স্যার।'

'মার্গারেট মিড?'

'না, স্যার।'

'আপনি কি বিবাহিত, মি. মুলো?'

'এ মুহূর্তে ব্যাচেলর। তবে আমি তিনবার বিয়ে করেছি। কাজেই আমাকে মেয়েদের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট বলতে পারেন।'

'মি. মুলো, আপনি যদি মেয়েদের ব্যাপারে সত্যি এক্সপার্ট হতেন তাহলে অন্তত একটি বিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারতেন। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

'আপনার নাম, প্লিজ?'

'ক্রিস্টোফার কোকানিস।'

'পেশা?'

'আমি কেভস অব পেরামার একজন গাইড।'

'কতদিন ধরে ওখানে গাইড হিসেবে আছেন?'

'দশ বছর।'

'কাজ কেমন চলছে?'

'খুব ভালো। প্রতি বছর হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসে গুহা দেখতে।'

'বক্সে বসা লোকটার দিকে একবার তাকান। মি. ডগলাসকে আগে কখনো দেখেছেন?'

'জি, স্যার। তিনি আগস্টে গুহা দেখতে এসেছিলেন।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই।'

'আপনার কথা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে, মি. কোকানিস। প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ গুহা দেখতে আসে, আপনি একজন মানুষকে কী করে চিনে রাখলেন?'

'ওনাকে আমার মনে রাখার কারণ ছিল।'

'কী কারণ?'

'প্রথমত উনি গাইড নিতে চাননি।'

'আপনার সকল দর্শনার্থীই কি গাইড নেন?'

'জার্মান আর ফরাসিরা তেমন নেয় না, তবে আমেরিকানরা সবাই গাইড ব্যবহার করে।'

হাসি।

'আচ্ছা। মি. ডগলাসকে মনে থাকার আর কী কারণ ছিল?'

'উনি যখন গাইড নেবেন না বললেন, তার সঙ্গিনীকে কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছি। একঘণ্টা পরে আমি ওকে প্রবেশপথ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে দেখি। তিনি একা ছিলেন এবং তাঁকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল। ভেবেছি তাঁর সঙ্গিনী বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাই তার সঙ্গিনী ঠিক আছেন কিনা। তিনি আমার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দেন, 'কিসের সঙ্গিনী?'

আমি বলি, 'যাকে নিয়ে আপনি গুহায় ঢুকলেন,' তখন তার মুখ সাদা হয়ে যায়। ভয় পাচ্ছিলাম উনি আমাকে না মেরে বসেন। এরপর তিনি চিৎকার শুরু করেন, 'আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি। আমার সাহায্য দরকার।' তিনি উন্মাদের মতো কান্নাকাটি শুরু করে দেন।'

'কিন্তু আপনি নিখোঁজ মহিলা সম্পর্কে খোঁজ না-নেয়ার আগ-পর্যন্ত তিনি সাহায্যের জন্য চেঁচামেচি করেননি?'

'জি।'

'এরপর কী ঘটল?'

'আমি কয়েকজন গাইড নিয়ে হারানো মহিলার খোঁজে নেমে পড়ি। কোনো নির্বোধ নিউ সেকশনের 'বিপজ্জনক' লেখা সাইনবোর্ডটি ফেলে দিয়েছিলেন। ওই গুহা দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনঘণ্টা পরে আমরা ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পাই। তার দশা ছিল খুবই শোচনীয়।'

'শেষ প্রশ্ন। খুব সাবধানে জবাব দেবেন। মি. ডগলাস যখন প্রথমবার গুহা থেকে বের হয়ে এলেন তিনি কি সাহায্য পাবার জন্য কাউকে খুঁজছিলেন নাকি আপনার মনে হয়েছে উনি পালিয়ে যাচ্ছেন?'

'মনে হয়েছে উনি পালিয়ে যাচ্ছেন।'

'ইয়োর উইটনেস।'

নেপোলিয়ন চোটাস মৃদু গলায় জেরা শুরু করলেন।

'মি. কোকানিস, আপনি কি সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'না, স্যার। আমি একজন গাইড।'

'আপনি সাইকিক নন?'

'না, স্যার।'

'এ প্রশ্ন করার কারণ গত সপ্তাহে আমরা হোটেল ক্লার্ক পেয়েছি যিনি হিউম্যান সাইকোলজিতে এক্সপার্ট, সাক্ষী পেয়েছি যে দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখতে পায় না, আর আপনি এখন বলছেন আপনি উত্তেজিত কোনো মানুষ দেখলে তার প্রতি

আকৃষ্ট হন, তার মনের কথা পড়তে পারেন। আপনি কী করে জানলেন আপনি যখন তার কাছে গেলেন এবং তার সঙ্গে কথা বললেন তখন তাকে সাহায্যের জন্য ব্যাকুল বলে মনে হচ্ছিল না?'

'তার চেহারা দেখে তেমন মনে হয়নি আমার।'

'তার আচার-আচরণ পরিষ্কার মনে আছে আপনার?'

'জি।'

'সন্দেহ নেই আপনার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। একবার আদালতকক্ষের চারপাশে চোখ বুলান। এখানে আজকের আগে অন্য কাউকে দেখেছেন?'

'বিবাদীকে দেখেছি।'

'ঠিক আছে। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে? সময় নিন।'

'না।'

'দেখলে মনে পড়ত?'

'অবশ্যই।'

'আমাকে আপনি আজকের আগে কখনো দেখেছেন?'

'না, স্যার।'

'এ কাগজখণ্ডটি একবার দেখুন, প্লিজ। এটা কি বলুন তো?'

'একটি টিকেট।'

'কিসের?'

'কেভস অব পেরামার।'

'এতে কোন্ তারিখ দেয়া আছে?'

'সোমবারের। তিন সপ্তাহ আগের।'

'জি। এ টিকেট আমিই ব্যবহার করেছি, মি. কোকানিস। আমার সঙ্গে আরো পাঁচজন ছিলেন। আপনি ছিলেন আমাদের গাইড। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

'তোমার পেশা?'

'আমি আইওনিনার প্যালেস হোটেলের বেলবয়।'

'ডিফেনডেন্ট বক্সের ভদ্রমহিলাকে আগে কখনো দেখেছ?'

'জি, স্যার। সিনেমায়।'

'আজকের আগে আর কখনো মুখোমুখি দ্যাখো?'

'দেখেছি, স্যার। উনি হোটেলে এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন মি. ডগলাস কত নম্বর রুমে থাকেন। আমি তাকে ডেস্কে গিয়ে খবর নিতে বলি। উনি ডেস্কে যেতে চাননি। তখন আমি তাঁকে মি. ডগলাসের বাংলোর নাম্বার দিই।'

'সেটা কবে?'

'আগস্টের ১ তারিখ।'

'তুমি কি নিশ্চিত ইনিই সেই মহিলা?'

'আমি কী করে তাকে ভুলব? তিনি আমাকে দুশো দ্রাকমা বকশিশ দিয়েছিলেন।'

মামলার শুনানির চতুর্থ সপ্তাহ চলছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে নেপোলিয়ন চোটাসের মতো ধুরন্ধর আইনজীবী দ্বিতীয়টি দেখেননি। ল্যারি ডগলাসের আইনজীবী ফ্রেডরিক স্টাভরোস আনন্দের সাথে নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। সে এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে নেপোলিয়ন চোটাসের ওপর। তবে বুঝতে পারছে বিবাদীপক্ষের বেকসুর খালাস একমাত্র অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটলেই সম্ভব। আদালতে একটি চেয়ার সবসময় খালি থাকে। ওদিকে তাকিয়ে স্টাভরোস ভাবে কনস্টানটিন ডেমিরিস কি সত্যি সত্যি আদালতে হাজির হবেন? নোয়েল পেজ দোষী সাব্যস্ত হলে গ্রিক টাইকুনটি সম্ভবত আসবেন না। নোয়েল দোষী সাব্যস্ত হওয়া মানে তার পরাজয়। তবে তিনি যদি বুঝতে পারেন নোয়েল বেকসুর খালাস পাবে, তাহলে হয়তো তাঁর চেহারা দেখা যাবে।

তবে চেয়ারটি খালিই থাকল।

শুক্রবার বিকেলে অবশেষে মামলায় বিস্ফোরণ ঘটল।

'আপনার নাম বলবেন দয়া করে?'

'ডক্টর কাজোমিডস। জন কাজোমিডস।'

'আপনার সঙ্গে কখনো মি. কিংবা মিসেস ডগলাসের দেখা হয়েছিল, ডক্টর?'

'জি, স্যার। দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছে।'

'কোথায়?'

'আমাকে টেলিফোন করে কেভস অব পেরামায় যেতে বলা হয়। এক ভদ্রমহিলা হারিয়ে গেছেন গুহায়। অবশেষে সার্চপার্টি খুঁজে পায় তাকে। তিনি ভয়ানক শকের মধ্যে ছিলেন।'

'শারীরিকভাবে কি আহত ছিলেন?'

'জি। শরীর প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার হাত, বাহু এবং গালের চামড়া ছিলে গিয়েছিল ধারালো পাথরের আঘাতে। পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি, তাঁর খিঁচুনিও দেখা দেয়। ব্যথার জন্য আমি তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে মরফিন দিই। এবং তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্চপার্টিকে বলি।'

'তিনি সেখানে গিয়েছিলেন?'

'না, স্যার।'

'জুরিদেরকে বলবেন কি কেন তিনি যাননি?'

'তার স্বামীই তাকে জোর করে প্যালেস হোটেলের বাংলোয় নিয়ে আসেন। তিনি নিজেই স্ত্রীর যত্ন নেবেন বলছিলেন।'

'তো মিসেস ডগলাসকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আপনি কি সেখানে তাকে

সঙ্গ দিয়েছেন?'

'জি। আমি তার সঙ্গে বাংলোতে যেতে চাই। আমি চাইছিলাম জেগে ওঠার পরে তাঁর পাশে থাকতে।'

'উনি জেগে ওঠার পরে তার পাশে ছিলেন?'

'জি, স্যার।'

'মিসেস ডগলাস আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন।'

'আদালতকে কী বলবেন তিনি কি বলেছিলেন?'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর স্বামী তাকে খুন করতে চাইছে।'

আদালতকক্ষে এমন শোরগোল শুরু হয়ে গেল, থামাতে ঝাড়া পাঁচ মিনিট লাগল। প্রধান বিচারক আদালতকক্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিলে সবাই শান্ত হল। নেপোলিয়ন চোটাস দ্রুত ডিফেনডেন্ট বক্সে গিয়ে নোয়েলের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এই প্রথম আপসেট মনে হল নোয়েলকে। ডেমোনিডস জেরা চালিয়ে গেলেন।

'ডক্টর, আপনি সাক্ষ্যে বলেছেন মিসেস ডগলাস শক-এর মধ্যে ছিলেন। উনি যখন বললেন তাঁর স্বামী তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন তখন কি তিনি সুস্থমস্তিষ্কে ছিলেন?'

'জি, স্যার। আমি গুহায় থাকতেই তাঁকে একটি সিডেটিভ দিই। তিনি তখন অনেকটাই শান্ত ছিলেন। তবে আমি যখন তাঁকে আরেকবার সিডেটিভ দিতে যাই, উনি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। আমাকে সিডেটিভ না দিতে অনুরোধ করতে থাকেন।'

প্রধান বিচারক সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন?'

'জি, ইয়োর অনার। বলেছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁকে মেরে ফেলবেন।'

চেয়ারে হেলান দিলেন বিচারক। চিন্তিত। পিটার ডেমোনিডসকে বললেন, 'আপনি জেরা চালিয়ে যেতে পারেন।'

'ডক্টর, কাজোমিডস, আপনি কি মিসেস ডগলাসকে দ্বিতীয় সিডেটিভটি দিয়েছিলেন?'

'জি।'

'তিনি তখন বাংলোর বিছানায় ছিলেন?'

'জি।'

'কীভাবে সিডেটিভ দিয়েছিলেন?'

'হাইপডারমিক ইনজেকশনে। নিতম্বে।'

'আপনি চলে আসার পরে উনি ঘুমিয়ে পড়েন?'

'জি।'

'এমন কি হতে পারে না কয়েক ঘণ্টা পরে মিসেস ডগলাস জেগে উঠে কারো সাহায্য ছাড়াই বিছানা ছাড়লেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন কাউকে কিছু না বলে?'

'শরীরের ওই দশায়? না, এটা হতে পারে না। তাকে প্রচুর সিডেটিভ দেয়া হয়েছিল।'

'ঠিক আছে, ডক্টর, ধন্যবাদ।'

জুরীরা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নোয়েল পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের দিকে। জুরিদের চেহারা শীতল এবং ক্রূর।

বিল ফ্রেজার মনে-মনে খুব খুশি। ড. কাজোমিডসের সাক্ষ্যদানের পরে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না ক্যাথেরিনকে ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েল পেজই হত্যা করেছে। নেপোলিয়ন চোটাস যতই চেষ্টা করুন জুরিদের মন থেকে এক আতঙ্কিত নারীর ছবি মুছে ফেলতে পারবেন না যে-নারীকে হত্যার জন্য নিষ্ঠুরভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর সে আকুতি করছিল, প্রাণভিক্ষা চাইছিল।

আতঙ্কবোধ করছে ফ্রেডরিক স্টাভরোস। নেপোলিয়ন চোটাসের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল সে, অন্ধের মতো বিশ্বাস করছিল তাঁকে। নিশ্চিত ছিল চোটাস তার মক্কেলকে বেকসুর খালাস করে আনবেন। কিন্তু সবকিছু উল্টো হয়ে গেল। নিজেকে প্রতারিত মনে হচ্ছে স্টাভরোসের। সে চোটাসের দিকে তাকাল। ব্লাডহাউন্ড চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ডাক্তারকে দেখছেন তিনি। যেন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছেন।

নেপোলিয়ন চোটাস ধীরগতিতে সিধে হলেন। তবে সাক্ষীর দিকে না গিয়ে বিচারকদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'মি. প্রেসিডেন্ট, ইয়োর অনার,' বললেন তিনি বিচারকদের উদ্দেশ করে। 'আমি সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করতে চাই না। তবে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কোর্ট এবং প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির সঙ্গে আলোচনার জন্য একটু সময় প্রার্থনা করছি।'

প্রধান বিচারক তাকালেন প্রসিকিউটরের দিকে। 'মি. ডেমোনিডস?'

'নো, অবজেকশন,' বললেন ডেমোনিডস, তাঁর কণ্ঠ শুকনো।

আদালত সাময়িকভাবে মুলতবি ঘোষণা করা হল। তবে কেউ আসন ছেড়ে নড়ল না।

এরপরে যেন একটি মিরাকল ঘটে গেল। নেপোলিয়ন চোটাস তিন বিচারকের সঙ্গে কিছুক্ষণ একান্তে কথা বললেন। শেষে বিচারকদের কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েল পেজকে। ল্যারির সঙ্গে তার আইনজীবী ফ্রেডরিক স্টাভরোসও থাকল। চোটাস জানালেন বিচারকদের সঙ্গে কথা বলার পরে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে, বিবাদীপক্ষ যদি তাদের অপরাধ স্বীকার করে

ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাহলে বিচারকরা তাদের দুজনের প্রত্যেককে পাঁচবছর করে জেল দেবেন। তবে এর মধ্যে চারবছর তাদেরকে জেল খাটতে হবে না। আসলে সবসুদ্ধ জেল খাটতে হবে ছ'মাস। ল্যারি ডগলাস আমেরিকান বলে তাকে খালাস দেয়া হবে। তবে ল্যারি কোনোদিনই গ্রিসে ফিরতে পারবে না। ল্যারির শাস্তি মওকুফের কারণ বিচারকমণ্ডলী মনে করছেন সে ইতোমধ্যে যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তাঁরা আর তাকে শাস্তি দিতে চান না। আর নোয়েলের পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হবে। সে আর কোনোদিনই গ্রিস ত্যাগ করতে পারবে না। তাকে কনস্টানটিন ডেমিরিসের প্রটেকশনে কাটাতে হবে বাকি জীবন।

নোয়েল বুঝতে পারল ওদের শাস্তি মওকুফের পেছনে পুরো কৃতিত্বই কনস্টানটিন ডেমিরিসের। বিচারকরা দয়া করে ল্যারিকে ক্ষমা করেননি কিংবা নোয়েলকে মানবিক কারণে ছেড়ে দিচ্ছেন না। এজন্য ডেমিরিসকে নিশ্চয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তবে বিনিময়ে গ্রিক টাইকুন এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে নোয়েল তাঁর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য এবং কোনোদিন তাঁকে ত্যাগ করতে পারবে না। অথবা ল্যারিকে দেখার সুযোগও কোনোদিন নোয়েলের হবে না। নোয়েল ল্যারির দিকে তাকাল। ল্যারির চেহারায় স্বস্তির ছাপ। সে মুক্তি পাচ্ছে এবং এ নিয়েই শুধু ভাবছে। নোয়েলকে হারানোর বেদনার চিহ্নমাত্র নেই তার চেহারায়। নোয়েল চোটাসের দিকে ফিরল, 'আপনার কথা শুনে ভরসা পাচ্ছি।'

চোটাস তাকালেন নোয়েলের দিকে। তার চাউনিতে বিষণ্নতা এবং তৃপ্তি। বিষয়টি বুঝতে পারল নোয়েল। চোটাস তার প্রেমে পড়েছেন, নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ব্যয় করে তিনি নোয়েলকে রক্ষা করেছেন আরেকজন পুরুষের জন্য। নোয়েলই চোটাসকে তার প্রেমে পড়তে সাহস যুগিয়েছে। কারণ চোটাসকে তার দরকার ছিল।

'দারুণ একটা কাজ হয়েছে,' মন্তব্য করল স্টাভরোস, 'খুবই দারুণ।' আসলে তার মনে হচ্ছে এটা একটা মিরাকল ঘটে গেছে। ল্যারি বলল, 'সবই ঠিক আছে। তবে একটা কথা—আমরা অপরাধী নই। আমরা ক্যাথেরিনকে খুন করিনি।'

রেগে গেল ফ্রেডরিক স্টাভরোস। 'আপনি অপরাধী হোন বা না হোন তাতে কার কী এসে যায়?' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'আমরা স্রেফ আপনাকে নতুন একটা জীবন দিলাম।' চোটাসের দিকে চট করে তাকাল সে একবার 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য বৃদ্ধ কিছু মনে করেছেন কিনা দেখতে। তবে তাঁর চেহারা শান্ত, সমাহিত।

পনেরো মিনিট বাদে দুই বিবাদীকে নিয়ে আসা হল বিচারকদের সামনে। প্রধান বিচারপতি মাঝখানে বসেছেন, তাঁর দুইপাশে দুই বিচারক। নেপোলিয়ন চোটাস দাঁড়িয়ে রয়েছেন নোয়েল পেজের পাশে, আর ফ্রেডরিস স্টাভরোস ল্যারি ডগলাসের কাছে। প্রচণ্ড একটা টেনশন বিরাজ করছে আদালতকক্ষে।

আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল।

নেপোলিয়ন চোটাস বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, ইয়োর অনার, আমার মক্কেল দোষী নয় বলে যে আবেদন করেছিলেন তা থেকে সরে আসতে চাইছেন। তিনি নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে ক্ষমা চাইছেন।'

প্রধান বিচারপতি চেয়ারে হেলান দিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন চোটাসের দিকে। যেন খবরটা এই প্রথম শুনছেন।

লোকটা ভালোই অভিনয় করছে, ভাবল নোয়েল। *ডেমিরিস ওকে কত টাকা খাইয়েছেন কে জানে!*

প্রধান বিচারক অন্য দুই বিচারকের সঙ্গে ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারা মাথা ঝাঁকালেন সম্মতির ভঙ্গিতে। প্রধান বিচারক নোয়েলের দিকে তাকালেন। 'আপনি অপরাধ স্বীকার করতে চাইছেন?'

মাথা দোলাল নোয়েল, দৃঢ় গলায় জবাব দিল, 'জি।'

ফ্রেডরিক স্টাভরোস চট করে বলে উঠল, 'ইয়োর অনার, আমার মক্কেলও অপরাধ স্বীকার করবেন।'

প্রধান বিচারক তাকালেন ল্যারির দিকে, 'আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করতে চাইছেন?'

চোটাসের দিকে একবার তাকাল ল্যারি, তারপর মাথা ঝাঁকাল, 'জি।'

দুই আসামিকে লক্ষ করছেন প্রধান বিচারক। চেহারা থমথমে, 'আপনাদের আইনজীবীরা কি আপনাদেরকে জানিয়েছেন গ্রিক আইনে পূর্বকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড?'

'জি, ইয়োর অনার,' নোয়েলের কণ্ঠ দৃঢ় এবং পরিষ্কার।

বিচারক তাকালেন ল্যারির দিকে।

'জি, স্যার।' বলল সে।

বিচারকদের মধ্যে আবার ফিসফাস আলাপ শুরু হয়ে গেল। প্রধান বিচারক ডেমোনিডসের দিকে তাকালেন, 'সরকার পক্ষের কৌসুলীর কি এই অপরাধ স্বীকারের বিষয়ে কোনো আপত্তি আছে?'

চোটাসের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ডেমোনিডস, তারপর বললেন, 'না, নেই।'

'বেশ,' বললেন প্রধান বিচারপতি। 'এই আবেদন গ্রহণ করা ছাড়া আদালতের অন্য কোনো বিকল্প নেই।' তিনি জুরিদের দিকে ফিরলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এই নতুন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জুরি হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। মামলারও সমাপ্তি ঘটল সেইসাথে। এবার আদালত রায় ঘোষণা করবে। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আদালত দু-ঘণ্টার জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হল।'

এর পরপরই সাংবাদিকরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ছুটলেন টেলিফোন এবং টেলিটাইপ মেশিনের দিকে। নোয়েল পেজ ও ল্যারি ডগলাসের হত্যামামলার আকস্মিক পরিবর্তিত ঘটনার বর্ণনা পাঠাতে।

দুই ঘণ্টা পরে আদালতকক্ষ আবার কানায় কানায় ভরে উঠল। নোয়েল দর্শকদের ওপর চোখ বুলাল। সবাই তাকিয়ে আছে নোয়েলের দিকে। এরা সাধারণ মানুষ।

একটু পরে প্রধান বিচারক বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে অস্বস্তিবোধ হতে লাগল নোয়েলের। যদিও বক্তৃতায় ভীতিকর কিছু নেই, তবু কেমন ভয় ভয় করছে ওর। কিন্তু বক্তৃতার মাঝপর্যায়ে ওর অস্বস্তি বেড়ে গেল, দম কেমন বন্ধ হয়ে আসছে। ল্যারি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিচারকের দিকে। যেন বুঝতে পারছে না কী ঘটছে।

প্রধান বিচারক বলে চলেছেন, 'আমি বুঝতে পারছি মানুষ এবং আদালতের সামনে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করা কত কষ্টের এবং যন্ত্রণার। তবে তারা ঠাণ্ডা-মাথায় একটি অসহায় নারীকে খুন করেছেন। কাজেই তাদের কোনো আবেদন বা কাকুতি মিনতি গ্রাহ্য করা হবে না।'

আর সে-মুহূর্তে নোয়েল বুঝে গেল তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ডেমিরিস মিথ্যা নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে ওর মুখ থেকে বের করে নিয়েছেন ও অপরাধী। এটাই তাঁর খেলা। এ ফাঁদটাই তিনি পেতেছিলেন। তিনি জানতেন মৃত্যুকে ভয় পায় নোয়েল, এজন্য তিনি ওর মনে আশার আলো জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নোয়েল তাকে বিশ্বাস করেছিল। এবং তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। অবশেষে প্রতিশোধ নিচ্ছেন ডেমিরিস। অবশ্যই চোটাস জানতেন লাশ খুঁজে না-পেলে নোয়েলের মৃত্যুদণ্ড হবে না। বিচারকদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটি ছিল সর্বৈব মিথ্যা। চোটাস ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। নোয়েল আইনজীবীর দিকে তাকাল। তার চোখ প্রচণ্ড বিষণ্ন। চোটাস নোয়েলকে ভালোবাসতেন আবার তাকেই তিনি হত্যা করলেন। কারণ তিনি ডেমিরিসের লোক। যেমন সে ডেমিরিসের রক্ষিতা। ডেমিরিসের শক্তির সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না।

প্রধান বিচারক বলছেন, '... রাষ্ট্রের, ক্ষমতাবলে এবং আইন অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি দুই আসামি নোয়েল পেজ ও ল্যারি ডগলাসকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যা করা হবে। ... আজ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে এ রায় কার্যকর করা হবে।'

আদালতে যেন নরক ভেঙে পড়ল। তবে নোয়েল হৈ-হল্লা চিৎকার কিছু শুনছে না, কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে আদালতের সেই শূন্য আসনটির দিকে। আসনটি এখন খালি নেই। ওতে বসে আছেন কনস্টানটিন ডেমিরিস। শেভ করে এসেছেন তিনি, পরনে ব্লু রঙের সিল্কের সুট, হালকা নীল শার্ট, টাই। তার জলপাইরঙা চোখজোড়া ঝকঝকে, উজ্জ্বল। এখন দেখে বোঝার উপায় নেই এই মানুষটি বিধ্বস্ত, পরাজিত চেহারা নিয়ে কারাগারে দেখা করতে গিয়েছিলেন নোয়েলের সঙ্গে।

কনস্টানটিন ডেমিরিস স্থিরদৃষ্টিতে দেখছেন নোয়েলকে। ডেমিরিসের চোখে একমুহূর্তের জন্য অশুভ তৃপ্তি ফুটে উঠতে দেখল নোয়েল। হয়তো খানিকটা

অনুতাপও। তবে ঠিক বুঝতে পারল না নোয়েল।

খেলা অবশেষে শেষ।

বিচারকের রায় শুনে অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল ল্যারির মুখ। এক আর্দালি এসে ওর হাত ধরল। ল্যারি ঝাঁকি মেরে ছুটিয়ে নিল হাত। তাকাল বিচারকদের দিকে।

'এক মিনিট!' চিৎকার দিল ও। 'আমি ওকে খুন করিনি! ওরা আমাকে ফাঁদে ফেলেছে।'

আরেক আর্দালি এগিয়ে এল। দুজনে মিলে জাপটে ধরল ল্যারিকে। একজনের হাতে হ্যান্ডকাফ।

'না!' চিৎকার করছে ল্যারি, 'আমার কথা শোনো! আমি ওকে খুন করিনি!'

আর্দালিদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল ল্যারি, কিন্তু ওর কব্জিতে চেপে বসল হাতকড়া। ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল ঘর থেকে।

নোয়েল ওর হাতে চাপ অনুভব করল। একজন ম্যাট্রন অপেক্ষা করছে ওকে আদালতকক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

'ওরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, মিস পেজ।'

এ যেন নাটকের সেই আহ্বান—*ওরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে*। তবে এবারে পর্দা পড়ার পরে আর উঠবে না। আর কখনো জনসমক্ষে হাজির হওয়ার সুযোগ ঘটবে না ওর। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে একটা ঝাঁকি খেল নোয়েল। শেষবারের মতো আদালতকক্ষে চোখ বুলাল। দেখল আরমন্দ গটিয়ের ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দেখল ফিলিপ্পি সোরেল ওকে সাহস দেয়ার জন্য হাসার চেষ্টা করছে কিন্তু হাসতে পারছে না।

রুমের ওধারে ইসরায়েল কাৎজ। চোখ বুজে আছে যেন নীরব প্রার্থনা করছে। নোয়েলের মনে পড়ে গেল সে-রাতের কথা যে-রাতে কাৎজকে জেনারেলের গাড়ির ট্যাংকে ভরে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছিল আলবিনো গেস্টাপো অফিসারের নাকের ডগা দিয়ে। ওই সময় ভয়ে কাতর ছিল নোয়েল। কিন্তু এখনকার আতঙ্কের চেয়ে ওটা কিছুই না।

নোয়েল দেখতে পেল অগাস্তি ল্যানচনকে। লোকটা চোখ পিটপিট করছে। হয়তো চোখে আসা পানি ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

এক লম্বা, সুদর্শন, ধূসরচুলো আমেরিকান আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, তাকিয়ে আছেন নোয়েলের দিকে। কিছু বলতে চাইছেন। তবে এ লোককে চিনতে পারল না নোয়েল। মেট্রন নোয়েলের হাত ধরে টানল, 'চলুন, মিস পেজ...'

দিশেহারা বোধ করছে ফ্রেডরিক স্টাভরোস। কী করবে বুঝতে পারছে না। সে কি প্রধান বিচারকের কাছে গিয়ে বলবে নেপোলিয়ন চোটাস ওদেরকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? কিন্তু ওরা কি স্টাভরোসের কথা বিশ্বাস করবেন? আজকের ঘটনার

পরে আইনজীবী হিসেবে ক্যারিয়ার খতম হয়ে গেল স্টাভরোসের। কেউ আর তার কাছে আসবে না।

গ্রিক আইন অনুসারে এজিয়ানার ছোট্ট দ্বীপে ওদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। দ্বীপটি পোর্ট অব পিরাউস থেকে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সরকারি বিশেষ বোটে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের এখানে নিয়ে আসা হয়।

শনিবার। ভোর চারটা। নোয়েলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে সকাল ছটায়।

ওরা নোয়েলের প্রিয় পোশাক নিয়ে এসেছে পরার জন্য। ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের ওয়াইন-রেড, উলের ড্রেস। সঙ্গে ম্যাচ-করা লালজুতো। কনস্টানটিন ডেমিরিস নোয়েলের হেয়ারড্রেসারকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন চুলের যত্ন নিতে। যেন নোয়েল কোনো পার্টিতে যাবে।

নোয়েল জানে আর দু ঘণ্টা পরে ওর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত শরীর লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। তবু আশা ছাড়ছে না শেষমুহূর্তে একটি মিরাকল ঘটিয়ে ফেলবেন ডেমিরিস। বেঁচে যাবে নোয়েল। মিরাকলের দরকার নেই—ডেমিরিস স্রেফ একটা ফোন করলেই সবকিছু বদলে যাবে। উনি যদি নোয়েলের জীবন রক্ষা করেন, ডেমিরিসের পক্ষে যা-কিছু করা সম্ভব তা করবে নোয়েল। তাঁকে বলবে আর কোনোদিন অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সে জড়াবে না। নিজেকে উৎসর্গ করবে বাকি জীবনটা ডেমিরিসকে সুখী করার জন্য।

কারাগারের অপরপ্রান্তে রয়েছে ল্যারি ডগলাস। মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পরে তার কাছে চিঠি আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে মেয়েরা চিঠি লিখেছে ল্যারিকে। অবশ্য ল্যারি এসব চিঠির কথা জানে না। সে আছে এক অদ্ভুত আঁধারের রাজ্যে। দ্বীপে আসার প্রথম কয়েকদিন সে সারা দিনরাত শুধু চিৎকার করেছে, আবার নতুন করে বিচারের দাবি করেছে। ডাক্তার ওর উন্মাদনা থামাতে শেষে ট্রাংকুইলাইজার দিয়েছেন।

ভোর পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে কারাগারের ওয়ার্ডেন চারজন গার্ড নিয়ে ঢুকল ল্যারির কারাকক্ষে। সে বাঙ্কে বসে আছে। হতাশ, বিধ্বস্ত, ম্রিয়মাণ। দুবার নাম ধরে ডাকার পরে সে সচেতন হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সিধে হল। তাকে দেখে মনে হল মাতাল।

ওকে নিয়ে করিডর ধরে এগোল ওয়ার্ডেন। করিডরের শেষপ্রান্তে একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রক্ষী খুলে দিল দরজা। ওরা দেয়ালঘেরা একটি উঠোনে ঢুকল। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর শিরশির করে উঠল ল্যারির। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র। দৃশ্যটা সাউথ প্যাসিফিক দ্বীপের কথা মনে করিয়ে দিল ল্যারিকে। টেকঅফের আগে, শেষমুহূর্তের ব্রিফিঙে পাইলটরা তাদের

উষ্ণ বাংক ছেড়ে তারা-জ্বলা খোলা আকাশের দিকে এভাবে এসে দাঁড়াত। দূর থেকে ভেসে এল সাগরের গর্জন। ল্যারি মনে করার চেষ্টা করল কোন্ দ্বীপে সে ছিল, তার মিশন কী ছিল। কয়েকজন লোক দেয়ালের সামনে খুঁটির সঙ্গে দাঁড় করাল। হাত বেঁধে ফেলল পেছনে।

ল্যারির এখন আর রাগ হচ্ছে না। একধরনের আলস্যে ভার হয়ে আছে মাথা। মুখ তুলে চাইল ও। ইউনিফর্ম-পরা কয়েকজন লোক বন্দুক তুলেছে ওকে লক্ষ করে। ওর মাথাটা হঠাৎ বনবন করে ঘুরতে লাগল। গোটা দুনিয়া ঘুরছে ওর চারপাশে। সব কেমন অন্ধকার আর নীরব হয়ে আসছে।

কারাকক্ষে নোয়েলের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে হেয়ারড্রেসার, বাইরে বজ্রপাতের মতো শব্দ হল।

'বৃষ্টি আসছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

হেয়ারড্রেসার জবাব দিল, 'না। আজ আবহাওয়া খুব পরিষ্কার।'

তখন নোয়েল শব্দের উৎস বুঝতে পারল।

এরপর ওর পালা।

ভোর সাড়ে পাঁচটায়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আধঘণ্টা আগে নোয়েল শুনতে পেল কেউ হেঁটে আসছে ওর কারাকক্ষের দিকে। লাফিয়ে উঠল কলজে। ও নিশ্চিত কনস্টানটিন ডেমরিস দেখতে এসেছেন ওকে। হয়তো উনি ওর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারবেন না... হয়তো...

কারাগারের ওয়ার্ডেন দাঁড়াল কারাকক্ষের সামনে, সঙ্গে একজন গার্ড এবং নার্স। নার্সের হাতে কালো মেডিকেল ব্যাগ। নোয়েল ওদের পেছনে তাকাল। নেই ডেমিরিস। শূন্য করিডর। গার্ড সেলের দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল ওয়ার্ডেন এবং নার্স। নোয়েলের বুক ধুকপুক করতে লাগল, মৃত্যুভয়টা আবার ফিরে আসছে ওর আশা নিভিয়ে দিয়ে।

'এখনো সময় হয়নি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল। অস্বস্তি নিয়ে তাকাল ওয়ার্ডেন। 'না, মিস পেজ। নার্স এনেছি আপনাকে এনিমা (enema) দেয়ার জন্য।'

ওয়ার্ডেনের দিকে তাকাল নোয়েল, লোকটার কথা বুঝতে পারেনি। 'আমার এনিমার দরকার নেই।'

লোকটা যেন আরো অস্বস্তিতে পড়ে গেল। 'এটা আপনাকে বিব্রত হওয়ার কবল থেকে রক্ষা করবে।'

এবারে তার কথা বুঝতে পারল নোয়েল। ভয়ের জায়গায় জন্ম নিল ক্রোধ। তবু মাথা ঝাঁকাল সে। ঘুরল ওয়ার্ডেন। চলে গেল সেল ছেড়ে। দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড। করিডর ধরে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'আপনার সুন্দর পোশাকটা নষ্ট করতে চাই না,' বলল নার্স।

'আপনি ড্রেস খুলে ওখানে শুয়ে পড়ুন। কাজ সারতে মাত্র এক মিনিট লাগবে।'

কাজ শুরু করল নার্স, নোয়েল কিছুই টের পেল না।

বাবাকে দেখতে পাচ্ছে নোয়েল। বলছে : আমার মেয়েটিকে দ্যাখো। যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে ওর শরীরে বইছে অভিজাত রক্ত। লোকজন ওকে কোলে নেয়ার জন্য রীতিমতো কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে। এক প্রিস্ট ঢুকলেন ঘরে। বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে কি তুমি কনফেশন করবে, মাই চাইল্ড?' অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নোয়েল, কারণ তার বাবা বলছে, *তুমি একজন রাজকুমারী। আর এটি তোমার রাজ্য। বড় হলে এক সুদর্শন রাজপুত্রকে বিয়ে করবে তুমি, থাকবে রাজপ্রাসাদে।*

লম্বা করিডর ধরে হাঁটছে নোয়েল কয়েকজন লোকের সঙ্গে। তারা একটি দরজা খুলল। ওকে নিয়ে এল ঠাণ্ডা উঠোনে। ওর বাবা ওকে জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সে জাহাজের লম্বা মাস্তুল দেখতে পাচ্ছে।

লোকগুলো নোয়েলকে একটি দেয়ালের সামনে নিয়ে এল। কোমরের পেছনে শক্ত করে বাঁধল হাত। একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল ওকে। ওর বাবা বলছে, *ওই জাহাজগুলো দেখতে পাচ্ছ, প্রিন্সেস? ওগুলো তোমার নৌবহর। একদিন ওই জাহাজে চড়ে তুমি পৃথিবীর সেরা জায়গাগুলোয় ঘুরতে যাবে।* বাবা ওকে জড়িয়ে ধরল। নিজেকে নিরাপদ মনে হচ্ছে নোয়েলের। নোয়েল জানে না বাবা কেন তার ওপর রেগে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। বাবা আবার তাকে আদর করবে, ভালোবাসবে। বাবার দিকে ফিরল নোয়েল। কিন্তু তার চেহারাটা আবছা হয়ে গেল। মনে পড়ছে না বাবা কেমন ছিল দেখতে। বাবার চেহারা ভুলে গেছে নোয়েল।

প্রচণ্ড দুঃখ লাগছে নোয়েলের। যেন মূল্যবান কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছে। বাবার চেহারা মনে করতেই হবে নইলে ও বাঁচবে না। মনোসংযোগের চেষ্টা করল নোয়েল। কিন্তু বাবার চেহারা দেখার আগেই বজ্রপাতের শব্দ হল, ওর শরীরে যেন একসঙ্গে বসিয়ে দেয়া হল হাজার হাজার ছুরি। ওর বুক হাহাকার করে উঠল, *'না! এখন না! আমার বাবার মুখটা দেখতে দাও!'*

কিন্তু গভীর আঁধারে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল সে মুখ।

উপসংহার

সমাধিস্তম্ভ ধরে হাঁটছেন নারী এবং পুরুষটি। তাদের মুখে লম্বা সাইপ্রেসের ছায়া পড়েছে। পথের দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছগুলো। দুপুরের তপ্ত রোদে হাঁটছেন ওরা।

সিস্টার থেয়েসা বললেন, ‘আপনার মহানুভবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আপনি না থাকলে আমাদের যে কী দশা হত জানি না।’

হাত নাড়লেন কনস্টানটিন ডেমিরিস, ‘আরে, এসব কিছু না, সিস্টার।’

কিন্তু সিস্টার থেরেসা জানেন গ্রিক টাইকুনটি অর্থসাহায্য না করলে তাদের এই মঠ বন্ধ হয়ে যেত বহু আগে। তিনি এই মানুষটির উপকারের কিছুটা হলেও প্রতিদান এখন দিতে পারছেন। সেইন্ট ডাইওনিসিয়াসকে তিনি আবার ধন্যবাদ দিলেন ডেমিরিসের আমেরিকান বান্ধবীকে সেই ভয়ংকর ঝড়ের রাতে লেক থেকে উদ্ধার করার জন্য। তবে মেয়েটির মনোজগতে ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে। শিশুর মতো আচরণ করছে সে। তবে তার ঠিকমতো যত্নআত্তি নেয়া হচ্ছে। মি. ডেমিরিস সিস্টার থেরেসাকে বলেছেন মেয়েটিকে এই চার-দেয়ালের মধ্যে রাখতে। বাকি জীবনটা তার এখানেই কাটবে। ডেমিরিস খুবই দয়ালু মানুষ।

সমাধির শেষপ্রান্তে চলে এসেছেন ওরা। রাস্তার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। স্থিরদৃষ্টি শান্ত, সবুজ পান্না হ্রদের দিকে।

‘এই যে সে,’ বললেন সিস্টার থেরেসা, ‘আপনি কথা বলুন। আমি গেলাম।’

মঠের দিকে পা বাড়ালেন সিস্টার থেরেসা। ডেমিরিস এগোলেন মেয়েটির দিকে।

‘সুপ্রভাত,’ নরম গলায় বললেন তিনি।

ধীরে ধীরে ঘুরল সে। তাকাল ডেমিরিসের দিকে। তার চোখ নিষ্প্রভ, ফাঁকা। ডেমিরিসকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না।

‘তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি,’ বললেন ডেমিরিস।

পকেট থেকে একটি জুয়েলারি বক্স বের করলেন তিনি। এগিয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। সে বক্সের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শিশুদের মতো।

‘নাও।’

হাত বাড়িয়ে বক্স নিল মেয়েটি। খুলল। ভেতরে তুলোর মধ্যে শুয়ে আছে সোনার একটি পাখি। পাখিটির চোখজোড়া লাল রুবির, ডানা ছড়ানো। যেন উড়াল দেবে এক্ষুনি। সে পাখিটি তুলে নিল বক্স থেকে। চোখের সামনে নিয়ে এল। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল পাখির সোনালি গা এবং পাথরের লাল চোখ। ছোট্ট একটি রংধনুর সৃষ্টি করল। সে উল্টেপাল্টে দেখছে পাখিটি।

'তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না,' বললেন ডেমিরিস, 'তবে ভয় নেই। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। দুষ্টু লোকগুলো মরে গেছে।'

মেয়েটি একমুহূর্তের জন্য তাকাল ডেমিরিসের দিকে। ডেমিরিসের মনে হল মুহূর্তের জন্য তিনি ওর চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ ফুটে উঠতে দেখেছেন, সেইসঙ্গে আনন্দ। তবে পরমুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে এল চাউনি। শূন্য, ফাঁকা দৃষ্টি। হয়তো চোখে ভ্রম দেখেছেন ডেমিরিস। সোনার পাখির ঝলকানি মুহূর্তের জন্য একটা ইল্যুসন তৈরি করেছে।

কনস্টানটিন ডেমিরিস ঘুরলেন। ধীরগতিতে এগোলেন মঠের প্রকাণ্ড পাথরের গেটে। ওখানে অপেক্ষা করছে তাঁর লিমুজিন। তাঁকে নিয়ে যাবে এথেন্সে।